বাংলাদেশ

CONFINED

একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা

সরকারী খাতের সংস্কার

BPATC LIBRARY
Accession No.
Class No.
Source Cost
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রন্থাগার সাভার ঢাকা

বিশ্বব্যাংকের জন্য প্রকাশিত

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

0 7 JAN 1997

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্ট বিল্ডিং
১১৪ মতিঝিল বা/এ
পোষ্ট বক্স ২৬১১
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

Fax : 880-2-867547

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৬

BPATC LIBRARY
Accession No. 80314
Class No. 351·0073/ব03
Source
Cost
বাংলা
ক-১

© বিশ্বব্যাংক ১৯৯৬

প্রচ্ছদ : গৌতম চক্রবর্তী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এই বই অথবা এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ, বাজারজাত অথবা যে কোন রূপে বা অর্থে যেমন, কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার, সিডি রম, ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোন মাধ্যমে ব্যবহার অথবা প্রকাশ করা যাবে না।

এই রিপোর্ট একটি সমন্বিত গবেষণা যা বিশ্বব্যাংক স্টাফ ও বাংলাদেশের উপদেষ্টাবৃন্দ কর্তৃক প্রণীত এবং এখানে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে তা বোর্ডের নির্বাহী পরিচালকগণ অথবা তাদের সরকারের মতামত নয়।

ISBN 984 05 1070 4

প্রকাশক : মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
মুদ্রণ : দি লেমিনেটরস, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।

0 7 JAN 1997

মুদ্রা তুল্যমান

বাংলাদেশী টাকার বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয় একগুচ্ছ বৈদেশিক মুদ্রার সাথে সম্পর্কের নিরিখে। এক্ষেত্রে মার্কিন ডলার হলো ইন্টারভেনশন কারেন্সি। ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ তারিখে সরকারী বিনিময় হার ছিল :

১ মার্কিন ডলার	=	৪১.০০ টাকা
১ টাকা	=	০.০২৪ মার্কিন ডলার

স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ব্যয় এবং রাজস্ব কখনও কখনও কোটির হিসেবে দেখানো হয়। এক কোটি টাকা হলো ১০ মিলিয়ন টাকার সমান। বর্তমানে সরকারী বিনিময় হার অনুযায়ী ১ কোটি টাকা = ২৪৩,০০০ মার্কিন ডলার।

এই প্রতিবেদনে মার্কিন ডলার কখনও কখনও শুধু ডলার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

351.0073
BAL/1996

ওজন ও মাপ

KWH	=	কিলোওয়াট আওয়ার
MCF	=	মিলিয়ন কিউবিক ফিট
MMCFD	=	মিলিয়ন কিউবিক ফিট পার ডে
MT	=	মেট্রিক টন
MW	=	মেগাওয়াটস

অর্থ বছর

জুলাই ১ - জুন ৩০

CONFINED

শব্দ-সংক্ষেপ তালিকা

ACR	-	Annual Confidential Report
ACB	-	Anti-Corruption Bureau
ADP	-	Annual Development Program
ADR	-	Alternative Dispute Resolution
AGM	-	Annual General Meeting
ASRC	-	Administrative Services & Reorganization Committee
BADC	-	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BAU		Budget Analysis Unit
BB	-	Bangladesh Bank
BBS	-	Bangladesh Bureau of Statistics
BCIC	-	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BCS	-	Bangladesh Civil Service
BD	-	Bangladesh
BEPZA	-	Bangladesh Export Processing Zone Authority
BGMEA	-	Bangladesh Garments Manufacturers & Exporters Association
BIWTA	-	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIWTC	-	Bangladesh Inland Water Transport Corporation
BJMC	-	Bangladesh Jute Mills Corporation
BOI	-	Board of Investment
BOO	-	Build Operate Own
BOT	-	Build Operate Transfer
BKB	-	Bangladesh Krishi Bank
BPC	-	Bangladesh Petroleum Corporation
BPDB	-	Bangladesh Power Development Board
BPDU	-	Building and Planning Design Unit
BR	-	Bangladesh Railway
BRAC	-	Bangladesh Rural Advancement Committee
BRTA	-	Bangladesh Road Transport Authority
BRTC	-	Bangladesh Road Transport Corporation
BRDB	-	Bangladesh Rural Development Board
BSC	-	Bangladesh Shipping Corporation
BSI	-	Bangladesh Standards Institution
BSS	-	Bittihin Samabay Samity
BTC	-	Bangladesh Tariff Commission
BTMC	-	Bangladesh Textile Mills Corporation
BTTB	-	Bangladesh Telegraph and Telephone Board
BUET	-	Bangladesh University of Engineering & Technology
BWDB	-	Bangladesh Water Development Board
CAAB	-	Civil Aviation Authority of Bangladesh
CAG	-	Comptroller & Auditor General
CARR	-	Committee for Administrative Reorganization/Reform
CCFEA	-	Council Committee for Finance & Economic Affairs
CE	-	Chief Executive
CG	-	Central Government
CH	-	Chapter
CJ	-	Chief Justice
CPI	-	Consumer Price Index
CSCRs	-	Civil Service Conduct Rules
CSM	-	Civil Service Management
CSP	-	Civil Service of Pakistan
CY	-	Calendar Year

DEDO	-	Duty Exemption and Drawback Office
DESA	-	Dhaka Electricity Supply Authority
DFI	-	Development Financial Institution
DG	-	Director General
DMP	-	Dhaka Metropolitan Police
DOA	-	Department of Architecture
DOAFAP	-	Directorate of Audit for Foreign Aided Projects
DOC	-	Department of Cooperatives
DPHE	-	Department of Public Health and Engineering
DRC	-	Dhaka Research Centre
Dy.	-	Deputy
ECNEC	-	Executive Committee of National Economic Council
EDI	-	Economic Development Institution
EPB	-	Export Promotion Bureau
EPCS	-	East Pakistan Civil Service
EPF	-	Export Promotion Fund
EPI	-	Expanded Program of Immunization
EPIWTC	-	East Pakistan Inland Water Transport Corporation
EPZ	-	Export Processing Zone
ERD	-	Economic Relations Division
FIAS	-	Foreign Investment Advisory Service
FLC	-	Financial Loan Court
FP	-	Family Planning
FSR	-	Four Secretaries Report
GATT	-	General Agreement on Tariffs and Trade
GB	-	Grameen Bank
GDP	-	Gross Domestic Product
GEP	-	General Education Project
GOB	-	Government of Bangladesh
GSCR	-	Government Servants Conduct Rule
HPP	-	Health & Population Program
IAS	-	Indian Administrative Service
IBA	-	Institute of Business Administration
IEDCR	-	Institute of Epidemiology, Disease Control & Research
IFC	-	International Finance Corporation
IIMS	-	Indian Institute of Management Services
IMED	-	Implementation Monitoring & Evaluation Division
IMF	-	International Monetary Fund
INFEP	-	Integrated Non-Formal Education Project
IOC	-	International Oil Company
IRD	-	Internal Resources Division
IRDP	-	Integrated Rural Development Program
JMBA	-	Jamuna Multi-purpose Bridge Authority
JS	-	Joint Secretary
KAFCO	-	Karnaphuli Fertilizer Company
KSS	-	Krishi Samabay Samities

LC	-	Letter of Credit
LG	-	Local Government
LGD	-	Local Government Division
LGED	-	Local Government Engineering Department
LGRD	-	Local Government, Rural Development & Cooperatives
LNG	-	Liquid Natural Gas
LOI	-	Letter of Invitation
MBSS	-	Mahila Bittihin Samabay Samity
MEMR	-	Ministry of Energy & Mineral Resources
MHW	-	Ministry of Housing and Works
MIS	-	Management Information System
MMM	-	Motivation, Mobilization & Monitoring
MOC	-	Ministry of Commerce
MOE	-	Ministry of Education
MOE	-	Ministry of Establishment
MOF	-	Ministry of Finance
MOL	-	Ministry of Law
MOT	-	Ministry of Textiles
MOT	-	Ministry of Transport
MOU	-	Memorandum of Understanding
MOWR	-	Ministry of Water Resources
MP	-	Member of Parliament
MSS	-	Mahila Samabay Samity
NBR	-	National Board of Revenue
NCRG	-	National Commission for Reforming Government
NCB	-	Nationalized Commercial Bank
NCTB	-	National Curriculum and Textbook Board
NFPE	-	Non-Formal Primary Education
NGO	-	Non-Governmental Organization
NIC	-	Newly Industrializing Country
NNRC	-	Nurun Nabi Reorganization Committee
NPS	-	National Pay Scale
NZ	-	New Zealand
OECD	-	Organization for Economic Cooperation and Development
ORS	-	Oral Rehydration Solution
ORT	-	Oral Rehydration Therapy
PAC	-	Public Accounts Committee
PAES	-	Public Administration Efficiency Study
PASS	-	Public Administration Sector Study
PATC	-	Public Administration Training Centre
PB	-	Privatization Board
PBS	-	Palli Bidyut Samity
PCB	-	Private Commercial Bank
PCO	-	Public Call Office
PCU	-	Project Coordinating Units
PD	-	Project Director
PDB	-	Power Development Board
PEPP	-	Petroleum Exploration and Promotion Project
PHC	-	Primary Health Care
PKSF	-	Palli Karma Shahayak Foundation

PM	-	Prime Minister
PP	-	Project Proforma
PSCs	-	Production Sharing Contracts
PSC	-	Public Service Commission
PSD	-	Private Sector Development
PSMR	-	Public Sector Management Reform
PWD	-	Public Works Department
REB	-	Rural Electrification Board
RDP	-	Rural Development Program
RDRS	-	Rangpur Dinajpur Rural Society
RMG	-	Ready-Made Garments
Rs.	-	Rupees
RTD	-	Road Transport Division
RWS	-	Rural Water Supply
SIU	-	Service Improvement Unit
SOE	-	State-Owned Enterprise
SRO	-	Statutory Regulatory Order
SSSB	-	Senior Services Selection Board
SSP	-	Senior Selection Pool
SSSP	-	Specialized Senior Services Pool
STOL	-	Short Take-Off and Landing
SWOT	-	Strength Weaknesses Opportunities Threats
sq.ft.	-	Square Feet
TAPP	-	Technical Assistance Project Proforma
THC	-	Thana Health Complex
Tk.	-	Taka
TLM	-	Total Literacy Movement
TOR	-	Terms of Reference
UGS	-	Unified Grade System
UNDP	-	United Nations Development Program
UNICEF	-	United Nations Children's Fund
UP	-	Union Parishad
USAID	-	United States Agency for International Development
UPEA	-	Universal Primary Education for All
VFM	-	Value-For-Money
VGD	-	Vulnerable Group Development
WASA	-	Water Supply and Sewerage Authority
WATSAN	-	Water & Sanitation
WC	-	Water Closet
WFP	-	World Food Program
WHO	-	World Health Organization

মুখবন্ধ

"সব কিছুরই আছে নিজস্ব একটি ঋতু, আর আকাশের নিচে সকল উদ্দেশ্যের রয়েছে নিজস্ব একটি সময়" – এক্লেসিয়াস্টিস।

বাংলাদেশে লোক প্রশাসনের উপর প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সমীক্ষাই হয়েছে কিন্তু প্রায়োগিক ফলাফল পাওয়া গেছে সামান্যই। তাহলে আরেকটি সমীক্ষা কেন? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি, এ সমীক্ষাটি এজন্য যে অনেক সময় দৃষ্টিকোণটি সামান্য বদলে দিলে একটি নতুন প্রেক্ষিত ধরা পড়ে, যা দৃশ্যতঃ নিস্পত্তির অযোগ্য বিষয়েরও সমাধান দিতে সাহায্য করে। এই প্রতিবেদনের সূচনাবিন্দু হচ্ছে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন। যেমন, বাংলাদেশে সরকারের ভূমিকা ও চরিত্র কি হওয়া উচিত ? এ সরকার তার নাগরিকদের সবচেয়ে ভাল সেবা দেবে কিভাবে? সরকার কিভাবে বেসরকারী খাতে শক্তি সঞ্চার করবে এবং এ খাতের সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগাবে ?

এ পর্যন্ত লোক-ব্যবস্থাপনা সংস্কার সম্পর্কিত সমীক্ষাগুলি বহুলাংশে সরকার "কিভাবে" চলবে, তার মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে। কিন্তু যে কোনো কার্যকর সংস্কার কর্মসূচিকে সরকারের "কিভাবে" এবং "কি" এর মধ্যে যোগসূত্রকে খুঁজে নিতে হবে। সংস্কারাধীন দেশগুলিতে এই "কি" এর বিষয়টি "কিভাবে"র বিষয়কে প্রভাবিত করেছে। অন্য একটি পর্যায়ে, "কিভাবে"র চূড়ান্ত পরীক্ষা হচ্ছে এ বিষয়টি দেখা যে, "কি"এর সম্পর্কে উন্নততর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার ও জনগোষ্ঠিগুলিকে এটি সমর্থন দিচ্ছে কিনা।

এই প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, এটি দেশজ। সরকারী খাতের বিষয়গুলিকে একদল বাংলাদেশী নাগরিক পরীক্ষা করে দেখেছেন, যাদের সরকারী খাত সংস্কারে যেমন জ্ঞান রয়েছে, তেমনি রয়েছে আগ্রহও। এই প্রতিবেদনের ফলাফলগুলি বিভিন্ন কেইস (case) সমীক্ষা, নাগরিক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর পরিচালিত জরিপ এবং সংবাদপত্রের বিষয় বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করেছে।

এই প্রতিবেদনটি আটটি পরিচ্ছেদে সংগঠিত, এবং এতে সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন, সরকারের অতিরিক্ত সম্প্রসারণ; সকল সরকারী উদ্যোগের জন্য উদ্দীপক ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্টাবলী; জবাবদিহিতার অপর্যাপ্ত মাত্রা ও প্রকৃতি; নিয়ন্ত্রণমূলক বোঝা এবং বিচার পদ্ধতির নিম্নমানের কার্যসম্পাদনা; দুর্বল নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন, এবং ধীর গতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সবশেষে, বেতন ভাতা ও কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অকার্যকারিতা।

রাষ্ট্র ও সরকারী খাতের কার্যসম্পাদনার উপর দেশে চলমান বিতর্কের মান, গভীরতা ও পরিসর বাড়াতে, রাজনৈতিক সমাজে সরকারী খাতের কার্যসম্পাদনা ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে, সরকারী খাতের সংস্কারের ক্ষেত্রে নানা দেশের অভিজ্ঞতা, এবং বিশ্লেষণমূলক উপাত্ত প্রদান করতে, পরিবর্তনের জন্য গতিশীলতা বাড়াতে এবং বাংলাদেশে যেসব শক্তি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিচ্ছে তাদের জোরদার করতে এই প্রতিবেদন একটি ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ প্রতিবেদন বাংলাদেশে সরকারী খাতের চলমান সংস্কার উদ্যোগগুলিতে পরিবর্তন আনতে বিভিন্ন ধারণার যোগান দিবে, যাতে একটি শক্তিশালী প্রভাব রাখা সম্ভব হবে। এ বিষয়টি এতদিন ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। বস্তুতঃ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আচরণগত পরিবর্তন আনতে যে ব্যাপকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং প্রেক্ষিত প্রয়োজন, এসব উদ্যোগে তা অনুপস্থিত ছিল। প্রতিবেদনটি প্রকৃতিগত ভাবে রীতিমূলক। আগামী সরকারকে সরকারী খাতের সংস্কারের জন্য একটি বিষয়সূচি নির্ধারণ করতে এই প্রতিবেদনে স্বল্প মেয়াদে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলিতে সংস্কার সাধনের সুপারিশ রাখা হচ্ছে, এবং রাষ্ট্রের পুনঃসংজ্ঞায়িত ভূমিকার একটি দীর্ঘ-মেয়াদী ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুসমন্বিত মধ্যম- মেয়াদী কার্য-পরিকল্পনা কিভাবে তৈরি করতে হবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ

একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা : সরকারী খাতের সংস্কার

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

নির্বাহী সারসংক্ষেপ i

অধ্যায় ১: ভালো রাষ্ট্র এবং অসন্তোষজনক রাষ্ট্র

সরকারী খাতের অর্থনৈতিক মানচিত্র..১
যেসব অর্জন নিয়ে গর্ব করা যায়..২
সরকারী খাত — নিচ থেকে দেখা..৩
বিরামহীন অদক্ষতা — উপর থেকে দেখা....................................১০
সংস্কারের অপরিহার্যতা..১২
সরকারকে কর্মক্ষম করতে..১৪
প্রতিবেদনের বিশ্লেষণমূলক বিন্যাস এবং কাঠামো..............................১৯

অধ্যায় ২ :সর্বত্র গজিয়ে ওঠা সরকার —সময় এসেছে পুনর্বিবেচনার

সরকারের বৃদ্ধি...২৩
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের যুক্তি : সরকারী এবং ব্যক্তিগত সেবাসামগ্রী..................২৫
কেইস সমীক্ষাসমূহ...২৭
সরকারকে সঠিক আকৃতিতে আনা : পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার
ও ব্যবস্থাপনা ৩৫
রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং ম্যান্ডেট..৩৭
প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা..৩৭
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং বাজেটগত পদ্ধতিসমূহ...........................৪৩
ক্ষতিগ্রস্তদের দলে আনা..৪৩

অধ্যায় ৩ : দক্ষতা বৃদ্ধি — সাফল্যের শিক্ষাগুলি কাজে লাগানো

সাফল্যের ঘটনা ৪৫
কেইস সমীক্ষাগুলি থেকে যা দেখা গেল ৫২
সাফল্যের শিক্ষা কাজে লাগানো ৫৮
বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)সমূহের ভূমিকা জোরদার করা ৫৯

পৃষ্ঠা

স্থানীয় সরকার : অনুদ্ঘাটিত সম্ভাবনা..৬১
এজেন্সি-বিকল্প...৬৩

অধ্যায় ৪ : জবাবদিহিতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি

সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাসমূহকে শক্তিশালী করা........................৬৭
সরকারের সংসদীয় জবাবদিহিতা..৬৭
কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল...৬৯
নির্বাহী বিভাগের ভিতর জবাবদিহিতা বাড়ানো..৭২
সরকারী বাজেটের কেন্দ্রিকতা..৭২
বাস্তবায়ন, প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ..৭৯
অন্যান্য পদক্ষেপ...৮০
গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি..৮১
স্বচ্ছতা বৃদ্ধি..৮৫
দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ...৮৮

অধ্যায় ৫ : সরকারী শাসন এবং বেসরকারী খাতের কর্মকান্ড

নাগরিক, ফার্মসমূহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক অভিন্ন ক্ষেত্র..................................৯৬
বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা — নিয়ন্ত্রণ নয়, গলা টিপে ধরা.......................................৯৮
ভাল নিয়ন্ত্রণমূলক ডিজাইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ..১১০
আইনগত অচলাবস্থা..১১৮
বেসরকারী খাতের প্রসার বাড়ানো...১২৩
রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ...১২৯

অধ্যায় ৬ : সরকারের কাজকর্ম — নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন...১৩১
প্রশাসনিক নিয়মকানুন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ...১৩৭
রুলস অফ বিজিনেস..১৩৯
কেন্দ্রিভূত ও বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ..১৪১

অধ্যায় ৭ : সিভিল সার্ভিস কর্মী ব্যবস্থাপনা

বেসামরিক প্রশাসন...১৪৮
আসল বিষয় — বেতন-ভাতা..১৫৫
দক্ষতার অপপ্রয়োগ — জেলা ব্যবস্থাপক হিসেবে ডাক্তার......................................১৬৪
পদোন্নতি...১৬৮

পৃষ্ঠা

বদলী ব্যবস্থা..১৬৯
নারী-পুরুষ বৈষম্য..১৭১
প্রশিক্ষণ..১৭৩
কর্মী যৌক্তিকীকরণ এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মী ব্যবস্থাপনা..................১৭৫
সরকারী চাকুরির মূল্যবোধ বৃদ্ধি..১৭৭
সরকারী চাকুরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ..........................১৭৮

অধ্যায় ৮ : গন্তব্যের দিকে যাত্রা — দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন

পরিবর্তনের শক্তিসমূহ...১৮১
অভিজ্ঞতার শিক্ষা..১৮৪
পরিবর্তনের প্রচার ও ব্যবস্থাপনা..১৮৫
একবিংশ শতাব্দী — বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খাতের চেহারা.....................১৮৬

পরিশিষ্ট : বাংলাদেশ: একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা: সরকারী খাতের সংস্কার

১. সরকারের কাঠামো..১৮৮
২. দাতা-সহায়তা প্রাপ্ত লোক প্রশাসন সংস্কার সমীক্ষা..........................১৯০
৩. সংস্থা পদ্ধতি (এজেন্সি এ্যাপ্রোচ) রূপরেখা....................................১৯১
৪. বাজেট পঞ্জিকা ও প্রক্রিয়া..১৯৩

সারণী এবং ঘরসমূহের তালিকা

পৃষ্ঠা

সারণীসমূহ

২.১ মন্ত্রণালয়ের বৃদ্ধি ২৩
২.২ বেসামরিক প্রশাসনের চাকুরি বৃদ্ধি...২৪
২.৩ সরকারী কর্মচারীদের বেতনভাতা খরচের প্রবণতা..........................২৫

৭.১ বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরি বৃদ্ধি...১৫০
৭.২ সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মচারীর মন্ত্রণালয় সমূহ.....................................১৫১
৭.৩ মন্ত্রণালয়সমূহের উর্ধতন কর্মকর্তা ঃ কর্মচারী অনুপাত.......................১৫২
৭.৪ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বেসামরিক প্রশাসনের আকার........................১৫৩
৭.৫ সরকারী কর্মচারীদের বেতনভাতা (কমপেনসেশন) ব্যয়ের প্রবণতা..........১৫৪
৭.৬ বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা..১৫৪
৭.৭ বেসামরিক প্রশাসনে বেতন স্তরসমূহ...১৫৬
৭.৮ সংকোচন (কম্প্রেশন) হারের প্রবণতা...১৫৬

পৃষ্ঠা

৭.৯ শীর্ষ সচিবালয় কর্মকর্তাদের নমিনাল ও প্রকৃত বেতন..১৫৭
৭.১০ বিচারকদের বেতনের ক্রয় ক্ষমতা..১৫৮
৭.১ বেসামরিক প্রশাসন ও বেসরকারী খাতের বেতন..১৫৯
৭.১২ বেতন বৃদ্ধি ও ছাঁটাইয়ের অর্থায়ন..১৬২
৭.১৩ বিসিএস নির্বাচনে নারী-পুরুষ অনুপাত..১৭২
৭.১৪ নির্বাচিত কয়েকটি দেশে অব্যাহতির ফর্মুলা..১৭৭

<u>ঘরসমূহ</u>

১.১ সেবা প্রাপ্তি ও সেবার মান সম্পর্কে নাগরিকদের অভিমত..৬
১.২ বাংলাদেশে ব্যবসা করার পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসমূহ..৭
১.৩ সরকারী খাতের ক্ষতির সুযোগ ব্যয়..১১
১.৪ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার : আরো দক্ষ করে তোলা..১৪
১.৫ মালয়েশিয়া : সরকারী সেবার উন্নতিবিধান..১৬
১.৬ নিউজিল্যান্ড : সরকারের নতুন ভূমিকা..১৮

২.১ অর্থের বিনিময়ে মূল্য — প্রতিটি করদাতা ও ভোক্তার .সাংবিধানিক অধিকার............৩৯
২.২ সার বিপণন বেসরকারীকরণ..৪৪

৩.১ অর্থায়ন থেকে সরবরাহ পৃথকীকরণ — একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত..৪৬
৩.২ পাওয়ার গেম — পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) এবং
ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) ৪৭
৩.৩ উদ্বুদ্ধকরণ, সমাবেশ ঘটানো এবং প্রত্যবেক্ষণ —
সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য..৪৭
৩.৪ প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা সরবরাহের বিকল্প পদ্ধতিসমূহ..৪৮
৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর : একটি দক্ষ সরকার..৫০
৩.৬ সরকার-এনজিও সহযোগিতার কয়েকটি সফল উদাহরণ..৫১
৩.৭ এজেন্সি উদ্দেশ্য নির্ধারণ — যুক্তরাজ্যের প্রিজন সার্ভিস..৬৪

৪.১ নির্বাচিত কিছু দেশে বাজেট সংস্কার..৭৫
৪.২ এজেন্সি-উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ : ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি গভর্নমেন্ট,
ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র..৭৭
৪.৩ নাগরিকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগসমূহ..৮২
৪.৪ নাগরিকদের সনদ : যুক্তরাজ্যের উদাহরণ..৮৩
৪.৫ দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ..৯২

৫.১ ভাল আইন কিভাবে মন্দ হয়ে যায়..১০৩
৫.২ লুব্রিকেন্ট থেকে সাপের তেল..১০৪
৫.৩ বাংলাদেশে ব্যবসা করার লুক্কায়িত ব্যয়..১০৮
৫.৪ নিয়ন্ত্রণমূলক এবং আমলাতান্ত্রিক গোলক ধাঁধাঁয় পথ খোঁজা..১০৯

শব্দ-সংক্ষেপ তালিকা

ACR	-	Annual Confidential Report
ACB	-	Anti-Corruption Bureau
ADP	-	Annual Development Program
ADR	-	Alternative Dispute Resolution
AGM	-	Annual General Meeting
ASRC	-	Administrative Services & Reorganization Committee
BADC	-	Bangladesh Agricultural Development Corporation
BAU		Budget Analysis Unit
BB	-	Bangladesh Bank
BBS	-	Bangladesh Bureau of Statistics
BCIC	-	Bangladesh Chemical Industries Corporation
BCS	-	Bangladesh Civil Service
BD	-	Bangladesh
BEPZA	-	Bangladesh Export Processing Zone Authority
BGMEA	-	Bangladesh Garments Manufacturers & Exporters Association
BIWTA	-	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BIWTC	-	Bangladesh Inland Water Transport Corporation
BJMC	-	Bangladesh Jute Mills Corporation
BOI	-	Board of Investment
BOO	-	Build Operate Own
BOT	-	Build Operate Transfer
BKB	-	Bangladesh Krishi Bank
BPC	-	Bangladesh Petroleum Corporation
BPDB	-	Bangladesh Power Development Board
BPDU	-	Building and Planning Design Unit
BR	-	Bangladesh Railway
BRAC	-	Bangladesh Rural Advancement Committee
BRTA	-	Bangladesh Road Transport Authority
BRTC	-	Bangladesh Road Transport Corporation
BRDB	-	Bangladesh Rural Development Board
BSC	-	Bangladesh Shipping Corporation
BSI	-	Bangladesh Standards Institution
BSS	-	Bittihin Samabay Samity
BTC	-	Bangladesh Tariff Commission
BTMC	-	Bangladesh Textile Mills Corporation
BTTB	-	Bangladesh Telegraph and Telephone Board
BUET	-	Bangladesh University of Engineering & Technology
BWDB	-	Bangladesh Water Development Board
CAAB	-	Civil Aviation Authority of Bangladesh
CAG	-	Comptroller & Auditor General
CARR	-	Committee for Administrative Reorganization/Reform
CCFEA	-	Council Committee for Finance & Economic Affairs
CE	-	Chief Executive
CG	-	Central Government
CH	-	Chapter
CJ	-	Chief Justice
CPI	-	Consumer Price Index
CSCRs	-	Civil Service Conduct Rules
CSM	-	Civil Service Management
CSP	-	Civil Service of Pakistan
CY	-	Calendar Year

DEDO	-	Duty Exemption and Drawback Office
DESA	-	Dhaka Electricity Supply Authority
DFI	-	Development Financial Institution
DG	-	Director General
DMP	-	Dhaka Metropolitan Police
DOA	-	Department of Architecture
DOAFAP	-	Directorate of Audit for Foreign Aided Projects
DOC	-	Department of Cooperatives
DPHE	-	Department of Public Health and Engineering
DRC	-	Dhaka Research Centre
Dy.	-	Deputy
ECNEC	-	Executive Committee of National Economic Council
EDI	-	Economic Development Institution
EPB	-	Export Promotion Bureau
EPCS	-	East Pakistan Civil Service
EPF	-	Export Promotion Fund
EPI	-	Expanded Program of Immunization
EPIWTC	-	East Pakistan Inland Water Transport Corporation
EPZ	-	Export Processing Zone
ERD	-	Economic Relations Division
FIAS	-	Foreign Investment Advisory Service
FLC	-	Financial Loan Court
FP	-	Family Planning
FSR	-	Four Secretaries Report
GATT	-	General Agreement on Tariffs and Trade
GB	-	Grameen Bank
GDP	-	Gross Domestic Product
GEP	-	General Education Project
GOB	-	Government of Bangladesh
GSCR	-	Government Servants Conduct Rule
HPP	-	Health & Population Program
IAS	-	Indian Administrative Service
IBA	-	Institute of Business Administration
IEDCR	-	Institute of Epidemiology, Disease Control & Research
IFC	-	International Finance Corporation
IIMS	-	Indian Institute of Management Services
IMED	-	Implementation Monitoring & Evaluation Division
IMF	-	International Monetary Fund
INFEP	-	Integrated Non-Formal Education Project
IOC	-	International Oil Company
IRD	-	Internal Resources Division
IRDP	-	Integrated Rural Development Program
JMBA	-	Jamuna Multi-purpose Bridge Authority
JS	-	Joint Secretary
KAFCO	-	Karnaphuli Fertilizer Company
KSS	-	Krishi Samabay Samities

LC	-	Letter of Credit
LG	-	Local Government
LGD	-	Local Government Division
LGED	-	Local Government Engineering Department
LGRD	-	Local Government, Rural Development & Cooperatives
LNG	-	Liquid Natural Gas
LOI	-	Letter of Invitation
MBSS	-	Mahila Bittihin Samabay Samity
MEMR	-	Ministry of Energy & Mineral Resources
MHW	-	Ministry of Housing and Works
MIS	-	Management Information System
MMM	-	Motivation, Mobilization & Monitoring
MOC	-	Ministry of Commerce
MOE	-	Ministry of Education
MOE	-	Ministry of Establishment
MOF	-	Ministry of Finance
MOL	-	Ministry of Law
MOT	-	Ministry of Textiles
MOT	-	Ministry of Transport
MOU	-	Memorandum of Understanding
MOWR	-	Ministry of Water Resources
MP	-	Member of Parliament
MSS	-	Mahila Samabay Samity
NBR	-	National Board of Revenue
NCRG	-	National Commission for Reforming Government
NCB	-	Nationalized Commercial Bank
NCTB	-	National Curriculum and Textbook Board
NFPE	-	Non-Formal Primary Education
NGO	-	Non-Governmental Organization
NIC	-	Newly Industrializing Country
NNRC	-	Nurun Nabi Reorganization Committee
NPS	-	National Pay Scale
NZ	-	New Zealand
OECD	-	Organization for Economic Cooperation and Development
ORS	-	Oral Rehydration Solution
ORT	-	Oral Rehydration Therapy
PAC	-	Public Accounts Committee
PAES	-	Public Administration Efficiency Study
PASS	-	Public Administration Sector Study
PATC	-	Public Administration Training Centre
PB	-	Privatization Board
PBS	-	Palli Bidyut Samity
PCB	-	Private Commercial Bank
PCO	-	Public Call Office
PCU	-	Project Coordinating Units
PD	-	Project Director
PDB	-	Power Development Board
PEPP	-	Petroleum Exploration and Promotion Project
PHC	-	Primary Health Care
PKSF	-	Palli Karma Shahayak Foundation

PM	-	Prime Minister
PP	-	Project Proforma
PSCs	-	Production Sharing Contracts
PSC	-	Public Service Commission
PSD	-	Private Sector Development
PSMR	-	Public Sector Management Reform
PWD	-	Public Works Department
REB	-	Rural Electrification Board
RDP	-	Rural Development Program
RDRS	-	Rangpur Dinajpur Rural Society
RMG	-	Ready-Made Garments
Rs.	-	Rupees
RTD	-	Road Transport Division
RWS	-	Rural Water Supply
SIU	-	Service Improvement Unit
SOE	-	State-Owned Enterprise
SRO	-	Statutory Regulatory Order
SSSB	-	Senior Services Selection Board
SSP	-	Senior Selection Pool
SSSP	-	Specialized Senior Services Pool
STOL	-	Short Take-Off and Landing
SWOT	-	Strength Weaknesses Opportunities Threats
sq.ft.	-	Square Feet
TAPP	-	Technical Assistance Project Proforma
THC	-	Thana Health Complex
Tk.	-	Taka
TLM	-	Total Literacy Movement
TOR	-	Terms of Reference
UGS	-	Unified Grade System
UNDP	-	United Nations Development Program
UNICEF	-	United Nations Children's Fund
UP	-	Union Parishad
USAID	-	United States Agency for International Development
UPEA	-	Universal Primary Education for All
VFM	-	Value-For-Money
VGD	-	Vulnerable Group Development
WASA	-	Water Supply and Sewerage Authority
WATSAN	-	Water & Sanitation
WC	-	Water Closet
WFP	-	World Food Program
WHO	-	World Health Organization

পৃষ্ঠা

৫.৫	কার্যকর নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারের মৌলিক বিষয়াদি	১১০
৫.৬	দেশে দেশে বি-নিয়ন্ত্রণ	১১৩
৫.৭	স্টক-লট নিয়ে সতেরো বছরের আইনযুদ্ধ	১১৬
৫.৮	আদালতের দুর্বলতার জন্য আইন প্রণয়ন কিভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে	১১৮
৫.৯	বাংলাদেশ কি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হতে পারে	১২৫
৫.১০	রপ্তানীর জন্য মাঝে মাঝে ভাগ্য অনুকূল থাকতে হয়	১২৬
৬.১	সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ	১৩৩
৬.২	নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হল, কিন্তু বাস্তবে কি ঘটে	১৩৫
৬.৩	বিলম্বিত সংগ্রহ	১৪৫
৭.১	আমলাতান্ত্রিক অভিধান	১৪৯
৭.২	নিয়োগ চেকলিষ্ট	১৬৮
৭.৩	কিভাবে অন্যান্য দেশ কার্যসম্পাদনার সাথে পদোন্নতির সম্পর্ক নির্ণয় করে	১৭০
৭.৪	A Rolling Stone Angers No Boss.	১৭১
৭.৫	সরকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ	১৭৪
৮.১	আমলাতান্ত্রিক খোলস থেকে বেরিয়ে আসা	১৮২

এই প্রতিবেদনটি আইডিএ স্টাফ এবং বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের যৌথ উদ্যোগে রচিত। এর দায়িত্বে যুগ্মভাবে ছিলেন আবিদ হাসান এবং ওয়াইজ সাদাত, এবং তাঁদের সাহায্য করেন খুরশীদ আলম ও রিয়াজুল ইসলাম (আরএমবি)। বাংলাদেশী টিমে ছিলেন রেজা কিবরিয়া (মুখ্য উপদেষ্টা/ সমন্বয়কারী লেখক), মশিউর রহমান ও তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী (মুখ্য উপদেষ্টাদ্বয়)। প্রেক্ষাপট প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন এম. রহমান, টি. চৌধুরী, ডি. বুচার, এস. আল-হুসাইনী, হাবিব সাত্তার, মোহসীন রশিদ ও জি. কিবরিয়া। প্রতিবেদনটি প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বে ছিলেন এ্যানি আনড্রিয়ানাসোলো, এন্টনী স্ট্যানলী, সুন-ওন পাক, সুজান পামার, এবং তাঁদের সহায়তা দেন এগনেস এভিডেন্ত ও সেনি সোজ। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেন শাহিদ ইউসুফ, ডেভিড স্টীডম্যান, শাহিদ চৌধুরী, মাইক স্টিভেনস (অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনাকারী) : এবং প্রফেসর রবার্ট ওয়েইড, এম. সাইদুজ্জামান, শামসুল হুদা ও ফয়জুর রাজ্জাক (বহি:স্থ পর্যালোচনাকারী)। ঢাকাস্থ যুক্তরাজ্যের এইড ম্যানেজমেন্ট অফিস কনসালটেন্ট হিসেবে "ভাল প্রশাসন" (ডি. গলসওয়ার্দী ও পি. স্টকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত) সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও স্থানীয় কনসালটেন্টদের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গর্বিত হওয়ার মত অনেক কিছু রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর চমকপ্রদ অর্জন (ঘর ১) বাংলাদেশকে বহুসংখ্যক উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঈর্ষার পাত্র করে তুলতে পারে। তবে শুধু এভাবে দেখলে বাংলাদেশকে দূরবীনের ভুল প্রান্তটি দিয়ে দেখার মত হবে। **বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্রে নিপতিত** এবং মানুষের আয় বাড়ছে অতি ধীর গতিতে। বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেকটাই পাশ কাটিয়ে গেছে, এবং তারা মৌলিক সেবাসমূহের কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। তাদের জন্য **বর্তমান প্রবণতাগুলি একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সামান্য আশাবাদই সঞ্চার করে।**

ঘর ১. সরকার: সাফল্যের খতিয়ান

সরকারের গর্ব করার মত অনেক কারণ রয়েছে, তবে এর কার্যসম্পাদনা গুরুতরভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অনেকগুলো সুগভীর প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার জন্য।

অর্জন

সরকার চমকপ্রদ কার্যসম্পাদনা দেখিয়েছে চালের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনে; জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে; টিকাদান ও প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিতে; আর্থিক সুস্থিরতা অর্জনে; এবং দ্রুত তৈরি পোশাক শিল্প রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে।

সরকার : নিচ থেকে দেখা

- সরকার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে: প্রক্রিয়া নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত; অতিশয় পরিব্যাপ্ত; অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত; অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক; অতিশয় স্বেচ্ছাচারী; অ-জবাবদিহিতামূলক ও অমনোযোগী; এবং অপচয়কারী।
- ১৫০০ শহুরে/গ্রামীণ গৃহস্থালীর একটি জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী নমুনার ওপর ভিত্তি করে দেখা গেছে, সরকার প্রদত্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্প্রসারণ সেবাসমূহের সুযোগ শুধু সীমিতই নয়, এদের মানও নিম্নস্তরের। প্রায় সকল ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সেবাসমূহ এনজিও এবং বেসরকারী খাতের দেয়া সেবা থেকে খারাপ।
- ২০০ জন ব্যবসায়ী এবং ৭০ জন রপ্তানিকারকের ওপর পরিচালিত একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে, সরকারী কর্মকর্তারা অমনোযোগী এবং বিলম্ব যে ক্ষতি সাধন করে, সে সম্পর্কে উদাসীন। সরকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রতিদিনের লেনদেনের যে ঝক্কি ঝামেলা রয়েছে, তাতেও উন্নতি বলতে গেলে হয়নি। সরকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে বিলম্বের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানিকারক রপ্তানি অর্ডার হারিয়েছেন, এবং সরকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততর করার জন্য রপ্তানিকারকরা গড়ে তাদের বিক্রীর ৭% ব্যয় করেন।

বিরামহীন অদক্ষতা: গত দশক – উপর থেকে দেখা

- বাংলাদেশ নিম্ন প্রবৃদ্ধি ও নিম্ন বিনিয়োগের চক্রে আটকা পড়েছে, এবং এর ৫০% মানুষ দারিদ্রের মধ্যে বাস করছে।
- সরকারী বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাত্রা এখনও নিচেই রয়ে গেছে যা জিডিপির ৮-৯%, যদিও বিশেষ ছাড়ে দেয়া তহবিলের ব্যবস্থা রয়েছে।
- বেসরকারী বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাত্রাও নিচু: জিডিপির মাত্র ৬-৭%।
- অনেক কার্যক্রমের প্রভাব ন্যূনতম। যেসব ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ঢুকছে, তাদের মাত্র ৪% দ্বাদশ শ্রেণী সমাপ্ত করে। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করতে সাত বছর লেগে যায়। গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগী থাকার হার মাত্র ৫৫%, যদিও রুগ্নতা ব্যাপক।
- সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক লোকসান বিশাল – জিডিপি'র প্রায় ২%, এবং তাদের অনাদায়ী ঋণ জিডিপির ৯০% এর একটি বড় অংশ নন-পারফর্মিং, এবং বাজেটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঘাড়ে পড়বে)।

বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু দেশটি নিম্ন-প্রবৃদ্ধির আবর্তে আটকা পড়ে গেছে। সারা বিশ্বে এখন এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য আন্তঃ সম্পর্ক রয়েছে। এটিও ক্রমাগত পরিষ্কার হচ্ছে যে, নিম্ন প্রবৃত্তির ফাঁদ থেকে বাংলাদেশের বেরিয়ে আসার ব্যর্থতার জন্য দায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বল বাস্তবায়ন ক্ষমতা ও অদক্ষতা, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের অসমর্থতা, এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনার প্রতি এর পক্ষপাত। একবিংশ শতকে প্রবেশের মুহূর্তে বাংলাদেশ একটি ভিন্ন দেশ হয়ে দাঁড়াবে। এটি কারো পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়। দ্রুত বর্ধমান এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার জনগণ থেকে আসা অভ্যন্তরীণ চাপের সঙ্গে অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে আসা বহিঃস্থ চাপসমূহ যুক্ত হয়ে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে, এবং অনেক নতুন দাবী উত্থাপন করবে। বর্তমানে যেভাবে সরকারী খাতটি গঠিত, তাতে এই চাপ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না।

সারা বিশ্বের সরকারসমূহ নতুন যুগের সঙ্গে অনেক কষ্টে বোঝাপড়া করছে। রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিহ্বল করা গতি, এবং দ্রুত-ধাবমান বৈশ্বিক বাজার সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে, এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন তুলছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পৃথিবীটাই অনেক বেশি অনিশ্চিত একটি জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে সরকার, বেসরকারী খাত ও এনজিওসমূহের মধ্যে সম্পর্ক ও ভারসাম্য ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে, এবং যেখানে অর্থনৈতিক এজেন্টরা সরকারের কার্যসম্পাদনা অনেক উঁচু মানদন্ডে বিচার করছেন। এসব সকল বিষয় বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও জোরের সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়।

সরকারী খাতের কোনো কোনো ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ হলেও, সামগ্রিকভাবে, এর কার্যসম্পাদনা আরো ভাল হওয়া উচিত ছিল। যদি বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে এবং তা টিকিয়ে রাখতে, দারিদ্র কমাতে, ও ভবিষ্যতের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ আগে থেকেই অনুমান করতে হয়, এবং উদ্যোগী নাগরিকদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের ও একটি ভীষণ প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে নামার সামর্থ্য যোগান দিতে হয়, তাহলে দক্ষতা ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে এক লাফে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হবে। এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হল একটি দক্ষ ও কার্যকর সরকার গড়ে তোলার জন্য একটি সড়ক-মানচিত্র তৈরি করা এবং নানা বিকল্প/পছন্দ এবং নির্মাণ উপকরণ চিহ্নিত করা। বাংলাদেশে সফল কিছু উদ্যোগের উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে, এবং সংস্কারাধীন ও উচ্চ কার্যসম্পাদনার দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে সরকারের মূল কর্মকান্ড ও আবশ্যকীয় সেবাসমূহের মান ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনতে হবে। এবং এজন্য প্রয়োজন হবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ:

- **সরকারী খাতের সীমানা পুনঃনির্ধারণ**। একই সঙ্গে, যেসব মৌলিক সেবা শুধু সরকারই দিতে পারে, এবং অন্যরা যেসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফল হয়নি (যেমন দারিদ্র বিমোচন) সেসব ক্ষেত্রে এর শক্তি ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা উচিত। যে সরকার খুব বেশি সম্প্রসারিত, যেমন বাংলাদেশ সরকার, সে সরকার দক্ষ হতে পারে না। সরকারের সীমা পুনঃসংজ্ঞায়িত করার অর্থ হবে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আকার সঠিক করা, এবং অন্যদিকে এনজিওসমূহ, স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারী খাতের জন্য জায়গা বাড়ানো। বাংলাদেশ এনজিও সমৃদ্ধ; কয়েকটি এনজিও বিশ্বনন্দিতও বটে। বাংলাদেশের রয়েছে একটি উদ্যমী বেসরকারী খাত। কিন্তু এনজিও অথবা বেসরকারী খাত, কারো সম্ভাবনাই সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। সামাজিক খাতের সেবা প্রদানের মান ও পরিমাণ উভয়ের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এনজিওগুলির বিশাল সম্ভাবনা রয়ে গেছে; একই সঙ্গে, বেসরকারী খাতের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করা গেলে প্রবৃদ্ধির গতি বাড়বে।

- জনগণের কাছে সরকারী সংস্থাসমূহের **জবাবদিহিতা ও মনোযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি বৃদ্ধি করা।** যে সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের "মালিক" অর্থাৎ সংসদ, জনগণ ও ভোক্তাদের কাছে দায়ী থাকে, সেগুলো ভাল কাজ করে।

- সরকার যেসব বিধিবিধান, আইন-কানুন ও প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে জনগন ও বেসরকারী খাতের সঙ্গে আদান-প্রদান করে ও তাদের নিয়ন্ত্রণ করে, **সেসব বাহুল্যমুক্ত ও সুসমন্বিত করা।** আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, নীতি ও চর্চাসমূহের স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও স্বয়ংক্রিয়তা সরকারের দক্ষতার ওপর একটি জোরালো প্রভাব ফেলে।

- **সরকার যেসব নিয়ম ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে, তাদের ব্যাপক পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা।** বিচক্ষণ নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন এবং দ্রুত ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে একটি দক্ষ সরকারের বৈশিষ্ট্য।

- **দক্ষ, নিবেদিত এবং পেশাদারী সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিযুক্ত রাখা।** এদের ছাড়া সরকার ফলপ্রদ অথবা মনোযোগী, কোনোটাই হতে পারবে না।

১. সরকারী খাতের সীমানা পুনঃনির্ধারণ

স্বাধীনতার পর থেকে মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও কর্মকর্তা/কর্মীদের হিসাবে সরকারের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা (৩৫) অন্যান্য দেশ, যেমন মালয়েশিয়া (২৪), দক্ষিন কোরিয়া (২৫) ও থাইল্যান্ডের (১৪) তুলনায় অনেক বেশি। পরিবর্তনশীল অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সকল আমলাতন্ত্রেই পরিবর্তন হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশে এসব পরিবর্তন হয়েছে একই গন্তব্যে। নতুন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর স্থাপন করা একটি সাধারণ আচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সাথে নিম্ন-অগ্রাধিকারের দায়-দায়িত্বগুলি বাদ দেয়া হচ্ছে না অথবা অপ্রয়োজনীয়তা বা অতিরিক্ততা নির্মূল করার কোনো প্রচেষ্টা হাতে নেয়া হচ্ছে না।

বেশির ভাগ দেশেই রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে যে বিতর্ক হয়, তা সাধারণত 'আধা-সরকারী' বিষয়ের ধূসর অঞ্চলেই হয়ে থাকে – যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা রেলপথ – যেখানে বিনিয়োগ করা হলে সার্বিকভাবে দেশের জন্যই তা লাভ বয়ে আনে, যদিও এর সুযোগ সুবিধা অনেক ক্ষেত্রেই সবাই সমান ভাবে পায়না। তবে বাংলাদেশ সরকার শুধু রাষ্ট্রের মূল দায়িত্বগুলি -– যেমন জাতীয় প্রতিরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার ব্যবস্থা, ইত্যাদি – পালন করেই ক্ষান্ত হয়না, বরং প্রায় সম্পূর্ণ ধূসর এলাকাটিও তার নিয়ন্ত্রণে। এরপর এ সরকার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করে। বস্তুত বেশির ভাগ নাগরিকই বিশ্বাস করেন যে, **সরকার প্রচুর বাণিজ্যিক কাজ করে যাচ্ছে, যেগুলি অন্যরা আরো ভাল করতে পারত; এবং সরকারের যেগুলো আরো বেশি করার কথা, যেমন দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, ইত্যাদি, সেগুলো করছে খুব কম। সরকার অতিশয় সম্প্রসারিত, এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিয়ন্ত্রণমূলক অনধিকার চর্চা; এর বেশির ভাগ কর্মকান্ডই অদক্ষতাপূর্ণ। সরকারের ভিতর অনেক বেশি মানুষ অনেক কম কাজ করছে – উপরন্তু, অন্যদের উদ্যোগ তারা বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। অথচ বিলম্বিত সিদ্ধান্তের জন্য তারা কোনো শাস্তি পাচ্ছে না। আনুষ্ঠানিক জিডিপি খাতের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে সরকার, এর হাত সবখানে ছড়িয়ে আছে হয় সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, অথবা/এবং মাথাভারী এবং স্বেচ্ছাচারী বিধিবিধানসমূহের মাধ্যমে; আর সরকারের অদক্ষতা প্রভাবিত করছে সমগ্র অর্থনীতিকে।**

সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার খরচ (জিডিপির প্রায় ৪.৫%) একই অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরে সমগোত্রীয় অন্যান্য দেশের মতই। অবশ্য করদাতাদের এই "যুক্তিযুক্ত" খরচ যোগানের বিষয়টি নিয়ে স্বস্তি লাভের কোনো কারণ নেই। আসল বিষয় হল করদাতারা কতটা মূল্য পাচ্ছেন এবং "বড়" সরকার সম্বন্ধে তাদের ধারণা কি। কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের সরকারের জন্য তাদের নাগরিকরা যে ব্যয় করেন, জিডিপির % হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকরাও তাদের সরকারের জন্য প্রায় একই ব্যয় করেন, কিন্তু এ দু'টি সরকারের দক্ষতা ও মান বাংলাদেশের সরকারের থেকে অনেক উঁচু।

অন্য অনেক দেশের মত বাংলাদেশের সরকারগুলিও তাদের শাখা বিস্তারের জন্য নিচের যুক্তিগুলি ব্যবহার করেছে : সেবা প্রদানে বাজারের ব্যর্থতা; জনস্বার্থ; কৌশলগত কারণ এবং সামাজিক/ন্যায়নীতি সংক্রান্ত বিবেচনা। এসব বিবেচনা যুক্তির বিচারে টিকে কিনা তা দেখার জন্য বেশ কটি দপ্তর/কর্মসূচি পর্যালোচনা করা হয়েছে (ঘর ২) খুব কম দপ্তর/কর্মসূচিই তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে। একই ভাবে, দেশটির ১৫৪টি বাণিজ্যিক সরকারী প্রতিষ্ঠানকে জনমালিকানার প্রথাগত যুক্তির বিপরীতে বিচার করা হয়েছিল; এদের খুব কমই সরকারী খাতে থাকার যোগ্যতা দেখাতে পেরেছে।

ঘর ২. অর্থের বিনিময়ে মূল্য: প্রত্যেক করদাতা ও ভোক্তার সাংবিধানিক অধিকার

নগণ্য সংখ্যক দপ্তর অথবা কর্মসূচিকেই বাজারের শৃঙ্খলা মানতে হয়। কাজেই তাদের বৈধতা অন্য উপায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। একটি উপায় হচ্ছে অর্থের বিনিময়ে মূল্য (VFM) বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দপ্তর বা কর্মসূচিটি সমর্থন করার বিনিময়ে করদাতা কি মূল্য পান, এবং গ্রাহকই বা কি মূল্য পান? এর কর্মকান্ড কি একান্তই প্রয়োজনীয় ? যদি না হয়, এটি বন্ধ করে দিতে হবে। যদি এর কর্মকাণ্ড চালাতেই হয়, তাহলে কি এটি সরকারের একটি দায়িত্ব হিসেবে থাকবে ? যদি না হয়, তাহলে এটিকে বেসরকারী করে ফেলতে হবে। যদি সরকারের দায়িত্বেই থাকতে হয়, তাহলেও এর কর্মকাণ্ড কি একটি বেসরকারী ফার্ম আরো ভাল চালাতে পারেনা ? যদি তাই হয়, তাহলে অন্যভাবে কিছু কি করা যায় ? সবশেষে, যে সেবা দেয়া হচ্ছে , তা কি কম ব্যয়বহুল করা যায় ? সকল সরকারী সংস্থা ও কর্মসূচিকে এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। নিচে বাংলাদেশ সরকারের কয়েকটি দপ্তরের তালিকা দেয়া হল, যেগুলোর প্রয়োজন প্রশ্ন সাপেক্ষ, অথবা যেগুলো অর্থের বিনিময়ে খুবই কম মূল্য দিচ্ছে।

সমবায় দপ্তর (DOC) -- সমবায় দপ্তরের কাজ হচ্ছে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচার, নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান। এই দপ্তরের কর্মী সংখ্যা ৪,৭০০ এবং এর জন্য করদাতাদের বছরে দিতে হচ্ছে ২৭ কোটি টাকা। ১৩৩,০০০ টি সমবায় প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ দপ্তরটি হয়তো বিরাট সাফল্য দাবী করতে পারে। তবে, দুভার্গ্যজনকভাবে, বেশির ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠানই অচল হয়ে আছে। কাজেই এই বিশাল কর্মীবাহিনী ঠিক কি করছে, এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে হয়। যেহেতু এনজিওগুলি দলগত ও সামাজিক সমাবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে, সেহেতু সমবায় আন্দোলনের প্রতি সরকারের অবিরাম সমর্থনের সুযোগ কোথায় রয়েছে এবং এর আকারটাই বা কি হবে এ বিষয়টির মৌলিক পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সমবায় সমিতিগুলির নিবন্ধন ডাকের মাধ্যমে করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রণও একটি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত পেশাদারী ইউনিট করতে পারে, যারা খ্যাতিমান চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্মকে চুক্তিভিত্তিক কাজ দিয়ে দিতে পারে।

জনশক্তি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো -- জনশক্তি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৭৬টি কার্যালয়ে ২,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছে, যার জন্য করদাতার বছরে খরচ হচ্ছে ৮ কোটি টাকা। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে রপ্তানির জন্য জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া। অবশ্য এরকম কোনো প্রমাণ এ পর্যন্ত মিলেনি যে কোথাও ব্যুরোটির কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে। বেশির ভাগ কর্মীই নিজের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এবং এটিও পরিষ্কার নয় যে ব্যুরোটি না থাকলে জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ কম হত।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB) -- এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণদান, প্রশিক্ষণ ও বিপণন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সাহায্য করা। ১৯৯২ সালের শেষ পর্যন্ত BRDB-তে বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ১,৩৩০ কোটি টাকা, এবং অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৬০ কোটি টাকা। ফসলের জন্য ঋণ আদায়ের হার ছিল ৭৭ শতাংশ, এবং যন্ত্রপাতির জন্য ২০ শতাংশ। BRDB -র প্রধান যুক্তি হচ্ছে সামাজিক ন্যায়-নীতি বাড়ানো। তবে যেখানে এনজিওদের সংখ্যা নাটকীয় হারে বেড়েছে, বিশেষ করে যেগুলি ব্যষ্টিক ঋণ-স্কীম নিয়ে কাজ করছে, তাতে সন্দেহ করার অবকাশ রয়েছে যে, BRDB-র ভূমিকা আগে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এখনও ততটা আছে কিনা। BRDB-র ঋণদান কর্মকাণ্ড খুব সহজেই দারিদ্র ফাউন্ডেশনের (PKSF) হাতে ছেড়ে দেয়া যায়।

দীর্ঘদিন থেকেই সরকার তার মৌলিক জনসেবার মান ও ব্যাপ্তির অবনতি সম্পর্কে সচেতন। বেসরকারী খাত ও এনজিওদের সহায়তায় সরকার বিকল্প সরবরাহ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, এবং এতে অনেক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মকান্ড; একটি বৃহৎ এনজিও (ব্র্যাক) কর্তৃক বাস্তবায়িত সরকারী অর্থায়নে প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম; স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি; এবং দারিদ্র ফাউন্ডেশন (PKSF) কর্তৃক ব্যষ্টিক ঋণদানকারী এনজিওদের অর্থায়ন। এসব সফল উদ্যোগের পিছনে মূল উপাদান ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, জবাবদিহিতা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং এনজিওদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব (ঘর ৩)।

ঘর ৩. সফল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়

সাফল্যের নানা ঘটনা থেকে যে মূল বিষয়গুলি উঠে আসে, সেগুলো হল:

বিকেন্দ্রীকরণ ছিল টিকাদান কর্মসূচি ও পল্লী বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাফল্যের মূলে। টিকাদান কর্মসূচি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপকদের নিজেদের এলাকার জন্য পরিকল্পনা করার সুযোগ দিয়েছে; এবং পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলির স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের যথেষ্ট পরিচালনাগত স্বাধীনতা রয়েছে। তবে বিকেন্দ্রীকরণ সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারেনা। এর জন্য নিম্ন পর্যায়ে কর্তৃত্বের অপব্যবহার রোধে বিচক্ষণ প্রত্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়।

কার্যসম্পাদনা ভিত্তিক জবাবদিহিতা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলির সাফল্যের পেছনে অবদান রেখেছে। এতে একটি বিস্তারিত কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে, যেখানে বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করে সন্তোষজনক কাজের উপর। এই মডেলটি অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চালু করা উচিত।

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ব্র্যাকের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি রয়েছে, যাতে শিক্ষক, সমাজনেতা ও ব্র্যাক কর্মকর্তারা রয়েছেন। কমিটি যে কোনো উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের জন্য নিয়মিত সভায় মিলিত হয়।

গ্রাহকের কাছে জবাবদিহিতা খরচ উঠে আসার উচ্চ হারের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। যেহেতু পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলি ভোক্তা-মালিকানার সমবায়, সেহেতু সকলেই দক্ষতা থেকে লাভবান হয়। তাদের টাকা দিতে হয় কম। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিগুলি গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করেছে। তারা বছরে দু'তিন বার সমস্যা অথবা অভিযোগ আলোচনার জন্য গ্রাম পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান করে।

সেবাদান থেকে অর্থায়ন আলাদা করার ফলে তহবিল যোগানদার সংস্থাগুলি সেবাদানকারীর কাছ থেকে উচ্চমানের সেবা দাবী করতে পেরেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্মাণ ও পরিকল্পনা নক্সা ইউনিট পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহের পরিকল্পনা, নক্সা ও নির্মাণ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম গণপূর্ত বিভাগকে না দিয়ে বেসরকারী খাতের কনসালটেন্টকে দেয়ায় কম ব্যয় এবং উন্নত সেবার সুযোগ লাভ করতে পেরেছে। গণপূর্ত বিভাগ যেখানে এ সেবার জন্য ১৫% হিসেবে নেয়, সেখানে প্রাইভেট কনসালটেন্ট নিয়েছে ৬% এর মত।

এনজিওদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব উচ্চতর-মান ও দূরবর্তী অঞ্চলে উন্নততর সেবা নিশ্চিত করেছে, যা পানি ও স্বাস্থ্যবিধান কার্যক্রম ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সপ্রমাণিত হয়েছে। দারিদ্র ফাউন্ডেশন (PKSF) প্রতিষ্ঠা এ ধরনের সহযোগিতার একটি সফল মডেল -- এ ফাউন্ডেশনটি এনজিওদের ব্যষ্টিক-ঋণ স্কীমে সরকারী তহবিল যোগান দেয়।

উপরের উদাহরণগুলি বিভিন্ন দপ্তর ও কর্মসূচির সমালোচনামূলক নিরীক্ষা, তাদের যুক্তির পূনর্মূল্যায়ন এবং করদাতা/ব্যবহারকারীকে অর্থের বিনিময়ে মূল্য দেয়ার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। **এর লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমানের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের দিকে সরকারের শক্তি ও উদ্যম নিবদ্ধ করা।** সরকারের ভূমিকার পুনঃসংজ্ঞায়নের ফলে যে ক্ষেত্রটি বেরিয়ে আসবে, তা পূরণ করার লক্ষ্যে আগে থেকেই বিকল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসারের জন্য চারটি আন্তঃসম্পর্কিত উদ্যোগের প্রয়োজন হবে ।

- সরকারের আকৃতি সঠিক ও হ্রাস করা।
- এনজিওদের ভূমিকা বাড়ানো।
- স্থানীয় সরকার প্রতিপালন।
- বেসরকারী খাতের উন্নয়ন।

সরকারের আকার সঠিক করা

সংস্কারাধীন দেশগুলি আকার সঠিক করার বিষয়টিকে ধারণাবদ্ধ করা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক মডেল ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গোর কমিশন সংস্কারের ক্ষেত্র নির্ধারণ ও সংস্কার পরিচালনার কাজ করেছে। যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দক্ষতা ইউনিট অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; এবং কানাডায় সরকারী খাতের সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন পূর্ণ মর্যাদার কেবিনেট মন্ত্রী এ উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডে অর্থ মন্ত্রণালয় মৌলিক বাজেটগত সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারের বিষয়সূচি এবং আওতা/গতি নির্ধারণে নেতৃত্ব দিয়েছে। মালয়েশিয়াতে মূখ্য-সচিবের অধীনে বেসামরিক প্রশাসনে প্রশাসনিক উন্নয়নের ওপর একটি প্যানেল প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য একটি থিংক ট্যাঙ্ক বা চিন্তাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছে। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সংস্কার বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রশাসনিক আধুনিকীকরণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট স্থাপন করা হয়। **সকল দেশেই রাষ্ট্রের ভূমিকা পুনঃনির্ধারণে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাজেট প্রক্রিয়া এবং সংসদীয় পর্যালোচনাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।**

বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই সরকারের আকার সীমিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। এ উদ্দেশ্যে নুরুন্নবী পুনর্গঠন কমিটি স্থাপিত হয়। এ পর্যন্ত এ কমিটি ৮০ টি দপ্তরের পর্যালোচনা করেছে। কিন্তু এ কমিটির প্রভাব হয়েছে সামান্যই, কারণ এর কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ। কমিটিটি নির্বাহী শাখার একটি অংশ এবং কোনো দপ্তরের যুক্তিযুক্ততার মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা এর নেই। এ ছাড়া, বাংলাদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর

কার্যালয়ে একটি দক্ষতা ইউনিট স্থাপন করেছে। এর সাফল্য নির্ভর করবে এর স্টাফ নিয়ুক্তি এবং ম্যান্ডেটের ওপর, এবং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনের ওপর। সাফল্যের জন্য আরো প্রয়োজন হবে ব্যাপক ভিত্তিক জনসমর্থন -- এবং পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাকে সমর্থন করার জন্য যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি উদ্ভাবন। এ ইউনিটটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থাপন করা সত্ত্বেও অথবা প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন সত্ত্বেও বর্তমান পরিবেশে একটি আমলাতান্ত্রিক ইউনিট মৌলিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক ভিত্তিক সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হবে না। এজন্য সুপারিশ করা হচ্ছে যে, **একটি নতুন কমিশন, অর্থাৎ সরকার সংস্কারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিশন (NCRG), স্থাপন করা হোক**, যা নূরুন্নবী কমিটির কাজ চালিয়ে যাবে। এই কমিশনটি স্বাধীন হবে এবং এতে থাকবেন সাংসদ, সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিরা; এতে পেশাদারী কর্মীদের নিয়োগ দিতে হবে, এবং প্রতিটি সংস্থার যুক্তি বিশ্লেষণাত্মকভাবে পুনর্মূল্যায়ন করা, করদাতা ও ব্যবহারকারীরা কি মূল্য পাচ্ছেন তা হিসাব করা, ইত্যাদি ক্ষমতা এর থাকতে হবে। **কমিশন কর্তৃক প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠান সংস্কারের জন্য জনগণের সমর্থন আদায় করতে সাহায্য করবে।**

আশা করা যাচ্ছে যে, এই কমিশন দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যার যোগান দিবে, এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও কৌশল নির্ধারণ করবে। এটি কার্যপরিচালনার প্রথাগত উপায়গুলিকে প্রশ্ন করার জন্য, পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের সমর্থন যোগাড় করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে। দক্ষতা ইউনিটটি এই কমিশনের কাজ বাস্তবে প্রয়োগ করবে, এবং নির্বাহী শাখার ভিতরে পরিবর্তন সূচিত করতে প্রচেষ্টা চালাবে । এটি সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও তা প্রত্যবেক্ষণ করবে। দক্ষতা ইউনিটটি কমিশনের স্টাফ সচিবালয় হিসাবেও কাজ করতে পারে, এবং কমিশনের ভিতরে একটি আলাদা বিশ্লেষণমূলক সামর্থ্য গড়ে তোলার পরিবর্তে কমিশনকে বিশ্লেষণমূলক সহায়তা দিবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কমিশন ও ইউনিট উভয় স্থানেই যেন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদারী কর্মীরা নিয়ুক্তি লাভ করেন। সংস্কার প্রক্রিয়াটি ধাক্কা দিয়ে চালু করার জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন হলেও **সংস্কার নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন**। কমিশন দু'টি ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার দেবে:

- ***প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া বা কাটছাঁট করে সুসংগঠিত করা*** -- অনেক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য এখন তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া পরিবর্তিত অর্থনৈতিক দৃশ্যপট ও নতুন অগ্রাধিকারের জন্য অনেক মন্ত্রণালয়/সংস্থার দিকে নতুন করে দৃষ্টি দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন রাষ্ট্রীয় মালিকানার কারখানাগুলি হস্তান্তর করে দেয়া হবে, তখন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের করার কিছুই থাকবে না। অন্য একটি উদাহরণ হচ্ছে মূল্য ও বাজার তথ্য দপ্তর (DPMI), যা গুটিয়ে নিয়ে দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন প্রত্যবেক্ষণের অবশিষ্ট দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে দিয়ে দেয়া যায়। অনেক সংস্থার নিবিড় পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে, এগুলো আকারে অনেক ছোট হতে পারত। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং সমবায় দপ্তরের কাজকর্ম শুধু যে একে অপরের অনুরূপ, তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়ও – যদি আমরা একই রকম ক্ষেত্রে এনজিওদের দেয়া সফল সেবার কথাটি মনে রাখি।

- ***কাজকর্মের 'বোঁচকা-খোলা' এবং ঠিকা দেয়া*** -- অনেক সংস্থা এমন সব কর্মকান্ড করে থাকে যেগুলো বেসরকারী খাত আরো ভাল ভাবে করতে পারত; অনেক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ এবং পরিচালনাকে এক করে দেখা হয়। এই 'বোঁচকা'টি খুলে দিলে প্রশাসনিক গুরুভার অনেক লাঘব হয়ে যাবে, এবং সেবা সরবরাহ উন্নত হবে, যেহেতু মন্ত্রণালয়গুলি (যেগুলো সেবার জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অর্থ যোগাবে) উন্নত মান দাবী করার জন্য ভাল অবস্থানে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তার দায়িত্ব থেকে সড়ক পরিবহন সংস্থাকে ছেড়ে দিতে পারে, এবং এর

সড়ক যোগাযোগ বিভাগের বর্তমান নির্মাণ-দায়িত্বটি বাইরের ঠিকাদারদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতে পারে। অনেক কর্মকান্ডই এখন এনজিওদের ও বেসরকারী এজেন্টদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা বর্তমান। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, পানি ও স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এটি সফল ভাবে পরীক্ষিত হয়েছে।

মধ্য মেয়াদে সরকারী চাকুরির ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সংসদীয় কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবনের বিষয়টিও গুরুতর বিবেচনার দাবী রাখে। সুব্যবস্থাপনাকৃত উন্নত দেশগুলি এবং কিছু NIC দেশ সরকারের *চূড়ান্ত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আইন পাশ করে* এ ধরনের প্রয়াস রোধ করেছে। উচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য নতুন কর্মকান্ডের প্রয়োজন হলে সরকার এখন নিম্ন অধিকার এলাকাগুলিতে চাকুরি হ্রাস করতে বাধ্য হবে। *অন্য একটি পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন 'সূর্যাস্ত আইন'*, যার মাধ্যমে সেকেলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কর্মসূচির একটি সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কাটছাঁট করা হয়। তবে জাতীয় সংসদ তাদের কর্তৃত্ব দিলে আলাদা কথা।

এনজিওদের ভূমিকা জোরদার করা

বাংলাদেশকে এনজিওসমৃদ্ধ দেশ বলা যায়। এসব এনজিও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে, এবং অনেকেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্য এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা জোরদার করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে:

- *এনজিও নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সুসমন্বিত করা*, এবং এসব কাজের অনেকগুলি এডাবের হাতে ন্যস্ত করা। এডাব হচ্ছে এনজিওদের শীর্ষ সমিতি।

- *বাংলাদেশ সরকার - এনজিও উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপন*, যা আগেভাগেই পরামর্শ করা, সফল এনজিও কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটানো ও জবাবদিহিতা উন্নত করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য যোগাবে।

- ***PKSF** ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন*, যা সামাজিক খাতের কার্যক্রম, গ্রামীণ অবকাঠামো স্কীম ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য এনজিওদের বাজেটভুক্ত তহবিল যোগান দেবে।

স্থানীয় সরকার – যে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়নি

বাংলাদেশে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামো এবং নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলির শিকড় তৃণমূল পর্যায় বিস্তৃত। এতে অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ও জনসেবা সরবরাহের জন্য ভিত্তি গড়ে উঠেছে। তবে এই কাঠামোটি দুটি কারণে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারেনি: সিদ্ধান্ত গ্রহণের অতিরিক্ত কেন্দ্রীকতা; এবং অকার্যকর স্থানীয় নির্বাচিত সংস্থাসমূহ – যাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুর্বল প্রশাসনিক ক্ষমতা, এবং একটি সীমিত আর্থিক ও মানব সম্পদ ভিত্তি।

স্থানীয় প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানগুলি জনসেবা ও সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য (সরাসরিভাবে অথবা এনজিও/ব্যক্তিগত সরবরাহকারীদের মাধ্যমে) একটি ভাল অবস্থানে আছে। তবে তাদের কর্মকাণ্ডে এই পরিবর্তন আসবে যদি স্থানীয় সরকারের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত মৌলিক জনসেবা সরবরাহ উন্নত করার জন্য একটি কর্মসূচি চালু করা। নিচের কাজগুলি সমাধা করে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব:

- স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত ২০টিরও বেশি এ্যাক্ট/অর্ডিন্যান্স যুক্তিযুক্তকরণের মধ্য দিয়ে *স্থানীয় সরকারের জন্য আইনগত কাঠামো মজবুত করা।*

- *যথাযথ আকারের স্থানীয় সরকার ইউনিট গড়ে তোলা*, যা উপজেলা (থানা) পরিষদ থেকে বড় হবে, কিন্তু জেলা পরিষদ থেকে ছোট হবে; এবং যার কাজ হবে মাত্রার (Scale) অর্থনীতিকে কাজে লাগানো; এবং একই সঙ্গে এটি নিশ্চিত করা যে, ইউনিটগুলি যাতে খুব বড় না হয়, কারণ এতে ব্যাপক ও সরাসরি অংশগ্রহণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

- একটি ফর্মূলাভিত্তিক মঞ্জুরী ও স্থানীয় কর সংগ্রহে বৃহত্তর কর্তৃত্ব, এবং একই সাথে আর্থিক প্রজ্ঞা নিশ্চিত করে এমন পদ্ধতির মাধ্যমে *স্থানীয় সরকার অর্থায়ন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস।*

বেসরকারী খাতের প্রসার

সরকার ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সম্পর্ক এখন যেমন আছে তার থেকে অনেক বেশি সহযোগিতামূলক হওয়া উচিত, এবং বেসরকারী খাত যেসব প্রশাসনিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়, সেগুলি নিরসনের জন্য সরকারী সংস্থাগুলিকে অনেক বেশি মনোযোগী এবং তৎপর হতে হবে। এছাড়া বেসরকারী খাতের উন্নয়ন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করছে যে আলাদা আলাদা সংস্থা/মন্ত্রণালয়, তাদের ভিতর অনেক বেশি সমন্বয় প্রয়োজন। বেসরকারী খাতের বিষয়াদি চারটি মন্ত্রণালয় – শিল্প, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্র – এবং তিনটি প্রসারমুখী সংস্থা – বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন এলাকা কর্তৃপক্ষ – জুড়ে বিস্তৃত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এগুলো তাদের পূর্ব-এশীয় প্রতিপক্ষের মত অতটা কার্যকর হতে পারেনি। তাদের কাজের সংস্কৃতি বেসরকারী খাতের চাহিদাকে ঘিরে তৈরি হয়নি, এবং তাদের পছন্দ হচ্ছে প্রসার নয়, বরং নিয়ন্ত্রণ। সরকার নানা উপায়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার ঘটাতে পারে বা তাদের সহায়তা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব-এশীয় দেশগুলি সরকার ও বাণিজ্যের শক্তিশালী আন্তঃসম্পর্কের, এবং বেসরকারী খাতকে ত্বরান্বিত করতে পারে তেমন কার্যকর সরকারী সংস্থার গুরুত্ব সপ্রমাণ করেছে। বাংলাদেশে নিচের সংস্কারগুলি বহুদিন আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল:

- *প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাতের একটি উপদেষ্টা কাউন্সিল তৈরি করা* –– যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী/সচিব ও সম্মুখ সারির ব্যবসায়ীরা অন্তর্ভুক্ত হবেন, এবং মাসে অন্ততঃ একবার নিয়মিত সভায় মিলিত হবেন।

- *প্রচারণাধর্মী সংস্থাগুলিকে অনেক বেশি জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও মনোযোগী করে তোলা* –– এদের তত্ত্বাবধানকারী বোর্ডগুলিতে বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিদের জড়িত করে, সেবার মান নির্দিষ্ট করে, পেশাদার কর্মীদের নিযুক্ত করে, অতিরিক্ত কর্মী পর্যায়ক্রমে ছাঁটাই করে (বিনিয়োগ বোর্ডের ক্ষেত্রে মোট কর্মীর দুই-তৃতীয়াংশ), সংস্থাগুলিকে অনেক বেশি স্বায়ত্তশাসন দিয়ে, এবং তাদের হাত থেকে প্রবিধানমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড সরিয়ে নিয়ে এটি করা সম্ভব।

- *গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ উন্নত করা* –– জাতীয় কমিশন যে একটি বিকল্প পর্যালোচনা করবে, তা হচ্ছে: বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে একটি মাত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা, যার নাম হবে বেসরকারী খাত উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় চারটি

মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করবে, যার মধ্যে থাকবে উপরে উল্লেখিত প্রচারণা সংস্থাগুলির তদারকী এবং এসব মন্ত্রণালয়ের অধীন এসওইগুলিকে হস্তান্তর করা। এই 'বোঁচকা' খোলায় আরেকটি অতিরিক্ত সুবিধা হবে এই যে, এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা আলাদা হয়ে যাবে।

বেসরকারী খাত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে **রাষ্ট্রমালিকানার প্রতিষ্ঠানকে (SOE) ব্যক্তিমালিকানাধীন/বাণিজ্যিকীকরণ**। অদক্ষতা, লোকসান ও নিম্নমানের সেবার আমূল পরিবর্তন করতে হবে, কারণ এতে ভোক্তা ও বেসরকারী খাত উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিচের দুটি বিকল্প -- যা বাংলাদেশ সরকার শিথিল উদ্যমে করে যাচ্ছে -- ত্বরান্বিত করতে হবে। *প্রথমত,* যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চালু রয়েছে, যে বাজারে ব্যক্তিগতখাতে উৎপাদিত সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিমালিকানাধীন করা, বা যেখানে প্রয়োজন, বন্ধ করে দেয়া। এতে করদাতা ও ভোক্তাদের উপকার হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন করা পর্যন্ত এসব এসওই'র প্রশাসনিক ও পরিচালনগত তদারকীর দায়িত্ব মন্ত্রণালয়গুলির হাত থেকে নিয়ে নেয়া উচিত, যেমনটা উপরে সুপারিশ করা হয়েছে। এই দায়িত্বটি সম্পূর্ণভাবে নিজ নিজ হোল্ডিং কর্পোরেশনগুলির ওপর ন্যস্ত করা উচিত – এ ক্ষেত্রে আর্থিক তদারকী প্রদান করবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এবি শাখা। *দ্বিতীয়ত,* যেসব প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া ও অ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পরিচালিত হচ্ছে, যেমন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বা ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ, সেগুলোর দক্ষতা ও গ্রাহক সেবা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের (যেমন, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, PKSF) ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়। যেসব পদক্ষেপ নেয়া যায়, তার মধ্যে আছে : প্রতিযোগিতা, আঁটোসাঁটো বাজেট, স্বাধীন বোর্ড, পেশাদারী ব্যবস্থাপনা, কার্যসম্পাদনা-ভিত্তিক উদ্দীপক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সরকারের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের পরিবর্তন। ***সরকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো কেমন হওয়া উচিত, বাংলাদেশে PKSF তার একটি চমৎকার উদাহরণ। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, এটি সকল এসওই'র ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হোক।***

২. সরকারের জবাবদিহিতা এবং মনোযোগ বাড়ানো

বাংলাদেশের বেসরকারী খাত জুড়ে একটি প্রধান সমস্যা শুধু যে জবাদিহিতার অভাব, তাই নয়, বরং জবাবদিহিতার প্রকৃতিও। জাতীয় সংসদ থেকে নিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত জবাবদিহিতার যে শৃঙ্খলটি বিস্তৃত, তা দুর্বল এবং অস্পষ্ট। এই শৃঙ্খলের অনেক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, যার ফলে আর্থিক চুক্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না, সরকারী প্রতিষ্ঠানে চুরি থামানো যাচ্ছে না, অথবা অযথাযথ বা বিলম্বিত বিচারের জন্য কর্মকর্তাদের দায়ী করা যাচ্ছে না। বাজেট পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনাও দুর্বল এবং দক্ষতা ও খরচ-সাশ্রয়তা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে অকার্যকর। সাধারণ ভাবে, বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাগুলির আর্থিক নিয়ন্ত্রণ দুর্বল, বাজেট প্রক্রিয়ায় অথবা সংসদে এদের গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করে দেখা হয় না এবং বাজারের আর্থিক শৃঙ্খলা থেকে তারা মুক্ত। সর্বোপরি, তারা মানুষের চাহিদার প্রতি অমনোযোগী। কর্মকর্তারা যখন তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, নাগরিকরা তখন কোনো কার্যকর প্রতিকার পেতে পারে না। নিচের ছ'টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন:

সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুপ্রশাসনের দৃঢ় ভিত্তি হচ্ছে সংসদীয় জবাবদিহিতা, তবে বাংলাদেশে সংসদীয় জবাবদিহিতা ভালভাবে কাজ করেনি। অনেকগুলি সমস্যা রয়েছে, যার কিছু সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতার পাল্লা

যেগুলো জাতীয় কমিশন ও দক্ষতা ইউনিটের কাজ জোরদার করার জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়। এগুলো যেকোনো দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক সংস্কারের অংশে পরিণত হবে।

- *একটি বাজেট বিশ্লেষণ ইউনিট (BAU) স্থাপন* -- এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখায় স্থাপিত হবে এবং এতে পেশাদার অর্থনীতিবিদ ও আর্থিক বিশ্লেষকরা একটি মূল দল হিসেবে কাজ করবেন। বর্তমান বাজেট অফিসারদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে BAU সরকারের মূল প্রবাহের একটি শাখা হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর থেকে আসা বাজেট বরাদ্দের অনুরোধ পরীক্ষা করবে এবং ব্যয়ের যথার্থতা নিরুপণের জন্য সরকারী ব্যয়ের বৃহত্তর পর্যালোচনা করবে, এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সুপারিশ রাখবে।

- সরকারী বিনিয়োগ পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার জন্য **প্রকল্প প্রফর্মা ফর্মাটসমূহ পরিমার্জনা করা**, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে শক্তি-সংস্থাগুলিকে সংবেদনশীল করা যাতে তারা সেবা সরবরাহ ও কার্যসম্পাদনের বিকল্প উপায়গুলি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে। প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে প্রকল্প প্রফর্মা ফর্মাট-এ প্রশ্নমালার একটি মানসম্মত সেট যুক্ত করা হোক যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, দাতাসমূহ এবং সরকার উভয়েই বিকল্পগুলি সত্যিকারভাবে গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করছে। "বাজার পরীক্ষণ"এর প্রচলিত পদ্ধতিটি মানসম্মত করা হলেও তা নিয়ম মাফিক/প্রথাগত প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে সংস্থাগুলিকে এরকম চাপের মুখে ফেলা এবং এসব বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে।

- অর্থনৈতিক উপাত্তের উপস্থাপনা উন্নত করে **বাজেটের "গ্রাহক-বান্ধব" চরিত্রটি উন্নত করা**। এতে জনগণের মধ্যে পরিচালিত বিতর্কের মানও বাড়বে।

এ সংস্কারগুলি শিকড় ছড়িয়ে ফেললে, এবং পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক এবং তথ্যগত সামর্থ্য তৈরি হয়ে গেলে ফলাফল, কৌশলগত অগ্রাধিকারসমূহ এবং মধ্যম-মেয়াদী কাঠামোর সঙ্গে বাজেট বন্টনকে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত করার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার সূচিত করতে হবে। এরকম সংস্কার নিউজিল্যান্ডে সাধিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সংস্কার সূচিত হবে নিম্নলিখিত ভাবে:

- ***বাজেট বন্টন ও আউটপুট/ফলাফলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন*** – প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি মন্ত্রণালয় বাজেট/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রধান উদ্দেশ্যাবলী, কার্যসম্পাদনা লক্ষ্য, এবং বিগত বছরের অর্জনসমূহ উল্লেখ করবে। অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই তা করছে। দক্ষতা ইউনিটের সাহায্য নিয়ে সংস্থাসমূহ কোনো বিস্তারিত সমীক্ষা ছাড়াই তাদের দক্ষতার (যেমন – আউটপুটের ইউনিট -প্রতি ব্যয়) ও কার্যকারিতার (যেমন – প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ফলাফল) সহজ ও পরিমাপযোগ্য সূচকে উপস্থাপন করতে পারে।

- ***একটি মধ্যম মেয়াদের রাজস্ব ও ব্যয় কাঠামোর মধ্যে বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপন*** – এতে বাজেট ও সমষ্টিক-অর্থনীতির উদ্দেশ্যাবলীর সংযোগটি শক্তিশালী এবং অনেক বেশি স্বচ্ছ হবে, নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরো অধিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হবে এবং নতুন কর্মসূচি/প্রকল্পের জন্য সম্পদের প্রাপ্যতা স্পষ্ট হবে।

বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিভাগকে (IMED) আরো শক্তিশালী করতে হবে, যাতে এটি তার বর্তমান কর্মকাণ্ড আরো ভাল চালাতে পারে, এবং সার্বিক নীতি বাস্তবায়ন মূল্যায়নে কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে:

- ***শক্তিবর্ধিত IMED-কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থাপন*** – যেসব সংস্থা সার্বিক প্রশাসনের জন্য পদ্ধতিগতভাবে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। IMED তখন সরকারের উন্নয়ন ও পৌণঃপুনিক ব্যয় ও নীতি বাস্তবায়নের ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রত্যবেক্ষণ, এবং কার্যসম্পাদনার ওপর সময়মত ফিডব্যাক প্রদানের জন্য প্রধান নির্বাহীর মূল প্রহরী হয়ে দাঁড়াবে।

- প্রধান ব্যয় কার্যক্রম ও নীতি বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য ***এর ম্যান্ডেট বাড়ানো***। প্রধান ব্যয় কার্যক্রমগুলি সময়মত পর্যালোচনা করতে সমর্থ বহু বিষয়ে পারদর্শী একটি দল গড়ে তোলার জন্য অতিরিক্ত সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে।

- ***এর প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও রিপোর্টিং ফর্মাটসমূহ উন্নত করা***। এতে ভৌত অর্জনসমূহ, চুক্তিভিত্তিক কাজ ও সম্পূর্ণ করা প্রকল্পসমূহের নিয়মিত প্রত্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এ ছাড়া মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য বর্তমান পদ্ধতিগুলিও জোরদার করতে হবে। যেমন–

- মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলির মধ্যে ***আর্থিক ও ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতিসমূহ আধুনিকীকরণের জন্য একটি কর্মসূচি চালু করা,*** যার উদ্দেশ্য হবে আর্থিক ও ভৌত ইনপুট/আউটপুট এবং উপাদান/ফলাফলসমূহ প্রত্যবেক্ষণ করা।

- হিসাব নিরীক্ষণ নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করে এবং বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষকদের সম্মানী বাড়িয়ে ***এসওই-সমূহের বহিঃস্থ অডিট উন্নত করা***।

গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি

বাংলাদেশে গ্রাহক সেবা উদ্যোগ বহু আগেই নেয়া উচিত ছিল, ভোটারদের কাছেও এটি জনপ্রিয়তা পেত। এরকম উদ্যোগ হাতে নিলে বিভিন্ন সংস্থা তাদের কার্যসম্পাদনা সম্পর্কে ফিডব্যাক পাবে, এবং গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে। সেবার মানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া উচিত নিম্নমানের ও অনির্ভরযোগ্য সেবার জন্য গ্রাহকদের অর্থ ফেরৎ দেয়া (যেমন – পুড়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত বিল, ডেড টেলিফোন লাইন, ইত্যাদির জন্য)। **সরকারী সংস্থাগুলির দেয়া নিম্নমানের সেবার জন্য ভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত, বিশেষ করে ভোক্তারা যখন তাদের পছন্দ অপছন্দ প্রয়োগ করতে পারেন না।** এ ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হবে যুক্তরাজ্যের সিটিজেন চার্টার, যা প্রতিটি সংস্থাকে মেনে চলতে হয়। যেমন, লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডের চার্টারটি নিরাপদ, দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থের বিনিময়ে মূল্য সেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এতে একটি ফেরৎ প্রদান স্কীম রয়েছে যার অধীনে ***কোনো যাত্রীকে যদি ঘোষিত সময়ের ২০ মিনিট বেশি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করতে হয়, অথবা যে ট্রেনে তিনি ভ্রমণ করছেন, তা যদি ১৫ মিনিটের বেশি***

বিলম্বিত হয়, তাহলে একটি রিফান্ড ভাউচার পাওয়ার অধিকার তার থাকবে। এই চার্টারটি প্রতিটি স্টেশনে বিজ্ঞাপিত হয়। জনগণের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য সরকারকে মধ্যম ও দীর্ঘ-মেয়াদী কিছু পদক্ষেপ বিবেচনা করতে হবে, যেমন:

- *গ্রাহক সেবার মান নির্ধারণ।* প্রতিটি সংস্থাকেই গ্রাহক মান নির্ধারণ করতে হবে, এবং এটি সেবা-গ্রহিতাদের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তি হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

- *সরকারী সংস্থা ও অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রাহকদের মধ্যে* তারা কী মানের সেবা পাচ্ছেন এবং কী মানের সেবা চান, সে ব্যাপারে *নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা।*

গ্রাহক সেবা ও জনগণের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দক্ষতা ইউনিটের একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা উচিত। কার্যসম্পাদনা উদ্দেশ্যাবলীর মত দক্ষতা ইউনিটের সহায়তায় বাংলাদেশী সংস্থাগুলো কোনো ব্যাপক বহিঃস্থ সাহায্য অথবা দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা ছাড়াই সেবার মান প্রতিষ্ঠা করতে পারে (যেমন – ভোক্তার অভিযোগের সংখ্যা হ্রাস, সময় মত যানবাহন ছাড়া; শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মালামাল খালাস ও ড্রব্যাক রিফান্ড প্রক্রিয়াকরণ, ভূমি মালিকানা রেকর্ড করা, অতিরিক্ত বিল ঠিক করা ও অত্যাবশ্যকীয় সেবার সংযোগ দেয়ার জন্য এখন যে সময় লাগে তা কমিয়ে আনা)। সংস্থাগুলোর সামর্থ্যের মধ্যেই এসব সম্ভব। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, প্রত্যবেক্ষণ যে শুধুমাত্র স্ব-প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হচ্ছে না, এবং একটি স্বাধীন বহিঃস্থ সংস্থা (যেমন – ন্যায়পালের দপ্তর) যে তদারকীর ভূমিকায় এবং সেবার মান নির্ণয়ের সঙ্গে জড়িত, তা নিশ্চিত করা।

একটি উন্মুক্ত সরকারের লক্ষ্যে

নাগরিকদের ক্ষমতায়ন এবং আরো বেশি কার্যকর সরকারের জন্য একটি চাবিকাঠি হচ্ছে উন্মুক্ততা এবং স্বচ্ছতা। বর্তমানে বাংলাদেশে লোকপ্রশাসন খুবই অস্বচ্ছ। আমলারা গোপনীয়তা নিয়ে এতটা সচেতন যে জনগণকে কোনো তথ্য দিতেই তারা রাজি নন – সে তথ্য যতই নিয়মমাফিক এবং নিরীহ হোকনা কেন। আমলারা অবশ্য কিছুটা পর্যন্ত এই যুক্তি দিতে পারেন যে, তারা সরকারী বাধানিষেধের জালে আবদ্ধ। ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন এবং ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি (GSCR) গোপনীয়তার শপথে সরকারী কর্মচারীদের বেঁধে রেখেছে – এমনকি সরকারী অন্যান্য দপ্তরেও তারা কোনো তথ্য যোগান দিতে পারেন না। অনেক সরকারেরই এখন তথ্য স্বাধীনতা আইন রয়েছে। ***সুপারিশ করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ উৎসাহিত ও বৈধ করার জন্য সরকারী গোপনীয়তা আইন ও GSCR সংশোধনের ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোক।*** অন্যান্য দেশে বাস্তবায়িত আরো কিছু পদক্ষেপ নিচে সুপারিশ করা হচ্ছে:

- *স্বচ্ছতার ওপর একটি পাবলিক পলিসি ঘোষণা করা।*

- *সরকারী খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স স্থাপন করা,* যা স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সুপারিশ করার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবী ও কর্মজীবী দল থেকে নেয়া স্বাধীন সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে।

- *যেসব কাজের জন্য কন্ট্রাক্ট দেয়া হয় তার মূল্যায়ন রিপোর্টগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করা* – কন্ট্রাক্টের আকৃতি যা-ই হোক।

- *সকল নির্বাচিত ব্যক্তির আয় ট্যাক্স রিটার্ন ফর্মে যেভাবে উল্লেখ করা আছে, সেভাবে প্রকাশ করা।* এই পদক্ষেপটি আয়কর নিয়মাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে নৈতিক বৈধতাই শুধু বাড়াবেনা, এতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের ওপরও তাদের সঠিক আয় ঘোষণা করা এবং আয়কর আইনসমূহ মেনে চলার জন্য চাপ বাড়বে।

- সংসদ ও তথ্য মাধ্যমের কাছে নিয়মিত ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলি পৌঁছে দিয়ে *তথ্য ও রিপোর্টের প্রচারণা বৃদ্ধি করা*: সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বার্ষিক ও বহিঃস্থ অডিট রিপোর্ট, IMED রিপোর্ট, দাতাদের কাছে দেয়া সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং প্রকল্প তথ্য, বেসরকারী ও সরকারী খাতের কর্মকর্তা ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের দেয়া কর অব্যাহতি/ছাড়ের পরিমাণ, সরকারী কর্মকর্তা ও নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে বিনামূল্যে দেয়া সেবার পরিমাণ (যেমন আবশ্যকীয় সেবা, বিমান টিকেট, ব্যক্তিগত যানবাহন, ইত্যাদি)।

দুর্নীতি নির্মূল করা

যেখানে স্বেচ্ছাক্ষমতা ও একচেটিয়া অধিকার থাকে, জবাবদিহিতা দুর্বল থাকে, এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয় খুব কম, সেখানে দুর্নীতির প্রসার ঘটে। বাংলাদেশে লোক প্রশাসন পর্যায়ে দুর্নীতির এগুলোই হল কারণ। বাংলাদেশে একটি দুর্নীতি দমন ব্যুরো রয়েছে বটে, কিন্তু এটি বহুলাংশে অকার্যকর, এবং জনগণের ধারণা এটি প্রতিহিংসা পরায়ন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার একটি হাতিয়ার। দুর্নীতি দমন ব্যুরো সমাধান না দিয়ে বরং নতুন একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে – তা হল, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অচলাবস্থা, যার উৎপত্তি ভীতি থেকে। এমনকি যেখানে দুর্নীতি দমন ব্যুরো সঠিকভাবে তদন্ত করে, ঐ তদন্তের জন্য গড়ে সময় লাগে তিন বছর, যার মাত্র ১৫% শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

দুর্নীতি হ্রাসের জন্য প্রয়োজন সরকারের ভিতর উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, বিধি-বিধানমুক্ত করা, বেসামরিক প্রশাসনে বেতন ভাতা বৃদ্ধি, এবং কঠোর শাস্তি প্রয়োগ। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিচের ব্যবস্থাগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে:

- সরকারী কর্মকর্তা, সাংসদ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে *একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন।*

- আইন দ্বারা সুরক্ষিত *একটি স্বায়ত্তশাসিত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন*, যার কাজ হবে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদারকী করা, এবং একজন .সংবিধিবদ্ধভাবে নিযুক্ত এবং সুরক্ষিত পাবলিক প্রসিকিউটারকে মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও কর্পোরেশন সমূহের উর্দ্ধতন স্টাফদের তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া। এতে হয়রানি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভীতি কমবে, এবং উদ্যমী ও দৃঢ়সংকল্প সরকারী কর্মচারীদের সুরক্ষা দেবে। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট সম্মানিত নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত সংস্কার

প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণের গোলক ধাঁধাঁ: মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

নাগরিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে লেনদেনের বিষয়টি নাগরিকদের জন্য দুঃস্বপ্নের মত। পাসপোর্ট অথবা ভূমি মালিকানা, অথবা দালান নির্মাণের অনুমতি বা অত্যাবশ্যকীয় সেবার সংযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট অথবা রিক্সার লাইসেন্স পাওয়া – যাই হোক না কেন, নাগরিকদের জন্য সকল ক্ষেত্রেই থাকে অহেতুক বিলম্ব, স্বেচ্ছাচারী নিয়মকানুন এবং অমনোযোগী কর্মকর্তা, এবং সর্বোপরি, উৎকোচের প্রয়োজনীয়তা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও অবস্থাটা একই রকম। বেশির ভাগ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় হাজারো প্রবিধানের গোলক ধাঁধাঁ পার হতে। প্রবিধানগুলির ভাষা অস্বচ্ছ, এবং এদের প্রয়োগও অসংলগ্ন। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে স্ববিরোধীও বটে (ঘর ৪)।

ঘর ৪. প্রবিধানের শাসন : এক জটিল ও স্বেচ্ছাক্ষমতামূলক জটাজাল

প্রবিধানের শাসন, নীতি ও চর্চার প্রচুর সমস্যা রয়েছে। তার কারণ, এগুলি:

- *অস্পষ্ট এবং স্বেচ্ছাক্ষমতাধীন* – সু-প্রশাসনকে প্রচন্ডভাবে বাধাগ্রস্ত করে এমন এক উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে এই যে অনেক প্রবিধানকেই অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট করে রেখে দেয়া হয়। এতে নিয়ন্ত্রণকারী আমলাদের দক্ষতা ও সততা সম্পর্কে ভ্রান্ত আস্থাই প্রতিফলিত হয়, এবং তাদের হাতে এক বিশাল স্বেচ্ছাক্ষমতা দিয়ে দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফ্যাক্টরী আইনে (১৯৬৫) বর্ণিত আছে : "যদি কোনো পরিদর্শকের কাছে *মনে হয় যে* আর্দ্রতার জন্য পানি *কার্যকরভাবে* পরিশোধিত হয়নি, অথবা দালান বা যন্ত্রপাতির কোনো অংশ একটি *নিরাপত্তা ঝুঁকি*, তাহলে তিনি নোটিশ দিতে পারেন।" বাঁকা হরফে লেখা শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত নয়, এবং এগুলি খুবই স্বেচ্ছাক্ষমতাধীন – যে ব্যাপারটি পরিদর্শকেরা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত স্বার্থে কাজে লাগান, কারণ তারাই হলেন একমাত্র বিচারক।

- *পরিব্যাপ্ত এবং সেকেলে* – বাংলাদেশে হাজার হাজার প্রবিধান রয়েছে। এর বেশির ভাগ সেকেলে, এবং বিরোধপূর্ণ। এসব প্রবিধান কী জনস্বার্থ রক্ষা করছে, তা বোঝা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, ফ্যাক্টরীসমূহে পিকদানী থাকতে হবে; বিমান/ইঞ্জিন বিক্রীর জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে; পাসপোর্টের ছবি প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে; সংযোগের জন্য গ্যাস কোম্পানীকে জমির আদি মালিকানা দলিল দেখাতে হবে; একই দিনে একাধিক ফ্যাক্টরীতে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কাজ করতে পারবে না; ফ্যাক্স মেশিন স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড থেকে অনুমতি নিতে হবে; ইত্যাদি।

- *ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল বাস্তবায়ন* – বাংলাদেশে প্রবিধান প্রয়োগের দায়িত্বে আছেন একচেটিয়াভাবে নিম্ন পর্যায়ের স্বল্প বেতনভুক কর্মকর্তা/কর্মচারী। কেউ যদি ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করতে চান, তাহলে তাকে এসব অসংখ্য ছোটখাটো আমলাদের সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না, যারা তাদের কথামত কাজ করানোর সকল সুযোগ কাজে লাগান। বস্তুতঃ তারা ঘুষ গ্রহণের জন্য প্রবিধানের স্বেচ্ছাক্ষমতামূলক এবং অস্পষ্ট প্রক্রিয়াটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। সৌভাগ্যজনকভাবে নাগরিক এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপ্রয়োজনীয় প্রবিধানগুলি 'অক্ষরে অক্ষরে' পালন করতে হয়না। একই সঙ্গে, নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও গণস্বার্থে সংশ্লিষ্ট প্রবিধানগুলি প্রয়োগের দুর্বল ক্ষমতা – অথচ একটি বাজার অর্থনীতির সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- *প্রবিধান প্রণয়নের ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া* – বাংলাদেশে সকল প্রবিধানের উৎপত্তি আইনে। নিয়ন্ত্রণমূলক মন্ত্রণালয়/ সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে সহায়ক নিয়মকানুন, প্রবিধান এবং রূপরেখাসমূহের খসড়া করা। এই খসড়া তৈরির প্রক্রিয়ার একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই যে, এটি নিয়ন্ত্রণকারীর দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়ে, এবং এতে প্রবিধানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মতামতের কোনো প্রতিফলন থাকেনা।

- *প্রয়োজনীয় দূরত্বের অভাব* – নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধানমূলক আরো একটি সমস্যা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী এবং পরিচালকের মধ্যে (অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলির) প্রয়োজনীয় দূরত্বের অভাব। প্রায়শই তারা এক হয়ে যায় (উদাহরণ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা)।

বাংলাদেশের প্রয়োজন প্রবিধানগুলি পর্যালোচনা করা ও সুসংহত করা। এরকম যে কোনো প্রয়াসের অংশ হিসেবে নিচের বিষয়গুলি অবশ্যই থাকবে :

- ***একটি সুসমন্বিত নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ কার্যক্রম চালু করা*** – এর জন্য একটি বিনিয়ন্ত্রণ বা ডিরেগুলেশন কমিশন স্থাপন করতে হবে, যা সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত হবে। ডিরেগুলেশন কমিশনকে জাতীয় কমিশনের সঙ্গে (হয়তো এর অধীনেই) এবং দক্ষতা ইউনিটের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে, যাতে এর গবেষণালব্ধ ফলাফল সমন্বিত এবং বাস্তবায়িত করা যায়। এই কমিশন কস্ট বেনিফিট বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের খরচ নির্ধারণসহ কারিগরী পর্যালোচনার একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে। প্রতিটি প্রবিধান পর্যালোচনা, সংশোধন বা বাতিল করার জন্য কমিশনকে উন্মুক্ত ও প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠান করতে হবে। এরকম একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুরস্ক ১২,০০০ প্রবিধানকে মাত্র ৭০০ টিতে নিয়ে এসেছে, এবং ব্রাজিল তার ১২৭,০০০ ডিক্রীর মধ্যে ১১২,০০০ টিই প্রত্যাহার করেছে।

- যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অফ দি ফেডারেল রেজিস্ট্রারের মত আইন মন্ত্রণালয়ে ***একটি ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন*** যা সকল প্রবিধানের হিসাব রাখবে। প্রথম একটি পদক্ষেপ হিসেবে, এই দপ্তরটি একটি সুসমন্বিত ডক্যুমেন্টেশন তৈরি করবে যাতে একটি জায়গাতেই সকল আইন, প্রবিধান, সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশ ও প্রশাসনিক আদেশসমূহ একত্রিত হবে। এই দলিলটি প্রতি মাসে একবার হাল নাগাদ করতে হবে।

- ***নিয়ম-বিধি তৈরির প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা*** – এজন্য এরকম একটি বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে যে শুধুমাত্র জরুরী অবস্থা ও ফৌজদারী বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে পরামর্শমূলক প্রক্রিয়া ও প্রকাশ্য শুনানি ব্যতিরেকে কোনো নিয়ম বিধি জারি করা যাবে না, এবং খসড়া নিয়মবিধি চূড়ান্ত করার অনেক আগেই খবরের কাগজে প্রকাশ করতে হবে।

- নিয়ন্ত্রণকারী ও নিয়ন্ত্রিতদের মধ্যে *সংস্পর্শ সর্বনিম্ন করার জন্য অগ্রবর্তী কর্মসূচি চালু করা* – এতে থাকবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নাগরিক গোষ্ঠীসমূহ, এনজিও ও প্রখ্যাত ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মগুলির সংশ্লিষ্টতা; কাস্টমস্ ডিউটি নির্ধারণের জন্য প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা; প্রখ্যাত চার্টার্ড একাউন্টেন্টদের দ্বারা আয়কর মূল্যায়ন গ্রহণ করা; কম্প্যুটারের মাধ্যমে কর প্রক্রিয়াকরণ।

- *একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগকারী খাতের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি চালু করা*, যা এসব এলাকায় বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, প্রতিযোগিতা বাড়াবে, এবং উৎপাদনকারী ও ভোক্তার স্বার্থ সুসম করে তেমন প্রক্রিয়া ও নিয়মবিধি তৈরি করবে।

আইনগত অচলাবস্থা

বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা নাগরিকদের চাহিদা যেমন মেটায় না, তেমনি লেনদেনের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক কোনো পরিবেশও গড়ে তোলে না। আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি সেকেলে এবং ত্রুটিপূর্ণ, পদ্ধতিগুলি ঝঞ্ঝাটপূর্ণ, উচ্চ পর্যায়ের বিচারকরা তেমন কোনো প্রত্যবেক্ষণ কাজ করেন না, আদালতের সুযোগ সুবিধা অপর্যাপ্ত, এবং সু-প্রশিক্ষিত বিচারক ও আইন কর্মকর্তার সংখ্যাও খুবই কম। এসবের জন্য বিচারের রায় পেতে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। বস্তুতঃ তুচ্ছ এবং অপেক্ষাকৃত সহজ মামলার ক্ষেত্রে রায়ের জন্য কয়েক দশক ধরে ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ মোকদ্দমা চলতে পারে। **আদালতের ওপর জনগণের বিশ্বাস বোধগম্য কারণেই কম। একটি আধুনিক অর্থনীতির দাবীসমূহ মেটানোর জন্য বিচার ব্যবস্থার প্রধান কিছু সংস্কার সাধন করতে হবে।** এই সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল:

- *আইন সংস্কার কমিশন চালু করা।*

- *আদালতগুলির গতি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা* – এর জন্য প্রয়োজন হবে মামলা ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা, আদালতের সুযোগ সুবিধা উন্নত করা, এবং বিশেষ আদালত স্থাপন করা – যার বিচারকরা ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন।

- *বিচারকবর্গের সার্বিক উন্নয়ন সাধন* – এই উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ হচ্ছে: বিচারক নির্বাচনের পদ্ধতি, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, এবং সরকারী বেতন পদ্ধতি থেকে বিচারকদের বেতন-ভাতার প্যাকেজটি পৃথক করে, এবং ১৯৫০ এর দশকের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে, এর সার্বিক পরিমার্জনা।

- একটি স্থায়ী ইউনিট বসিয়ে *নিম্ন আদালতগুলির তত্ত্বাবধান ও প্রত্যবেক্ষণ বৃদ্ধি* – এই ইউনিটের প্রধান হবেন সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত অথবা চাকুরিরত বিচারপতি, এবং তিনি প্রধান বিচারপতির কাছে রিপোর্ট করবেন। এ ছাড়া, উচ্চতর বিচারকবৃন্দ নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতির/বদলির দায়িত্বে থাকবেন।

- *বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা বৃদ্ধি* – পূর্ণ আর্থিক স্বাধীনতাসহ সংবিধানের সবগুলো বিধান পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। বিচার ব্যবস্থার বাজেট-ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে প্রধান বিচারপতির দপ্তরে ন্যস্ত করতে হবে।

৪. নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উন্নতিবিধান

নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উন্নতিবিধান

যেকোনো আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতার চাবিকাঠি হচ্ছে সু-প্রণীত সরকারী নীতিমালার বাস্তবায়ন। যদিও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু চমৎকার নতুন নীতি তৈরি করেছে – যেমন ভ্যাট এর প্রবর্তন – পরিস্থিতি এখনও কিন্তু সন্তোষজনক পর্যায়ে আসেনি (ঘর ৫)।

ঘর ৫. সরকারী নীতিসমূহ : উন্নতিবিধান প্রয়োজন

সাধারণভাবে, সরকারী নীতিসমূহ :

- *অনুকূল সাড়া দিতে ব্যর্থ* – বাংলাদেশে নীতি পরিবর্তন সাধারণত হয় 'দেরিতে এবং সামান্য পরিমাণে'।
- *অসংলগ্ন* – ব্যাপক আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন নীতির মধ্যে সঙ্গতি সাধন নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। তবুও, বেশ কিছু বড় ধরণের সমস্যা রয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, তৈরি পোশাক খাতে সরকার মূল্য-সংযোজন বাড়াতে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপন করতে আগ্রহী, কিন্তু একই সঙ্গে সরকার গ্রে-ক্লথ আমদানী ও ব্যাকওয়ার্ড-লিংকেজ শিল্পের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে।
- *আগে থেকে আঁচ করা যায় না* – অসংখ্য নীতি হঠাৎ করে আগাগোড়া পাল্টে যায়, অথবা এগুলোর লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় বেসরকারী খাতে পেট্রোলিয়াম আমদানী, বেসরকারী খাতে সার বিপণন এবং ব্যক্তিমালিকানাকরণের ক্ষেত্রে নীতি উল্টে যাওয়া।
- *বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ* – অধিকাংশ বাংলাদেশী নাগরিক নতুন কোনো নীতি ঘোষণাকে যথেষ্ট অবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করেন – তাদের চোখে নতুন নীতিটি যতটা না পরিবর্তনের পক্ষে সত্যিকার একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয়, তার থেকে বেশি দাতাদের শর্ত মেটানোর জন্য প্রণীত বলে মনে হয়। বিশ্বাসযোগ্যতার আরো অভাব দেখা দেয় যখন একাধিক মন্ত্রী একই বিষয়ের ওপর পরস্পর বিরোধী ঘোষণা দিয়ে থাকেন।
- *অবাস্তবায়নযোগ্য* – স্পষ্টতই অবাস্তব নীতি ঘোষণা করে সরকারও বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি বাস্তবায়ন যে সম্ভব নয়, তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত, যেহেতু দেশটির প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক বা মানবসম্পদের অভাব রয়েছে।

কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন:

- *বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য বাড়ানো* – মন্ত্রণালয়গুলির নীতি পরিকল্পনা ও সমন্বয় সেলগুলি জরুরী ভিত্তিতে জোরদার করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে একটি উপযোগী পদক্ষেপ হবে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখাগুলিকে নীতি পরিকল্পনা ইউনিটগুলির সঙ্গে একীভূত করে ফেলা। সরকারকেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এসব পরিকল্পনা সেলগুলিতে পরিকল্পনা কমিশন থেকে লোক নিয়োগের, এবং পরিকল্পনা কমিশনের আকার কমানো ও এর কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করার কথা বিবেচনা করতে হবে।

- *নীতি বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি IMED-এর অধীনে এনে এটিকে জোরদার করা।*

- নীতি বিশ্লেষণ ও গবেষণা কাজে ***স্থানীয় থিংক ট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কো-অপ্ট করা ও অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা।*** এ উদ্দেশ্যে সরকার ও এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্টাফ বিনিময় করা যেতে পারে।

সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা

সরকারের কর্মকাণ্ডের কোনো কোনো দিক যদি বাদও দেয়া হয়, এবং অন্যান্যগুলোকে বেসরকারী খাতে, এনজিও বা স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়, তারপরও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম সুসমন্বিত করার অবকাশ থেকে যাবে। বর্তমানের অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিটি দ্রুত উন্নয়ন প্রত্যাশী একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাহিদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত ও মানসম্মত করতে হলে প্রক্রিয়া ও আচরণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন সোজাসোজি হওয়া উচিত, যদিও বাস্তবে নানা স্বার্থান্বেষী মহল এবং কায়েমি সংঘাতের কারণে এটি দূরূহ হবে। আর আচরণগত পরিবর্তন তো আরো জটিল ব্যাপার। এর জন্য যথাযথ উদ্দীপক ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে এবং উদ্যমী চেতনার পরিচয় দিতে অনুপ্রাণিত করা উচিত। নিচে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কিছু অগ্রাধিকার উল্লেখ করা হল :

- দৈনন্দিন খরচপত্র, পূর্ত কাজ এবং সেবা ও সামগ্রী সংগ্রহে সংস্থা ও দপ্তর প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের ***আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি।*** মন্ত্রণালয়গুলি থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি/কর্তৃত্ব পেতে যে বিলম্ব হয়, এর ফলে তা পরিহার করা যাবে।

- ***প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হয়,*** এমন সব বিষয় শুধুমাত্র সরকারের কার্যক্রমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং পদ্ধতিগতভাবে জরুরী ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করা।

- ***সংগ্রহ (procurement) সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি তুলে দিয়ে*** একটি স্থায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় সচিব কমিটি স্থাপন, যাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কর্তৃত্বের বাইরে অনুমোদন দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হবে।

- পরিহারযোগ্য বিলম্ব এবং অতিরিক্ত খরচের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে ***জবাবদিহিতা প্রয়োগ করা।*** চুক্তিভিত্তিক (contract) কাজ অনুমোদন ও পর্যালোচনায় জড়িত না হয়ে মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের এদিকেই মনোযোগ দিতে হবে।

৫. সরকারের ভিতর মানবসম্পদের উন্নতিবিধান

সরকারের জন্য যারা কাজ করেন, তাদের গুণগত মান না বাড়ালে অন্য কোনো ধরনের সংস্কারে কোনো কাজ হবে না। সরকারের জন্য উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন এবং উদ্বুদ্ধ কর্মী অত্যাবশ্যক -– এবং এর জন্য প্রয়োজন বেতন-ভাতা, পেশাদারী দক্ষতার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুসমন্বিত সংস্কার।

বেতন ভাতা

গত তিন দশকে বাংলাদেশে কর্মকর্তা পর্যায়ের বেতন নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। ১৯৬০ এর দশকে– যখন সরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকারী কর্মচারীদের মনে করা হত দক্ষ ও কার্যকর – সরকারী চাকুরিতে সদ্য যোগদান করা একজন কর্মকর্তার একটি গাড়ি কিনতে লাগত ছয় মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, অথচ এখন লাগবে চল্লিশ মাসের বেতনের টাকা। উচ্চ পর্যায়ের (সচিব/বিচারপতি) বেতন ছিল বেসরকারী খাতের (এবং বিশ্ব ব্যাংকের !) বেতনের কাছাকাছি, এবং তারা দুই বছরের বেতন দিয়ে একটি বাসা বানাতে পারতেন – এখন একই ধরনের একটি বাসা বানাতে কুড়ি বছরের বেতন লেগে যাবে। বর্তমানে সরকারী খাতের বেতন বেসরকারী খাতের বেতনের শতকরা হিসেবে বাংলাদেশে মাত্র ২০%; তুলনায় সিঙ্গাপুরে তা ১১০% এবং কোরিয়াতে ৭০%। এ বেতন দিয়ে একটি মধ্যবিত্ত জীবন টিকিয়ে রাখা যায়না। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারিকরা যতই ভাবুন না কেন যে তারা নিচু বেতন দিয়ে পূর্ব এশিয়ার ধরনের দক্ষতা পেয়ে যাবেন – দুঃখজনক সত্যটি হল, এ ধরনের কোনো সাফল্যের ঘটনা এখানে নেই।

মানুষ উন্নত মানের জন্য বেশি পয়সা দিতে রাজি – এমনকি গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মত দরিদ্র লোকেরাও, যারা সরকারী ব্যাংকের চাইতে অনেক বেশি হারে সুদ দিয়ে থাকে। যদি উন্নত সেবার নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে সরকারী কর্মচারীদের বেশি বেতন দেয়াকে তারা সমর্থন করবে, এবং এজন্য প্রয়োজনীয় কর বৃদ্ধিতে তারা আপত্তি করবে না। কিন্তু বর্তমানের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশির ভাগের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে তারা তা সমর্থন করবে না। কারণ এদের সেবার মান নিচু, এবং তাদের ব্যবহার অমনোযোগী এবং শোষণমূলক। **বেতন পদ্ধতিতে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন তখনই বাস্তবায়ন করা উচিত, যখন কার্যসম্পাদনার মান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে এমন একটি সন্তোষজনক পদ্ধতি কার্যকর হয়।** তা ছাড়া, মৌলিক বেতন সংস্কার জটিল বিষয়; এর জন্য এ প্রতিবেদনে যে সমীক্ষা করা হয়েছে, তার চাইতে আরো অনেক গভীর সমীক্ষার প্রয়োজন, এবং আর্থিক ক্ষেত্র ও লক্ষ্যগুলির সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক থাকতে হবে। বাস্তবসম্মতভাবে, যে কোনো মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ৫-৭ বছর লেগে যাবে। অন্তর্বর্তী সময়ে হাজার হাজার বিশিষ্ট এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীর জন্য নির্বাচিতভাবে বেতন বৃদ্ধি প্রয়োজন। এঁরাই হচ্ছেন 'পরিবর্তনের মাধ্যম' বা 'প্রতিনিধি' এবং প্রচন্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা সরকারী চাকুরি করে যাচ্ছেন। অন্যান্য দেশে (যেমন, মালয়েশিয়াতে) যে কয়েকটি অন্তর্বর্তীকালীন বিকল্প প্রয়োগ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আছে :

- ***মেধাবী কাজের জন্য আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা করা*** -– এসব পুরস্কার 'পরিবর্তনের প্রতিনিধি'-দের অর্থাৎ প্রতি দপ্তরের শীর্ষ ১-২% কার্যসম্পাদনকারীর হাতে যাওয়া উচিত এবং এই পুরস্কার কার্যসম্পাদনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নির্ভর করে দেয়া উচিত। এসব বিষয়ের মধ্যে থাকবে ব্যবহারকারীদের থেকে প্রাপ্ত ফিডব্যাকের ওপর নির্ভরশীল সেবার মান, সময়মত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রাজস্ব আদায়ের সাফল্য, অথবা উচ্চমানের নীতি বিশ্লেষণ। এসব পুরস্কারের ভাল অর্থমূল্য থাকা উচিত – যেমন ১২-১৮ মাসের বেতন – যা গাড়ি কেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বা ছেলেমেয়েদের বিয়ে, ইত্যাদির মত এককালীন বড় ধরনের খরচের জন্য সুবিধাজনক হবে। এরকম খরচ অন্যথায় উৎকোচের মাধ্যমেই হয়তো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেটানো হয়। প্রতি দপ্তর বা মন্ত্রণালয় একটি প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে পারে, যা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কমিটি নাম বাছাই করবে। প্রধানমন্ত্রীর কমিটিতে থাকবেন সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিক ও পেশাদার বিশেষজ্ঞ। কমিটিতে বহিরাগতদের সাহায্যে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রার্থী নির্বাচন করলে অপব্যবহারের সম্ভাবনা কমে যাবে।

- *বিশেষ-যোগ্যতা সম্পুরক ভাতা চালু করা* -- যেসব কর্মকর্তা OECD দেশগুলোর কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী বা পিএইচডি লাভ করবেন, তারা এই এককালীন ভাতা পাবেন। এই সম্পূরক ভাতাটিরও ভাল অর্থ মূল্য থাকতে হবে – যেমন মাষ্টার্স ডিগ্রীর জন্য মূল বেতনের ১০০ ভাগ, এবং পিএইচডি'র জন্য মূল বেতনের ২০০ ভাগ। এর ফলে সরকারী কর্মচারীরা এমনকি নিজের খরচেও বিদেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ হবেন এবং সরকারী চাকুরিতে আরো উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আগ্রহী হবেন।

- *খরচ হ্রাস পুরস্কার চালু করা* -- যেসব সরকারী কর্মচারীর প্রস্তাবনা/ধারণার জন্য অপব্যয় থেকে বাঁচা যায় এবং খরচ সাশ্রয় হয়, তাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া উচিত। আগে থেকেই এরকম ধারণা উৎসাহিত করার জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেয়া যায়।

- ***বিচার ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বেতন সরকারী বেতন থেকে আলাদা করার জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নেয়া***। এসব প্রতিষ্ঠানের বেতন ভাতা বাজার ও বাণিজ্যিক বিবেচনার সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ করা উচিত।

যদি নির্বাচিতভাবে এবং ব্যাপকভাবে কার্যসম্পাদনা ও যোগ্যতাভিত্তিক বেতন-ভাতা বাড়ানোর স্বচ্ছ পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে চর্চা করা হয়, তাহলে তা রাজনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব প্রমাণিত হবে। কিন্তু এজন্য সকল ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হবে না। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলির সঙ্গে নিয়মিত ভিত্তিতে পদ্ধতিগত এবং সার্বিক পর্যালোচনার জন্য ***অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি বেতন গবেষণা ইউনিট স্থাপন করা উচিত***। প্রথম কাজ হিসেবে ইউনিটটি সরকারী চাকুরির বেতন সমন্বয় করার জন্য একটি উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা হাতে নিবে, যে উপায়টি আর্থিক লক্ষ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং যা পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে বেতন ভাতার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনয়ন করবে। এ পরিবর্তনটি হবে এ্যাট্রিশন (attrition), সময়ের আগে অবসর গ্রহণ, নিচের স্তরে অনুচ্চ বেতন বৃদ্ধি, এবং শীর্ষ পর্যায়ে বড় ধরনের বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে। উচ্চ পর্যায়ে বেতন বৃদ্ধি নিম্ন পর্যায়ে কর্মচারী হ্রাসের মাধ্যমে বাঁচানো অর্থ থেকে মেটানো সম্ভব।

পেশাদারী দক্ষতা উন্নয়ন

আজকের জটিল এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা অনেক সরকারের জন্যই একটি দূরূহ কাজ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর সাথে যোগ হয়েছে অত্যন্ত জটিল এবং প্রকান্ড উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রায় অতিমানবিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতারই প্রয়োজন। **সরকারী চাকুরিতে পেশাদারী মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন**, যাতে এটি নিশ্চিত হয় যে, মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও দপ্তরগুলিতে যোগ্য এবং সু-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী রয়েছে। নিচের বিবেচনাগুলি পেশাদারী মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়াতে পারে :

- *বিশেষ কার্যদল গঠন করা* -- কোনো একটি ক্ষেত্রে দক্ষতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে অন্য কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ করতে এবং আন্তঃক্যাডার বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে এমন একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ হল মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন কর্মভিত্তিক (functional) গুচ্ছে বিন্যস্ত করা এবং এসব কর্মভিত্তিক গুচ্ছের ব্যবস্থাপনার জন্য স্পেশালাইজড সিনিয়র স্টাফিং পুল (SSSP) গ্রুপ গঠন। এসব কর্মভিত্তিক গুচ্ছ/দলে একটি সামষ্টিক অর্থনীতি গ্রুপ, একটি সামাজিক খাত গ্রুপ, একটি অবকাঠামো গ্রুপ, একটি কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রুপ, ইত্যাদি থাকতে পারে।

মন্ত্রণালয়/সংস্থার ব্যবস্থাপনা কাজের অংশ হিসেবে যারা এসব দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের সংশ্লিষ্ট SSSP গ্রুপ থেকে নেয়া হবে। সকল ক্যাডার থেকেই উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তারা তাদের আগ্রহ, চাকুরির ইতিহাস এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তুত স্নাতোকত্তর পর্যায়ের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে যে কোনো SSSP গ্রুপে যোগদান করতে পারবেন। একবার কোনো SSSP গ্রুপের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো কর্মকতা তার পেশাগত জীবনের বাকী সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থায় নিযুক্ত থাকবেন, এবং তার কার্যসম্পাদনা সন্তোষজনক হলে যথাসময়ে সংস্থা প্রধান/সচিব পর্যন্ত হতে পারবেন।

- প্রতিটি মন্ত্রণালয়/সংস্থা যাতে মধ্যম মেয়াদে একদল সু-প্রশিক্ষিত সিনিয়র এবং মধ্যম-পর্যায়ের ব্যবস্থাপক পেতে পারে, যা ঐ মন্ত্রণালয়/সংস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য একটি *জরুরীভিত্তিক বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা।*

- *প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলিকে শক্তিশালী করা* – একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে উর্দ্ধতন স্টাফ প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলিতে নিয়োগদানকে শাস্তিমূলক নিয়োগ হিসেবে না দেখে পেশাগত জীবনের জন্য উন্নতি হিসেবে গণ্য করা –– যেমন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একাডেমি/স্টাফ কলেজগুলিতে দেখা হয়।

৬. সংস্কার বাস্তবায়ন

সরকারী খাতের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন না থাকলেও একটি ভিন্ন প্রশ্ন রয়েই যায়: সেটি হচ্ছে, সংস্কার কখন ও কোথায় শুরু করতে হবে। অনেক দেশই সংস্কারের জন্য বিশাল কোনো ওলটপালটের সুযোগ নিয়েছে – যেমন যুদ্ধ অথবা অর্থনৈতিক বিপর্যয়। বাংলাদেশে শীঘ্রই এরকম ওলটপালটের সম্ভাবনা নেই, তেমন কোনো লক্ষণও দৃশ্যমান নয়। বরং দেশটি একটি সংকটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, যা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে ক্রমাগত দুর্বল করে দিচ্ছে। যদিও এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপরে বর্ণিত সংস্কারের বৃহত্তর নীতিগুলি মেনে নেবে, তবুও বাংলাদেশে সংস্কার প্রক্রিয়াটি চালু করা অনেক বেশি দূরূহ হবে।

অতএব, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য হয়তো বৈপ্লবিক কোনো সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়াটা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষ করে যে কর্মসূচি তাদের নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি অস্থিতিশীল করে ফেলতে পারে। একইভাবে, সরকারী কর্মচারীদের সংস্কারের সমর্থনে একত্রিত করাও সহজ হবে না, যেহেতু সংস্কার তাদের স্বেচ্ছাক্ষমতামূলক কর্তৃত্ব, বিশেষ করে অধিকার, এবং সর্বোপরি, উৎকোচ গ্রহণের সুবিধা হ্রাস করবে। সব শেষে, এনজিও ও বেসরকারী খাতের মাধ্যমে সরকারী সম্পদ প্রবাহিত করার প্রতি অঙ্গীকার শক্তিশালী কায়েমি স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

তবে এসব "কায়েমি স্বার্থ" থেকে সম্ভাব্য বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকারের উচিত হবে দৃঢ়তার সাথে সংস্কারগুলি সূচিত করা। এটি আর কিছু না হলেও, রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিজস্ব "আলোকিত স্বার্থের" খাতিরেই করতে হবে, যেহেতু এরূপ সংস্কার সরকারের জন্য বড় ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে। পূর্ব-এশীয় এবং অন্যান্য দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, দারিদ্র দূরীকরণের একটি উপায় হিসেবে ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে দক্ষ সরকারী খাত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি চাবিকাঠি। বাংলাদেশেও এ পথটি অনুসরণ করা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, কারণ এতে ব্যাপক জনসমর্থন

পাওয়া যাবে, এবং এর ফলে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সরকারকে অবশ্য এজন্য আন্তরিকভাবে সরকারী খাতের অদক্ষতা, জনসেবার নিম্নমান অথবা অনুপস্থিতি, সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাক্ষমতা প্রয়োগ ও জবাবদিহিতার অভাব ও সর্বব্যাপ্ত দুর্নীতিকে আক্রমণ করতে হবে। এই বিষয়সূচি নিয়ে এগিয়ে গেলে সরকারের মিত্রের অভাব হবে না। সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে; এবং দাতাগোষ্ঠির জন্যও ক্রমশ সেসব দেশকে সাহায্য দেয়াটি যুক্তিযুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ছে যারা নিজেদের ঘর গোছাতেই ব্যর্থ হচ্ছে। সর্বোপরি, সরকারের ভিতরেই মিত্র রয়েছে। এরা হচ্ছেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং উদ্ভাবনীমনস্ক কর্মকর্তার একটি মূল দল, যারা স্ব-উদ্যোগে পরিবর্তনের পক্ষে সাহসী পদক্ষেপ দিয়ে প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য "পরিবর্তনের প্রতিনিধি" হিসেবে কাজ করতে তাদের প্রস্তুতির কথাটি জানিয়ে দিয়েছেন।

এ বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না যে, সংস্কারের জন্য রাজনৈতিকভাবে কিছু মূল্য দিতে হবে। **তবে, নিষ্ক্রিয়তার জন্য মূল্য দিতে হবে আরো বেশি, যেমন নিম্ন প্রবৃদ্ধি, অন্তহীন দারিদ্র এবং নাগরিকদের বেশির বিনিময়ে কম প্রাপ্তির পরম্পরা।**

সফল সংস্কার থেকে শিক্ষা

সরকারের মত একটি জটিল প্রতিষ্ঠানের সংস্কার একটি জটিল, কষ্টকর এবং দূরূহ কাজ। যে কথাটি গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে, তা হল: **সংস্কার কোনো ঘটনা নয়, এটি একটি প্রক্রিয়া**। যেসব দেশ সাফল্যজনকভাবে রাষ্ট্রের সীমানা পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে এবং সরকারের সংস্কার সাধন করেছে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, **একটি কম হস্তক্ষেপকারী অথচ বেশি দক্ষ সরকারের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্ব্যর্থহীন ও অবিচল অঙ্গীকার সব দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ**। সরকারী খাতের সফলতা অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদৃষ্টি এবং সমর্থনের ওপর। যেসব প্রতিষ্ঠান সংস্কার বাস্তবায়ন করছে তারা যাতে জোরের সাথে তাদের বিষয়সূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু সেজন্যই যে এই দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, তা নয়, বরং রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকরা রাষ্ট্রের পুনঃসংজ্ঞায়িত ভূমিকাটি কিভাবে দেখেন, সে ব্যাপারে সিভিল সমাজ ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে একটি সুস্পষ্ট সংকেতও তা প্রেরণ করে।

এ ছাড়া, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও ম্যান্ডেটের কাঠামোর ভিতরে সাফল্যের শিক্ষা থেকে পরিবর্তনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় :

- প্রথমত, সংস্কার সম্পর্কে ভাবা, সংস্কার বাস্তবায়ন ও তা প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য **উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পেশাদার কর্মী সমৃদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহ**। সংস্কার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা প্রয়োজনীয় বটে, তবে এজন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে উচ্চ মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অনুপস্থিতিতেও সংস্কার সাধন করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সহজেই প্রতীয়মান হয়।

- দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয়নীতির মান ও গন্তব্য উভয়কে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য **একটি সুদৃঢ় বাজেট প্রক্রিয়া**।

তাছাড়া, সফল বাস্তবায়ন কৌশলের আরো কিছু আবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে। সেগুলি হল:

- কিছু সাহসী, এবং সম্ভবত অ-জনপ্রিয়, কাজের মধ্য দিয়ে সংস্কার সূচিত করা, যা দূরদৃষ্টি সম্পর্কে স্পষ্ট সংকেত প্রদান করবে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে আরো অনেক পদক্ষেপ, যেগুলিতে লাভ ছাড়া কোনো ক্ষতি নেই বলে সকলের কাছে প্রতীয়মান হবে, এবং এসব পদক্ষেপ সংস্কারের পক্ষে জনগণের সমর্থন জোগাড় করবে। এগুলো ফলপ্রসূ বিবেচিত হলে, এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনিশ্চয়তা হ্রাসের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বেতনভাতার কর্মসূচি চালু হলে, ধীরে ধীরে কিন্তু অবিচলিতভাবে, দুরূহ এবং অ-জনপ্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণও করতে হবে। সংস্কারের ফলে যুক্তিযুক্ত কিছু প্রত্যাশা যাতে উচ্চারিত হয়, সেটি দেখতে হবে, এবং দ্রুত কিছু বাস্তব ফল মানুষের হাতে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দ্রুত সাফল্যের ব্যাপারে কোনো মিথ্যা প্রত্যাশার জন্ম না হয়।

- অগ্রিম কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যাপক ভিত্তিক জনসমর্থন আদায়ের জন্য জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি ও যুক্তিতর্ককে উৎসাহিত করা।

- সাংসদ, বেসরকারী খাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এনজিওসমূহ, বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পেশাদার সমিতিগুলির সমর্থন আদায় করে সংস্কার কার্যক্রমের একটি অধিকতর অংশগ্রহণ-মূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা।

- সংস্কারসমূহ ক্রমানুযায়ী সূচিত করা এবং অগ্রবর্তী কর্মসূচিতে সেগুলো প্রথমে প্রয়োগ করা; একই সঙ্গে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে এসব প্রয়াস সুসমন্বিতভাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বিন্দুগুলির উদ্দেশে চালিত। এতে শুধুমাত্র সংস্কারের সম্ভাব্য সুফল তুলে ধরে সংস্কারের পক্ষে সমর্থনই সৃষ্টি হবে তা নয়, বরং যারা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন, তাদের জন্যও এতে ভবিষ্যতের কিছু উপকারী শিক্ষণীয় বিষয় তোলা থাকবে। যখনই কোনো সরকার একটি সামূহিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার বিষয়সূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে, দেখা গেছে, সরকারী খাতের সংস্কার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে।

- সরকারী কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে যারা "পরিবর্তনের প্রতিনিধি", তাদের সমর্থন আদায়। এসব কর্মকর্তা সংস্কার বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবেন, এবং সংস্কারের প্রভাব একাধিককভাবে তাদের ওপর পড়বে। অভিজ্ঞতা থেকে অবশ্য দেখা গেছে যদি তাদের আগ্রহ ও শক্তি ধরে রাখতে হয়, তাহলে তাদেরকে ব্যাপকতর স্বীকৃতি দিতে হবে। তাছাড়া, যারা সংস্কারের ফলে স্বল্প মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তারা যাতে সংস্কারের বিরুদ্ধে না যান, সেজন্য তাদের সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

প্রস্তাবিত বাস্তবায়ন কৌশল

<u>ভিত্তি স্থাপন — প্রথম ৪-৬ মাস</u>

এই বাস্তবায়ন পর্যায়ে যেসব সংস্কার চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলো তিনটি পরস্পর শক্তিবৃদ্ধিকারী শর্ত পূরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। শর্তগুলি হল এই যে, (১) দৃঢ়তার সাথে সরকারী খাতের সংস্কার কর্মসূচি

বাস্তবায়নে সরকারের প্রত্যয়টি যেন একটি ইতিবাচক "প্রদর্শনী প্রভাবের" আকারে প্রতিভাত হয়; (২) সংস্কার যেন জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মনে রেখে বাস্তবায়িত হয়, এবং সমাজের সর্ববৃহৎ অংশের এবং/অথবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের সমর্থন আদায় করা যায়; এবং (৩) সংস্কার যাতে প্রশাসনিক ও কারিগরী, উভয় দিক থেকে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য হয় – বস্তুত সংস্কারকে প্রায় স্ব-বাস্তবায়নযোগ্যই হতে হবে। উপরের বিষয়গুলি মনে রেখে, এই চারটি মূল উপাদানকে নিয়ে আয়োজিত নিচের অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপসমূহ নতুন সরকারের জন্য চিহ্নিত করা হচ্ছে: *রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি/সংজ্ঞা; সামর্থদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ; ব্যাপক ভিত্তিক কর্মকান্ড যাতে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই; এবং অত্যন্ত সুনির্বাচিত ক্ষেত্রে আকার হ্রাসের পদক্ষেপ*। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মূল ঝোঁকটি দেয়া হবে স্বয়ংভর প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতিসমূহের ওপর, যা ৬-১২ মাস পরে মৌলিক সংস্কার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পাটাতন হিসেবে কাজ করবে।

সরকারকে কর্মক্ষম করার জন্য জাতীয় সংসদে একটি নীতি বিবরণী ঘোষণা করা – একটি নীতি বিবরণীতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি/সংজ্ঞা ও ম্যান্ডেটকে তুলে ধরা যায়, যা অন্যান্য অনেক দেশে করা হয়েছে (মালয়েশিয়া ২০২০, যুক্তরাষ্ট্র: "দক্ষ সরকার হচ্ছে কম ব্যয়সাপেক্ষ সরকার")। এই নীতি বিবরণীতে একবিংশ শতাব্দীতে সরকার নিজেকে কোন ভূমিকায় দেখছে, এবং সরকারকে আরো অধিক কর্মক্ষম করে তোলার জন্য সংস্কারের মূল উপাদানগুলি কি হবে, সে বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হবে। এই বিবরণীটিতে সাহসের সঙ্গে এবং প্রকাশ্যভাবে সরকারকে এই অঙ্গীকারটি ব্যক্ত করতে হবে যে জনগণের চাহিদার প্রতি আমলাতন্ত্র যাতে আরো মনোযোগী হয়, এবং করদাতাদের কাছে যাতে এর জবাবদিহিতা থাকে, তা নিশ্চিত করা হবে। সাংসদ ও জনগণের সমর্থন লাভের জন্য নীতি বিবরণীটি সংসদে ঘোষণা করাই বাঞ্ছনীয়, এবং এজন্য আগে থেকেই সংবাদ মাধ্যম/টেলিভিশন ইত্যাদিতে বিতর্ক উৎসাহিত করতে হবে। ধারণা করা যাচ্ছে যে, এই নীতি বিবরণীটি প্রস্তুত করবেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী/সচিবদের একটি ছোট গ্রুপ এবং তারা দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও সরকারী খাতের সংস্কার সম্পর্কে বর্তমান প্রতিবেদন ও আগের অন্যান্য প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনায় আনবেন।

"চালক" প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন – শুরুতেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে, যেগুলো সংস্কারের পক্ষে সেরা সমর্থক হবে, এবং সংস্কার এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে, নিচের পদক্ষেপগুলি সুপারিশ করা হল:

- সরকারের সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন গঠন, যার প্রধান হবেন একজন উপ-প্রধানমন্ত্রী, এবং যাতে সদস্য হিসেবে থাকবেন বিভিন্ন কর্মকর্তা, আইন প্রণয়নকারী, এবং বেসরকারী সংস্থা, এনজিও ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধি। এই অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়াটি সংস্কারের পক্ষে ব্যাপক সমর্থন সৃষ্টি করবে।

- প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে সম্প্রতি স্থাপিত দক্ষতা ইউনিটটিতে পূর্ণাঙ্গ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে, যা উপরোক্ত কমিশনের স্টাফ হিসেবে কাজ করবে। বিভিন্ন টাস্ক ফোর্স থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাবনাগুলি মন্ত্রিপরিষদে পাশ করিয়ে নেয়া এবং সরকার অনুমোদিত সার্বিক সংস্কার ও আলাদা আলাদা পরিবর্তনে দিক নির্দেশনা দেয়া ও তাদের প্রত্যবেক্ষণ করার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই ইউনিটটি কাজ করবে।

- একটি বাজেট বিশ্লেষণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা।

- মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তসমূহ নিবিড়ভাবে প্রত্যবেক্ষণ ও তাদের দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য এবং নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের বিষয়টি যাতে প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক

বিলম্বের ফাঁদে আটকা না পড়ে তা নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অথবা প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা, যা প্রারম্ভিক পর্যায়ে অন্ততঃ প্রতি দু'সপ্তাহে একবার সভায় মিলিত হবে। সময়মত বাস্তবায়ন হলে গতিশীলতা নিশ্চিত হবে, এবং অঙ্গীকার সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকলে তা নিরসন হবে। কাজেই অব্যবহিত এবং দীর্ঘ মেয়াদী সাফল্যের জন্য এই কমিটির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এটি খুবই জরুরী যে দক্ষতা ও বাজেট বিশ্লেষণ ইউনিটদ্বয়ের স্টাফ সরকারের ভিতরের এবং বাইরের সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ প্রার্থীদের থেকে বাছাই করে নিতে হবে। এ দুই প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে সংস্কারের চাবিকাঠি, কাজেই এদের স্টাফদের গুণগত মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে নিষ্ক্রিয়তার মূল্য যে কতখানি এরা তা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারবেন। এখানে আরেকটি সুপারিশ রাখা হচ্ছে যে দক্ষতা ইউনিটের দায়িত্বে যেন এমন একজন ব্যক্তি থাকেন যিনি 'পরিবর্তনের প্রতিনিধি' হিসেবে পরিচিত, এবং তাঁর পদমর্যাদা হওয়া উচিত একজন সচিবের – সম্ভব হলে একজন সিনিয়র সচিবের – যাতে ইউনিটটি প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা লাভ করে।

যেসব ব্যবস্থা গ্রহণে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই --- এগুলোর মধ্যে থাকা উচিত বেসরকারী খাত, সাধারণ নাগরিক ও সিভিল সমাজ/ এনজিও থেকে সংস্কারের পক্ষে দ্রুত সমর্থন আদায়। নিচের ব্যবস্থাগুলি সুপারিশ করা হচ্ছে :

- সংসদীয় জবাবদিহিতার জন্য দ্বিপক্ষীয় সংসদীয় টাস্ক ফোর্স গঠন। এটি সংসদের প্রতি মনোযোগী একটি স্বচ্ছ এবং উন্মুক্ত সরকারের প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রতিপন্ন করবে। একই সাথে সরকারের উচিত সাংসদদের আইন প্রণয়নগত এবং তদারকী দায়-দায়িত্ব আরো কার্যকরভাবে পালনের জন্য ভৌত ও বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান।

- সরকার ও নাগরিক/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেন নিয়ন্ত্রণকারী প্রবিধানমূলক প্রশাসন পর্যালোচনা ও সংস্কারের ম্যান্ডেটসহ একটি প্রবিধানমুক্তকরণ বা বিনিয়ন্ত্রণ কমিশন (Deregulation Commission) গঠন। এটি সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হবে।

- "নাগরিক সনদ" (Citizen Charter) প্রচলনে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা এবং কার্যসম্পাদনা মান নির্দিষ্ট করার জন্য কয়েকটি জনসেবা চিহ্নিত করা। শুরুতে কয়েকটি সেবা, যেমন পাসপোর্ট তৈরি ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান, গ্যাস সংযোগ, রেলপথের টাইমটেবিল ইত্যাদির ক্ষেত্রে নাগরিক সনদকে জনগণ স্বাগত জানাবে।

- ঢাকাতে ন্যায়পালের দপ্তর স্থাপন (একসঙ্গে কয়েকটি আঞ্চলিক দপ্তরও খোলা যায়) এবং প্রতিটি থানা অফিসে জনগণের অভিযোগ জানাবার ব্যবস্থা করা।

- বাংলাদেশ সরকার-এনজিও উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপন, যা এনজিও সম্প্রদায়ের কাছে একটি আরো শক্তিশালী অংশীদারিত্ব স্থাপনে সরকারের আগ্রহ প্রতীয়মান করবে। এছাড়া, এতে শিকড় পর্যায়ে সমর্থন যোগাতে সরকারের পক্ষে এনজিওদের সমর্থন লাভ সহজ হবে।

- প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপন। এই ব্যবস্থা নেয়া হলে পূর্ব-এশীয় আঙ্গিকে সরকার ও ব্যক্তি পর্যায়ের অংশীদারিত্ব সূচিত করতে প্রধানমন্ত্রীর সংকল্প প্রতীয়মান হবে, এবং বেসরকারী খাতের কাছে তা সাদরে গৃহীত হবে।

- দুর্নীতি নির্মূলের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা ঘোষণা করা। দুর্নীতি সম্পর্কে যে ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপকে সিভিল সমাজ স্বাগত জানাবে, এবং দুর্নীতির বিষয়টিকে সরকার যে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, সে সম্পর্কে সরকারের সংকল্প প্রতীয়মান করবে।

সরকারের সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ – এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ যে সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে একটি "নতুন" সরকার সম্পর্কে তার দৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবে এবং অ-জনপ্রিয় ব্যবস্থা নিতেও তার সংকল্প জানিয়ে দিবে। ন্যূনতম হিসেবে, সরকারের উচিত :

- কয়েকটি দপ্তর/সংস্থা (যেমন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়), যেগুলি তাদের চালু থাকার যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলেছে, একীভূত করা/বন্ধ করে দেয়া। এক্ষেত্রে নূরন্নবী কমিটির রিপোর্টটি কাজে লাগানো উচিত।

- চলমান ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ কর্মসূচি এবং টেলিযোগাযোগ, গ্যাস ও জাহাজ চলাচল খাতসমূহ নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ ত্বরান্বিত করা। উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারকে সংস্কারের জন্য প্রধান লক্ষ্যসমূহ একটি সময়-নির্দিষ্ট ও প্রত্যবেক্ষণযোগ্য কর্মসূচির অধীনে নির্ধারণ করতে হবে, যে কর্মসূচি পুরোপুরি জনসাধারণের গোচরে থাকবে।

<u>কম জনপ্রিয় সংস্কারসমূহ সূচিত করা –</u>
<u>পরবর্তী ১২ মাস</u>

৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে যখন প্রথম পর্যায়টি শেষ হয়ে যাবে, ততদিনে মূল প্রতিষ্ঠানগুলি এবং টাস্ক ফোর্সগুলি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর হয়ে যাবে এবং তাদের কাজের প্রাথমিক সুফল হাতে আসতে থাকবে। কয়েকটি "শুধুমাত্রই লাভ" ধরনের পদক্ষেপের ফলাফল নিচের ক্ষেত্রগুলিতে দৃশ্যমান হতে শুরু করবে: সাধারণ নাগরিকদের জীবনে হয়রানি কিছুটা কমবে, নির্বাচিত কয়েকটি সরকারী সংস্থা অধিকতর মনোযোগী হয়ে দাঁড়াবে, এবং বেসরকারী খাত ও এনজিওগুলি নীতি প্রণয়নে আরো বেশি জড়িত হবে। এই "সামর্থ্যদানকারী পরিবেশ" আরো কঠিন সংস্কার শুরু করার জন্য অনুকূল প্রমাণিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কার চালু রাখতে হবে, এবং "শুধুই লাভ" ধরনের ব্যবস্থাগুলি আরো সম্প্রাসরিত করতে হবে, এবং একই সঙ্গে আরো দুরূহ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংস্কারের আরো বিস্তারিত সূচি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করবে, তবে নিচের তালিকাটি মূল পরিসীমা নির্ধারণ করবে:

- জাতীয় কমিশনের প্রাথমিক সুপারিশগুলির বাস্তবায়ন সূচিত করা।

- বিনিয়ন্ত্রণ কমিশন; সংসদীয় জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতির ওপর টাস্ক ফোর্স, এবং সরকার-এনজিও ও বেসরকারী খাতের কাউন্সিলসমূহ বাস্তবায়ন সূচিত করা।

- প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন, এরকম সিদ্ধান্তের সংখ্যা হ্রাস করা।

- IMED কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থাপন করা।

- সংস্থাগুলিকে সেবা প্রদানের বিকল্প পথ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করার জন্য পিপি ফর্মাট সংশোধন।

- আইন সংস্কার কমিশনকে সক্রিয় করা।

- বেতন গবেষণা ইউনিট স্থাপন করা।

- কর্মী ব্যবস্থাপনা সংস্কার সূচিত করা, এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিশেষ/মেধা বেতন স্কীম এবং বিদেশে "ক্র্যাশ" প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা।

- মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলিকে তাদের বাজেট প্রস্তাবনায় কার্যসম্পাদনা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম করার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন করা।

- অতিরিক্ত/অপ্রয়োজনীয় কর্মচারীদের জন্য একটি সম্পূর্ণভাবে অর্থায়নকৃত সেইফটি নেট (নিরাপত্তা জাল) চালু করা।

- এসওই সমূহের বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষণের পরিধি সম্পর্কে নির্দেশ রেখা প্রণয়ন।

<u>পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা – মধ্যম মেয়াদের বিষয়সূচি</u>

এই পর্যায়ে বেশির ভাগ বিষয়সূচি স্পষ্টতই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ এবং প্রথম ১২-১৮ মাসের অভিজ্ঞতার নানা শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসবে। পরবর্তী বছরগুলিতে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত পূর্ব-নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি হবে নিম্ন অগ্রাধিকারের অথবা এদের নির্ভরযোগ্যতা ও চালু থাকার ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রচুর প্রশাসনিক ও কারিগরী পরিমার্জনা প্রয়োজন হবে। এই শ্রেণীতে কয়েকটি কাঠামোগত সংস্কারের মধ্যে রয়েছে :

- নির্বাচিত ব্যুরো/বোর্ডসমূহকে পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্বশাসনসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করা। এসব সংস্থার প্রধান মূখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করবেন, যাতে পাবলিক একাউন্টস কমিটি ও মহা হিসাবনিরীক্ষকের কাছে তাদের সম্পূর্ণ জবাবদিহিতা থাকে।

- সাংসদদের জন্য বিধানিক সহায়তা প্রদান, সংসদীয় সচিবালয়ে সংসদীয় ওয়াচডগ সংস্থা এবং অর্থনৈতিক নীতি- বিশ্লেষণ ইউনিট স্থাপন।

- স্থানীয় সরকার আইন প্রণয়ন, এবং পল্লী কর্মসূচির জন্য সম্পদ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর।

- পরিকল্পনা কমিশনের পরিধি এবং কাজের আওতা কমানো, এবং একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়গুলির সামর্থ্য বাড়ানো।

- কয়েকটি মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে নিয়ে একটি কর্মসূচি চালু করা, যা তাদের বাজেটকে কার্যসম্পাদনার উদ্দেশ্যাবলী এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত করবে।

এই পর্যায়ের শেষ নাগাদ সরকারী ব্যয় নীতি নির্ধারণে বাজেট প্রক্রিয়া প্রভাব রাখতে শুরু করবে। এ ছাড়া, আকৃতি হ্রাস ও অনেক কাজ বাইরের ঠিকাদারদের দিয়ে দেয়ার ফলে আর্থিক ক্ষেত্রটিও অনেক বেশি সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে বেতন-ভাতা সংক্রান্ত কাঠামোগত সংস্কার শুরু করা সম্ভব হবে। **নির্বাহী সারসংক্ষেপের শেষে একটি দীর্ঘ সারণীতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশকৃত সংস্কারের একটি ক্রমিক তালিকা দেয়া হয়েছে।**

দাতাদের ভূমিকা

প্রতিষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা দান ছাড়াও দাতারা পরিবর্তন উৎসাহিত করতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। তারা যেসব কাজ করতে পারেন, তার মধ্যে রয়েছে :

- তাদের নিজস্ব কর্মসূচিতে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ও কার্যসম্পাদনার মান নির্ধারণ করা (শর্ত মেনে না চলার জন্য শাস্তি ও ভোক্তাদের মূল্য ফেরত দেয়াসহ), যা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

- ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, গ্রাহক-জরিপ পরিচালনা করা এবং তাদের নিজস্ব কর্মসূচিতে ও তাদের দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত বাস্তবায়ন সংস্থাগুলির কর্মসূচিতে গ্রাহকের প্রতি মনোযোগ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।

- সিভিল সমাজের কাছে তাদের পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যপ্রবাহ বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।

- তাদের কর্মসূচিতে "সাফল্য থেকে শিক্ষা"র বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা, এবং কর্মসূচি/প্রকল্প নক্সা চূড়ান্ত করার আগে প্রচলিত কর্মপদ্ধতিকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করা ও প্রশ্ন করা।

- "পরিবর্তনের প্রতিনিধি"দের আগে থেকেই চিহ্নিত করা ও উৎসাহিত করা।

- এই বিতর্কটি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতরে শুরু করা ও টিকিয়ে রাখার জন্য স্থানীয় থিংক ট্যাংক ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নীতি-গবেষণাকে সমর্থন দেয়া।

- স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমকে প্রহরীর ভূমিকা পালনের জন্য এবং সংস্কারের আবশ্যকতা ও উপায়সমূহের ওপর বিতর্কের একটি ফোরাম হিসেবে কাজ করার জন্য সমর্থন দেয়া।

সংস্কারের জন্য আর্থিক খরচ

সংস্কারের জন্য মূল তিন ধরনের খরচ হবে: প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের খরচ, বেতন ভাতা ও অতিরিক্ততা সংক্রান্ত খরচ।

- *প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের* আওতায় আছে বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে (যেমন– সিএজি, IMED ইত্যাদি) শক্তিশালী করা, এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন (যেমন– সংসদীয় ওয়াচডগ এজেন্সি ও কমিটিসমূহ, ন্যায়পালের দপ্তর, দক্ষতা ও বাজেট বিশ্লেষণ ইউনিট, প্রবিধানমুক্তকরণ ও সংস্কার কমিশন, ইত্যাদি)। এর জন্য খসড়া বাজেট প্রাক্কলন হচ্ছে প্রতি বছর ১০ কোটি টাকা।

- *বেতন ভাতা ও অতিরিক্ততা সংক্রান্ত খরচ* – একটি সুপ্রণীত কর্মী নিয়োগ যুক্তিযুক্তকরণ এবং একাধারে বেতন সংস্কার কর্মসূচিতে অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে বেতন-ভাতা খাতে বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে এটি বহুলাংশে অর্থায়ন করা যায়। সবচেয়ে বড় বাড়তি খরচটি হবে মেধা/বিশেষ বেতন কর্মসূচিতে। তবে এতে বছরে ১৪ কোটি টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়।

প্রাপ্ত বাজেট সম্পদের তুলনায় একত্রে এই দু'টি খরচ অত্যন্ত নগণ্য। আর একটি কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক সরকার থেকে সম্ভাব্য যে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল আসবে তার সাথে যদি এই খরচ তুলনা করা হয়, তাহলে এটি আরো নগণ্য হয়ে পড়ে। অনেক দাতাই এই খরচ যোগান দিতে রাজি হবেন।

৭. ভবিষ্যত বাংলাদেশ: দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন সমাপ্ত করা

দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকার তার দায়-দায়িত্ব একেবারে ভিন্নভাবে পালন করবে। সরকার আর কোনো স্থিরনির্দিষ্ট নীলনক্সা মেনে চলতে পারবেনা, কারণ এমন একটি যুগে তখন আমরা প্রবেশ করব, যখন একমাত্র নিশ্চয়তা হবে ক্রমাগত পরিবর্তনের নিশ্চয়তা। তবে কিছু সাধারণ গন্তব্য কি হবে, তা এখন থেকেই হয়তো বলা যায়।

প্রথমত, একটি সফল প্রশাসন বর্তমানের অনেক কাজকর্ম অন্যত্র পুনর্বন্টন করে দেবে, যাতে অনেক বেশি দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে সেগুলি করা যায়। এর অর্থ হতে পারে বিকেন্দ্রীকরণ – এবং স্থানীয় সরকারের হাতে ঐসব কাজকর্ম ছেড়ে দেয়া, অথবা এনজিও অথবা বেসরকারী খাতের হাতে সেগুলো চুক্তিভিত্তিক হস্তান্তর। সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অনেক ধরনের সেবার জন্য অর্থ যোগান দিয়ে যাবে, তবে যেসব প্রতিষ্ঠান এসব সেবা সবচেয়ে ভালভাবে দিতে পারে, সরকার তাদেরকেই কাজে লাগাবে। আর জনগণ যাতে তাদের অর্থের বিনিময় মূল্য পান, তা নিশ্চিত করতে সরকার এসব কাজের ফলাফল নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণ করবে।

অন্য অনেক ক্ষেত্রে, সরকার বর্তমানে যেসব কাজ করছে, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেবে। কারণ এসব কাজের আর প্রয়োজন থাকবে না, অথবা এগুলো বেসরকারী খাত আরো ভালভাবে অর্থায়ন ও সম্পাদন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক লোকসান দেয়া রাষ্ট্রমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন করে দেবে, অথবা বন্ধ করে দেবে। এর ফলে সরকার মেদবর্জিত এবং অনেক বেশি কর্মক্ষম হয়ে দাঁড়াবে, এবং যেসব কাজ শুধু সরকারই করতে পারে সেদিকে আরো বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে। বেশির ভাগ উন্নয়ন প্রকল্প নিজে শুরু না করে সরকার বিভিন্ন সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বেসরকারী সংস্থাকে করার জন্য থোক মঞ্জুরী দেবে, এবং এরপর তাদের সততা ও কার্যকারিতা প্রত্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

নতুন ধরনের সরকারের একটি কাজ হবে সামান্য ফেরিওয়ালা থেকে নিয়ে সবচেয়ে বড় কর্পোরেশনকে, অর্থাৎ পুরো বেসরকারী খাতকে, তার কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রটি সম্প্রসারণ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত করে দেয়া, যাতে এ খাতটি বৃদ্ধি পায় ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। এ সরকার প্রবিধানের ঝোঁপ-ঝাড় কাটার কাজে নেমে পড়বে; শুধু যেসব প্রবিধান জনস্বার্থ রক্ষা করে, এবং সুসম ও ফলপ্রসূ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড উৎসাহিত করে, সেগুলো যথাস্থানেই থাকবে। তা ছাড়া, বিচার ব্যবস্থাকেও এ সরকার পুনরুজ্জীবিত করবে, যাতে ব্যক্তি ও কর্পোরেশন, উভয়ের আচরণের জবাবদিহিতা থাকে, এবং কোনো ব্যত্যয় ঘটলে যাতে দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তার বিচার করা যায়।

- *বেতন ভাতা ও অতিরিক্ততা সংক্রান্ত খরচ* – একটি সুপ্রণীত কর্মী নিয়োগ যুক্তিযুক্তকরণ এবং একাধারে বেতন সংস্কার কর্মসূচিতে অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে বেতন-ভাতা খাতে বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে এটি বহুলাংশে অর্থায়ন করা যায়। সবচেয়ে বড় বাড়তি খরচটি হবে মেধা/বিশেষ বেতন কর্মসূচিতে। তবে এতে বছরে ১৪ কোটি টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়।

প্রাপ্ত বাজেট সম্পদের তুলনায় একত্রে এই দু'টি খরচ অত্যন্ত নগণ্য। আর একটি কার্যকর এবং জবাবদিহিমূলক সরকার থেকে সম্ভাব্য যে দীর্ঘ মেয়াদী সুফল আসবে তার সাথে যদি এই খরচ তুলনা করা হয়, তাহলে এটি আরো নগণ্য হয়ে পড়ে। অনেক দাতাই এই খরচ যোগান দিতে রাজি হবেন।

৭. ভবিষ্যত বাংলাদেশ: দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন সমাপ্ত করা

দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকার তার দায়-দায়িত্ব একেবারে ভিন্নভাবে পালন করবে। সরকার আর কোনো স্থিরনির্দিষ্ট নীলনক্সা মেনে চলতে পারবেনা, কারণ এমন একটি যুগে তখন আমরা প্রবেশ করব, যখন একমাত্র নিশ্চয়তা হবে ক্রমাগত পরিবর্তনের নিশ্চয়তা। তবে কিছু সাধারণ গন্তব্য কি হবে, তা এখন থেকেই হয়তো বলা যায়।

প্রথমত, একটি সফল প্রশাসন বর্তমানের অনেক কাজকর্ম অন্যত্র পুনর্বন্টন করে দেবে, যাতে অনেক বেশি দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে সেগুলি করা যায়। এর অর্থ হতে পারে বিকেন্দ্রীকরণ – এবং স্থানীয় সরকারের হাতে ঐসব কাজকর্ম ছেড়ে দেয়া, অথবা এনজিও অথবা বেসরকারী খাতের হাতে সেগুলো চুক্তিভিত্তিক হস্তান্তর। সরকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অনেক ধরনের সেবার জন্য অর্থ যোগান দিয়ে যাবে, তবে যেসব প্রতিষ্ঠান এসব সেবা সবচেয়ে ভালভাবে দিতে পারে, সরকার তাদেরকেই কাজে লাগাবে। আর জনগণ যাতে তাদের অর্থের বিনিময় মূল্য পান, তা নিশ্চিত করতে সরকার এসব কাজের ফলাফল নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণ করবে।

অন্য অনেক ক্ষেত্রে, সরকার বর্তমানে যেসব কাজ করছে, তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেবে। কারণ এসব কাজের আর প্রয়োজন থাকবে না, অথবা এগুলো বেসরকারী খাত আরো ভালভাবে অর্থায়ন ও সম্পাদন করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক লোকসান দেয়া রাষ্ট্রমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন করে দেবে, অথবা বন্ধ করে দেবে। এর ফলে সরকার মেদবর্জিত এবং অনেক বেশি কর্মক্ষম হয়ে দাঁড়াবে, এবং যেসব কাজ শুধু সরকারই করতে পারে সেদিকে আরো বেশি মনোনিবেশ করতে পারবে। বেশির ভাগ উন্নয়ন প্রকল্প নিজে শুরু না করে সরকার বিভিন্ন সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বেসরকারী সংস্থাকে করার জন্য থোক মঞ্জুরী দেবে, এবং এরপর তাদের সততা ও কার্যকারিতা প্রত্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

নতুন ধরনের সরকারের একটি কাজ হবে সামান্য ফেরিওয়ালা থেকে নিয়ে সবচেয়ে বড় কর্পোরেশনকে, অর্থাৎ পুরো বেসরকারী খাতকে, তার কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রটি সম্প্রসারণ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত করে দেয়া, যাতে এ খাতটি বৃদ্ধি পায় ও সমৃদ্ধি অর্জন করে। এ সরকার প্রবিধানের ঝোঁপ-ঝাড় কাটার কাজে নেমে পড়বে; শুধু যেসব প্রবিধান জনস্বার্থ রক্ষা করে, এবং সুসম ও ফলপ্রসূ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড উৎসাহিত করে, সেগুলো যথাস্থানেই থাকবে। তা ছাড়া, বিচার ব্যবস্থাকেও এ সরকার পুনরুজ্জীবিত করবে, যাতে ব্যক্তি ও কর্পোরেশন, উভয়ের আচরণের জবাবদিহিতা থাকে, এবং কোনো ব্যত্যয় ঘটলে যাতে দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে তার বিচার করা যায়।

তবে সবার উপরে বাংলাদেশে পরবর্তী সরকার পদ্ধতি জনগণের সাথে একটি নতুন সম্পর্কের ওপর গড়ে ওঠবে। গোপনতা-প্রিয় এবং স্বার্থান্বেষী আমলাতন্ত্রের দিনগুলি শুধু অতীত দুঃস্বপ্ন হয়েই থাকবে। সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের সংস্পর্শ হবে উন্মুক্ত এবং অবাধ। সরকারের পরিকল্পনায় তারা সহযোগিতা করবে, এর কার্যকারিতা পরিমাপ করবে, এবং ব্যর্থতার জন্য একে দায়ী করবে। সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তারা তাদের দক্ষতা, কার্যসম্পাদনা এবং সাধারণ নাগরিকদের সাহায্য করার সদিচ্ছা অনুযায়ী বেতন পাবেন।

একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা : সরকারী খাতের সংস্কার
প্রস্তাবিত সংস্কার বিষয়সূচির সারণী

স্বল্প-মেয়াদী ব্যবস্থাসমূহ (প্রথম ৬ মাসের মধ্যে)	নিকট-মেয়াদী ব্যবস্থাসমূহ (১২ মাসের মধ্যে)	মধ্য মেয়াদী ব্যবস্থাসমূহ (২য় বছরের মধ্যে)
সরকারের ভূমিকা পুনঃসংজ্ঞায়ন/সরকারের আকার সঠিক করা		
• একবিংশ শতকে সরকার কি রকম হবে, তা বর্ণনা করে সংসদে একটি নীতি-বিবরণী ঘোষণা; সরকারকে দক্ষ করার জন্য বেসামরিক প্রশাসন সংস্কার এবং বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ	• সংস্থাসমূহকে সরকারী খাতে হস্তক্ষেপের যুক্তি প্রতিপাদন করতে "বাধ্য করার" জন্য পি পি ফর্মাট সংশোধন করা	• জাতীয় কমিশন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে, কর্মকান্ডের "বোঁচকা খুলতে", কাজ ঠিকাভিত্তিক অন্যত্র ন্যস্ত করতে এবং নানা সংস্থাকে কাটছাঁট করে সুসংগঠিত করতে যেসব সুপারিশ করেছে, সেগুলি কাজে প্রয়োগ অব্যাহত রাখা
• সরকারের সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশন গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা শুরু করা; দক্ষতা ইউনিট এতে কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে	• জাতীয় কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন চালিয়ে যাওয়া	
	• সরকারের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে খসড়া বিল প্রস্তুত করা	• সরকারের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে আইন পাশ করা
• নূরুন্নবী পুনর্গঠন কমিটির ও চার সচিবের রিপোর্টের মুলতবী সুপারিশ বাস্তবায়ন		
• সংস্কার বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণের জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন		
• প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে দক্ষতা ইউনিটের পূর্ণ স্টাফ নিয়োগ		
• প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মচারীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়নকৃত একটি নিরাপত্তা কর্মসূচি চালুর লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ	• অতিরিক্ত কর্মীদের জন্য সম্পূর্ণভাবে অর্থায়নকৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কর্মসূচি হাতে নেয়া	
• দক্ষ সেবা সংস্থা হিসেবে স্থাপন করার জন্য ব্যুরো/ বডিসমূহকে চিহ্নিত করা	• নির্বাচিত বোর্ড/ব্যুরোসমূহকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করা	

জবাবদিহিতা এবং মনোযোগ বৃদ্ধি (১) সংসদীয় • সংসদীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ্যাকশন প্ল্যান তৈরির জন্য একটি দ্বিপক্ষীয় টাস্ক ফোর্স গঠন • ন্যায়পালের নিয়োগদান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর স্থাপন • জনগণের অভিযোগ শোনার জন্য অফিসসমূহ স্থাপনের কাজ শুরু করা • পাবলিক একাউন্টস কমিটি শক্তিশালী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ • প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর ঘন্টা শুরু করা • সংসদে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে উপযুক্ত সাংসদদের সিলেক্ট কমিটির সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া	• টাস্ক ফোর্স কর্তৃক সুপারিশকৃত কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা • জনগণের অভিযোগ গ্রহণ অফিসসমূহ স্থাপন শেষ করা • পাবলিক একাউন্টস কমিটি শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা • সাংসদদের বিধানিক সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ • সংসদীয় ওয়াচডগ এজেন্সি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ • সংসদ সচিবালয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি-বিশ্লেষণ ইউনিট স্থাপনের কাজ শুরু করা	• পাবলিক একাউন্টস কমিটি শক্তিশালী করার কর্মসূচি সমাপ্ত করা • সাংসদদের বিধানিক সহায়তা দেয়া • সংসদীয় ওয়াচডগ এজেন্সি স্থাপন • সংসদ সচিবালয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি-বিশ্লেষণ ইউনিট স্থাপন • গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় নিয়োগ সংসদীয় অনুমোদন সাপেক্ষ করা
(২) মন্ত্রণালয়/সংস্থা সম্পর্কিত • নাগরিক সনদ প্রবর্তনের পক্ষে অঙ্গীকার ঘোষণা • গুরুত্বপূর্ণ খাত মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ বছরের শুরুতে তাদের উদ্দেশ্যাবলী এবং কার্যসম্পাদনা লক্ষ্য ঘোষণা করবে, যাতে বিরতিহীনভাবে কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন করা যায় • কয়েকটি সেবা সংস্থা/আবশ্যকীয় সেবা চিহ্নিত করে নাগরিক সনদের অংশ হিসেবে পরিমাপযোগ্য এবং স্বচ্ছ সেবা প্রদান মান নির্ধারণ করা • IMED-র ভূমিকা পুনঃনির্ধারণ এবং একে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থাপন	• গুরুত্বপূর্ণ খাত মন্ত্রণালয়/সংস্থা বছরের শুরুতে যেসব উদ্দেশ্য ও কার্যসম্পাদনা লক্ষ্য সম্পর্কে সম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেগুলো অর্জনের জন্য কর্মসূচি চালু করা যাতে বিরতিহীন কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন করা যায় • কয়েকটি নির্বাচিত জনসেবার ক্ষেত্রে পরিমাপযোগ্য এবং স্বচ্ছ সেবাপ্রদান মান যে অর্জিত হচ্ছে, তা নিশ্চিত করা ও প্রত্যবেক্ষণ করা	• নাগরিক সনদ প্রবর্তন করতে বাধ্য এরকম সংস্থার সংখ্যা বাড়ানো

(৩) <u>বাজেট/সিএজি</u> • RIBEC সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা • বাজেট বিশ্লেষণ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা • মন্ত্রণালয়/এজেন্সিসমূহকে দেয়া বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে কৌশলগত অগ্রাধিকার ও কার্যসম্পাদনা উদ্দেশ্যাবলী/ লক্ষ্যসমূহ সংযুক্ত করে দেয়ার জন্য কর্মসূচি তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ	• মধ্য-মেয়াদী বাজেট-প্রক্রিয়া সংস্কার হাতে নেয়া • হিসাব নিরীক্ষণ ও হিসাব রক্ষণ কার্যক্রম আলাদা করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা হাতে নেয়া • মন্ত্রণালয়/এজেন্সিসমূহকে দেয়া বাজেট বরাদ্দের সঙ্গে কৌশলগত অগ্রাধিকার ও কার্যসম্পাদনা উদ্দেশ্যাবলী/ লক্ষ্যসমূহ সংযুক্ত করে দেয়ার জন্য কর্মসূচি প্রস্তুত করা • এসওইসমূহের বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষণের (অডিটের) আওতা/টার্মস অফ রেফারেন্স-এর মান নির্ধারণ	• মধ্য-মেয়াদী বাজেট প্রক্রিয়া সংস্কার অব্যাহত রাখা • হিসাব নিরীক্ষণ ও হিসাব রক্ষণ কার্যাবলী পৃথক করে ফেলা • নির্বাচিত সংস্থাগুলির জন্য হিসাব নিরীক্ষণ ঠিকাভিত্তিক বাইরের ফার্মকে দেয়া অনুমোদন করা • অর্থের-বিনিময়ে-মূল্য অডিট চালু করা
(৪) <u>দুর্নীতি দমন</u> • দুর্নীতি দমন কেইসসমূহ পর্যালোচনার জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন •	• দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য তদারকী কমিটি গঠন	• টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রণীত মধ্য-মেয়াদী কর্মসূচি বাস্তবায়ন
(৫) <u>স্বচ্ছতা</u> • সরকারী খাতের স্বচ্ছতা সম্পর্কে বিভিন্ন পেশাদারী ও কর্মভিত্তিক গ্রুপ থেকে নেয়া স্বাধীন সদস্যদের সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন, যা স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখবে • স্বচ্ছতা সম্পর্কে একটি পাবলিক পলিসি নির্ধারণ ও ঘোষণা করা • নির্বাচিত ব্যক্তিদের বার্ষিক আয়/প্রদেয় ট্যাক্স ঘোষণা করার নির্দেশরেখা প্রণয়ন	• ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট (সরকারী গোপনীয়তা আইন) রদ করা, এবং এর স্থলে জনগণের তথ্যের অধিকার আইন পাশ করা • মূল্যায়ন রিপোর্টগুলি জনগণের গোচরে এনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা – প্রক্যুরমেন্ট ইভালুয়েশন কমিটির রিপোর্ট সকল দরপত্র জমাকারীর আইনানুগভাবে পাওয়ার অধিকার থাকা উচিৎ • এক কোটি টাকার উপর সকল সংগ্রহ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা • নির্বাচিত ব্যক্তিদের বার্ষিক আয়/প্রদেয় ট্যাক্স প্রকাশ করা সংসদের কাছে সময়মত সকল এসওই এবং প্যারাস্টাটাল প্রতিষ্ঠানের হিসাব, অডিট ও বার্ষিক কার্যসম্পাদনা রিপোর্ট পেশ করা	• ট্রান্সপ্যারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল-এর স্থানীয় শাখাকে দুর্নীতি ঠেকাতে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি উদ্ভাবনে সহায়তা করা।

প্রবিধানমুক্তকরণ ও সামর্থদানকারী পরিবেশ সৃষ্টি (১) <u>প্রবিধানমুক্তকরণ/বিনিয়ন্ত্রণ</u> • একটি বিনিয়ন্ত্রণ কমিশন স্থাপন করে প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠান শুরু করা ও একই সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রবিধান রদ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব আসা নিশ্চিত করা • বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ ঘটানোর জন্য পথ করে দেয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, বিমান চলাচল ও গ্যাস খাতসমূহের জন্য প্রবিধান তৈরির ব্যবস্থা হাতে নেয়া • নির্বাহী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক খসড়াকৃত সকল প্রস্তাবিত প্রবিধান যাতে জনগণ পর্যালোচনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করা (যেমন খসড়া সংসদে পাঠানো, প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠান করা)	• বিনিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত সংস্কার বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা • বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, বিমান চলাচল ও গ্যাস খাতসমূহে প্রবিধান তৈরি চূড়ান্ত করা • জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল প্রবিধানের একটি সংকলন প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ • নিয়ন্ত্রণকারী ও নিয়ন্ত্রিতদের মধ্যে সংস্পর্শ যত কম করা যায়, সে লক্ষ্যে অগ্রবর্তী কর্মসূচি চালু করা	• জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল প্রবিধানের একটি সংকলন প্রকাশ করা • নির্বাহী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক খসড়াকৃত সকল প্রস্তাবিত প্রবিধান যাতে জনগণ পর্যালোচনা করতে পারে (অর্থাৎ খসড়াটি সংসদে পাঠানো এবং এগুলো নিয়ে প্রকাশ্য শুনানি অনুষ্ঠান) তার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা
(২) <u>আইনগত সংস্কার</u> • আইন সংস্কার কমিশন স্থাপন ও স্টাফ নিয়োগ শুরু করা • বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ • বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য কর্মসূচি তৈরির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ	• আইন সংস্কার কমিশনে সকল স্টাফ নিয়োগ ও এ ব্যাপারে অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কে সংসদকে অবহিত করা • বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট স্থাপন ও স্টাফ নিয়োগ অব্যাহত রাখা • বিচার ব্যবস্থা জোরদার করার কর্মসূচি শুরু করা	• বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সকল স্টাফ নিয়োগ • বিচার পদ্ধতি জোরদার করার জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন চূড়ান্ত করা
বিকল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা (১) <u>এনজিও</u> • সরকার—এনজিও উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন	• এনজিও নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্তকরণ এবং এনজিওদের কাজকর্ম তদারকী করার দায়িত্ব এডাবকে দেয়া, ইত্যাদি	• এনজিওদের সামাজিক/পল্লী খাতের কর্মসূচিতে অর্থ যোগানোর জন্য PKSF ধরনের পদ্ধতি চালু করা

• এনজিও নিবন্ধন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত-করণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ • ECNEC এর কাছে পাঠানো বিনিয়োগ প্রস্তাবে এনজিওদের মতামত যাতে সংযুক্ত হয় তার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ	• অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ও অস্পষ্টতা হ্রাসের জন্য এনজিও প্রবিধানগুলি সংশোধন করা • ECNEC এর কাছে পাঠানো বিনিয়োগ প্রস্তাবে এনজিওদের মতামত যাতে সংযুক্ত হয় তার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা • এনজিওদের সামাজিক/পল্লীখাত কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য PKSF ধরনের পদ্ধতি স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করা	• ECNEC এর কাছে পাঠানো বিনিয়োগ প্রস্তাবে এনজিওদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করে উন্নয়ন পরিকল্পনায় এনজিওদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
(২) <u>স্থানীয় সরকার</u> • স্থানীয় সরকার বিল আবার সক্রিয় করা/সংশোধন করা	• স্থানীয় সরকার সংস্কার সম্পর্কিত আইন পাশ করা • নির্বাচিত জনসেবাগুলি পর্যায়ভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার কাছে হস্তান্তরের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন • স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য রাজস্ব ভাগ করার ফর্মূলা ও মূলনীতি প্রণয়ন	• নির্বাচিত জনসেবা (পাবলিক সার্ভিস) পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার কাছে হস্তান্তর • স্থানীয় সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য রাজস্ব ভাগ করার ফর্মুলা ও মূলনীতি প্রণয়ন • স্থানীয় সরকারের আরো বেশি অংশগ্রহণ ও রাজস্ব ভাগ করার জন্য অগ্রবর্তী স্কীম তৈরি করা
(৩) <u>বেসরকারী খাতের প্রসার</u> • প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারীখাত উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপন • ব্যক্তিমালিকানাকরণ ত্বরান্বিত করা • বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানী উন্নয়ন বোর্ডের সংস্কার সূচিত করা	• উপদেষ্টা কাউন্সিলের সুপারিশ বাস্তবায়ন ।	

পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং জাতীয় নীতি প্রণয়ন সুসংহত করা • পরিকল্পনা কমিশনে কাজের মাত্রা ও পরিধি হ্রাস করা ও একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়গুলির পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন সামর্থ জোরদার করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ	• পরিকল্পনা কমিশনের কাজের মাত্রা ও পরিধি হ্রাস করা, এবং একই সঙ্গে মন্ত্রণালয়গুলির পরিকল্পনা নীতি প্রণয়ন সামর্থ জোরদার করা	
সরকারের কর্মকান্ড সুসংহত করা • বৃহৎ উন্নয়ন দপ্তরের/স্বায়ত্বশাসিত কর্তৃপক্ষের (এলজিইডি, যমুনা বহুমুখী সেতু, মাধ্যমিক শিক্ষার মহাপরিচালক) প্রধানকে মূখ্য হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা মনোনীত করা • প্রকল্প পরিচালকদের আর্থিক/প্রশাসনিক ক্ষমতা বাড়ানো • প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন এমন সিদ্ধান্তের সংখ্যা কমিয়ে পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সরকারের কার্য-পরিচালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা • TAPP সহ বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদন ক্রিয়া সুসংহত করা	• সংগ্রহ সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি বিলোপ করা এবং এর স্থলে সচিব পর্যায়ের একটি স্থায়ী আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি স্থাপন করা, যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব বহির্ভুত সকল সংগ্রহের দায়িত্বে থাকবে • কর্মী ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা শাখা শক্তিশালী করা • সচিবালয় বিধিসমূহ এবং রুলস অফ বিজিনেস পর্যালোচনা করা	
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা • সিভিল সার্ভিসের ভিতরে "পরিবর্তনের প্রতিনিধিদের" চিহ্নিত করা/সক্রিয় করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা • অর্থ মন্ত্রণালয়ে বেতন গবেষণা ইউনিট খোলা • সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ • প্রশিক্ষণ চাহিদা মূল্যায়ন, এবং সকল মধ্য-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য চাকুরি-বিবরণী পদ্ধতি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করা	• "পরিবর্তনের প্রতিনিধিদের" চিহ্নিত ও সক্রিয় করার কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও প্রয়োজন হলে পরিমার্জনা করা • মেধা/বিশেষ বেতন স্কীম চালু করা • সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান তৈরির কর্মসূচি অব্যাহত রাখা • প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মী ও পেশাজীবনের মধ্য-পর্যায়ে অবসর গ্রহণ সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা • স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বিভিন্ন পেশা থেকে	• ব্যাপক আকারে বিদেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা • প্রয়োজনাতিরিক্ত স্টাফ ও পেশাজীবনের মাঝামাঝি অবসর গ্রহণের বিষয় নিয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা • প্রশিক্ষণ চাহিদা মূল্যায়ন এবং সকল মধ্যম-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটি চাকুরি-বিবরণী তৈরি করা অব্যাহত রাখা

	মন্ত্রণালয়গুলিতে এবং মন্ত্রণালয়গুলি থেকে এসব সংস্থা ও পেশায় নির্বাচিত কর্মীদের আড়াআড়ি নিযুক্তির বিষয়টি অনুমোদন করা • সরকারী বেতন থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ/বিচার বিভাগের বেতন আলাদা করে কর্মসূচি তৈরি শুরু ররা	
নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি • নারীদের জন্য সংরক্ষিত চাকুরির সংখ্যা বাড়ানো এবং ব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারণী পদগুলিতে আড়াআড়ি (ল্যাটারেল) নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি • আগে থেকেই এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা যাতে আরো অনেক বেশি নারী সরকারী চাকুরির প্রতি আগ্রহী হন	• ব্যবস্থাপনায় নারী-পুরুষ প্রসঙ্গ, যৌন হয়রানি, নারীদের জন্য সমান সুযোগ, ইত্যাদির ওপর বাধ্যতামূলক কার্যক্রম চালু করা	• সরকারী খাতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া

১. ভালো রাষ্ট্র, অসন্তোষজনক রাষ্ট্র

এই প্রারম্ভিক পরিচ্ছেদে বাংলাদেশী রাষ্ট্রের সর্বপরিব্যাপ্ত ভূমিকা এবং এর অর্জনগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া এ পরিচ্ছেদে তিনটি জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে গুরুত্বের সংগে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম জরিপে সাধারণ নাগরিকদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা যেসব সেবা পান অথবা পান না – সে সম্পর্কে তাদের ধারণা কি। অন্য দুটিতে উদ্যোক্তা এবং রপ্তানিকারকদের ব্যবসার বর্তমান পরিবেশ – এবং সরকার এ পরিবেশকে ভাল করছে না খারাপ করছে – সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। সব শেষে, এ পরিচ্ছেদে সরকারী খাতের দুর্বল দিকগুলি এবং সুস্পষ্ট অদক্ষতাগুলি, এবং সংস্কারের আবশ্যকতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

"কোনো সরকারের প্রধান চিন্তা হওয়া উচিত কিভাবে জনগণ ক্রমশঃ সরকার ছাড়াই চলতে অভ্যস্ত হবে, তা শেখানো।" আলেক্সিস দ্য টকভিল, কার্নে দ্য ভয়াজ (১৮৩১)।

সরকারী খাতের অর্থনৈতিক মানচিত্র

১.১ সরকারী খাত বলতে বুঝায়: ৩৫টি মন্ত্রণালয়, ৫০টি বিভাগ, ২২১টি দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট), ১৩৯টি অধিদপ্তর (ডাইরেক্টরেট) এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং ১৫৩টি রাষ্ট্রমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (এসওই) তে কর্মরত দশ লাখ মানুষ (পরিশিষ্ট-১)। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটভুক্ত ব্যয় এবং পাবলিক সার্ভিস খাতে চাকুরি এবং উৎপাদন ও সেবা প্রদান সহ অন্যান্য নানা উপায়ে সরকার তার প্রভাব খাটায়। তবে সরকার বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক, কর-সংক্রান্ত, উদ্দীপক ও ভর্তুকী নীতিমালা এবং আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশসহ সার্বিক নীতি কাঠামোর মধ্য দিয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে রাষ্ট্রকে দেখা হত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে। এর ফলে নাগরিকদের অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল সুস্পষ্ট। এ ছাড়া বিচিত্র ধরনের নানা কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্র জড়িত, যার অনেকগুলির উপর আছে তার একচেটিয়া অধিকার। এসব কর্মকাণ্ডের বেশির ভাগ একই সাথে বেসরকারী খাতও করে থাকে। যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপস্থিতি খুবই জোরালো, সেগুলো হচ্ছে :

- *প্রাকৃতিক সম্পদ* -- গ্যাস ক্ষেত্র এবং বন।
- *যানবাহন* -- একটি বিমান সংস্থা, রেলপথ, বন্দর, ফেরি ব্যবস্থা এবং সড়ক যানবাহন।
- *আবশ্যকীয় সার্ভিস* -- বিদ্যুৎ, পানি, তেল এবং গ্যাস।
- *মৌলিক সেবা কার্যক্রম* -- স্কুল, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য ক্লিনিক, কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খামার ও বাজারজাতকরণ সুবিধাদি, এবং পরিবার পরিকল্পনা ও টিকাদান সেবাসমূহ।
- *সরকারী সেবা কার্যক্রম* -- নিরাপত্তা,আইন ও শৃংখলা এবং বেতার ও টেলিভিশন।
- *সামাজিক কার্যক্রমসমূহ* -- ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পল্লী উন্নয়ন এবং দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগান কর্মসূচি।

- *বাণিজ্যিক উৎপাদন* -- বস্ত্র থেকে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, সার থেকে চিনি, দিয়াশলাই থেকে কাগজ পর্যন্ত বিভিন্ন সামগ্রী।

- *ব্যবসা বাণিজ্য* -- খাদ্যশস্য, চাল, চিনি, লবন, মরিচ, পেট্রোলিয়াম সামগ্রী, টায়ার ও টিউবের মত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী আমদানী ও বিতরণ।

- *অন্যান্য কর্মকাণ্ড* -- হোটেল ব্যবস্থাপনা থেকে সিনেমা স্টুডিও অথবা গাড়ি ভাড়া দেয়ার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত।

১.২ সরকারের অর্থনৈতিক আধিপত্য যে কতটা, তা নিচের উদাহরণ থেকে বুঝা যাবে:

- সরকারী খাত (এসওইসমূহ সহ) মোট জিডিপির প্রায় ২৬%, এবং আনুষ্ঠানিক খাত থেকে উৎপাদিত জিডিপির মোট প্রায় ৬৯% যোগান দেয়।

- সরকারী চাকুরির সংখ্যা প্রায় দশ লাখের মত, যা আনুষ্ঠানিক খাতের চাকুরির মোট প্রায় ২০%; এবং

- সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মতই বৃহৎ ঋণ দাতা, কারণ এসওইসমূহে দেয়া সরাসরি ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫৫০ কোটি মার্কিন ডলার। যদি আন্তর্জাতিক শ্রেণীকরণ প্রয়োগ করা হত, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই 'নন-পারফর্মিং' বলে প্রতীয়মান হত। তুলনায়, ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে দেয়া ঋণের পরিমাণ ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।

যেসব অর্জন নিয়ে গর্ব করা যায়

১.৩ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। বাইরের ঘটনার অভিঘাত এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মুখে এ দেশটি চমৎকার স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে, এবং একটি আন্তর্জাতিক 'তলাহীন ঝুড়ি' অবস্থা থেকে এমন একটি দেশে পরিণত হয়েছে যা খাদ্যে বলতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যেখানে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নতিও হয়েছে, এবং অ-প্রথাগত রপ্তানির ক্ষেত্রে চমকপ্রদ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ যথেষ্ট অর্থনৈতিক সুস্থিতি অর্জন করেছে। সরকার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে, অর্থনীতিকে বহুমুখী করতে এবং এর দৃষ্টি বহির্বিশ্বের দিকে ফেরাতে সমষ্টিক অর্থনৈতিক সমন্বয় এবং কাঠামোগত সংস্কারের একটি বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ১৯৯০ ও ১৯৯৪ সালের মধ্যে রাজস্ব ঘাটতি জিডিপির ৭.৭ শতাংশ থেকে ৫.৯ শতাংশে কমে এসেছে; মুদ্রাস্ফীতির হার ৯.৩ থেকে ১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে; চলতি হিসাবের ঘাটতি জিডিপির ৭.০ শতাংশ থেকে কমে ১.৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে; এবং বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ১.৯ মাসের আমদানীর সমপরিমাণ থেকে ৮.২ মাসের আমদানীর সমপরিমাণে উন্নীত হয়েছে।

১.৪ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় বছরে ছিল চার শতাংশ, এবং বেশির ভাগ আর্থ-সামাজিক সূচকই উন্নতি নির্দেশ করেছে। এ ছাড়া নিচের ক্ষেত্রগুলিতে অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য:

- *খাদ্য উৎপাদন* -- দেশটি এখন চাল-এ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৯৭২ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে সেচ ও সারের উন্নত প্রাপ্যতার জন্য শীতের (রবি) শস্যের ফলন বেড়েছে শতকরা ৭৫ ভাগ।

- *লেনদেনের উদ্বৃত্ত* – বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং অ-প্রথাগত রপ্তানি বেড়ে যাওয়ায় এ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক।

- *জনসংখ্যা* – পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে সাফল্যের কারণে সন্তান ধারণ ক্ষমতার হার সাতের কিছু বেশি থেকে চারের সামান্য বেশিতে নেমে এসেছে। এর ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৯৭০ এর দশকের প্রায় ২.৭ শতাংশ থেকে বর্তমানের ২ শতাংশে নেমে এসেছে।

- *শিশুমৃত্যু* – সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর মত বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য উদ্যোগের ফলে পূর্ণ টিকাদানকৃত শিশুদের হার ১৯৮৫ সালের মাত্র দুই শতাংশ থেকে বর্তমানের ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে শিশুমৃত্যু হার প্রায় ৪০ শতাংশ কমে গেছে।

- পানি সরবরাহ – গ্রামীণ পানি সরবরাহ কর্মসূচির মাধ্যমে ৮৬০,০০০টি টিউবওয়েল স্থাপন, এবং বেসরকারী খাতে আরো দশ লক্ষ টিউবওয়েল স্থাপনের ফলে পরিষ্কার পানি প্রাপ্তিতে নাটকীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে।

- *শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি* – গত পনেরো বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৩৪ শতাংশ থেকে ৮৬ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ক্রমান্বয়ে মেয়েদের ভর্তির হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১.৫ বাংলাদেশের গর্বিত এবং আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে গভীরে প্রোথিত প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যাগুলোর এখনও সমাধান হয়নি। এর ফলে মৌলিক সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যসম্পাদনা শুধু যে বর্তমান সরবরাহ মাত্রার বিচারে অসন্তোষজনক তাই নয়, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যও তা প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের বেশির ভাগই মনে করেন, বাংলাদেশে সরকারী জনসেবার মান খুবই নিচু। এতে অংশত দেশটির দারিদ্রের প্রতিফলন ঘটেছে এবং একই সাথে প্রধান সরকারী সেবাসমূহের ক্ষেত্রে অপ্রতুল মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য খাতে মোট রাষ্ট্রীয় ব্যয় বর্তমানে জিডিপির ১.৫ শতাংশ, কিন্তু অর্থের হিসাবে এটি মাথাপিছু মাত্র ২ মার্কিন ডলার। জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য এ সত্যটি যথেষ্ট নয় যে বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশ সরকারের হাতে সম্পদ খুবই সীমিত। নিচে আলোচিত তিনটি ক্লায়েন্ট জরিপ একটি বিষয় পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে যে, চূড়ান্ত অথবা আপেক্ষিক বিচারে, বেশিরভাগ সরকারী সংস্থা অর্থের বিনিময়ে নিম্নমানের সেবা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ও বেসরকারী খাত এবং বিদেশে নানা সরকারী সংস্থার সঙ্গে তুলনায় এসব ঘাটতি সহজেই ধরা পড়ে।

সরকারী খাত — নিচ থেকে দেখা

" রাষ্ট্র একই সঙ্গে সর্বত্র বিদ্যমান অথচ বলতে গেলে অনুপস্থিত। নাগরিক যা করতে চান, তা নিয়ন্ত্রণ করেন কর্তৃত্ব-প্রয়াসী এবং উদাসীন কর্মকর্তারা। কিন্তু যদি একটি রাস্তা ভেঙ্গে যায়, সংখ্যালঘুদের (যেমন - ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিক সংগঠন) অত্যাচার বন্ধের প্রয়োজন পড়ে, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে বা তাদের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্র তখন থাকে অনুপস্থিত।"

"সরকারের মালিক জনগণ, অথচ যে বেসরকারী খাতের মালিক তারা নন, তা-ই তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করে।"

১.৬ বাংলাদেশে যে হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ, মেধাবী ও দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারী আছেন, সে ব্যাপারে নাগরিক, সরকারী কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটি সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। তবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, স্বার্থান্বেষী মহল, আইন ও প্রবিধানসমূহ এবং সরকারী কর্মচারীদের সামষ্টিক আচরণ দ্বারা সরকারের যে কর্মফল এবং কার্যক্রম নির্ধারিত হয়, তা মোটেও সন্তোষজনক নয়। সরকার সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হল এই যে, সরকার:

- *পদ্ধতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত*। নিয়ম ও পদ্ধতি নিয়েই সরকার বেশি ব্যস্ত, কাজেই তার ফলাফলের দিকে নজর দেয়ার সময় নেই। এর ফলে উন্নত ও গুণগত সেবার জন্য নাগরিকদের যে চাহিদা রয়েছে, তা মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে।

- *অতিমাত্রায় পরিব্যাপ্ত*। এখনও সরকার এমন কাজ করছে যা অন্যরা আরো ভাল করতে পারত। সরকার যদিও এসব কর্মকাণ্ডের কিছু নিজের কর্তৃত্ব থেকে ছেড়ে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে, প্রক্রিয়াটি চলছে খুবই ঢিমে তালে।

- *অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত*। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী হচ্ছে জনসংখ্যার বেশির ভাগ অংশ, কিন্তু এখনও দেশে এমন কোনো কার্যকর স্থানীয় সরকার নেই, যা তাদের জনসেবা দিতে পারবে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে দেয়া অনেক সেবা নির্বাচিত পরিধিতেই সীমাবদ্ধ, এবং দরিদ্রের কাছে তা পৌঁছায় না।

- *অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক*। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং বেসামরিক প্রশাসনের স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা একত্রিত হয়ে এমন একটি প্রশাসনিক সংস্কৃতি তৈরি করেছে যা যে কোনো আধুনিক অর্থনীতির জন্যই বেমানান।

- *শাসনকাজে খুব বেশি বৈষম্যমূলক*। প্রবিধানগত নিয়ন্ত্রণের যে ব্যাপক কাঠামো রয়েছে, তা একদিকে যেমন অস্পষ্ট, অন্যদিকে তেমনি বৈষম্যমূলক, যার ফলে দুর্নীতি এবং উৎকোচ গ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া আইনগত কাঠামোটি সেকেলে, এবং প্রাচীন বিচার ব্যবস্থা ভারাক্রান্ত ও অপ্রতুল, যা ব্যবসায়িক লেনদেনের খরচ আরো বাড়িয়ে দেয়।

- *অ-জবাবদিহিমূলক এবং অমনোযোগী*। কার্যসম্পাদনা খারাপ হলে বা সিদ্ধান্ত দিতে দেরি হলে সরকারী কর্মচারীরা দায়ী থাকেন না। সরকারী কর্মসূচিগুলির সার্বিক দক্ষতা, যথার্থতা বা খরচ-সাশ্রয়ীতা ঠিকভাবে খুঁটিয়ে দেখা হয়না। মাত্র সামান্য কিছু সরকারী কর্মচারী নাগরিকদের প্রতি মনোযোগ দেয়াটাকে তাদের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে দেখে থাকেন। প্রশাসন অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত, হস্তক্ষেপ না হলে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না।

- *অপচয়কারী।* সরকারের ভিতরে চারদিকে অপচয়ের ছড়াছড়ি, যেন সরকারের কাজই হচ্ছে অপচয়। অপচয়ের মধ্যে ধরতে হবে কর্মচারীদের, যারা অলস বসে থাকেন, আধা-গতিতে কাজ করেন বা বলতে গেলে কোনো কাজই করেন না। এই অপচয়ের মধ্যে ধরতে হবে পরিশ্রমী সেসব মানুষকে যারা এমন কাজে শ্রম ব্যয় করেন, সেগুলি করাই উচিত নয়। এসব কাজ করতে গিয়ে তাদের এমন সব বিধিবিধান মেনে চলতে হয়, সেগুলি তৈরি হওয়াই উচিত ছিল না, এবং এমন সব ফর্ম পূরণ করতে হয় যেগুলো কখনো মুদ্রিত হওয়াই উচিত ছিল না।

- *এড়িয়ে চলতে হবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান*। বেশির ভাগ নাগরিক মনে করেন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিবর্তনমূলক, এবং সরকারী কর্তাব্যক্তি-কর্মচারীরা "উৎকোচ গ্রহণকারী," যাদের এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

১.৭ *নাগরিকের দৃষ্টিতে*: বিভিন্ন সমীক্ষায় যদিও বিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের চিন্তাভাবনা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তবুও পাবলিক সার্ভিস বা জনসেবা জনগণের চাহিদা কতটা মেটায় তা আরো বেশী পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এই প্রতিবেদনটি তৈরি করার সময় একটি ব্যাপক *গ্রাহক বা ব্যবহারকারীর জরিপ* নেয়া হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল পাবলিক সার্ভিসের অবস্থা সম্বন্ধে ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের দৃষ্টিভঙ্গি জানা বা 'নিচ থেকে দেখা'র একটি উদ্যোগের আয়োজন করা। বাংলাদেশে এ ধরনের উদ্যোগ হয়তো প্রথম বারের মতই হাতে নেয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টির মাত্রা নিরূপন, বিকল্প সেবা সরবরাহ কাঠামোর কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন এবং জনসেবা পেতে নাগরিকরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হন, তা নির্ধারণ করা। জরিপটি (যা ১৯৯৪ সালের শেষ তিন মাসে চালানো হয়) সারাদেশের মোট ২০টি থানার ১,৫৬০ টি বাড়িতে পরিচালিত হয়। নমুনা কাঠামোটি গ্রামীণ এবং শহুরে উত্তরদাতার মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, যা মোটামুটি জনসংখ্যার বিতরণের অনুপাতে করা এবং যাতে সমানসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা উত্তরদাতা অন্তর্ভুক্ত হন।[১] নমুনাটি এমন ভাবে নেয়া হয় যাতে প্রাক্কলনগুলি জাতীয় এবং গ্রামীণ-শহুরে, উভয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক হয়। প্রশ্নপত্রে ছিল উত্তরদাতাদের জনমিতিক পরিচিতি সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা থেকে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন পর্যন্ত নানা জনসেবা সম্পর্কিত ৫২টি প্রশ্ন।[২] এই জরিপে একটি তুলনামূলক মূল্যায়নের জন্য বিকল্প সেবা প্রদানকারীদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মূল জরিপটি শুরু করার আগে ৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে একটি অগ্রবর্তী জরিপ পরিচালনা করা হয়, এবং এ জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল মূল প্রশ্নমালাকে বিন্যস্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। মূল প্রশ্নমালা প্রধানত একাধিক পছন্দের প্রশ্নের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, তবে তাতেই তা পুরোপুরি সীমিত থাকেনি। উদাহরণস্বরূপ, এতে অসন্তুষ্টির "অন্যান্য" কারণ উল্লেখের সুযোগ ছিল, যেগুলো পরে কোডভুক্ত এবং বিশ্লেষণ করা হয়।

১.৮ জরিপের ফলাফল ঘর ১.১ তে দেখানো হয়েছে। তবে এসব ফলাফল বিশ্লেষণের আগে একটি সতর্কীকরণ প্রয়োজন। সরকার ও তার নাগরিকদের মধ্যে যে 'চুক্তি' থাকার কথা সে ধারণাটি সম্পর্কে বাংলাদেশী জনগণ, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায়, বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানেন না। এর অর্থ হল তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে কমই সচেতন; 'গ্রহীতা' বা 'সুফললাভকারী' জনসেবাসমূহকে সমালোচনার দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করতে তেমন ইচ্ছুক হন না। তারা অভিযোগ করতেও ভয় পান (অনুঃ ১.১৪), কাজেই তাদের সন্তুষ্টির চূড়ান্ত মাত্রা বেশি করে দেখানোরই সম্ভাবনা থেকে যায়।

---

[১] সারাদেশ থেকে কেন্দ্রগুলিকে এলোপাথারিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, এবং উত্তরদাতা নির্বাচনে বহু-পর্যায়ভিত্তিক স্তরবিশিষ্ট ও পদ্ধতিগত নমুনা নির্ধারণ কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

[২] অন্য যেসব সেবা এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হল: প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা/টিকাদান; মাধ্যমিক শিক্ষা; পানি সরবরাহ; পশুপালন/পশু পরিচর্চা; হাঁসমুরগী পালন; মৎস্য চাষ; ব্যাঙ্কিং; বিদ্যুৎ; সড়ক পরিবহন এবং টেলিফোন।

ঘর ১.১. সেবা প্রাপ্তি ও সেবার মান সম্পর্কে নাগরিকদের অভিমত

স্বাস্থ্য সেবা :

- সরকার প্রদত্ত সেবার ভূমিকা গৌণ। শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার যথাক্রমে ১৮% এবং ২৬% মাত্র এসব সেবা গ্রহণ করে। গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হাতুড়ে ডাক্তার বৈদ্যির কাছে যায়।

- বেসরকারী সেবার ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির মাত্রা ছিল সর্বাধিক; এর পরই আছে হাতুড়ে ডাক্তার বা গ্রাম্য ডাক্তার এবং সরকার পরিচালিত সুযোগ সুবিধাসমূহ। ১ থেকে ৫ মূল্যমাত্রার বিচারে এদের গড় হচ্ছে যথাক্রমে ৩.৮, ৩.৪ এবং ৩.১। সরকারী সেবাসমূহ সম্পর্কে অসন্তুষ্টির প্রধান কারণগুলি হচ্ছে রোগীর প্রতি মনোযোগের অভাব, সঠিক পরিচর্যার অভাব, এবং সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান।

শিক্ষা :

- সরকার হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ যোগানদার। শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্কুলে যায় এরকম শিশুর যথাক্রমে ৫০% এবং ৭২% সরকারী স্কুলে পড়ে। ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টিমাত্রা সবচেয়ে বেশি এনজিও পরিচালিত স্কুলগুলির ক্ষেত্রে। ১ থেকে ৫ মূল্যমাত্রার বিচারে গড় ছিল এনজিও স্কুলের জন্য ৪.১, প্রাইভেট স্কুলের জন্য ৩.৮ এবং সরকারী স্কুলের জন্য ৩.৫।

- মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোগানদার হচ্ছে প্রাইভেট স্কুলসমূহ। শহর ও গ্রামের শিশুদের যথাক্রমে ৭১% এবং ৮৯% এসব স্কুলে যাচ্ছে। ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি (১ থেকে ৫ মূল্যমাত্রায়) ছিল সরকারী স্কুলের জন্য ৩.৮ এবং প্রাইভেট স্কুলের জন্য ৩.৬।

- সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টির মূল কারণ ছিল ছাত্রদের প্রতি দায়িত্বের অভাব, শিক্ষার নিচু মান, এবং শিক্ষকদের অনুপস্থিতি। প্রাইভেট স্কুলগুলোর ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টির মূল কারণ ছিল শিক্ষকের নিচু মান এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়িত্বের অভাব।

খামার-বহির্ভূত সম্প্রসারণ সেবাসমূহ:

- পশুপালন সেবা দিয়ে থাকে বেসরকারী খাত ৫২% এবং সরকার ৪৩%। ৩৫% ব্যবহারকারী সরকারী সেবা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট; তুলনায় বেসরকারী খাতের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ১৩%।

- হাঁস-মুরগী পালন। শহরাঞ্চলে ৭০% মানুষ এক্ষেত্রে সরকার থেকে সেবা পেয়েছে এবং ৩৪% বেসরকারী খাত থেকে। গ্রামাঞ্চলে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩% এবং ৪৫%। সরকারী সেবা প্রাপ্তদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি ছিল অসন্তুষ্ট; তুলনায় বেসরকারী খাতে অসন্তুষ্ট ছিল ১২%।

- অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ ছিল সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান।

ব্যাঙ্কিং:

নাগরিকদের মাত্র ৪৩% কোনো না কোনোভাবে ব্যাংকের সংস্পর্শে এসেছেন। ব্যবহারকারীর সন্তুষ্টি সর্বনিম্ন (২.৯) ছিল কৃষি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে। গ্রাহকদের ৭০% কৃষি ব্যাংকের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন ঋণ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণে।

বিদ্যুৎ :

- ৯৭% শহুরে এবং ৯% গ্রামীণ উত্তরদাতা বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করেন। মধ্যক (mean) সন্তুষ্টি মাত্রা নিচু, যদিও গ্রামাঞ্চলে তা তুলনামূলক ভাবে কিছুটা বেশি। অসন্তুষ্টি ব্যাপক — শহরাঞ্চলে প্রায় ৬০% এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৪০%। এর কারণ হচ্ছে ঘনঘন বিদ্যুৎ বন্ধ, ভোল্টেজের ওঠানামা (শহরাঞ্চলে), এবং অতিমাত্রায় বিল আসা।

জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা:

- জরিপটি জনগণের চাহিদা ও প্রত্যাশা মূল্যায়নেরও প্রয়াস নিয়েছে। এটি অবশ্য আশ্চর্যজনক নয় যে, উত্তরগুলি ছিল সরাসরি। শহুরে মানুষজন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়: স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং প্রাথমিক স্কুলের ক্ষেত্রে। জরিপের ফলাফল থেকে এই বিষয়টি আবার নিশ্চিত করে যে সরকারের বাজেট বরাদ্দে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আরো বেশি সামাজিক খাত উন্নয়নের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে।

১.৯ **বাণিজ্যিক ফার্মের দৃষ্টিতে।** সাধারণ নাগরিকদের জরিপটি ছাড়াও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ওপর দুটি জরিপ চালানো হয়। প্রথমটি ছিল *ব্যবসার পরিবেশ মূল্যায়ন জরিপ*, যার ভিত্তি ছিল তৈরি পোশাক, বস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী, পাট, ইস্পাত ও প্রকৌশল, পণ্যদ্রব্য এবং তেজারতীসহ বিভিন্ন শিল্পের উদ্যোক্তাদের থেকে ২১৯টি উত্তর। এতে বেসরকারী খাতের প্রসার ঘটানোর জন্য গৃহীত সাম্প্রতিক পরিবর্তনসমূহের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। অন্য কথায়, এতে আপেক্ষিক একটি মূল্যায়ন উপহার দেয়া হয়েছে এবং এটিকে কোনো চূড়ান্ত বিষয় বলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। দ্বিতীয় জরিপটি ছিল *রপ্তানিকারকদের জরিপ*, যা বিভিন্ন আকারের ৭৫টি তৈরি পোশাক উৎপাদনকারীর সম্পূর্ণ করা প্রশ্নমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছিল। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে রপ্তানিকারকরা যে বিলম্বের সম্মুখীন হন, এই জরিপে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। গড় সময় থেকে সকল পর্যায়েরই ভিন্নতা ছিল, যার অর্থ হচ্ছে উচ্চ ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা। এসব জরিপের প্রধান ফলাফল ঘর ১.২ তে দেয়া হল :

ঘর ১.২ . বাংলাদেশে ব্যবসা করার পথে আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসমূহ

ব্যবসার পরিবেশ জরিপ নিচের বিষয়গুলি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে:

- *কর্মকর্তাদের মনোযোগ* — উত্তরদাতাদের ৭০ ভাগই মনে করেন না যে সরকারী কর্মকর্তারা পাঁচ বছর আগেও যতটা ছিলেন সে তুলনায় এখন বেসরকারী খাতের সমস্যা ও চাহিদাসমূহের প্রতি বেশি মনোযোগী। বস্তুত বেশির ভাগ উত্তরদাতাই মনে করেন যে, গত পাঁচ বছরে কর কর্তৃপক্ষ (কাষ্টমস্, আয়কর, বিক্রয়, শুল্ক, ভ্যাট), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ডেসা, গ্যাস কোম্পানী, এবং ওয়াসার সেবা মোটেও উন্নত হয়নি।

- *ব্যবসার পরিবেশ* — উত্তরদাতাদের সংখ্যাগুরু অংশ (৫৭%), বিশেষ করে যারা রপ্তানি ব্যবসায় জড়িত, মনে করেন যে পাঁচ বছর আগের তুলনায় এখন ব্যবসায়ের পরিবেশ বেসরকারী খাতের প্রতি অনেক বেশি অনুকূল। তবে উত্তরদাতাদের মাত্র অর্ধেক এই ধারনা পোষন করেন যে, ব্যবসা বাণিজ্য কার্যক্রম প্রতিদিন যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তা কমেছে।

- *শিল্প বিনিয়োগ* — সংস্কার কর্মসূচির মধ্যে শিল্প বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ একমত নন যে আগের চাইতে এখন নতুন ব্যবসা শুরু করা অথবা চালু একটি ব্যবসা সম্প্রসারণ করা সহজতর।

- *অনায়াস আমদানী রপ্তানি* --- ৭০ শতাংশের বেশি উত্তরদাতা এ ব্যাপারে একমত হন যে কাচামাল আমদানী এখন সহজতর, এবং রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মনে করে যে এখন রপ্তানি করা সহজতর।

রপ্তানিকারকদের জরিপ নিচের বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছে:

- *কাষ্টমস এর বিলম্ব* --- নিচের কাজগুলিতে গড়ে সময় লেগেছে
  - রপ্তানিকারকদের আমদানীকৃত প্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্দর বা বিমান বন্দর থেকে কাষ্টমস এর মাধ্যমে ছাড়িয়ে নিতে – ১২ দিন (সর্বোচ্চ ৩০ দিন);
  - একটি চালান রপ্তানির জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে – ৯ দিন (সর্বোচ্চ ৭৫ দিন);
  - রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র তৈরী করতে –৭ দিন (সর্বোচ্চ ৩০ দিন);

- *মিথঃক্রিয়ার মূল্য* – সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন কাস্টমস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, কর বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংগে লেনদেনে প্রচুর সময় লেগে যায় যা ব্যক্তি-বছর হিসেবে প্রায় অর্ধেক বছর পর্যন্ত গড়ায়। সরকারী সংস্থাগুলির আমদানী রপ্তানি বিলম্ব মোকাবেলাঁর জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তাদের বিক্রয় আয়ের ৭ শতাংশ খরচ করতে হয়েছে। অধিকাংশ রপ্তানিকারক (৮২ শতাংশ) সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে লেনদেনের জন্য একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়।

- *ডিউটি ড্রব্যাক* – শুল্ক রেহাই এবং শুল্ক ফেরত অফিস থেকে একটি রিফান্ড চেক পেতে গড়ে ৫৮ দিন (সর্বোচ্চ ১২০ দিন) এবং অতিরিক্ত ৬ শতাংশ খরচ লেগে যায়।

- *হারানো রপ্তানি ফরমাশ* – কোনো না কোনো সময় রপ্তানিকারকদের ৭৩ শতাংশ তাদের রপ্তানি ফরমাশ হারিয়েছেন।

- *বিলম্বের কারণসমূহ* – জাহাজীকরণের জন্য সময়সীমা পূরণ করতে বিলম্বের জন্য যে সব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল হরতাল বা শ্রমিক ধর্মঘট, কাস্টমস থেকে মাল ছাড়ানো, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, কাপড় সরবরাহকারীদের তরফ থেকে বিলম্ব, এবং বন্দরসমূহে বিলম্ব।

- *মুচলেকাবদ্ধ পণ্যাগার (বন্ডেড ওয়্যারহাউজ)* – বিশেষ মুচলেকাবদ্ধ পণ্যাগার ব্যবহারকারীদের প্রায় অর্ধেকের মতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সংগে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক নয়।

- *রপ্তানি প্রতিষ্ঠানসমূহ* --- গত ১২ মাসে ৫২ শতাংশ রপ্তানিকারক রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে সরাসরি সহায়তা পেলেও তাদের মধ্যে ৭৬ শতাংশ মনে করেন, যদি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া হত, তাহলে এর কাজকর্ম অনেক উন্নত হত।

১.১০ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেবাসমূহের বেশ কয়েকটির ক্ষেত্রে কর্ম তৎপরতা খুবই কম এবং গ্রাহক সন্তুষ্টিও স্বল্প মাত্রার। গ্রাহকদের স্কোর কার্ডে এ চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। সেবা সুবিধাপ্রাপ্তরা যখন এসব কর্মসূচির খরচের সঙ্গে প্রাপ্ত সুবিধার তুলনা করবেন, তখন তারা নিশ্চয় আশ্চর্য হবেন। তাছাড়া, প্রচলিত বিশ্বাসের বিপরীতে দেখা যায়, বেশ কিছু 'মূল' সেবা এলাকায় বেসরকারী খাত এবং এনজিওরাই হচ্ছে প্রধান সেবা প্রদানকারী। প্রত্যাশা মত, গ্রাহক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে তাদের স্কোরও অনেক উঁচু। তুলনায়, সরকারী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিপুল ক্ষতি হচ্ছে, আপাতঃদৃষ্টে 'জনগণের স্বার্থে'। এসব প্রতিষ্ঠান অপর্যাপ্ত, অনির্ভরযোগ্য এবং ত্রুটিপূর্ণ সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারী খাতে রপ্তানি-মূখ্য প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও সরকারী

প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে লেনদেনের যে মূল্য, তা এখনও বিশাল এক প্রতিবন্ধ হিসেবে রয়ে গেছে। এমনকি প্রসার/উন্নয়নধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলিও আমলাতান্ত্রিক রীতিনীতিতে আবদ্ধ হয়ে আছে।

১.১১ বাংলাদেশ সরকারের সেবাসমূহের অপর্যাপ্ততা শুধু যে সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি তুলে ধরে, তা নয়, বরং গূঢ় প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা এবং পদ্ধতিগত ত্রুটিকেও প্রমাণ করে। এসব সেবা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা নিচুমানের, এদের ভিতর স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে; প্রত্যবেক্ষণ এবং জবাবদিহিতার বিষয়গুলিও অনুপস্থিত, এবং সাধারণভাবে, বাজারের প্রতিযোগিতামূলক কোনো চাপ থেকে মুক্ত থেকেই এসব কার্যক্রম চলে। জনসেবার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গ্রাহক কি চায়, তা নিয়ে চিন্তা করা; সেবাদানকারী কতটা দিতে পারেন, সে নিয়ে নয়। দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাগুলি তাদের কার্যক্রম এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। বেশির ভাগ সরকারী সংস্থা করদাতা ও ব্যবহারকারীদের কাছে চূড়ান্ত বিচারে দায়বদ্ধ থাকার নীতিতে বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না, এমনকি এ ব্যাপারে তাদের কোনো সচেতনতা আছে বলেও প্রতীয়মান হয় না।

১.১২ সাধারণ নাগরিকেরা সরকারী কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা, এমনকি সৌজন্যমূলক ব্যবহারও প্রত্যাশা করেন না। বাংলাদেশের মানুষের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের শিক্ষার অভাব, এবং নাগরিক হিসাবে তাদের অধিকারসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের জন্য আমলাতন্ত্রের সংগে লেনদেনে প্রচন্ডভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। পুরুষ- নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র যেসব সেবা নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো পেতে মহিলাদের, বিশেষ করে যারা দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, আরো বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশের মানুষ বেসামরিক কর্মকর্তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কাছে তাদের অসহায়ত্বের বিষয়টি হাড়ে হাড়েই টের পান। অভিযোগ করলেও তাদের শাস্তি হিসেবে ফোনের লাইন বিচ্ছিন্ন করা হয়, অস্বাভাবিক রকম বেশি বিল আসে, বা স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের হাতে তাদের নাজেহাল হতে হয়। বস্তুত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তারা যখন ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব না ঘটান অথবা বাধা প্রদান না করেন, তখন বেশির ভাগ মানুষই বিনীত ধন্যবাদ জানান, অথবা কিছুটা অবাকই হয়ে যান। যখন বিশেষ কোনো সামর্থ্য বা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও করদাতারা কোনো রাষ্ট্রীয় সেবা পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন – যে সেবা পাওয়াটা তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে – তখন তাদেরকে এমন একটি ধারণা দেয়া হয় যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদেরকে দয়া দেখাচ্ছেন। তারা জানেন, আইনগত বা প্রশাসনিক পদ্ধতিতে আমলাতান্ত্রিক অবিচারের প্রতিবিধান পাওয়ার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই।[৩] সংক্ষেপে, বাংলাদেশের সাধারণ করদাতাদের সেবা প্রাপ্তির অধিকার এমনকি – যে সরকারের খরচ তারাই মেটান, তার মালিকানা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

১.১৪ এর বেশ কটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রয়েছে। সর্বপ্রথম হচ্ছে, রাষ্ট্রের "অনিয়ন্ত্রিত" ক্ষমতা। ভোক্তা এবং সাধারণ নাগরিকরা অভিযোগ করতে ভয় পান কারণ একচেটিয়া সেবা প্রদানকারী যদি নাজেহাল করে, তাহলে তার প্রতিবিধানের সম্ভাবনা প্রায় অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, অনেক মানুষ বিকল্প সেবা কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন – বিশেষ করে বেসরকারী খাত ও এনজিও সমূহের দিকে — যার ফলে সরকারী খাত সংস্কার করার যে চাপ ছিল তা কমে গেছে। সবচেয়ে বিত্তশালী এবং সমর্থ্য ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মত ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতাকে অনেকটাই পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন। কাজেই যারা তাদের ছেলেমেয়েদের বিদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠাতে পারেন, তাদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবনতি সামান্যই ব্যক্তিগত উদ্বেগের বিষয়ই হতে পারে। এজন্য, যারা সরকারী সেবার ওপর নির্ভরশীল রয়ে যান, তারা দক্ষ সেবা সরবরাহ দাবী করতে সক্ষম হননা। তৃতীয়ত, অনেক মানুষ এরকম ভেবে থাকেন যে, যদি অপচয় হয়েও থাকে, তাহলে অপচয় হচ্ছে বিদেশী সাহায্য – যা আসে বিনামূল্যে। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের এক ক্রমবর্ধমান অংশ এখন

---

[৩] এমনকি নিয়মমাফিক প্রশাসনিক বিষয়গুলিও বিশেষ টাকা দিয়ে ("তাড়াতাড়ি করার টাকা") সহজতর করতে হয় ; মাঝে মাঝে এই টাকা দিতে হয় 'দালাল'কে, (পরিচ্ছেদ ৫ দেখুন), অথবা 'তদবির' (প্রভাবশালী মানুষের মাধ্যমে করা সুনির্দিষ্ট অনুরোধ) - এর মাধ্যমে কাজটি করতে হয়।

আসছে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে, কাজেই সরকারের ভিতর অপচয় ও অব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনগণের অসন্তোষ সম্ভবতঃ বাড়বে। চতুর্থত, বাংলাদেশ সরকারের কার্যসম্পাদন উন্নত করার সম্ভাবনা নিয়ে এক ধরনের অদৃষ্টবাদ এবং নৈরাজ্যের বোধ বর্তমান। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই অনুভূতিকে প্রফলিত করে যে, কোনো অর্থবহ পরিবর্তন আনা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিরামহীন অদক্ষতা — উপর থেকে দেখা

১.১৫ সরকার সম্পর্কে নাগরিকদের হতাশাব্যঞ্জক ধারণা সামূহিক চিত্রটিতেও প্রতিফলিত হয়। এর কটি উদাহরণ নিচে আলোচনা করা হল।

১.১৬ **সরকারী বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাত্রা, মান এবং সময়োপযোগিতার মাপকাঠিতে সরকারের কার্যসম্পাদনা দুঃখজনকভাবে অপর্যাপ্ত থেকেই যাচ্ছে**। বিশেষ তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ সত্ত্বেও সরকারী বিনিয়োগ এখনও খুব নিচু স্তরে রয়ে গেছে, যা জিডিপির মাত্র ৮-৯%। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নে কয়েক বছরের বিলম্ব একটি সাধারণ ব্যাপার। এর কারণ হচ্ছে এই যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বাস্তবায়ন সামর্থ্যের একটি কার্যকর এবং সক্রিয় কাঠামো গড়ে তুলতে সরকারের সামর্থ্য এবং ক্ষমতাও খুব দুর্বল। এর ফলে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ – যা এখনও জিডিপির ৬-৭% এর নিচু স্তরে সীমাবদ্ধ – এবং প্রবৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সার্বিকভাবে, প্রয়োজনীয় সরকারী বিনিয়োগ এবং অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দুর্বল কার্যসম্পাদনা প্রবৃদ্ধির পথে এক বড় অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে।

১.১৭ এ ছাড়া, অনেক খাতেই সরকারী বিনিয়োগের অভিঘাত এবং কার্যকারিতা ততটা সন্তোষজনক হয়নি। **সামাজিক খাতসমূহে** ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দ এবং উচ্চমান-সম্পন্ন মৌলিক সেবা সম্পর্কে প্রকাশ্য অঙ্গীকার সত্ত্বেও, খরচ সাশ্রয়তা এবং সরকার প্রদত্ত সেবার মান অত্যন্ত নিচু। **শিক্ষা খাতে**, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের মাত্র ৪% বারো বছরের সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত করে। বয়স্ক শিক্ষার হার এখনও পুরুষদের জন্য মাত্র ৪৪ শতাংশ এবং মহিলাদের জন্য হতাশাব্যঞ্জক ২৬ শতাংশ। শিক্ষার মানও সন্দেহজনক, সুযোগ সুবিধা দুঃখজনকভাবে অপর্যাপ্ত, এবং শ্রেণীকক্ষগুলি ভীড়াক্রান্ত; শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ঃ৭০। ছাত্র-শিক্ষক যোগাযোগের গড় সময় দিনে মাত্র দুই ঘন্টা, এবং গড়পড়তা মানের বাংলাদেশী কোনো শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রক্রিয়া শেষ করতে সাত বছর লেগে যায়, যেখানে লাগার কথা পাঁচ বছর। মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ছেড়ে যাওয়া এবং অকৃতকার্যতার জন্য ভর্তুকি ব্যবস্থা অপচয়-সর্বস্ব, শিক্ষার মান নিচু, এবং বর্তমান পদ্ধতিটি প্রধানতঃ ইউনিয়নভুক্ত ৩০০,০০০ শিক্ষকেরই উপকারে আসছে। যেসব শিক্ষার্থী ১৯৮৫ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ঢুকেছিল, তাদের ৪৫% ১৯৯০ সালে দশম শ্রেণী সমাপ্ত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা চলে বিশাল ভর্তুকির ওপর, এবং এর যোগান দেয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকার; অথচ এর খরচ নিম্ন পর্যায়ের খরচের চাইতে ২০ গুণ বেশি। এর প্রভাব ব্যাপক নয়, এবং এতে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণও অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ এখনও তার খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম, সৃজনশীল কর্মী বাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি, অথবা আধুনিক কর্মস্থলে চাহিদা আছে এমন দক্ষতা তাদের দিতে সক্ষম হয়নি। **স্বাস্থ্য খাতে**, স্বাস্থ্য সেবার মান আরো উন্নত হওয়ার দাবী রাখে । এ ছাড়া এর প্রাপ্যতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ৩৬৫টি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবার মান নিচু, ঔষধপত্রেরও অভাব রয়েছে এবং ডাক্তাররাও প্রায়শঃ অনুপস্থিত থাকেন। এসব কারণে এসব কেন্দ্র প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে রোগী ভর্তির হার মাত্র শতকরা ৫৫ ভাগ। একটি সাম্প্রতিক জরিপে[৪] দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে অসুস্থ জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশ সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে, ১৯ শতাংশ আয়ুর্বেদিক অথবা ইউনানি সেবা গ্রহণ করে, এবং অন্য ৪১ শতাংশ বেসরকারী খাতের এলোপ্যাথ চিকিৎসা গ্রহণ করে।

১.১৮ **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (এসওই) সমূহ,** যেগুলো *আবশ্যকীয় সার্ভিস সরবরাহ এবং অনেক উৎপাদিত পণ্য যোগান দেয়ার ক্ষেত্রে মূখ্য – অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া– অবস্থানে রয়েছে, সেগুলো অদক্ষতা এবং বড় আকারের চুরির আবর্তে তলিয়ে আছে।* বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এধরনের এসওই-র কার্যসম্পাদন আশাব্যঞ্জক নয়। কিন্তু বাংলাদেশের এসওইগুলির কার্যসম্পাদনা সবচেয়ে খারাপ (ঘর ১.৩)।

ঘর ১.৩ সরকারী খাতের ক্ষতির সুযোগ ব্যয়

প্রতিবছর সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাট লোকসান দেখিয়ে যাচ্ছে, যা দেশের অপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাহিদাগুলি থেকে সম্পদ ভিন্ন খাতে সরিয়ে নিচ্ছে। শুধুমাত্র ৯২/৯৩ অর্থ বছরে ৩৩টি এসওই-র (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড, বাংলাদেশ রেলওয়ে, এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া) মিলিত ক্ষতির পরিমান ছিল ৪১ কোটি ৮০ লক্ষ মার্কিন ডলার। সবচেয়ে বেশি অর্থ গচ্চা দিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা। ৯২/৯৩ অর্থ বছরে সকল এসওই-র ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ডলার। এসব ক্ষতির কারণ হচ্ছে আবশ্যকীয় সার্ভিসসমূহের ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রার সিস্টেম লস, অতিরিক্ত জনবল ও অপচয় এবং নন-পারফর্মিং ঋণের বিশাল বোঝা। *৯৩ অর্থ বছরে সকল এসওই-র মিলিত লোকসান ছিল বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ২৬ শতাংশ, বিদেশী সাহায্য বিতরণের ৪৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২ শতাংশ।*

স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মত সরকার প্রদত্ত জনসেবা প্রদানেও প্রচুর অপচয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলিতে স্কুল ছেড়ে যাওয়ার এবং একই শ্রেণীতে পুনঃঅধ্যয়নের উচ্চ হারের জন্য পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতপক্ষে সময় লাগে সাত বছর। এর ফলে প্রতি বছর ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলারের ক্ষতি হয়। এ ছাড়া, প্রতি বছর প্রয়োজন থেকে বেশি ১৫ শতাংশ পাঠ্যবইয়ের ফরমায়েশের জন্য খরচ হচ্ছে বিশ লক্ষ ডলার (যাতে সাহায্য হিসেবে দেয়া কাগজের দাম অন্তর্ভুক্ত নয়)।

এ কয়টি জিনিস প্রতি বছর প্রায় ৫৪ কোটি ডলারের লোকসান ঘটায়।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, এই অংককে মোট ক্ষতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না যেহেতু এসওই -সমূহ মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারটি ব্যয়বহুল এবং বৈষম্যমূলক। এসওই-গুলিতে প্রতিটি চাকুরি বজায় রাখতে প্রতিবছর ৪,০০০ ডলারের প্রয়োজন পড়ে। এ সংখ্যাটি দেশের গড় মাথাপিছু আয়ের ২০ গুণ বেশি, এবং গ্রামের খামার-বহির্ভূত শ্রমিকের বার্ষিক আয়ের ১২ গুণ বেশি।

এসব লোকসানের ফলে বাজেটের জন্য গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। ৯৩/৯৪ অর্থ বছরের ১,০৭০ কোটি টাকার ক্ষতি বিদ্যমান বিশাল আধা-রাজস্ব ঘাটতি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। এসওইগুলির দায়দেনা জিডিপির ৯০ শতাংশের সমতুল্য, এবং বার্ষিক কর রাজস্বের ১০ গুণ বেশি। এসব ঋণের বেশির ভাগ শেষ পর্যন্ত বাজেটকে, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেই বহন করতে হবে।

যেহেতু এসওই-সমূহ প্রধান খাতগুলিতে একচেটিয়া অধিকার বজায় রেখেছে, তাদের অদক্ষতা পুরো অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, অপচয় করা সম্পদের খুব উঁচুমাত্রার সুযোগ-ব্যয় (opportunity cost) রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

---

[৪] বেসলাইন রোগ জরিপ ১৯৯৩ : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা মহাপরিচালকের অধিদপ্তর (আইইডিসিআর)।

- এসওই-গুলির মোট ৫০ কোটি ডলারের লোকসান গ্রামীণ ব্যাংককে অতিরিক্ত সত্তর লক্ষ দরিদ্র মানুষকে ঋণ দিতে সাহায্য করত (যাদের ঋণ পরিশোধ হার প্রায় ১০০ শতাংশ)।

- অতিরিক্ত পাঠ্যবই উৎপাদনে অপচয় করা বিশ লক্ষ ডলার দিয়ে প্রতিবছর অতিরিক্ত ৩৫০,০০০ শিশুকে টিকা দেয়া যেত।

- ৫০ কোটি ডলারের এসওই লোকসান ৯৩ অর্থ বছরের শিক্ষা খাতে বাস্তবায়িত উন্নয়ন ব্যয়ের দ্বিগুণেরও বেশি, এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলিতে ব্যয়িত অর্থের শতগুণ বেশি। এই অংকটি শিক্ষাখাতে উন্নয়ন ব্যয়ের অনুপাত জিডিপির ০.১ থেকে ৩ শতাংশে বৃদ্ধি করতে পারত, অথবা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়ের অনুপাত জিডিপির ০.২ থেকে ২.৩ শতাংশে উন্নত করতে পারত।

- বস্তুতঃ, এসওই খাতে লোকসান যদি বন্ধ করা যেত, তাহলে প্রতি আঠারো মাসে একটি করে যমুনা বহুমুখী সেতু সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকেই নির্মাণ করা যেত।

অদক্ষ এসওই গুলির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড – যার ক্ষতির পরিমাণ ৪০-৪৫%; চট্টগ্রাম বন্দর – অদক্ষতার কারণে যেখানে কনটেইনার পরিচালনা খরচ ৬০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে। তুলনায় সিঙ্গাপুরে এ খরচ ১৫০ ডলার এবং কলম্বোতে ২৫০ ডলার। তাছাড়া একটি কনটেইনারের মাল খালাস হয়ে ফেরত আসতে সময় লাগে সাত দিন, যেখানে সমমান ও আকৃতির একটি বন্দরে ওই সময় মাত্র দুই দিন; এবং পানি কর্তৃপক্ষ যেখানে সিস্টেম লসের পরিমাণ ৫০-৬০%। বেশির ভাগ এসওইতে জনবল প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি– ২০-৫০%। একটি চাকরী বজায় রাখার গড় খরচ হচ্ছে ৫৪,০০০ - ১৬৭,০০০ টাকা, যা দেশের মাথাপিছু আয়ের ৬ থেকে ২০ গুণ বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজকর্ম বন্ধ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘরে বসিয়ে বেতন দিলেও খরচ অনেক কম পড়বে। বেশির ভাগ এসওই লাভের মুখ দেখতে পায়না, বরং এগুলো সরকারের বাজেট এবং/অথবা ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিকে নিংড়ে নিচ্ছে, যার ফলে এক বিশাল সাপেক্ষ-দায় দেনা এবং আধা-রাজস্ব ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪তে ১৫৫টি এসওই মোট ১,০৭৩ কোটি টাকা লোকসান করে (বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ১২ শতাংশ এবং জিডিপির ১.২ শতাংশ)। এই অবিরাম লোকসান এসওইগুলির ইকুইটি এমনভাবে ক্ষয় করেছে যে এখন এদের বেশির ভাগেরই নিট মূল্য হচ্ছে ঋণাত্মক। তারা তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সরাসরি বাজেট হস্তান্তরের মাধ্যমে, অথবা রাষ্ট্রীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (এনসিবি) থেকে ঋণ নিয়ে। এর ফলে আবার এসব ব্যাংকের কার্যসম্পাদনায় গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৩ এর শেষে, এনসিবিগুলোর দেয়া ঋণের শতকরা ৫০ ভাগ ছিল এসওইদেরকে দেয়া ঋণ। যেহেতু এসব ঋণের এক বড় অংশ নন-পারফর্মিং, খোদ এনসিবিগুলিকে পুনঃপুঁজি সংযোজন করতে হয়েছে। ১৯৯০-৯৩ সময়কালে তাদের প্রায় ৫১৫ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। সরকারী খাতের এই লোকসানের সংগে উল্লেখযোগ্য সুযোগ ব্যয় জড়িত আছে, যেহেতু এসব তহবিল থেকে রাস্তা ও পুল নির্মাণ অথবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিনিয়োগ করা যেত। তাছাড়া, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতেও এই তহবিল ব্যবহার করা যেত। একই রকম দুশ্চিন্তার বিষয় হল, এসওইদের অদক্ষতা বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা বিনষ্ট করছে। সর্বোপরি, তাদের ওপর কার্যসম্পাদনা উন্নীত করার কোনো চাপ নেই, যেহেতু গ্রাহকরা বলতে গেলে, এসওইদের হাতে 'বন্দী'। গ্রাহকরা ইচ্ছা করলেও এদের কাছ থেকে সরে আসতে পারেন না।

সংস্কারের অপরিহার্যতা

১.১৯ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমানো, চাল উৎপাদন বাড়ানো এবং তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চমৎকার সাফল্য, এবং রাজস্ব এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অর্জন বাংলাদেশকে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের বেশির ভাগ

দেশের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত করতে পারে। কিন্তু এ হচ্ছে বাংলাদেশকে দূরবীণের ভুল প্রান্ত থেকে দেখা। বাংলাদেশে আয় বাড়ছে ধীর গতিতে এবং বেশির ভাগ মানুষ দারিদ্রে নিমজ্জিত – বার্ষিক মাথাপিছু আয় মাত্র ২২০ ডলার (১৯৯৪)। জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক: ৮০০ জন মানুষ এক বর্গ কিলোমিটারে বসবাস করে; বয়স্ক শিক্ষার হার মাত্র ৩৫ শতাংশ (১৯৯৩), এবং রুগ্নতার হার অত্যন্ত উঁচু – প্রতি হাজারে ১১। অপুষ্টি ব্যাপক, এবং 'অতি দরিদ্র'রা – অর্থাৎ যারা সুপারিশকৃত দৈনিক সর্বনিম্ন ২,১২২ ক্যালোরির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের তিন চতুর্থাংশের কম খাদ্য গ্রহণ করে থাকে – প্রতি পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন। এর থেকে বেশি সংখ্যক মানুষ নিঃস্বতার প্রান্তে অবস্থান করে, এবং ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নিয়মিত নিঃস্ব অবস্থায় পতিত হয়। অর্থনৈতিক সাফল্য এদেরকে পাশ কাটিয়ে গেছে, এবং রাষ্ট্র যে সীমিত সেবা দিয়ে যাচ্ছে, তা গ্রহণ করতেও তারা অক্ষম। এদের জন্য বর্তমান প্রবণতাগুলি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সামান্য আশাই সঞ্চার করতে পারছে।

১.২০ বেশির ভাগ মানুষের জন্যই মৌলিক জনসেবাগুলির প্রাপ্তির সুযোগ নেই। সেবা দেয়া হয় দুঃখজনকভাবে সামান্যই এবং এর মানও নিকৃষ্ট। জনসংখ্যার মাত্র ১৫ ভাগ *বিদ্যুৎ* পেয়ে থাকে; *টেলিফোন* ব্যবহার করতে পারে হাজারে দুইজন (এই হার পৃথিবীতে সর্বনিম্ন পর্যায়ের একটি); *প্রাথমিক শিক্ষা* সমাপ্ত করার হার মাত্র ৪০ শতাংশ; গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে পারে মাত্র ২৬ শতাংশ মানুষ; স্বাস্থ্য সেবা নিম্ন মানের এবং সীমিত। এসবের প্রতিফলনও ঘটেছে নানা ভাবে : মানুষের সম্ভাব্য আয়ু মাত্র ৫৭ বছর, এবং প্রতি হাজার জীবিত জন্মে শিশু মৃত্যুহার ৯১। বর্তমানে, ছয় থেকে দশ বছরের ১ কোটি ৫০ লক্ষ শিশু প্রাথমিক স্কুলে পড়ছে। ভবিষ্যতের জন্য চ্যালেঞ্জ আরো বেশি গুরুভার, যেহেতু আগামী দশকের মধ্যে স্কুলে যাওয়া শিশুর সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ৭০ লক্ষে, এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ। টিকাদান ও সন্তান ধারণ হারে অর্জিত সাফল্য সত্ত্বেও শিশু মৃত্যু এবং রুগ্নতার হার এখনও অগ্রহণযোগ্যভাবে উঁচু, এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচির অসমাপ্ত দিকটি প্রকান্ড।

১.২১ জনসেবার হতদরিদ্র অবস্থা থেকে সৃষ্ট সমস্যাবলী আরো সংকুল হয়ে পড়েছে চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধির জন্য। বাংলাদেশের নগরায়ন হার পৃথিবীর অন্যতম দ্রুততম – শহরের জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালের ষাট লক্ষ থেকে ১৯৯১ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা আক্রান্ত নগর পদ্ধতিগুলিতে এর ফলে প্রচন্ড চাপ পড়েছে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিস্কাশন, টেলিফোন এবং শিক্ষা খাতগুলিতে। স্বল্প-মেয়াদী পর্যায়ে এসব ক্ষেত্রে উন্নতি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে – এ জন্য নয় যে বিনিয়োগ উৎসের আপেক্ষিক অভাব রয়েছে, বরং এসব বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনায় সরকারী খাতের সামর্থ্যে সুস্পষ্ট অবনতি ঘটেছে।

১.২২ ***বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, অথচ তা নিম্ন বিনিয়োগ এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধির আবর্তে আটকা পড়ে গেছে।*** প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে কম, এবং দক্ষতা থেকে লাভ সামান্যই। যদি কার্যসম্পাদনা একই পর্যায়ে থাকে, তবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি এড়ানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যদি সরকার তার দৃষ্টি উর্ধে তুলে ধরে, এবং উল্লেখযোগ্য ভাবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্য গ্রহণ করে, তাহলে সামাজিক, অবকাঠামোগত এবং উৎপাদনশীল খাতসমূহে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ অনেক বেশি বাড়াতে হবে। অধিক মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিরও প্রয়োজন রয়েছে; আগামী ১৫ থেকে ২০ বছর দেশটিকে ৭-৮ শতাংশ টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে।

১.২৩ বিশ্বব্যাপী আজ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিতর আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি সুস্পষ্ট। *সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থনীতিকে যেমন গড়ে তোলে, তেমন পেছনেও নিয়ে যায়, এবং টেকসই ও সুষম প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে দক্ষ এবং কার্যকর সরকার এবং শাসন।* বাংলাদেশেও এটি ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে যে, নিচু প্রবৃদ্ধির ফাঁদ থেকে বেরুতে না পারার কারণ হচ্ছে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বল

বাস্তবায়ন সামর্থ্য এবং নিচু মান। এ বিষয়টিতে আরো জটিল করে তুলেছে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনায় সরকারের অসামর্থ্য, এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনায় সরকারের ব্যাপক উপস্থিতি। বাংলাদেশে এমন একটি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বর্তমান সরকারী খাত কাঠামো ও উদ্দীপনার দিক থেকে, এবং মানসিকাতর বিচারে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে ক্রমশঃ অসমর্থ্য হয়ে পড়ছে। তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলি মোকাবেলাতেই এটি ব্যস্ত – ভবিষ্যতের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জসমূহকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে এর আর সময় থাকে না। বস্তুত, দক্ষতা ও কার্যকারিতার দিক থেকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটির অবনতি ঘটেছে বলেই প্রতীয়মান হয়।

১.২৪ বাংলাদেশের সরকারী খাতের নেতিবাচক দিকগুলি হল: (১) রাষ্ট্রের মূল দায়িত্বগুলির বাইরেও রাষ্ট্রযন্ত্রের সম্প্রসারণ। বাংলাদেশ সরকারের একটি বড় অংশ এমন সব কাজে নিযুক্ত যা তার করার কথা নয়। সরকারী খাতের সরাসরি হস্তক্ষেপ বাজার-বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং বেসরকারী খাতের উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডকে ঠেলে বের করে দিয়েছে; (২) একটি অক্ষম অর্থনৈতিক পরিবেশ যেখানে বৈষম্যমূলক এবং বাধাসৃষ্টিকারী বিধিবিধানের সূক্ষ্ম জাল বিস্তৃত হয়েছে; (৩) একটি অস্বচ্ছ পদ্ধতি যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নীতি ও ক্রিয়াপদ্ধতিগত বিষয়ে খামখেয়ালীপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জবাবদিহিতার শৈথিল্য; (৪) এক অতিকায় জটিল এবং প্রায় নিয়ন্ত্রণ-দু:সাধ্য আমলাতন্ত্র এবং প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র; (৫) উচ্চ ও মধ্যম ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে উদ্যমহীন এবং কম বেতনভুক সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ; (৬) সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে বৈরি সম্পর্ক, যার জন্য একদিকে যেমন সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, অন্যদিকে বেসরকারী খাতের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়েছে; এবং (৭) অতিরিক্ত জনবল সম্বলিত এসওইসমূহ, যেখানে শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশাল লোকসান কমাতে, কাজের দক্ষতা বাড়াতে বা সেগুলিকে বেসরকারীকরণের প্রচেষ্টা ভন্ডুল করে দিয়েছে।

সরকারকে কর্মক্ষম করতে

১.২৫ বিশ্বের সর্বত্র দেশগুলিতে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসছে – এখন অগ্রাধিকারের পাল্লা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বরং সরাসরি বেসরকারী খাতের সমর্থন দেয়, তেমন উদ্যোগের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ভোটাররাও জনসেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে আরো বেশি দক্ষতা দাবী করছে। এর ফলে, বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত ও সংস্কারাধীন দেশ 'সরকারকে পুনঃআবিষ্কার' করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে এরকম একটি সমন্বিত উদ্যোগ সম্প্রতি গ্রহণ করা হচ্ছে (ঘর ১.৪)। মালয়েশিয়া গত এক দশকে একটি সমন্বিত সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিয়েছে (ঘর ১.৫)। নিউজিল্যান্ড এক গুচ্ছ বৈপ্লবিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন করেছে যার লক্ষ্য ছিল সরকারের ভূমিকা পুনঃনির্ধারণ করা এবং সরকারের কর্মকাণ্ড ঢেলে সাজানো (ঘর ১.৬)। এসব সংস্কারের উদ্দেশ্য হল সেবা সরবরাহ বৃদ্ধি, করদাতাদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি এবং জনসেবা প্রদানে বেসরকারী প্রতিনিধিদের ওপর নির্ভরতা আরো বেশি বাড়ানো।

ঘর ১.৪. যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার: আরো দক্ষ করে তোলা

"....সরকারের পেছনে আরো বেশি খরচ করা – এবং এ থেকে আরো কম পাওয়া – আমাদের জন্য আর সম্ভব নয়। একটি সমস্যার সমাধান সব সময় অন্য একটি কর্মসূচি বা আরো বেশি অর্থ দিয়ে হয়না। এখন সময় এসেছে সরকারের কাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা – আমাদের দৃষ্টি উপর থেকে নিচে বিস্তৃত আমলাতন্ত্র থেকে সরিয়ে উদ্যোক্তা-সরকারের দিকে নিবদ্ধ করতে হবে, যে সরকার নাগরিকদের এবং জনগোষ্ঠীগুলিকে দেশটাকে নিচ থেকে উপরের দিকে বদলে ফেলার ক্ষমতা প্রদান করবে। যেসব ব্যক্তি এবং চিন্তাভাবনা কার্যকর প্রমানিত হয়, তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে, এবং যারা হয়না তাদেরকে বাদ দিতে হবে।" প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন, ভাইস প্রেসিডেন্ট গোর, পুটিং পিপল ফার্স্ট।

দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোরকে জাতীয় কার্যসম্পাদনা পর্যালোচনা বা ন্যাশনাল পারফর্মেন্স রিভিউ - এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন, এবং ছয় মাসের মধ্যে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। এই সীমারেখার ভিতরেই *ফ্রম রেড টেপ টু রিজাল্টস: ক্রিয়েটিং এ গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস বেটার এন্ড কষ্টস লেস (লাল ফিতা থেকে সাফল্য : অধিক কার্যকর এবং কম ব্যয়বহুল একটি সরকার সৃষ্টি)* প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করা হয়।

১. এই প্রতিবেদনে "কিভাবে" সরকারকে আরো বেশি কার্যকর এবং কম ব্যয়বহুল করা যায়, তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে একটি "পুনঃআবিষ্কৃত সরকার" এর চারটি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়:

লাল ফিতা কাটা

- বাজেট প্রক্রিয়া সুসংহত করা
- কর্মচারী সংক্রান্ত নীতি বিকেন্দ্রীকরণ করা
- সংগ্রহ প্রক্রিয়া সুসংহত করা
- প্রধান পরিদর্শক (ইনসপেক্টর জেনারেল)দের পুনঃপরিচিতি প্রদান
- অত্যধিক নিয়ন্ত্রণাদি দূর করা
- রাজ্য ও স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন

গ্রাহকদের সর্বাগ্রে বিবেচনা করা

- গ্রাহকদের কথা বলার, এবং পছন্দের সুযোগ দেয়া
- সেবা সংস্থাগুলোকে প্রতিযোগী করা
- বাজার-গতিশীলতা সৃষ্টি করা
- বাজার কৌশলকে সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা

ফললাভের জন্য কর্মচারীদের ক্ষমতায়ন

- সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ করা
- সকল কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ফলাফলের ব্যাপারে দায়ী করা
- কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দেয়া
- কর্মজীবনের মান উন্নত করা
- শ্রম-ব্যবস্থাপনা অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা
- নেতৃত্ব প্রয়োগ করা

মূলে ফিরে যাওয়া

- যা প্রয়োজনীয় নয়, তা নির্মূল করা
- আরো বেশি সংগ্রহ করা
- অধিক উৎপাদনশীলতায় বিনিয়োগ করা
- খরচ কমানোর জন্য কর্মসূচিসমূহ পুনঃনির্ধারণ করা

২. নিচের বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি প্রধান সংস্থা এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরের পদ্ধতিসমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়, এবং পরবর্তীতে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়:

- মানসম্পন্ন নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি
- ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করা
- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রূপান্তরিত করা
- গ্রাহক সেবা উন্নত করা
- উদ্দেশ্য-চালিত, ফলমুখী বাজেট প্রণয়ন
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত করা
- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পুনঃআবিষ্কার করা
- কেন্দ্রীয় সংগ্রহ প্রক্রিয়া পুনঃআবিষ্কার করা
- সহায়ক সেবাসমূহ পুনঃআবিষ্কার করা
- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে পুনঃনির্মাণ
- কর্মসূচি নক্সা নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা
- আন্তঃসরকার সেবা সরবরাহে অংশীদারিত্ব জোরদার করা
- পরিবেশ ব্যবস্হাপনা পুনঃআবিষ্কার করা
- নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিসমূহ উন্নত করা

পরবর্তী সময়ে, প্রতিটি টাস্ক ফোর্স তার নিজস্ব সংস্থা বা সরকার ব্যাপী পদ্ধতি সম্পর্কে আলাদা আলাদা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ঘর ১.৫. মালয়েশিয়া: সরকারী সেবার উন্নতিবিধান

মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে এরকম একটি প্রধান উপাদান ছিল এর সুদক্ষ, মনোযোগী এবং নৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ বেসামরিক প্রশাসন। দেশটির রাজনৈতিক নেতৃত্ব একটি দক্ষ আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন-ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এবং গত এক দশকে এর বেসামরিক প্রশাসনের সংস্কারের লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালে মালয়েশিয়া **বেসামরিক প্রশাসনের প্রশাসনিক উন্নতি সাধনের জন্য প্যানেল** (PANEL) প্রতিষ্ঠা করে যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বেসামরিক কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং যা প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য একটি থিংক ট্যাঙ্ক বা চিন্তাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া, **প্রশাসনিক আধুনিকীকরণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট** (MAMPU) নামে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটি ইউনিট স্থাপন করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার কর্মসূচি কাজে প্রয়োগ করা এবং তার বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ। PANEL ও MAMPEU প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশাসনিক উন্নতি চিহ্নিতকরণ, বাস্তবায়ন এবং প্রত্যবেক্ষণের লক্ষ্যে আরো বেশি সুসংবদ্ধ, সমন্বিত এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল:

প্রতিষ্ঠানগত পুনর্বিন্যাস:

মালয়েশিয়ার সরকারী চাকুরি সংস্কারের মূল পুনর্বিন্যাসকারী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মালয়েশিয়া ইনকর্প্োরেটেড ধারণাটি। এটি এমন একটি কাঠামো যার অধীনে সরকারী ও বেসরকারী খাত অংশীদার হিসেবে একটি প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে একযোগে কাজ করে এগিয়ে যাবে। যোগসূত্রটি নির্মাণ করেছে দুটি পরামর্শদাতা প্যানেল – **মালয়েশিয়ান বিজনেস কাউন্সিল**, যার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী নিজে, এবং **মালয়েশিয়া ইনকরপোরেটেড প্যানেল**, যার সভাপতি প্রধান সচিব। এগুলোতে অর্থ মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মত সংস্থা সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত, যারা সমস্যা চিহ্নিত করা, এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য নিয়মিত বেসরকারী খাতের সংগে বৈঠকে মিলিত হয়। বাণিজ্য ও অর্থ, অবকাঠামো উন্নয়নের মত গুরুতুপূর্ণ সংস্থাগুলিকে “সীমান্ত” সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে এবং বাজার তথ্য সম্প্রসারণ, বৈশ্বিক বাজারজাতকরণ এবং এ ধরনের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

কর্মী ব্যবস্থাপনা:

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলির মধ্যে ছিল: একটি নতুন বেতন পদ্ধতি যা বেতন পদ্ধতিকে কার্যসম্পাদনার সংগে সম্পর্কিত করে; সংখ্যায় অল্প এবং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন স্টাফ আকর্ষণ করার জন্য নিজস্ব উদ্দীপক ব্যবস্থাসহ একটি "গুরুত্বপূর্ণ চাকুরি" গ্রুপ সৃষ্টি করা এবং আর্থিকভাবে টিকে থাকতে সক্ষম এসওই-দের নিজস্ব বেতন পদ্ধতি নির্ধারণ করার অনুমতি প্রদান।

উৎপাদনশীলতা এবং গুণগতমান ব্যবস্থাপনা:

বেসামরিক প্রশাসনকে আরো বেশি গ্রাহক-মুখী করার জন্য একটি সম্পূর্ণ গুনমানব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যাতে আছে: প্রধানমন্ত্রীর উৎকর্ষ পুরস্কার; সেবার গুণগত মান-উন্নয়নে সুপারিশ রাখার জন্য বেসামরিক কর্মচারীদের উৎকর্ষ সুপারিশ পদ্ধতি; উৎকর্ষ প্রক্রিয়া যাতে কোনো সংস্থাকে তার উৎপাদনের উপায়গুলি চিহ্নিত করতে হয়; সংস্থাগুলি পূর্বনির্ধারিত মান মেনে চলছে কিনা, এটি নিশ্চিত করতে গুনগতমান পরিদর্শন পদ্ধতি; উৎকর্ষ শ্লোগান যেমন 'সবার আগে গ্রাহক'; উৎকর্ষ ফিডব্যাক পদ্ধতি যা গ্রাহক সন্তুষ্টি প্রত্যবেক্ষণের জন্য উপায় উদ্ভাবন করে; সাফল্য উদযাপন এবং ভবিষ্যতের জন্য নতুন মান নির্ধারণের জন্য উৎকর্ষ দিবস; এবং উৎকর্ষ তথ্য পদ্ধতি যা প্যামফ্লেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের তথ্য যোগান দেয়। এছাড়া, সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলীও তৈরি করা হয়েছে এবং জোরে-সোরে সেগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সরকারী বিভাগসমূহে কাউন্টার-সেবার উন্নতি সাধন:

কাউন্টার সেবার (যেমন – পারমিট লাইসেন্স, পাসপোর্ট, পরিচিতি কার্ড, নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট, বিবাহ সার্টিফিকেট এবং রাজস্ব আদায়) মাধ্যমে সরকারী নানা সংস্থা ও নাগরিকরা যে পরস্পরের সন্নিকটে আসেন, এবং এক্ষেত্রে অদক্ষতা এবং অমনোযোগিতা যে সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ করে – এবিষয়টি উপলব্ধি করে একটি বড় ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে ছিল: কাউন্টার - কর্মীদের সঠিক নির্বাচন; ভাল কাজ করছেন এমন কর্মীদের স্বীকৃতি ফলক; বিভাগীয় মূলমন্ত্র এবং শ্লোগান; উন্নততর পদ্ধতি এবং বিধি; লাইন ধরে দাঁড়ানোর পদ্ধতি; কম্প্যুটার অন-লাইন পদ্ধতি; নির্দেশসূচক চিহ্ন এবং সাইনবোর্ড।

মৌলিক মূল্যবোধসমূহ অন্তঃস্থকরণ:

আমলাতন্ত্রের মনোবল এবং কাজকর্মের উপর ভাল সিভিল সার্ভিস -মূল্যবোধের একটি উন্নত পদ্ধতি যে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে, এ বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়ে মালয়েশিয়া সরকার ১৯৯১ সালে *বেসামরিক প্রশাসনের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা* নামে একটি বই প্রকাশ করে, যাতে বেসামরিক আমলারা যেসব মৌলিক মূল্যবোধ অবশ্যই চর্চা করবেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তাছাড়া, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি ওয়ার্ক এ্যাকশন ফর্ম উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ফাইল কোথায় কখন যাচ্ছে তার প্রত্যবেক্ষণ করে। একই সঙ্গে একটি ফাইল কখন কোথায় আছে, এই ফর্ম তা সহজেই বের করতে পারে এবং অযৌক্তিক বিলম্বের সংগে জড়িত কর্মকর্তারা কারা, তা সহজেই চিহ্নিত করতে পারে।

জবাবদিহিতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:

জবাবদিহিতা উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে ছিল: সরকারী পরিসম্পদের নতুন শ্রেণীকরণ ও সংজ্ঞায়ন এবং রেকর্ড রাখার জন্য নতুন ফর্মের মাধ্যমে সরকারী পরিসম্পদের উন্নততর ব্যবস্থাপনা; একটি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইউনিট/সরকারী হিসাব কমিটি প্রতিষ্ঠা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উন্নয়ন; পরিবর্তিত বাজেট পদ্ধতি (এমবিএস)।

বাস্তবায়ন কৌশল:

বাস্তবায়ন কৌশলের পাঁচটি মূল উপাদান হচ্ছে:

- উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে **ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা**; মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং স্ট্যাচুইটরি কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যনির্বাহীদের তিনটি প্রধান স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সংস্কারের সুপারিশ করা।
- ব্যবস্থাপনার ধারণাসমূহ এবং সরকারী খাতে নানা উদ্ভাবনা গাইডবই, প্যামফ্লেট ইত্যাদির মাধ্যমে **প্রচারণা**।
- উন্নতকরণ কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দিতে **প্রশিক্ষণ** কার্যক্রম।
- উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিদর্শন ইউনিটের ঘনঘন মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সংস্কার **প্রত্যবেক্ষণ** ; এবং
- জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশিষ্ট অবদানসমূহকে প্রকাশ্য স্বীকৃতি দেয়া।

সাফল্যের পিছনে কারণসমূহ:

মূল কারণসমূহ ছিল:

- সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অঙ্গীকার
- পরিবর্তন পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহ (PANEL, MAMPU)।

ঘর ১.৬. নিউজিল্যান্ড: সরকারের ভূমিকার পুনঃসংজ্ঞায়ন

গুরুতর অর্থনৈতিক সংকট এবং অনেকটা প্রাক্তন পূর্ব ইউরোপীয় কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির দেশের মত প্রচন্ড রকম হস্তক্ষেপবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ড সরকার পরপর এমন কিছু বৈপ্লবিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হাতে নেয়, যার লক্ষ্য ছিল সরকারের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্ধারণ করা এবং সরকারের কর্মকাণ্ড নতুন করে নির্দিষ্ট করা। এই সংস্কার চারটি পর্যায়ে চলে, এবং নিচের চারটি আইনে তা বিন্যস্ত হয়েছে:

- **রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আইন (১৯৮৬)** – এই আইনের সাহায্যে যেসব উৎপাদন কর্মকাণ্ড বেসরকারী খাত সহজেই প্রতিযোগিতামূলকভাবে চালাতে পারবে, সেগুলি থেকে রাষ্ট্রকে বের করে আনা হয়। পরবর্তী সময়ে যেসব সংস্কার পরিচালিত হয়, এই আইন তার কৌশলগত কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে।

- **রাষ্ট্রীয় খাত আইন (১৯৮৮)** – রাষ্ট্রীয় খাত আইনের মাধ্যমে বেসামরিক কর্মচারীদের চাকুরি স্থায়ী থাকার বিধানটি বিলোপ করা হয়। সংস্থা প্রধানদের পাঁচ বছরের (নবায়নযোগ্য) কার্যসম্পাদনা চুক্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, এবং তাদের এখতিয়ারে কর্মচারীদের নিয়োগ ও বাতিল করার কর্তৃত্ব দেয়া হয়। একটি সংস্থাকে দুই বা ততোধিক বিশেষ কর্ম ইউনিটে ভাগ করার বিধানও এ আইনে রাখা হয়; যেমন, একটি ইউনিট হয় তহবিল যোগানদার/ক্রয়কারী এবং অন্য ইউনিটটি যোগানদার।

- **সরকারী অর্থ (ফাইনান্স) আইন (১৯৮৯)** – এই আইন দুটি নতুন উদ্ভাবন ঘটায়: (১) সকল অর্থ সংক্রান্ত বিবরণকে একটি এ্যাক্রুয়াল হিসাব পদ্ধতির ভিত্তিতে স্থাপন করার বাধ্যবাধকতা সন্নিবেশিত করে এটি সরকারী অর্থ সংক্রান্ত বিবরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে, এবং (২) কোনো উপযোজনকে সাতটির যে কোনো একটি শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত করে (এই শ্রেণীগুলির প্রধানটি হল আউটপুট বা উৎপাদন) দেখানোর বাধ্যবাধকতা সংযুক্ত করে এই আইন জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করে। প্রথম উদ্ভাবনটি একটি সংস্থার বিবরণ অন্যান্য সংস্থার কাছে এবং একই সাথে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছে বোধগম্য করে। দ্বিতীয়টি প্রতিটি সংস্থাকে কোনো অর্থ বছরের জন্য এর পরিকল্পিত উৎপাদন (আউটপুট) সুনির্দিষ্ট করার মাধ্যমে সংস্থার জন্য একটি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে, কারণ সংস্থাটির উপর এতে অর্থ বছরে যে উৎপাদনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল, তার দায়দায়িত্ব বর্তায়।

* **রাজস্ব সংক্রান্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব আইন (১৯৯১)** – সরকারকে মাঝে মধ্যেই রাজস্ব সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করতে এবং প্রকাশিত সামগ্রিক রাজস্ব সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলীর বিপরীতে প্রকৃত কার্যসম্পাদনা প্রতিস্থাপন করতে বাধ্য করে এই আইন সামগ্রিক রাজস্ব সংক্রান্ত শৃঙ্খলার জন্য সরকারের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে।

১.২৬ *বাংলাদেশে অতীত সংস্কার উদ্যোগ।* বাংলাদেশ সরকার ও দাতারা লোক প্রশাসন উন্নত করতে অনেকবার উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু এসব উদ্যোগের পরিধি এবং প্রভাব ছিল খুবই সীমাবদ্ধ (পরিশিষ্ট ২)।এর দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমতঃ পুনর্বিন্যাসের দুরূহ এবং জটিল প্রক্রিয়াকে টিকিয়ে রাখতে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, প্রকৃতপক্ষে তা ছিল অনুপস্থিত। প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকগুলি কায়েমি স্বার্থ দাঁড়িয়ে যায়, এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের অবস্থান থেকে কেউ এগিয়ে এসে এই সংস্কারগুলোর পক্ষে হাল ধরেননি। দ্বিতীয়ত, সংস্কারগুলি বেসামরিক প্রশাসনের কিছু বিশেষ পদ্ধতিগত সমস্যাকেই তুলে ধরেছিল, কিন্তু অদক্ষতার প্রসারের পিছনে কার্যকর কাঠামোগত বিষয়গুলি কিভাবে সমাধান করতে হবে, সেদিকে দৃষ্টিপাত করেনি। অতীত উদ্যোগগুলি থেকে অনেক বেশি সুসমন্বিত চার সচিবের রিপোর্ট (এফএসআর) বেসামরিক প্রশাসন কর্মী ব্যবস্থাপনা, কার্যসম্পাদনা ভিত্তিক জবাবদিহিতা, এবং সেবার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিছু চমৎকার সুপারিশ প্রস্তাব করেছে। (পরিশিষ্ট ২)

১.২৭ এই প্রতিবেদন আগের সমীক্ষাগুলি থেকে পাওয়া সুপারিশসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছে, বিশেষ করে চার সচিবের প্রতিবেদনের – তবে এটি ঐসব সমীক্ষা থেকে আলাদা। অতীতের প্রতিবেদনসমূহ রাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকা সর্ম্পকে কোনো প্রশ্ন তোলেনি, তাছাড়া বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধানের ব্যাপকতার বিষয়গুলি তারা অবহেলা করেছে, এবং সাফল্যজনকভাবে জনসেবাসামগ্রী যোগান দেয়ার শিক্ষাসমূহকেও এড়িয়ে গেছে। তুলনায়, এই প্রতিবেদনে সর্বাগ্রে সরকারের "হস্তক্ষেপপন্থী" ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি অপ্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে রাষ্ট্রকে একটি বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে, এবং প্রশাসনের চরিত্রে একটি নাটকীয় পরিবর্তন আনার আহ্বান জানানো হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নতিবিধানের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলাপ-আলোচনাকে উৎসাহিত করা। তবে এই পরিবর্তন তখনই সম্ভব হবে যখন বিভিন্ন মহল সম্মিলিতভাবে একে সমর্থন করবে। এই সমর্থকদের মধ্যে থাকবেন রাজনৈতিক নেতা, ভোক্তা, করদাতা, বেসরকারী ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বেসামরিক প্রশাসনের সদস্যরা। অর্থনৈতিক প্রশাসন সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি – যা সংবাদ মাধ্যমসমূহে ক্রমশই অধিক হারে প্রকাশ পাচ্ছে – এখন হাল ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে এই উপলব্ধির সৃষ্টি করছে যে, ব্যাপক পরিবর্তন প্রকৃতই সম্ভব। এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে পরিবর্তনের এক নিরেট কর্মসূচিতে রূপান্তরের জন্য এখন প্রয়োজন সদিচ্ছার।

প্রতিবেদনের বিশ্লেষণমূলক বিন্যাস এবং কাঠামো

১.২৮ যে কোনো বড় সংগঠনের দক্ষতা বাড়ানো এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। সরকারের সংস্কার একটি দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য এবং জটিল কাজ। এ কাজের অংশ হিসেবে অসংখ্য পদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, উদ্দীপক কাঠামো এবং সংগঠনগত পুনঃনির্মাণ/বিন্যাস সর্বত্র পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, একটি প্রতিবেদনে সব কিছু নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। সরকারকে দিয়ে আরো ভাল কাজ করাতে হলে ছটি মূল এলাকা নির্বাচন অত্যাবশ্যক।

* প্রথমত, বর্তমানে যে নানাবিধ কর্মকান্ডে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি জড়িত সেই অংশগ্রহণের মাত্রা এবং প্রকৃতি পুনঃসংজ্ঞায়ন। একটি পরিব্যাপ্ত সরকার দক্ষ সরকার হতে পারেনা।

- দ্বিতীয়ত, সরকারী সংস্থাগুলোর ভিতরে নানা উদ্দীপক এবং প্রতিযোগিতামূলক চাপ নির্ধারণ করে এমন প্রিন্সিপাল-এজেন্টদের মধ্যকার সম্পর্ক, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং প্রক্রিয়াসমূহ।

- তৃতীয়ত, জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা এবং মনোযোগ বাড়ানো।

- চতুর্থত, যেসব বিধিবিধান, আইনকানুন এবং প্রক্রিয়া পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার নাগরিক এবং বেসরকারী খাতকে শাসন করে এবং তাদের সংগে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। আইনগত এবং নিয়ন্ত্রণধর্মী প্রতিষ্ঠান এবং নীতিসমূহের স্বচ্ছতা, সততা এবং স্বয়ংক্রিয়তা সরকারের দক্ষতার উপর এক বিরাট প্রভাব ফেলে।

- পঞ্চমত, নিয়ম ও প্রক্রিয়াসমূহ – যাদের সাহায্যে সরকার তার নীতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ কর্মকাণ্ডসমূহ পরিচালনা করে। বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণ, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং দ্রুত ও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ হচ্ছে একটি দক্ষ সরকারের চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

- সবশেষে, দক্ষ, অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং পেশাদারী সরকারী চাকুরে। অর্থনৈতিক প্রশাসন উন্নয়ন করতে হলে তাদের অবশ্যই প্রয়োজন হবে।

১.২৯ এই প্রতিবেদনে উপরের ছটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, অর্থনৈতিক প্রশাসনে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনতে হলে প্রয়োজন পর্যায়ক্রমিক কিন্তু সুসমন্বিত উদ্যোগ। সরকারের গুণগত মানের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে, যার সাথে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে পরিমাণের। বিষয়সূচিটি উচ্চাকাঙ্খী হলেও প্রতিবেদনটি একটি সার্বিক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন, তবে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রশাসন উন্নতকরণের জন্য এটিকে শেষ এবং চূড়ান্ত বক্তব্য হিসেবে ধরে নেয়া উচিত হবেনা।

১.৩০ প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত। সরকারী খাতের আটটি সফল কর্মসূচি এবং প্রকল্পের নির্বাচিত সমীক্ষা বা কেইস স্টাডি হাতে নেয়া হয়েছিল যাতে সরকারী খাতের অবিরাম অংশগ্রহণের পেছনে যুক্তিটি পরীক্ষা করে দেখা যায়। সবশেষে, এই প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফল বিশেষজ্ঞ জরিপে সপ্রমাণিত হয়েছে, যেমন: (১) জনসেবাসমূহের (পাবলিক সার্ভিসেস) অবস্থা সম্পর্কে একজন ব্যবহারকারীর দৃষ্টিকোণ; (২) সরকারের নীতি ঘোষণাসমূহের সঙ্গতি নির্ধারণ করার জন্য সংবাদপত্রসমূহের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ; (৩) সাম্প্রতিক নীতি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রভাব সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের মতামত জানার জন্য একটি জরিপ; (৪) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি কেন এত ধীরগতির – একজন 'ভিতরবাসীর' দৃষ্টিকোণ থেকে তার কারণ জানার জন্য ৪০ জন উর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তার কাছে পাঠানো একটি প্রশ্নমালা। প্রতিবেদনে নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদগুলি অন্তর্ভুক্ত।

- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: নীতি নির্ধারকরা যাতে রাষ্ট্রের আকার কমিয়ে আনতে পারেন, সেজন্য সরকারী হস্তক্ষেপের পেছনে যুক্তিগুলিকে এই পরিচ্ছেদে খতিয়ে দেখা হয়েছে। সাধারণভাবে, বাজারের এবং সরকারের ভূমিকার মধ্যে, এবং সুনির্দিষ্টভাবে, ত্রুটিপূর্ণ বাজার এবং ত্রুটিপূর্ণ সরকারের ভূমিকার মধ্যে জেনেশুনে বেছে নিতে সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য একটি ধারণাগত কাঠামো এবং মৌলিক নীতিসমূহ এ পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত হয়েছে। কেইস বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এ পরিচ্ছেদ সরকারের হস্তক্ষেপের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কিছু শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরেছে; সরকারী হস্তক্ষেপ কি প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিযুক্ত, নাকি এমন অনেক এলাকা আছে

যেখানে হস্তক্ষেপ করাটা কোনো গুরুতর সামাজিক বা অর্থনৈতিক কারণে সমর্থিত হতে পারেনা, এই প্রশ্নটি এখানে উত্থাপিত হয়েছে।

- তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যেখানে সরকার সরাসরি জড়িত, অথবা সেবার অর্থ যোগানদার হিসেবে ভাল কাজ করেছে সেরকম শ্রেষ্ঠ চর্চা ও নীতিগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন – সংগঠনগত বিন্যাস, উদ্দীপকসমূহ, ভোক্তার পছন্দ, প্রতিযোগিতা, জনসেবাসামগ্রীর বেসরকারী যোগান। সেবা সরবরাহের মান এবং খরচ-সাশ্রয়তা উন্নত করার জন্য যেসব শিক্ষণীয় বিষয় এবং প্রশাসন-কাজের নীতিসমূহ সরকারের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় এবং উচিতও, সেগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি এবং সংগঠনগত ব্যবস্থাপনার নীতি ব্যবহার করে কয়েকটি কেইস পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- চতুর্থ পরিচ্ছেদ: এই পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে জনগণের কাছে জবাবদিহিতার পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে, এবং একই সাথে ব্যবহারকারীদের প্রতি মনোযোগের অভাবকে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

- পঞ্চম পরিচ্ছেদ: নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং প্রয়োগ, এবং আইনগত কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান দুর্বলতাগুলি এই পরিচ্ছেদে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য একটি উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশ সৃষ্টি এবং অস্পষ্ট ও বৈষম্যমূলক নিয়ন্ত্রণসমূহের (যাদের মাধ্যমে একজন নাগরিক সরকারের সংগে মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত হন) কারণে সাধারণ নাগরিকরা প্রতিদিন যে ঝামেলা ও খরচের সম্মুখীন হন সেগুলো সংস্কারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি এ পরিচ্ছেদে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: এ পরিচ্ছেদে নীতি এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও নিয়মসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং একটি সুস্থির ও কার্যকর নীতি পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং সরকারের ভিতরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- সপ্তম পরিচ্ছেদ: সরকার মানব সম্পদ কিভাবে ব্যবস্থাপনা করেছে, এখানে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কর্মী ব্যবস্থাপনার মূল এলাকাগুলো – যেমন, বেতন ভাতা, নিয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন, পদোন্নতি, ইত্যাদিতে দুর্বলতা এ পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে – যেগুলো সরকারের দক্ষতার সাথে কাজ করার ক্ষমতা বিনষ্ট করছে। এই পরিচ্ছেদে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে মেধাবী কর্মীদের আকর্ষণ করা ও ধরে রাখার লক্ষ্যে নেয়া যথাযথ সংস্কার পদক্ষেপের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

- অষ্টম পরিচ্ছেদ: এ পরিচ্ছেদে সকল বক্তব্যের একটি সারসংক্ষেপ দেয়া হয়েছে, এবং একটি নতুন অবস্থায় উন্নীত হতে দৃষ্টান্তমূলক যেসব পরিবর্তন আনা সম্ভব তার উপায়গুলি চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। এই নতুন অবস্থাটি আসলে হবে এক নতুন আমলাতন্ত্র, যা সব দিক দিয়েই স্বল্পাশ্রয়ী এবং জনগণের প্রতি মনোযোগী, এবং নাগরিকদের করের অর্থের বিনিময়ে উন্নততর সেবা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই আমলাতন্ত্র হবে বাজার প্রতিপালনে ও বেসরকারী খাতের কর্মকান্ডে সহায়তা দানের জন্য নিবেদিত প্রাণ।

১.৩১ এই প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত বিষয়সূচি যেসব নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সেগুলি ইতিমধ্যে ভিন্ন মেরুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বহু সংস্কারাধীন সরকার গ্রহণ করেছে। যেসব পরিবর্তন প্রয়োজন সেগুলো প্রায়োগিক, এবং যেকোনো রাজনৈতিক চরিত্রের সরকারের কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত এমন সব সংস্কারকে সাদরে বরণ করে নেয়া যেগুলো জনগণের কাছে জবাবদিহিতা জোরদার করে এবং সরকারী সেবার মান উন্নত করে।

২. সর্বত্র গজিয়ে ওঠা সরকার – সময় এসেছে পুনর্বিবেচনার

অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের যেসব সাধারণ যুক্তি দেয়া হয়, এই পরিচ্ছেদে সেগুলি তলিয়ে দেখা হয়েছে। এরপর এসব যুক্তি কতটা কার্যকর, তা দেখার জন্য বেশ কয়েকটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কেইস সমীক্ষা করা হয়েছে। সবশেষে, এ পরিচ্ছদে পরিবর্তনের কয়েকটি বিকল্প – 'বোঁচকা খোলা' থেকে সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণ – বিবেচনা করা হয়েছে ।

"........... এখন আমাদের মূল সমস্যা খুব বেশি বা খুব কম সরকার – এর কোনোটাই নয়। আমাদের মূল সমস্যা এই যে, আমাদের সরকার হচ্ছে ভুল ধরনের সরকার ... ।" ভাইস প্রেসিডেন্ট গোর, ক্রিয়েটিং এ গভর্নমেন্ট দ্যাট ওয়ার্কস বেটার এন্ড কোস্টস লেস (১৯৯২)।

"....... বিশেষ বিশেষ হস্তক্ষেপ যেখানে সফল হয়েছিল, সেখানে তা তিনটি অবশ্যপূরণীয় শর্তের জন্যই হয়েছিল। প্রথমতঃ এসব শর্ত বাজারের কার্যসম্পাদনের সমস্যাগুলিকে মোকাবেলা করেছে। দ্বিতীয়তঃ এগুলো উন্নত ও মৌলিক নীতিসমূহের প্রেক্ষিতে কার্যকর হয়েছে। তৃতীয়তঃ এদের সাফল্য নির্ভর করেছে হস্তক্ষেপের সঙ্গে সম্পর্কিত যথাযথ অর্থনৈতিক কার্যসম্পাদনা মান গড়ে তোলার এবং প্রত্যবেক্ষণ করার সরকারের সামর্থ্যের ওপর ..... ।" লিউইস টি প্রেস্টন, দি ইষ্ট এশিয়ান মিরাকল, (১৯৯৩) *গ্রন্থের মুখবন্ধে।*

সরকারের বৃদ্ধি

২.১ স্বাধীনতার পর থেকে সরকার কার্যত মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং কর্মকর্তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছে (সারণী ২.১ এবং ২.২)। পরিবেশগত চিন্তাভাবনা এবং নারী সম্পর্কিত বিষয়ের মত চাহিদা মোকাবেলায় নতুন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিভাগ গঠিত হয়েছে। তাছাড়া বাণিজ্যিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডেও রাষ্ট্র তার শাখা বিস্তার করেছে। এই বৃদ্ধি অংশত রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিতে অন্তর্দলীয় গ্রুপগুলোকে জায়গা দেয়া সম্ভব হয়েছে, এবং মন্ত্রীর পদ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিতরণের জন্য অনেক চাকুরি সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা (৩৫) অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি, যেমন মালয়েশিয়া (২৪), দক্ষিণ কোরিয়া (২৫), থাইল্যান্ড (১৪), জাপান (১৪), এবং যুক্তরাজ্য (১৬)।

সারণী ২.১ মন্ত্রণালয়ের বৃদ্ধি

বছর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	বিভাগের সংখ্যা	স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট)ও অধিদপ্তরের সংখ্যা
১৯৭২	২১	উপাত্ত পাওয়া যায়নি	উপাত্ত পাওয়া যায়নি	উপাত্ত পাওয়া যায়নি
১৯৭৫	২০	"	"	"
১৯৮০	৩২	"	"	১৯০/এ
১৯৮২	১৮	৪৪	১০৯	১৮১
১৯৮৫	২৬	উপাত্ত পাওয়া যায়নি	উপাত্ত পাওয়া যায়নি	উপাত্ত পাওয়া যায়নি
১৯৯৪	৩৫	৪৯	১৩৯	২২১

সারণী ২.২ বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরি বৃদ্ধি

	১৯৭১	১৯৮২	১৯৮৬	১৯৯২	বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার
মোট	৪৫৪,৪৫০	৭৭৯,০০০	১,০৭২,৮৫৪	৯৪৬,৭৪৯	৩.৫৬%

২.২ সারণী ২.২ থেকে দেখা যাচ্ছে, সরকারী চাকুরেদের সংখ্যা সার্বিকভাবে দ্বিগুণ হয়েছে। সরকারী খাতের চাকুরি ১৯৭১ সালের ৪৫৪,৪৫০ থেকে বেড়ে ১৯৯২ সালে দশ লাখে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ ৩.৬ শতাংশ বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে তা বেড়েছে, যেখানে একই সময়কালে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার ছিল ২.৫ শতাংশের ওপর। তবে এই সংখ্যাও প্রকৃত সংখ্যাকে প্রকাশ করেনা, কারণ এতে প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও সহায়ক কর্মচারীদের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত নেই। একই ভাবে, আপতিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেটের অধীনে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মীদের সংখ্যাও ধরা হয়নি; যেমন গণপূর্ত এবং কৃষি ও বন মন্ত্রণালয় বিভাগগুলিতে নিয়োগ প্রাপ্ত লোকজন। খসড়া হিসাব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপরোক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে আরো ২০০,০০০ - ২৫০,০০০ যোগ হবে। ১৯৯২ সালে সরকারী খাতের মোট কর্মচারীর মাত্র ১ শতাংশ ছিল মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলিতে। বাকী কর্মচারীরা ছিল বিভিন্ন দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট) ও অধিদপ্তর (৬৯ শতাংশ) এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনগুলিতে (৩০ শতাংশ)।

২.৩ যদিও সব আমলাতন্ত্র পরিবর্তিত অগ্রাধিকারের প্রতি সাড়া দেয়, বাংলাদেশে, দুঃখজনকভাবে, পরিবর্তন হয়েছে যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে। এখানে প্রচলিত চর্চা হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটি নতুন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করা। কিন্তু একই সংগে নিম্ন অগ্রাধিকারের দায় বাদ দেয়া অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মীসংখ্যা দূর করার কোনো প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। বাজেটের ওপর প্রভাব ফেলা ছাড়াও, এই সম্প্রসারণের ফলে বাস্তবায়নের সামর্থ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে এবং সমন্বয়ের সমস্যাগুলোকে আরো সংকুল করেছে। এর ফলে কায়েমি স্বার্থ তৈরি হয়েছে যারা সংস্কারের প্রয়াস বাধাগ্রস্ত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার এমন সব কাজ করছে যা উপযোগী নয়, অথবা বেসরকারী খাত অনেক বেশি সাশ্রয়ীভাবে সেসব কাজ করতে পারত। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে অলাভজনক অনেক বস্ত্রকল এবং একটি পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র দপ্তর। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এরকম উদাহরণের অভাব নেই।

২.৪ আর্থিক বিচারে, সরকার পরিচালনার ব্যয় বাংলাদেশের সমশ্রেণী ও আকৃতির দেশগুলিতে সরকার পরিচালনার ব্যয় থেকে বেশি নয়। সারণী ২.৩ এ গত দশকে পারিশ্রমিক ও বেতন ভাতাদি বিল এবং চলতি ব্যয় (জিডিপির % হিসাবে) দেখানো হয়েছে। এসব ব্যয় গত দশকে প্রায় ৪০% বাড়লেও (১৯৮৫/৮৬'র জিডিপির ৩% থেকে ১৯৯৪/৯৫ তে প্রায় ৪.২% এ) এগুলো একই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্যায়ে অবস্থিত অন্যান্য দেশের সংগে তুলনীয়। তবে সরকার পরিচালনার জন্য করদাতার অর্থের এই "যুক্তিসঙ্গত" খরচ নিয়ে স্বস্তিলাভের কোনো অবকাশ নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, করদাতা বিনিময়ে কি পান তার মূল্য, এবং "বৃহৎ" সরকার সম্পর্কে তার অভিমত। কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের সরকারের জন্য (জিডিপির % হিসাবে) তাদের নাগরিকদের প্রায় একই খরচ করতে হয়, তবে এ দুটি রাষ্ট্রের দক্ষতা ও মান বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। একই ভাবে, বাংলাদেশের সরকারের জন্য খরচ যদিও যুক্তিযুক্ত, বেশির ভাগ সাধারণ নাগরিক এবং অনেক সরকারী কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদ বিশ্বাস করেন যে সরকার অতিরিক্ত বড় – এই অর্থে যে এটির বিস্তার মাত্রাতিরিক্ত, এর ফলে সংস্থা ও ডিপার্টমেন্টের সংখ্যা অতিরিক্ত বেশি এবং এর দায়-দায়িত্বও অত্যন্ত

বিশাল। এই ফুলে ওঠার অবস্থা অবশ্যই খরচ-সাশ্রয়ী নয়, এবং এতে অদক্ষতাও বাড়ে। একটি সংকীর্ণ অর্থেও সরকারকে মাত্রাতিরিক্ত বড় বলা যায়: কারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত বহু কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকার চাকুরি দিয়ে রেখেছে। তাছাড়া, রাষ্ট্র যখন সম্পদ তৈরির প্রথম উৎস হয়ে দাঁড়ায়, কিছু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপকের জন্য সম্পদের অন্বেষণ হয়ে দাঁড়ায় একটি প্রধান কাজ। এর ফলে, 'সরকারের সঠিক আকার' বিতর্কটি জনগণের কাছে একটি প্রধান আগ্রহের বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে।

সারণী ২.৩ সরকারী কর্মচারীদের বেতনভাতা খরচের প্রবণতাসমূহ
(একশ কোটি টাকায়)

	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯-৯০	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
বেতন ও ভাতা	১৩.৩৬	২৬.৫	৪০.৫	৪১.৯
পেনশন ও অবসরগ্রহণ	০.৭৫	১.৭	৪.৭	৪.৬
বেতন খাতে মোট প্রদান	১৪.১১	২৮.২	৪৫.২	৪৭.৫
রাজস্ব ব্যয়	৩৪.২১	৬৭.৪	৯২.০	০৩.০
জিডিপি (বর্তমান মূল্য অনুপাত)	৪৮৬.০০	৭৩৮.০	১০৩৫.০	১১৩৮.০
বেতন বিল/রাজস্ব ব্যয়ের %	৪১.০০	৪২.০	৪৯.০	৪৬.০
বেতন বিল/জিডিপির %	৩.০৩	৩.৮	৪.৪	৪.২
রাজস্ব ব্যয়/জিডিপির %	৭.৩৪	৯.১৪	৮.৮৯	৯.০৫

রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের যুক্তি: সরকারী এবং ব্যক্তিগত সেবাসামগ্রী

"....... অনেকের কাছেই অভিন্ন যা, তাকেই সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয়া হয়: কারণ অন্যের সংগে ভাগ করে যার মালিকানা ভোগ করতে হয় তার থেকে নিজস্ব মালিকানার জিনিষের প্রতি সকলেই অনেক বেশি যত্নবান ...." (এরিস্টটল)।

২.৫ অর্থনীতিতে সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপের পেছনে যে যুক্তি আছে, এই অনুচ্ছেদে তা পরীক্ষা করা হয়েছে, এবং এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের আধা ডজন সংস্থার কেইস-সমীক্ষাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সংস্থাকে এ জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল যে, সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের যুক্তির অনুকূলে এদের উপস্থাপন করা হয়েছে। জনগণের সংগে এদের ব্যাপক যোগাযোগও রয়েছে। বর্তমানে যেভাবে সরকারী হস্তক্ষেপ হচ্ছে, তার আবশ্যকতার একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের জরুরী প্রয়োজনীয়তার ওপরও এখানে আলোকপাত করা হবে। আলাদা আলাদা ভাবে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা এবং কর্মসূচিসমূহ মূল্যায়নে এ বিশ্লেষণ একটি দিক নির্দেশনা দিতে পারবে।

২.৬ ঐতিহ্যগতভাবে সরকারের স্বীকৃত নানা কর্মকাণ্ড সরকারী (পাবলিক) ও ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) সেবাসামগ্রীর পার্থক্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১] সরকারী সেবাসামগ্রী বলতে বোঝায় সেসব কর্মকাণ্ড এবং সুফলসমূহ, যেগুলি সংজ্ঞা অনুযায়ী সমস্ত দেশ জুড়ে বিস্তৃত। এদের মধ্যে আছে: দেশের প্রতিরক্ষা অক্ষুন্ন রাখা, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা করা এবং দেশের আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা। সরকারী সেবা সামগ্রী সাধারণতঃ সরকারেরই বিশেষ অধিকার, এবং এদের সরবরাহ নিশ্চিত করার দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করে থাকে। এই মানদন্ডের অন্য প্রান্তে আছে সেবাসামগ্রী যেগুলো একান্ত ব্যক্তিগত বলেই বিবেচিত – কাপড়-চোপড়

এবং সিগারেট থেকে গৃহায়ন পর্যন্ত -- যেগুলো উৎপাদিত এবং ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত পছন্দের প্রতি সাড়া দিয়ে, এবং যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীরাই এসবের সুফল ভোগ করেন। কিন্তু সরকারী ও ব্যক্তিগত বা বেসরকারী -- এদের মধ্যে সীমারেখা পরিষ্কার নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য অথবা রেলপথের মত সেবাসামগ্রীর ক্ষেত্রে -- যেখানে বিনিয়োগ সমস্ত দেশের জন্য লাভ বয়ে আনে, অথচ সুফল অনেক সময়ই ব্যক্তির খাতায় জমা হয় -- এক বিস্তৃত 'ধূসর' এলাকা রয়ে গেছে। বেশির ভাগ দেশেই সাধারণতঃ এই 'আধা-সরকারী' ধূসর অঞ্চলেই সরকারী যোগান নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। অবশ্য বাংলাদেশে সরকার শুধু পাবলিক বা সরকারী অঞ্চলটিই দখল করেনি, বরং প্রায় সমগ্র ধূসর অঞ্চলটিই অধিকার করে নিয়েছে। তাছাড়া একান্ত ব্যক্তিগত বলে যা বিবেচিত, সে অঞ্চলটিতেও সরকার উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশ, এবং অন্যত্র সরকারের বৃদ্ধির অনেকটাই এসেছে জনগণের পয়সায় ব্যক্তিগত/বেসরকারী সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত থেকে।

২.৭ সরকারী ও বেসরকারী সেবাসামগ্রীর ভিন্নতার পাশাপাশি রয়েছে অর্থায়ন ও সরবরাহের ভিন্নতার বিষয়টি। সরকার কোনো জিনিষের খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার মানেই যে তাকে তা উৎপাদন করতে হবে, তা নয়। যেমন জনগণ যদি একটি নতুন ক্লিনিক চায়, সরকার একটি নির্মাণ সংস্থাকে সেটি নির্মাণের ঠিকা দিতে পারে। একই ভাবে সরকার কোনো বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও-র সংগে এ ক্লিনিকটিতে স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য চুক্তি করতে পারে। সরকার নিজে যে পরিমাণ সেবা প্রদান করে, তার মাত্রা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় খাত খোদ সেবা সরবরাহ কাজে বিশালভাবে জড়িত। এবং এই প্রতিবেদনের একটি প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, অর্থায়ন থেকে উৎপাদনকে আলাদা করে ফেললে সরকারী ও আধা-সরকারী সেবাসামগ্রী সরবরাহকে অনেক বেশি উন্নত এবং ভোক্তার প্রতি মনোযোগী করা যায়।

২.৮ অনেক রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারসূত্রে নির্ধারিত, এবং বর্তমান ব্যয় অগ্রাধিকারের বিষয়টি এতে প্রতিফলিত হয়না। এগুলো চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কারণে যথাস্থানে থাকে, অথবা এদের টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ (এর কিছু নির্বাহী সংস্থার ভিতরেই রয়েছে) গড়ে ওঠে। তবে প্রায় প্রত্যেক সংস্থা কিছু যৌক্তিকতার অবতারণা করতে পারে যার মধ্যে নিচের চারটিই সাধারণতঃ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত:

- *বাজারের ব্যর্থতা* -- প্রযুক্তিগত বিষয়, মাত্রা (স্কেল) অথবা ত্রুটিপূর্ণ তথ্যের জন্য বেসরকারী খাত কোনো বিশেষ সামগ্রী বা সেবা সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ পরিমাণে যোগান দিতে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক।[১] এর মধ্যে আছে বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবগুলি সম্বন্ধে কৈফিয়ত দেয়ার ব্যর্থতা।

- *সামাজিক বা ন্যায়নীতি বিবেচনা* -- সামাজিক বিচার বা সামাজিক অগ্রাধিকারের কারণে কোনো কোনো অবস্থায়, কোনো সমাজ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের খুঁটিনাটি অগ্রাহ্য করতে পারে, এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কিছু সেবা দিতে পারে।

- *কৌশলগত কারণ* -- এগুলো জাতীয় প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার বাধ্যবাধকতাসমূহ, এবং সম্ভবতঃ জাতীয় সংহতি এবং সৌহার্দ্যেদোহাই প্রতিফলিত করে।

- *জনস্বার্থ* -- 'খাটি' জনসেবাসামগ্রী, যথা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধিবিধানসমূহ এবং আইন ও শৃঙ্খলা যোগান দেয়া।

---

১ দেখুন : *দি ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই অফ পাবলিক গুডস্।* বুকানান, জে.এম., র‍্যান্ড - ম্যাকন্যালি, শিকাগো (১৯৬৮)।

২.৯ উপরের চারটি বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে আরো কিছু বিষয়ও সরকারী হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন:

- *উন্নত তথ্য প্রাপ্যতা* -- এটি এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে উন্নত তথ্য রয়েছে এবং এই তথ্য প্রক্রিয়াজাত করার সামর্থ্য রয়েছে।

- *সমন্বিত উন্নয়ন থেকে আসা সমন্বিত শক্তি* – এই যুক্তিটি উন্নয়নের-জন্য-পরিকল্পনার যুগে জনপ্রিয় ছিল, এবং এখনও মাঝে মধ্যে রাষ্ট্র সমর্থিত শিল্পোন্নয়নের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে এটি ব্যবহৃত হয়। যুক্তি দেখানো হয় যে, একমাত্র রাষ্ট্রই পারে বাজারের বৃদ্ধি সম্পর্কে আগাম ধারণা দিতে এবং পারস্পরিক শক্তিবর্ধক বিনিয়োগ গুচ্ছ থেকে উঠে আসা খরচ কমাতে।

- *একটি ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী দৃষ্টি* – নিজস্ব উপায়ের ওপর নির্ভরশীল বেসরকারী পরিচালকরা স্বল্প-মেয়াদী লাভের জন্য অনেক সংকীর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন – যেমন অ-নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার মত বিষয়ের ওপর। কিন্তু জনস্বার্থে পরিচালিত সরকারকে একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

- *বেসরকারী খাতে সহায়তা অথবা এর কাজকর্ম সহজ করা* – এর মধ্যে আছে বেসরকারী খাতের কর্মকাণ্ড বাড়ানোর এবং সহজ করার জন্য কাজসমূহ।

- *কম খরচে অর্থ লভ্যতা* -- বেশির ভাগ রাষ্ট্রেরই ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম, এ কারণে অর্থ বাজারে তাদের অগ্রাধিকার রয়েছে -- যে সুবিধাটি তারা এসওইদের কাছে অন-লেন্ডিং এবং ঋণ নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে পারে।

কেইস সমীক্ষাসমূহ

২.১০ উপরোক্ত যুক্তির আলোকে নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও কর্মসূচি পরীক্ষা করে তৈরি সাতটি কেইস সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষাগুলো নয়টি সংস্থার ওপর পরিচালিত হয়েছিল: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, জাতীয় কারিকুলাম এবং টেক্সটবুক বোর্ড, বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন বোর্ড এবং দুঃস্থ গ্রুপ উন্নয়ন/ত্রাণ কর্মসূচি।

২.১১ *সড়ক পরিবহন* – এই কেইস সমীক্ষাটিতে সড়ক পরিবহন সার্ভিস, এবং এই খাতটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা করা হয়।

---

[২] বাজারের ব্যর্থতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে আছে: উৎপাদন খরচের নিম্নমুখিতা; ত্রুটিপূর্ণ বাজার কাঠামো (যা উৎপাদনকে সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ কাংক্ষিত মাত্রার নিচে বেঁধে রাখে); শূন্য প্রান্তিক খরচ (যদি সম্পদ সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ অনুকূল দাম নির্ধারণ অনুযায়ী বন্টন করতে হয়, তাহলে দাম হওয়া উচিত শূন্য, যা সরকারী বাণিজ্যিক যোগানকে বিবেচনার অযোগ্য করে দেবে); অ-বর্জনসহ (নন-এক্সক্লুশন) যুগ্মভাবে ভোগ করা; বহিঃস্থ বিষয়-আশয়; পর্যাপ্ত বাজার জ্ঞানের অভাব (যা যৌথ ঝুঁকি গ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে পারে); সম্পদের জড়তা; এবং সময়গত বন্টন বিবেচনাসমূহ (প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ)।

২.১২ *(১) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)* – এই সংস্থাটি বর্তমানে চারটি প্রধান শহরে প্রায় ১৫০টি বাস, এবং বাংলাদেশ সরকারের মালামাল পরিবহনের জন্য (যা বিআরটিসির জন্য একটি প্রাধিকারভিত্তিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে) সমান সংখ্যক ট্রাক পরিচালনা করে। বিআরটিসির আন্তঃজেলা সার্ভিস ১৯৯০ সালে স্থগিত করা হয়, কারণ এ এলাকাটিতে এখন একটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বেসরকারী খাত বর্তমান। অধিক দক্ষ বেসরকারী পরিচালকরা বিআরটিসির বাজার নাটকীয়ভাবে অনেকটা দখল করে নিয়েছে: ১৯৮০ সালে বিআরটিসির ভাগে ছিল ১০ শতাংশ বাস যাত্রী এবং ৭ শতাংশ সড়ক পথে পরিবাহিত পণ্য। যদিও ব্যবহারকারীদের জরিপ (প্রথম পরিচ্ছেদ) এরকম ধারণা দিয়েছিল যে বেসরকারী সার্ভিসগুলি বিআরটিসি থেকে তেমন উন্নত ছিলনা, দেখা যায় যে, বিআরটিসির সেবার মান অত্যন্ত খারাপ, এবং বেসরকারী খাতের তুলনায় এর ব্যয় কাঠামো অনেক উঁচু।[৩] বিআরটিসি বিশাল লোকসান দিয়ে এসেছে, যার ফলে এর চলতি দায়-দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২০ কোটি টাকায়। গত দুই বছরে, ছাঁটাই ও চালকদের কাছে বাস ইজারা দেয়ার কারণে বিআরটিসি এখন না লাভ-না ক্ষতির অবস্থানে পৌঁছতে শুরু করেছে, তবে পরিচালনা আয় পুঁজি পুনরুদ্ধার ব্যয়ের অনেক নিচে নেমে গেছে।[৪] নিম্নমানের ব্যবস্থাপনার জন্য এর মূলধন (ক্যাপিটাল স্টক) হ্রাস পেতে শুরু করেছে, এবং অপ্রতুল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যাপক চুরির জন্যও এতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিআরটিসির যানবাহনের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ সড়কে চলাচলযোগ্য। ভাড়া আদায়ে চুরি ইত্যাদির জন্য এবং দুঃস্থ মানুষজন ও ছাত্রদের বিশেষ ছাড় দেয়ার জন্য রাজস্ব আদায়ও ব্যাহত হয়েছে। বিআরটিসি জাতীয় জরুরী অবস্থার সময়ও সার্ভিস দিয়ে থাকে। তবে ভাড়ার ক্ষেত্রে দেয়া এসব ছাড় এবং বিশেষ সার্ভিসের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বাজেট ভুর্তকি দেয়া হয় না।

২.১৩ ১৯৬১ সালে বিআরটিসির গোড়াপত্তনের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে বাজার ব্যর্থতার যুক্তিটি ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু বেসরকারী সড়ক পরিবহন পরিচালকদের আধিপত্য এই যুক্তিটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। জনসেবার যুক্তিটিও ধোঁপে টেকেনা। দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে দেয়া সুনির্দিষ্ট ভর্তুকির মাধ্যমে যে কোনো সামাজিক বা ন্যায়নীতির উদ্দেশ্যটি পূরণ করা যেত – যেমন এ ধরনের ব্যক্তিদের ভাউচার ইস্যু করা যেত, যা তারা বেসরকারী সার্ভিস গ্রহণ করতে ব্যবহার করতে পারতেন। বিআরটিসিতে আর কোনো বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত করার প্রচেষ্টা তাই দৃঢ়ভাবে রুখতে হবে।

২.১৪ *(২) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)* -– এ সংস্থাটি ১৯৮৭ সালে সড়ক পরিবহন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থাপন করা হয়। এর অনেকগুলো কাজের মধ্যে আছে: সড়ক নিরাপত্তা এবং যানচলাচল শৃঙ্খলা বিধান; পাবলিক সার্ভিস পরিচালকদের রুট পারমিট ইস্যু করা; লাইসেন্স প্রদান এবং যানবাহনের নিবন্ধন ; যানবাহন পরিদর্শন ও যানবাহন থেকে ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ; এবং যাত্রী ভাড়া, সড়ক পরিবাহিত মালামালের ট্যারিফ এবং সড়ক ব্যবহারকারী চার্জ অনুমোদন। বিআরটিএ নিবন্ধন, লাইসেন্স এবং অন্যান্য ফি বাবদ ৫০ কোটি টাকা আয় করে। তবে সড়ক নিরাপত্তা বিধান, যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমনে পরিবেশগত নিরাপত্তার মান বজায় রাখা এবং ট্রাক ও বাসে মালামাল যাত্রী বোঝাই রোধের ক্ষেত্রে এই সংস্থার কার্যসম্পাদনা নিম্নমানের। অবশ্য এই প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগের দায়িত্ব অন্যান্য সংস্থার হাতে ন্যস্ত, এবং পুলিশের সাথে এসব ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট দায়িত্ব বন্টনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যান্য দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি হল যানবাহন নিবন্ধন পদ্ধতি

---

৩ একটি হিসাব মতে বেসরকারী খাতের তুলনায় বিআরটিসি বাস পরিচালনা খরচ ৬৫ শতাংশ এবং ট্রাক পরিচালনা খরচ ২২ শতাংশ বেশি। এতে প্রতিফলিত হয়েছে উচ্চতর জ্বালানী, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মী ব্যয় (৩,০০০ কর্মী ৩০০ যানবাহন পরিচালনা করেন)। দেখুন : *বাংলাদেশ পরিবহন খাত সমীক্ষা।*

৪ কার্যসম্পাদনায় সাম্প্রতিক উন্নতির যে চিত্র তুলে ধরে তা হল: ১,৫০০ কর্মী ছাঁটাই এবং এমন একটি পদ্ধতির প্রবর্তন যার অধীনে যানবাহনগুলিকে তাদের চালকদের কাছে ইজারা দেয়া হয়।

(যা নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে, যদিও কম্প্যুটার মুদ্রিত দলিলপত্রের মত কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্প্রতি কিছু উন্নতি হয়েছে) এবং ভুয়া লাইসেন্সের ব্যাপক ব্যবহার বন্ধ করতে সংস্থাটির ব্যর্থতা।

২.১৫ বিআরটিএর হস্তক্ষেপের দুটি যৌক্তিকতা রয়েছে: বেসরকারী খাতের সহায়তা (লাইসেন্স প্রদান) এবং জনস্বার্থ (সড়ক নিরাপত্তা, দুষণ নিয়ন্ত্রণ)। এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলি হল, সংস্থাটি এর সকল বর্তমান কর্মকান্ডে জড়িত থাকবে কিনা, এবং এর কর্মকান্ডের 'বোঁচকা খোলার' পর কিছু কাজকর্ম চুক্তি-ভিত্তিক অন্যদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ আছে কিনা। বিআরটিএ'র যাত্রী ভাড়া ও চার্জসমূহ নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে জোরালো যুক্তি রয়েছে। অন্যান্য কর্মকাণ্ড, যেমন–– যানবাহনের ধোঁয়া নির্গমন পরীক্ষা – সার্টিফিকেটধারী বেসরকারী সংস্থার কাছে ছেড়ে দেয়া যায় (যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অংশে আছে)। একটি ক্ষুদ্রতর, সুসংহত বিআরটিএ তার পরিদর্শক/তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে। একটি উদ্ভাবনী উপায় হতে পারে নাগরিকদের দল এবং এনজিওসমূহকে বিআরটিএ'র পক্ষে বিধিবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে জড়িত করা (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)।

২.১৬ *নৌ পরিবহন* – এই কেইস সমীক্ষায় একটি সরকারী সংস্থা, যা একটি নৌ বহর পরিচালনা করে, এবং অন্য একটি সংস্থা, যা নৌ পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে – এ উভয়ের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.১৭ (১) *বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)* – এ সংস্থাটি ১৯৭২ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এটি এক সময়ের পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন এবং দেশের ৩,৮০০ কি.মি. দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নৌ পথে পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনাকারী নয়টি পরিত্যক্ত বেসরকারী উদ্যোক্তার একত্রিত রূপ। এ সংস্থাটির বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ করার কথা, তবে জনস্বার্থের প্রতি 'যথাযথ সম্মান' দেখিয়ে – এবং জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মেনে নিয়ে। এর অনেকগুলি সমস্যার সূত্রপাত বিআইডব্লিউটিসিএ'র জনসেবামূলক এবং ব্যবসায়ী ভূমিকার অস্পষ্টতা থেকে উদ্ভূত। এ সংস্হার কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন এবং ফেরি সার্ভিস, ডকইয়ার্ড ও মেরামত সুবিধাদি। নৌবহরটি পুরোনো (যার ফলে জ্বালানীর খরচ বাড়ে) এবং অবস্থা খুবই খারাপ : মাত্র ২৮৩ টি যান চলাচলযোগ্য, যা মোট বহরের মাত্র অর্ধেক। এ সংস্থাটির লোকবল অতিরিক্ত – ৪,৯০০ লোক এতে কাজ করে –কিন্তু চলাচলরত যানের সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকবল কমেনি।[৫] ১৯৯২/৯৩ তে বিআইডব্লিউটিসি-র নীট লোকসান ছিল ১০ কোটি টাকা। ফেরি সার্ভিস – যার একচেটিয়া আধিপত্য এই সংস্থার – থেকে প্রাপ্ত লাভ অন্যান্য ক্ষেত্রে লোকসানের মধ্যে চলে গেছে, যেমন উপকূলীয় সার্ভিসে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

২.১৮ জনস্বার্থের যুক্তিটি স্বাধীনতার পর কিছুকাল হয়তো প্রযোজ্য ছিল, কারণ তখন জল পরিবহন ক্ষেত্রে ছিল অরাজকতা। কিন্তু গত দু'দশকে বেসরকারী খাতের পরিচালনা উন্নত হওয়ায় এই যুক্তিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, কারণ রাষ্ট্রীয় সংস্থাটির বাজারের হিস্যা এখন ৫ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। শুধুমাত্র দক্ষিণ ও উপকূলীয় জেলাগুলোর ক্ষেত্রে – যেগুলো নৌ পরিবহনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল – এই যুক্তিটি দেয়া যায় যে বাজারের ব্যর্থতার প্রমান রয়ে গেছে। কিন্তু এই রুটগুলিতেও বেসরকারী পরিচালকদের ভর্তুকি দেয়া হলে তা খরচ সাশ্রয়ী হবে। অন্যান্য সার্ভিস, যেমন জ্বালানী তেলের ট্যাংকার সার্ভিস এবং অভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মালামাল পরিবহন

---

[৫] এই সংখ্যাগুলি ১৯৯৩ এর। ১৯৮৭ সালে ৬,১২৭ জন কর্মী ৪৮৫ টি নৌযান পরিচালনা করছিল ; কিন্তু বহরের সংগঠনে এর পর আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি।

80314
CONFINED
গ্রন্থাগার
... সন প্রশিক্ষণ কে

হয় বেসরকারীকরণ করা উচিত অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নিয়ে আসা উচিত।[৬] সবশেষে, জাতীয় জরুরী অবস্থায় সংস্থাটির ভূমিকার যৌক্তিকতা আর প্রযোজ্য হবে না এ জন্য যে বেসরকারী নৌযান চার্টার করার সম্ভাবনা বর্তমান।

২.১৯ *(২) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)* --- এই সংস্থাটির কাজ হচ্ছে দশ লক্ষের মত নৌযানের নিরাপদ চলাচল[৭] সহজ করার জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথ উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করা। সংস্থাটি বেশ কটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যার কিছু নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত, এবং কিছু নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত (যেমন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ, নৌযান নক্সা অনুমোদন এবং প্রত্যয়ন)। কিছু কর্মকাণ্ড জাহাজ চলাচল বিভাগের কর্মকাণ্ডের সংগে মিলে যায়, বিশেষ করে নৌযান নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, যা মূলতঃ জাহাজ চলাচল বিভাগের দায়িত্ব।[৮] বিআইডব্লিউটিএ ফি ও চার্জসমূহ থেকে যথেষ্ট রাজস্ব আয় করে (২০ কোটি টাকার বেশি) কিন্তু এর পরিচালনায় বাজেট স্থানান্তরের মাধ্যমে এখনও ভর্তুকি দেয়া হয়। বিরাট সংখ্যক ফেরি ও লঞ্চ দুর্ঘটনার ফলে বিআইডব্লিউটিএ এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া নৌচলাচল খাত বা চ্যানেলগুলির রক্ষণাবেক্ষণেও এই সংস্থা গাফিলতি দেখিয়েছে।

২.২০ জনস্বার্থের যুক্তিটি বিআইডব্লিউএর কোনো কোনো কাজে প্রয়োগ করা যায় (যেমন নদী সংরক্ষণ)। অনেক এলাকাতে এই নৌপথগুলিই বাইরের পৃথিবীর সংগে যোগাযোগের একমাত্র উপায়, যদিও 'ফ্রি-রাইডার' সমস্যার জন্য এসব সেবা সংগঠিত করা দুরূহ হবে।[৯] অবশ্য এ সংস্থার কোনো কোনো কর্মকাণ্ড (যেমন ফেরি ও টার্মিনাল পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ) বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া যায়, অথবা ফ্র্যাঞ্চাইজ ব্যবস্থার অধীনে অন্য কাউকে দেয়া যায়।

২.২১ *বাংলাদেশ বিমান* --- বিমান ভ্রমণের চাহিদা প্রচন্ড ভাবে বেড়ে যাওয়ায় জাতীয় বিমান সংস্থাটি সম্প্রতি এর পরিচালনায় মুনাফা অর্জন করছে। এর ফলে মনে হচ্ছে বিমানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকার আশাবাদী ধারণা গ্রহণ করেছেন, যদিও সংস্থাটি এর মূলধন ব্যয় মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সংস্থাটির প্রতিযোগিতামূলক কার্যসম্পাদনার দাবী, বিশেষ করে পতাকাবাহী হিসেবে যেসব সুযোগ সুবিধা এটি পাচ্ছে, তার আলোকে দেখলে – নিশ্চিতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। সংস্থাটিকে বাজেট থেকে বিরাট মূলধন-সাহায্য দেয়া

----

[৬] নৌ পরিবহন মন্ত্রী সংসদকে জানান যে, বিআইডব্লিউটিসি-কে বেসরকারীকরণের কোনো পরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকারের নেই। দেখুন : *দি ডেইলী স্টার*, জুন ২৭শ ১৯৯৫, পৃঃ ৬।

[৭] এ সংস্থার পুর্বসূরী, অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, ১৯৫৮ সালে স্থাপিত হয়। বিআইডব্লিউটিএর বিবিধ কর্মকান্ডের মধ্যে আছে : নদী সংরক্ষণ, ড্রেজিং, নৌচলাচল সহায়ক উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ ও চার্টিং এবং পাইলটেজ জরিপ ; অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর এবং টার্মিনাল সুবিধাদি পরিচালনা; ভাড়া এবং সময়সূচি অনুমোদন; গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ; এবং দেশী নৌকার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিকায়নের প্রকল্প উন্নয়ন।

[৮] জাহাজ চলাচল বিভাগের অধীনে প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন স্থাপিত হলে এর হাতে নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড ন্যস্ত হবে, এবং তাতে এই অধিক্রমন কমে আসবে।

[৯] ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত দুটি বেসরকারী কোম্পানী (রিভার স্টীম নেভিগেশন এবং ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন) নদী সংরক্ষণ কাজ চালিয়ে গেছে এবং তাদের বাণিজ্যিক সার্ভিসের নির্ঝঞ্ঝাট পরিচালনার জন্য টার্মিনাল ও অন্যান্য সহযোগী সুবিধাদির উন্নয়ন করেছে।

হচ্ছে (ইকুইটি হস্তান্তর), যদিও এর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সার্ভিস নিয়ে যাত্রীদের ব্যাপক অসন্তোষ রয়েছে। বিমানের ব্যবস্থাপনা দুর্বল, এটির লোকবল অতিরিক্ত, এটি অব-মূলধনকৃত (আন্ডার ক্যাপিটালাইজড);[১০] এবং এর দৈনন্দিন পরিচালনা অতিরিক্ত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার। এটি স্পষ্ট হয় যখন বিমানের কার্যসম্পাদনা অনেক বেশি দক্ষ কোনো বিমান সংস্থা, যেমন – সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনের (এসআইএ) সাথে তুলনা করা হয়। যদিও বিমানের আয়ের অনুপাত এবং লোড-ফ্যাক্টর অনেক দক্ষ বিমান সংস্থার সংগে তুলনীয়, কিন্তু এর কর্মী ও ব্যয় অনুপাত তুলনায় খুবই খারাপ। উদাহরণস্বরূপ, বিমানের নন-ফ্লাইং কর্মচারীর সংখ্যা অনেক বেশি – ৫,২২৩ – যেখানে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনের এই সংখ্যা ৪,০৪৭, যদিও এর হাওয়াই জাহাজের সংখ্যা প্রায় দশগুণ বেশি। বিমানের জাহাজ প্রতি ককপিট ক্রু সংখ্যা ২২, সেখানে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনের ১৫। উৎপাদনশীলতার বিচারে, যা কর্মীপ্রতি টন কিলোমিটার পারফর্মড (টিকেপি) হিসেবে ধরা হয়, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন বিমান থেকে প্রায় দশগুণ বেশি উৎপাদনশীল।[১১] তাছাড়া টিকেপি প্রতি বিমানের পরিচালনা ব্যয়ও বিস্ময়কর, যা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন থেকে প্রায় ৩০% বেশি, যদিও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনের তুলনায় এর কর্মী বেতন ব্যয় অর্ধেকের কম হওয়া উচিত। এমনকি, বিমানের কার্যসম্পাদনা যখন এশিয়ার অন্যান্য বিমান সংস্থার সংগে তুলনা করা হয়, তখনও এর অবস্থান থাকে নিচের দিকে। ব্যবস্থাপনা জোরদার করার কর্মসূচিগুলির ফলে সমস্যার কিছু সুরাহা হয়েছে, কিন্তু কর্মী ব্যবস্থাপনায় যে মূখ্য পরিবর্তনগুলি প্রয়োজন ছিল, সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিসে এটি কখনো প্রতিযোগিতামূলক চাপের মধ্যে পড়েনি, যা এই সংস্থার ধীরগতির বৃদ্ধির আংশিক কারণও বটে। জাতীয় পতাকাবাহী হওয়ার জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) একে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।[১২] বেসরকারী খাতের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরুর অনুমতি প্রদানের সিএএবি'র সম্প্রতিক পদক্ষেপ বেশিদূর যায়নি। আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিমানকে তার 'প্রত্যাখ্যানের অধিকার' এর মাধ্যমে সংরক্ষণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এতে নিম্নমান (সময়ানুবর্তিতা) এবং সেবার উচ্চ মূল্যের জন্য রপ্তানির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

২.২২ বিমানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের যুক্তি এখন আর প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়। বিমান যেসব কৌশলগত সেবা দিচ্ছে, যেমন উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের অথবা বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীকে বহন করা, সেগুলো সহজেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা সম্ভব হত। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় সামরিক কাজে কোনো বাণিজ্যিক বিমান ব্যবহারের সম্ভাবনা দূরবর্তী হওয়ায়, সীমিত আকাশসীমার এই দেশে

---

[১০] বিমানের মোট অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ৮৩০ কোটি টাকা। বিমানকে দেয়া বাংলাদেশ সরকারের ঋণের পরিমাণ ৩৮০ কোটি টাকা।

[১১] বিমান ও অন্যান্য বিমান সংস্থার মধ্যে অন্যান্য অনুপাতের কিছু তুলনা দেয়া হল :

	বিমান	এসআইএ	পিআইএ	থাই	শিল্পের গড়
কর্মীপ্রতি টিকেপি (০০০)	৪৮	৪৮৪	৬৪	১৪৬	১৫৭
উড্ডীন কর্মীপ্রতি টিকেপি (০০০)	৪০৭	৯৫৪	৫৭৭	৮২২	৬৫৫
কর্মীপ্রতি যাত্রী	১৭৬	৬৮১	২৭৪	৪৪৩	৬৭৭
জাহাজের উড়াল ঘন্টা/কর্মী	৪.৩৭	১৭.৪৫	৬.২৪	৮.৫৭	১৬.৮৯
টিকেপি প্রতি পরিচালনা ব্যয়	$০.৬৩	$০.৪৯	$০.৫৭	$০.৭০	$০.৯১

[১২] বর্তমানে বহু রুটে কার্যকর দ্বিপাক্ষিক "বিমান সার্ভিস চুক্তি" অনুযায়ী কিছু সুবিধা (ট্রাফিক/অবতরণ অধিকার) যথেষ্ট জাতীয় মালিকানার "ক্ষমতাপ্রাপ্ত" বা ডেজিগনেটেড বিমান সংস্থাকে দেয়া হয়। প্রতিযোগিতার পথে এ ধরনের বাধা অবশ্য ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। তাছাড়া, এ ধরনের সুবিধাদির অধিকার নিলামের মাধ্যমে দেয়া যায়।

বিমানের রাষ্ট্রীয় মালিকানার চাহিদা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যদিও স্বাধীনতার পর অন্ততঃ এক দশকের জন্য অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল – বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ খাতের ক্ষেত্রে, যেখানে সীমিত চাহিদা ও বিশাল বিনিয়োগ বেসরকারী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করেছে – বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাজারের ব্যর্থতার পক্ষে যুক্তিসমূহ আর প্রযোজ্য নয়। অনেকগুলি বিদেশী বিমান সংস্থা দেশটিতে আন্তর্জাতিক সার্ভিস দিচ্ছে। একটি বেসরকারী বিমান সংস্থা ইতিমধ্যে বাজারে ঢুকেছে এবং অন্যদেরও অনুসরণ করার সম্ভাবনা আছে। সরকারী তহবিল বিমানকে না দিয়ে অথবা ঋণ নিশ্চয়তা বিধানে না ঢেলে আরো বেশি অর্থবহভাবে এমন সব সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করা যেত যেখানে প্রয়োজন অনেক বেশি।

২.২৩ *দুঃস্থ জনগোষ্ঠী উন্নয়ন/ত্রাণ কর্মসূচিসমূহ (ভিজিডি)*: এগুলো হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্রের আয়-উৎপাদন সুবিধাদি উন্নত করে দারিদ্রের অভিঘাত হ্রাস করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার মূল উপাদান।[১৩] শুধুমাত্র গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের জন্য পরিচালিত ভিজিডি কর্মসূচির অধীনে এখন প্রায় ৫ লক্ষ মহিলাকে প্রতিমাসে দান হিসেবে গম বা চাল দেয়া হয়, এবং উন্নয়ন প্যাকেজে (দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহ) লাভের পথ সুগম করা হয়। ভিজিডি কর্মসূচির মোট ব্যয় প্রায় ৩২০ কোটি টাকা (অর্থ বছর ৯৫)। দুঃস্থ মানুষজনের কাছে সম্পদ সরবরাহে বাংলাদেশ সরকারের কর্মসূচি সমূহের তুলনামূলক অদক্ষতার উপর যেসব সমীক্ষা পাওয়া যায়, সেগুলোর ভিত্তিতে ভিজিডি কর্মসূচিকে গ্রামীণ রেশন পদ্ধতির পছন্দসই একটি উপায় বলেই প্রতীয়মান হয়, যদিও এনজিওসমূহের কার্যসম্পাদনার সংগে এর অপচয় বা চুরি ইত্যাদির মাত্রা তুলনা করা প্রয়োজন।[১৪]

২.২৪ দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি জড়িত হওয়ার পক্ষে যে ন্যায়নীতি/সামাজিক যৌক্তিকতা রয়েছে এই কর্মসূচিটি খুব সহজেই তা পূরণ করে। দারিদ্র সমস্যার ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সরাসরি সমর্থন প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যখন স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ এবং এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করবে, তখন সরকারের সরাসরি অংশগ্রহণ কমিয়ে আনা যাবে। তবে স্বল্প মেয়াদে যা করণীয়, তা হল উন্নততর প্রত্যবেক্ষণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং যারা সুবিধা পাবে তাদের নির্বাচনে এবং খাদ্য বিতরণে স্বচ্ছতা আনয়নের মধ্য দিয়ে এ ক্ষেত্রে যেসব সরকারী সংস্থা কাজ করছে তাদের খরচ সাশ্রয়তা জোরদার করা (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

২.২৫ *বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড* (বিআরডিবি) -– এটি পল্লী উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে কর্মরত সর্ববৃহৎ সরকারী সংস্থা।[১৫] সমবায় সমিতি এবং আনুষ্ঠানিক গ্রুপ নেটওয়ার্কসমূহ ব্যবহার করে বিআরডিবি ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং বিপণন কর্মসূচির মাধ্যমে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে টেকসই আয়-উৎপাদন সুযোগ তৈরি করতে প্রয়াস পেয়েছে। এ সংস্থা স্থানীয় কৃষকদের সমবায় সমিতি (কেএসএস) ও মহিলা সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এসব সংস্থার মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ, যার তিন চতুর্থাংশ হচ্ছে কৃষি সমবায়

---

[১৩] ভিজিডি হচ্ছে দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংস্থান কর্মসূচির উত্তরসুরি, যা গ্রামীণ দরিদ্রের তাৎক্ষণিক খাদ্য গ্রহণ চাহিদা মেটাতে চালু করা হয়েছিল।

[১৪] বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির খরচ সাশ্রয়তার সাম্প্রতিক একটি পর্যালোচনার জন্য দেখুন: *অপশনন ফর টার্গেটিং ফুড ইন্টারভেনশনস ইন বাংলাদেশ*, ইউএসএইড, ঢাকা *(১৯৯৪)*। আরো দেখুন: *ভিজিডি বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯২/৯৩*, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ঢাকা *(১৯৯৫)*।

[১৫] বিআরডিবির শিকড় সন্ধান করা যায় ১৯৬০ এর দশকে আখতার হামিদ খান কর্তৃক উদ্ভাবিত সাফল্যজনক সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়নের কুমিল্লা মডেলে, যা ছিল ১৯৭২ সালের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির (আইআরডিপি) ভিত্তি। ১৯৮২ সালে আইআরডিপি'কে বিআরডিবি হিসেবে স্থায়ী করে নেয়া হয়।

সমিতির। বিআরডিবি কিছু কর্মসূচি (যেমন কানাডীয় সিডার অর্থানুকূল্যে আরডি-১২) যদিও গ্রামীণ ব্যাংকের মতই সফল হয়েছে, এর সার্বিক আর্থিক কার্যসম্পাদনা কিন্তু হত্যাশাব্যঞ্জক, এবং এর প্রভাব নিয়েও সন্দেহ রয়ে গেছে। ১৯৯২ সালের শেষে বিআরডিবি-তে মোট পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৩৩০ কোটি টাকা, এবং অপরিশোধিত ঋণ ছিল ৮৬০ কোটি টাকা: ঋণ পুনরুদ্ধার হার (১৯৯১/৯২) ছিল শস্য ঋণের ক্ষেত্রে প্রায় ৭৭ শতাংশ এবং উপকরণ ঋণের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ।

২.২৬ বিআরডিবি'র ক্ষেত্রে সরাসরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পেছনে ন্যায়নীতি/সামাজিক যৌক্তিকতা এখন আর প্রযোজ্য নয়, কারণ গত এক দশকে এনজিও খাতে নাটকীয় বৃদ্ধি ঘটেছে এবং এনজিওগুলি একই ধরনের সেবা দিচ্ছে। সামাজিক যৌক্তিকতার পক্ষে যেহেতু শক্তিশালী কোনো প্রমাণাদি নেই, এসব কাজ এখন গ্রামীণ ব্যাংক, এনজিওসমূহ এবং বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। বিআরডিবি'র ঋণ সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড দারিদ্র ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে জোরেসোরে চিন্তাভাবনা করতে হবে। পিকেএসএফ কে সফল ব্যষ্টিক ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারী তহবিল যোগানোর লক্ষ্যে শীর্ষ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যায়। একটি ক্ষুদ্রকায় বিআরডিবি (সম্ভব হলে সুসংহত সমবায় দপ্তরের সাথে সমন্বিত – ঘর ২.১ দেখুন) তখন সমবায় সংস্থাগুলির হিসাব নিরীক্ষা ও কর্মকাণ্ড প্রত্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

২.২৭ *বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন* (বিপিসি) – পেট্রোলিয়াম আমদানী ও বিতরণে একচেটিয়া অধিকার ভোগকারী এই সংস্থাটি মাত্র কয়েকটি লাভজনক এসওই-র অন্যতম। ১৯৯৪/৯৫ তে এ সংস্থা ২২০ কোটি টাকা মুনাফা আয় করে। তবে এই মুনাফা এর কার্যসম্পাদনার দক্ষতা থেকে নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত দাম নির্ধারণ কাঠামোর কারণে অর্জিত হয়েছে। বিপিসি আমদানীর ব্যবস্থা করে, অভ্যন্তরীণ পরিবহনের জন্য উপকূলীয় ট্যাংকার ভাড়া করে এবং খুচরা ডিলারশীপ অনুমোদন করে। এরকম একটি ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, শুধু একটি একচেটিয়া সরবরাহকারীই ট্যাংকার ভাড়া করা এবং পেট্রোল পাম্পের লাইসেন্স দেয়ার ফলে দুর্নীতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার আগে এ সমস্ত কর্মকাণ্ড বেসরকারী খাতেই ছিল।[১৬] ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে সরকার পেট্রোলিয়াম আমদানী বেসরকারী খাতের কাছে উন্মুক্ত করেন, কিন্তু এই উদারকরণ নীতি শেষ পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী হয়ে দাঁড়ায় এবং ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রত্যাহার করা হয়।[১৭] এই সময়কালে, একটি বেসরকারী ফার্ম একটি ট্যাংকার ভর্তি পেট্রোলিয়াম সামগ্রী আমদানী করে। এই হঠাৎ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের পক্ষে কোনো যুক্তি দেয়া হয়নি। একটি মাত্র সম্ভাব্য কারণ হতে পারে এই যে, সরকারী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের দুর্বল জবাবদিহিতামূলক কার্যক্রম থেকে যে কায়েমি স্বার্থ লাভবান হচ্ছিল, তারা পেছন থেকে ছুরি চালিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারী ও বেসরকারী হিসাব নিরীক্ষকরা যেন একটি নিয়ম হিসেবেই বিপিসির অব্যাখ্যাত সামুদ্রিক এবং অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন ক্ষতির অংকটি স্বীকার করে নিয়েছেন, যা ভল্যুমেট্রিক পরিমাণের ০.৫-০.৬ শতাংশ। অথচ এ নিয়ে বিপিসি কখনো কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। ব্যাপার দাঁড়িয়েছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকসান এই সংখ্যার নিচে থাকবে, বিপিসি-কে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। তুলনায় ঐ বেসরকারী আমদানীকারক যে পরিমাণ সামগ্রী প্রকৃতপক্ষে জোগাড় করেছিল, তার থেকে বেশি ভল্যুমেট্রিক পরিমাণের (২.২%) সামগ্রী বিক্রি করে – কারণ যে বন্দরে বোঝাই করা হয়েছিল এবং যে বন্দরে খালাস করা হয়েছিল,

---

[১৬] ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সরকার পেট্রোলিয়াম খাত রাষ্ট্রায়ত্ত করার আগে, চট্টগ্রামে একটি রিফাইনারী, এবং পাঁচটি মার্কেটিং কোম্পানী ছিল, সেগুলো সব বেসরকারী খাতেই ছিল। এসব কোম্পানীর একটি সংগঠন ছিল যার নাম ওয়েল কোম্পানীজ এডভাইজরি কমিটি, যা সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ ওয়েল অপারেশনস-এর সংগে আলোচনা করে দেশের পেট্রোলিয়াম চাহিদা নির্ধারণ করত। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব ছিল কার্টেলসমূহ যাতে কৃত্রিমভাবে তেলের দাম না বাড়াতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য দাম এবং মজুতের পরিমাণ তত্ত্বাবধান করা।

[১৭] বিদ্যমান আমদানী নীতির (এসআরও নং ৯৬-ল'৯৪) অধীনে "বেসরকারী খাতে আমদানীর ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনগত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সরকার বা সরকারের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিতে হবে"।

তাদের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে আমদানীর পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। বিপিসি শিপমেন্টগুলিতেও নিশ্চয় এ ধরনের ভল্যুমেট্রিক বৃদ্ধি ঘটে; এবং যদি তা হয়, তবে প্রায় ১ কোটি ডলারের কোনো হিসেব নেই।

২.২৮ বিপিসি'র দেয়া বাজেটগত অবদান এর একচেটিয়া অধিকার যুক্তিযুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়, যেহেতু বেসরকারী খাতে কর ফাঁকি দেয়ার একটা সম্ভাবনা রয়ে যায়। তবে এই খাতে যে ক্ষুদ্র সংখ্যক বেসরকারী পরিচালক জড়িত হতে পারে তাদের মুনাফা প্রত্যবেক্ষণ করার আপেক্ষিক সহজতা এবং বিতরণ কার্যক্রমের তুলনামূলক সরাসরি চরিত্র এই যুক্তিকে ভ্রান্ত প্রতীয়মান করে। তবে কোনোভাবেই কর পদ্ধতির অদক্ষতাকে পেট্রোলিয়াম বিতরণের অদক্ষতা যুক্তিযুক্ত করতে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। সরকারী খাতের হস্তক্ষেপের কোনো সাধারণ যুক্তিই আসলে এখানে বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়না। বস্তুত বেসরকারী ফার্মসমূহের একটি কার্টেল ইচ্ছেমত মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে বাজার-ব্যর্থতা সৃষ্টি করতে পারে ঠিকই, কিন্তু এ রকম ঝুঁকি খুব সহজেই কর প্রশাসন বা জ্বালানী মন্ত্রণালয় করের পার্থক্য প্রত্যবেক্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে পারে, কারণ পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর আন্তর্জাতিক মূল্যের তালিকা খুব সহজেই পাওয়া যায়। এই খাতে প্রবেশ করার সামর্থ্য এবং আগ্রহ আছে এ ধরনের বেসরকারী ফার্মের সংখ্যা কম নয়, এবং তারা বাজারে ঢুকতে পারলে বিপিসি'র একচেটিয়া অধিকারের অবসান হবে, এবং এর তুলনামূলক অদক্ষতা রোধের একটি মূল্যবান উপায় সৃষ্টি হবে।

২.২৯ *জাতীয় কারিকুলাম ও স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড* (এনসিটিবি) -- এ সংস্থাটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুল টেক্সট বোর্ড (১৯54 সালে প্রতিষ্ঠিত) এবং জাতীয় কারিকুলাম উন্নয়ন কেন্দ্রের (১৯৭৮) একত্রীকরণের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপিত হয়। এনসিটিবি পাঠক্রম উন্নয়ন এবং প্রতিবছর প্রায় ৮ কোটি মৌলিক পাঠ্যবই মুদ্রণ এবং বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। পাঠ্যবই উৎপাদন এনসিটিবি-র তত্ত্বাবধানে তালিকাভুক্ত বেসরকারী খাতের ছাপাখানা ও মুদ্রণ কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এনসিটিবি পাঠ্যপুস্তকের জন্য পরিবহন ও কাগজের (যা বাইরের দাতারা বিনামূল্যে সরবরাহ করেন) ব্যবস্থা করে এবং প্রকৃত ব্যয়ের সামান্য বেশি দামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে বিক্রি করে। এর ফলে এসব পাঠ্যপুস্তক অতিরিক্ত পরিমাণে মুদ্রণ ও বিতরণের জন্য এনসিটিবি-র অন্তর্নিহিত একটি আগ্রহ রয়ে যায়।[১৮] মুদ্রণ খরচ প্রতি বছর মুদ্রণকারীদের সমিতি বা প্রিন্টার্স এসোসিয়েশনের সংগে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হয়। আইডিএ'র অর্থানুকূল্যে গৃহীত একটি প্রকল্পের (সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প-১) সংগে সহযোগিতাক্রমে ১৯৯4 সাল থেকে একটি উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হয়।

২.৩০ এনসিটিবি'র জড়িত হওয়ার যৌক্তিকতাটি জনস্বার্থের বিবেচনাতেই করা হচ্ছে। একটি অভিন্ন পাঠক্রমের ওপর ভিত্তি করে রচিত পুস্তক সময় মত যাতে বাজারে চলে আসে এটি নিশ্চিত করা ঐ যৌক্তিকতার ভিত্তি। ১৯৯৫ সালে এক্ষেত্রে যে বিলম্ব হয়, তা থেকে এটা নিশ্চিত যে এনসিটিবি'র কার্যপরিচালকদের দক্ষতাকে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেয়া যায়না। বর্তমান পদ্ধতিটিতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে (ব্যয়ের হার নির্ধারণ, মুদ্রণকারীদের তালিকাভুক্তকরণ এবং ফরমাশমত বিতরণ), এবং প্রকৃত খরচ থেকে সামান্য বেশি দাম নির্ধারণ আসলে অদক্ষতাকেই আড়াল করে। অতিরিক্ত বই মজুত রাখতে গিয়ে বিশাল মজুত খরচ সৃষ্টি হচ্ছে। পাঠক্রম উন্নয়ন স্পষ্টতঃই "জনসেবাসামগ্রী"তে পড়ে, তবে বিরাট সংখ্যক বেসরকারী মুদ্রণকারী এবং সারা দেশের বইয়ের দোকানমালিকদের অভিমত হচ্ছে যে, পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন, মজুত এবং বিতরণে এনসিটিবি বা বাংলাদেশ সরকারের সরাসরি জড়িত হওয়ার কোনো অকাট্য যুক্তি নেই।

---

[১৮] ১৯৯4 সালে এনসিটিবি প্রায় ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মুনাফা করে, যেখানে পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণে বাংলাদেশ সরকারের মোট ব্যয় ছিল ৩৩ কোটি টাকা।

২.৩১ *রাষ্ট্রমালিকানার প্রতিষ্ঠান* (এসওই) *সমূহ* -- যদিও এই প্রতিবেদনে ১৫৫টি এসওই'র প্রতিটির যৌক্তিকতা পদ্ধতিগতভাবে নিরীক্ষা করা হয়নি, তবুও একথাটি প্রত্যয় নিয়েই বলা যায় যে, এগুলোর প্রায় কোনোটিরই রাষ্ট্রীয় খাতে থাকার যোগ্যতা নেই। এসওই খাতটি হচ্ছে অদক্ষ হস্তক্ষেপের উচ্চমূল্যের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সরকারী খাতের এই লোকসানের এক বিশাল সুবিধা ব্যয় রয়ে গেছে (ঘর ১.১)। এই অর্থ আরো ভালভাবে রাস্তাঘাট ও পুল তৈরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যেত।

২.৩২ এই কেইস সমীক্ষাগুলি বিভিন্ন উপ-খাত বা কর্মসূচির বিস্তারিত নিরীক্ষার বিকল্প নয়। প্রতিটি কর্মসূচি যদিও তার নিজস্ব যৌক্তিকতা নিয়ে শুরু হয়, যেখানে একটি অনুভূত চাহিদা মোকাবেলায় সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে, তবুও কোনো সংস্থাকেই তাদের বর্তমান অবস্থায় টিকিয়ে রাখার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই। এর কয়েকটি তাদের মূল যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, এবং অন্যগুলির জন্য যৌক্তিকতার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই, হস্তক্ষেপের বর্তমান রূপ সমর্থনযোগ্য নয়।

সরকারকে সঠিক আকৃতিতে আনা: পরিবর্তনের পক্ষে প্রচার ও ব্যবস্থাপনা

২.৩৩ এ বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রকে বিচিত্র ও বিশালসংখ্যক সেবার সমাহার ঘটাতে হবে। কিন্তু সরকার বড় হলে কাজ ভাল হবে এরকম একটি সাধারণ বিশ্বাস বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি। এটি যেমন বাংলাদেশে হয়নি, তেমনি হয়নি বেশির ভাগ দেশে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সবচেয়ে সাধারণ অর্থনৈতিক যুক্তিটি কিন্তু একটি নেতিবাচক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা হচ্ছে বাজার ব্যর্থতার ধারণা। বাজার ব্যর্থ হতেই পারে এবং হয়ও, কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, সরকারী খাতের সরবরাহ ব্যবস্থা সাধারণত প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যের অনেক পেছনে রয়ে গেছে। বাজার নিখুঁত ভাবে কাজ না করলেও, বাজার ব্যর্থতার সমাধান হিসেবে সরকারী খাতের ব্যবহার সাধারণত ব্যয়বহুল হয়েছে, এবং সুবিধার বিপরীতে ঝুঁকি গেছে বেড়ে। বাজারের ওপর নির্ভর করার পক্ষে একটি প্রত্যয়ধর্মী যুক্তি হচ্ছে এই যে বাজার কিভাবে কাজ করে, তার সহজ ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু লোক প্রশাসন পরিচালনা করে যেসব শক্তি তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সে উপলব্ধিটি খুবই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সরকারী সংস্থাগুলিতে উন্নত কার্যসম্পাদনা উৎসাহিত করার ব্যবস্থা এবং ঐ কার্যসম্পাদনার নিবিড় এবং ক্রমাগত তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও সরকারের ব্যর্থতার উচ্চ ঝুঁকি রয়ে যায়, এ বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে হবে। এ ছাড়া, বাজারের ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের যে ওলটপালট প্রভাব পড়ে, সে বিষয়টি নিয়েও ভাবতে হবে।

২.৩৪ অনেকেই এখন একথাটি মেনে নিচ্ছেন যে, বেসরকারী সংস্থার তুলনায় সরকারের পক্ষে বেশি দক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বলতে গেলে নেই। এর কারণ হল এই যে, সরকারী সংস্থার ব্যবস্থাকপদের নানান উদ্দেশ্য মেটাতে হয়, যার অনেকগুলি পরস্পর বিরোধী। তাছাড়া, তাদের রাজনৈতিক চাপও মোকাবেলা করতে হয়। কাজেই একটি দক্ষ কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা তাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। তাছাড়া, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তারা ততটা সক্ষম নন। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভাল কাজ করার জন্য তেমন কোনো প্রাপ্তি সম্ভাবনা ব্যবস্থাপকদের বলতে গেলে নেই। এটি অংশত এজন্য যে প্রতিযোগিতামূলক চাপ থেকে এরা বেশির ভাগ সময় আড়ালে থাকেন, এবং অন্য একটি কারণ হল, উন্নত দক্ষতা থেকে আসা সঞ্চয়ের কোনো হিস্যা ব্যবস্থাপকরা পাননা। তাছাড়া যারা প্রকৃত সুবিধাভোগী, অর্থাৎ সাধারণ নাগরিকরা, তারা খুব সামান্যই চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। যেখানে লোকসান সকল নাগরিকদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, এবং ব্যক্তিগতভাবে এই লোকসানের পরিমাণ হয় নগণ্য, সেখানে উন্নত কার্যসম্পাদনা দাবী করার জন্য চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংঘ সংগঠনের জন্য সময় ও সম্পদ খরচের সামান্য আগ্রহই পরিলক্ষিত হবে।

২.৩৫ বৈদেশিক বিষয়/প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে গাড়ী ভাড়া দেয়ার একটি কোম্পানী পরিচালনা পর্যন্ত (বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন) এই সুদীর্ঘ কার্যক্রমে এক সময় সরকারী সরবরাহের মূল্য বেসরকারী সরবরাহের মূল্য থেকে বেশি হতে শুরু করে। ঐ সময়ে বাজার থেকে সেবাগ্রহণ যুক্তিযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক খাতসমূহের কর্মকান্ডের বিশালতা বিবেচনা করে সরকারের অগ্রবর্তী একটি ভূমিকা নিতে হবে। তবে চ্যালেঞ্জ মেটানোর জন্য সরকারী কর্মসূচির মান ও খরচ সাশ্রয়তায় যে শুধু এক বিপুল উন্নতিসাধনই প্রয়োজন, তা নয়, বরং এনজিও এবং বেসরকারী খাতের সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তাও দিতে হবে। উদ্ভাবনামূলক এবং খরচ সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবনে এনজিওগুলি একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে, এবং সামাজিক খাতের সেবা যোগানের ক্ষেত্রে এক প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাজার ব্যর্থ হলেও, সরকারী সংস্থা কর্তৃক সরাসরি যোগান দেয়া এর সবচেয়ে ভাল সমাধান নাও হতে পারে। বরং বাজার ব্যর্থতা মোকাবেলা করার চেষ্টা করাটাই উচিত। যেমন, ক্ষুদ্র শিল্পের পুঁজির ক্ষেত্রে বাজার অনুপস্থিত থাকতে পারে, অথবা বাজারের সংখ্যা অতি অল্প হতে পারে, অথবা যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবে অথবা পুঁজি নির্ধারণের উচ্চ লেন-দেন মূল্যের জন্য নিম্নমানের হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের ঋণ দেয়ার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা স্থাপন কখনো অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান হাতে নেয়ার থেকে কম খরচ সাপেক্ষে হতে পারে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে – যেমন নির্মল বাতাসের জন্য বাজারের ক্ষেত্রে – বাজার অসম্পূর্ণ হতে পার, কারণ মালিকানা স্বত্বগুলি হয়তো সঠিকভাবে চিহ্নিত বা সুনির্দিষ্ট নয়। সমাধানের একটি উপায় হচ্ছে কর এবং ভর্তুকি নির্ধারনের মাধ্যমে দাম এবং খরচ কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, যাতে কোনো মূল্যবান পণ্যের ব্যবহার বা উৎপাদন প্রতিফলিত হবে।

২.৩৬ স্পষ্টতই সরকারের নানা ডিপার্টমেন্ট এবং কর্মসূচি খুঁটিয়ে দেখার এবং একইভাবে তাদের যৌক্তিকতা এবং খরচ করা অর্থের বিনিময়ে মূল্য নির্ধারণের একটি প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। (ঘর ২.১) । এ ছাড়া বাজারের দক্ষতাবর্ধক উপাদানগুলি সরকারী খাতে স্থাপন করতে হবে। সরকারী খাতে অবশ্যই বাজার রয়েছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে ভুল নামে – যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা। এসব বাজার পুনর্বিন্যাস করা, এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দীপনা থেকে এসব বাজারে প্রবেশ করে, তা পুনঃনির্ধারণ করা একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হওয়া উচিত। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন হবে পছন্দ এবং প্রতিযোগিতার বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে আসা। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ – কারণ সেবার মানের জন্য করদাতাদের যেটুকু দেয়ার কথা, তার থেকে বেশি দাম তারা দিচ্ছেন, এবং একচেটিয়া সংস্থাগুলি তাদের গ্রাহকদের কাছ থেকে কোনো অবদান ছাড়াই তহবিল পেয়ে যাচ্ছে।

২.৩৭ যেসব দেশে সংস্কার কর্মসূচি সফল হয়েছে, তাদের উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিম্নোক্ত তিনটি হাতিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, এবং বাংলাদেশের জন্যও এগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে :

- রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্ব্যর্থহীন এবং অবিচল অঙ্গীকার;
- সংস্কার কর্মসূচি নির্ণয়, এবং বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং পেশাদারী কর্মী নির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিসমূহ;
- সরকারী ব্যয় নীতির মান এবং দিকদর্শনে শৃঙ্খলা আনার জন্য বিচক্ষণ বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া।

রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং ম্যান্ডেট

২.৩৮ যে কোনো মৌলিক সংস্কারকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং ম্যান্ডেট দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এই দূরদৃষ্টি ও এই ম্যান্ডেট একবিংশ শতাব্দীতে সরকারের চেহারা কি হবে সে সম্পর্কে সরকারের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, বেসামরিক প্রশাসন সংস্কারের মূল উপাদনগুলি এবং সরকার কিভাবে আরো দক্ষ হতে পারে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সংক্রান্ত একটি নীতি ঘোষণার মাধ্যমে করা যায়, যেমন অনেক দেশে হয়েছে (মালয়েশিয়া ২০২০, শ্রীলংকা ২০১০, ইত্যাদি)। এরকম একটি দূরপ্রসারী দৃষ্টি সংস্কার বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোরেসোরে তাদের বিষয়সূচি নিয়ে এগিয়ে যাবার সামর্থ্য এবং কাঠামোই শুধু যোগান দিবে না, বরং রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকরা যে রাষ্ট্রের একটি পুনঃনির্ধারিত ভূমিকাটি দেখতে চান, সে সম্পর্কে সিভিল সমাজ ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে একটি স্পষ্ট বার্তাও পাঠাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা

২.৩৯ যেসব দেশ মৌলিক সংস্কার হাতে নিয়েছে, সেসব দেশে পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা, ধারণাবদ্ধ করা এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস কাজে লাগানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সংস্কার সূত্রবদ্ধ করা এবং সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গোর কমিশন স্থাপিত হয়। যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দক্ষতা ইউনিট এবং অর্থ মন্ত্রণালয় মিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল; এবং কানাডাতে সরকারী খাতের সংস্কারে একজন পূর্ণাঙ্গ কেবিনেট মন্ত্রী নেতৃত্ব প্রদান করেন। নিউজিল্যান্ডে বৈপ্লবিক প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাজেট সংক্রান্ত সংস্কারের প্রেক্ষিতে সংস্কারের বিষয়সূচি এবং সম্ভাবনা/গতি নির্ধারণে অর্থ মন্ত্রণালয় নেতৃত্ব দেয়। মালয়েশিয়াতে প্রধান সচিবের অধীনে বেসামরিক প্রশাসনের প্রশাসনিক উন্নয়নের ওপর একটি প্যানেল স্থাপন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করা; এ ছাড়া সংস্কার সূচনা এবং এর বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রশাসনিক আধুনিকায়ন এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ইউনিট নামে একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২.৪০ বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে আংশিক কাজ শুরু করেছে। সরকারের আকার ছোট করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে নুরুন্নবী পুনর্গঠন কমিটি স্থাপন করা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের দপ্তরসমূহের পর্যালোচনা এবং তাদের যথাযথ আকার সুপারিশ করা। কমিটিটি এ পর্যন্ত ৮০টি দপ্তর পর্যালোচনা করেছে। কমিটির কার্যপরিধি (টিওআর) এবং এর প্রতিষ্ঠা অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ, কিন্তু এর প্রভাব খুব সামান্যই অনুভূত হয়েছে, এর কারণগুলি হচ্ছে:

- *সীমিত টিওআর* – কমিটির টিওআর শুধু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেই সীমিত। একটি সংস্থা বা কর্মসূচি কেন টিকে আছে, অথবা খরচ সাশ্রয়তা বাড়াবার জন্য এর কার্যক্রম কিভাবে করা সম্ভব, অথবা আদৌ ভিন্নভাবে করা সম্ভব কিনা, এ ব্যাপারে কোনো আলোকপাত করা হয়নি।

- *সীমিত ক্ষমতা* -– বিভিন্ন সংস্থার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করা এবং অর্থের বিনিময়ে মূল্য সমীক্ষা হাতে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পেশাদারী কর্মী এ কমিটিতে নেই।

- *নির্মোহ অংশগ্রহণকারীর অভাব* -– কমিটি কার্যনির্বাহী শাখারই একটি অংশ, এবং এতে বাইরের নির্মোহ পেশাদারী কর্মী নেই।

- *সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক অংগীকারের অভাব* -— সংস্কারের ধীর গতি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সূচির অভাবের জন্য কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের সদিচ্ছার অভাব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে।

২.৪১ এ ছাড়া, বাংলাদেশ সরকারও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটি দক্ষতা ইউনিট চালু করেছে। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে এর কর্মী নিয়োগ, ম্যান্ডেট এবং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনের ওপর। এ ছাড়াও সাফল্য নির্ভর করে ব্যাপক-ভিত্তিক জনসমর্থনরএবং পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং একে সমর্থন প্রদানের জন্য যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া/কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলার ওপর। ইউনিটটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন সত্ত্বেও বর্তমান পরিবেশে একটি আমলাতান্ত্রিক ইউনিট মৌলিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক-ভিত্তিক সহায়তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই, সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, একটি সময়-ভিত্তিক নতুন কমিশন -— **সরকার সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশন (এনসিআরজি)** — গড়ে তোলা হোক, যা ৩-৪ বছর যাবৎ নুরুন্নবী কমিটির কাজ চালিয়ে যাবে। কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনকে অবশ্যই:

- ***উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বহুলাংশে স্বাধীন হতে হবে*** – এতে সরকারী কর্মকর্তা, সাংসদ, পাবলিক অফিসিয়াল, এবং বেসরকারী খাত থেকে নেয়া ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সম্ভব হলে একজন উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তি, যেমন উপ-প্রধানমন্ত্রী, এর দায়িত্বে থাকবেন।

- ***গণপরিমন্ডলে কার্যপরিচালনা করতে হবে*** -— যাতে জনসমর্থন সৃষ্টি করা যায়।

- ***যথাযথ প্রযুক্তিগত সমর্থন থাকতে হবে*** -— যাতে VFM ধরনের বিশ্লেষণসহ যৌক্তিকতার মৌলিক পর্যালোচনা হাতে নেয়া যায়।

২.৪২ ধারণা করা যাচ্ছে যে কমিশন দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের বিশ্লেষণমূলক ভিত্তিগুলি উপহার দেবে, এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা এবং কৌশলসমূহ নির্ধারণ করবে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এ কমিশনটি কার্যসম্পাদনার প্রচলিত মত ও পথগুলিকে প্রশ্ন করার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে, এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনসমর্থন সমন্বিত করার দায়িত্বও তা পালন করবে। দক্ষতা ইউনিটটি কমিশনের কাজ বাস্তবে প্রয়োগ করবে, এবং নির্বাহী শাখার ভিতরে পরিবর্তনের অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করবে। তা ছাড়া, সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণের দায়িত্ব এ কমিশনের থাকবে। দক্ষতা ইউনিটটি কমিশনের স্টাফ সচিবালয় হিসেবেও কাজ করবে, এবং কমিশনের ভিতরে একটি আলাদা বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা গড়ে তোলার পরিবর্তে একে বিশ্লেষণমূলক সহায়তা দিয়ে যাবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কমিশন ও ইউনিট, উভয়েরই মেধাবী এবং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার কর্মী থাকবে। প্রক্রিয়াটিকে ধাক্কা দিয়ে শুরু করতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকা আবশ্যক হলেও সংস্কার সূচনা করা এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

২.৪৩ পুরো ব্যবস্থাটি যাতে ভারাক্রান্ত না হয়, সেজন্য কমিশন ২-৩ বছর ধরে সকল প্রধান কর্মকান্ডের মৌলিক পর্যালোচনা হাতে নেবে। কমিশন চলমান ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করবে – পর্যালোচনার পুরো চক্রটি শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। প্রতিটি দপ্তর বা কর্মসূচির পর্যালোচনায় কমিশন নিম্নোক্ত ধরনের বিশ্লেষণ করবে :

- *সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক অংগীকারের অভাব* -— সংস্কারের ধীর গতি এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সূচির অভাবের জন্য কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের সদিচ্ছার অভাব সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে।

২.৪১ এ ছাড়া, বাংলাদেশ সরকারও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটি দক্ষতা ইউনিট চালু করেছে। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে এর কর্মী নিয়োগ, ম্যান্ডেট এবং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনের ওপর। এ ছাড়াও সাফল্য নির্ভর করে ব্যাপক-ভিত্তিক জনসমর্থনরএবং পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং একে সমর্থন প্রদানের জন্য যথোপযুক্ত প্রক্রিয়া/কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলার ওপর। ইউনিটটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন সত্ত্বেও বর্তমান পরিবেশে একটি আমলাতান্ত্রিক ইউনিট মৌলিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপক-ভিত্তিক সহায়তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই, সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, একটি সময়-ভিত্তিক নতুন কমিশন -— **সরকার সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশর্ন (এনসিআরজি)** – গড়ে তোলা হোক, যা ৩-৪ বছর যাবৎ নুরুন্নবী কমিটির কাজ চালিয়ে যাবে। কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কমিশনকে অবশ্যই:

- ***উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বহুলাংশে স্বাধীন হতে হবে*** – এতে সরকারী কর্মকর্তা, সাংসদ, পাবলিক অফিসিয়াল, এবং বেসরকারী খাত থেকে নেয়া ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। সম্ভব হলে একজন উচ্চ পদমর্যাদার ব্যক্তি, যেমন উপ-প্রধানমন্ত্রী, এর দায়িত্বে থাকবেন।

- ***গণপরিমন্ডলে কার্যপরিচালনা করতে হবে*** -— যাতে জনসমর্থন সৃষ্টি করা যায়।

- ***যথাযথ প্রযুক্তিগত সমর্থন থাকতে হবে*** -— যাতে VFM ধরনের বিশ্লেষণসহ যৌক্তিকতার মৌলিক পর্যালোচনা হাতে নেয়া যায়।

২.৪২ ধারণা করা যাচ্ছে যে কমিশন দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের বিশ্লেষণমূলক ভিত্তিগুলি উপহার দেবে, এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা এবং কৌশলসমূহ নির্ধারণ করবে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এ কমিশনটি কার্যসম্পাদনার প্রচলিত মত ও পথগুলিকে প্রশ্ন করার প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে, এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনসমর্থন সমন্বিত করার দায়িত্বও তা পালন করবে। দক্ষতা ইউনিটটি কমিশনের কাজ বাস্তবে প্রয়োগ করবে, এবং নির্বাহী শাখার ভিতরে পরিবর্তনের অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করবে। তা ছাড়া, সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণের দায়িত্ব এ কমিশনের থাকবে। দক্ষতা ইউনিটটি কমিশনের স্টাফ সচিবালয় হিসেবেও কাজ করবে, এবং কমিশনের ভিতরে একটি আলাদা বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা গড়ে তোলার পরিবর্তে একে বিশ্লেষণমূলক সহায়তা দিয়ে যাবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে কমিশন ও ইউনিট, উভয়েরই মেধাবী এবং উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার কর্মী থাকবে। প্রক্রিয়াটিকে ধাক্কা দিয়ে শুরু করতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি থাকা আবশ্যক হলেও সংস্কার সূচনা করা এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

২.৪৩ পুরো ব্যবস্থাটি যাতে ভারাক্রান্ত না হয়, সেজন্য কমিশন ২-৩ বছর ধরে সকল প্রধান কর্মকান্ডের মৌলিক পর্যালোচনা হাতে নেবে। কমিশন চলমান ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করবে – পর্যালোচনার পুরো চক্রটি শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে না। প্রতিটি দপ্তর বা কর্মসূচির পর্যালোচনায় কমিশন নিম্নোক্ত ধরনের বিশ্লেষণ করবে :

- *সরকারী হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা*: সরকারের কি আদৌ এই কাজটি করা উচিত? এই হস্তক্ষেপ সমর্থন করার জন্য করদাতা কী বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন? এই কাজটি বাদ দেয়া হলে নাগরিকরা, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ, কিভাবে কষ্ট পাবেন ?

ঘর ২.১. অর্থের-বিনিময়ে-মূল্য — প্রতিটি করদাতা ও ভোক্তার সাংবিধানিক অধিকার

খুব কম সংখ্যক সরকারী দপ্তর বা কর্মসূচি বাজারের শৃঙ্খলার আওতায় আসে, এবং তাই তাদের বৈধতা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে অর্থের বিনিময় মূল্য (ভিএফএম) বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণে বেশ কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন করা হয়। দপ্তর বা কর্মসূচিটি সমর্থন করার বিনিময়ে করদাতা কী মূল্য পান, এবং গ্রাহক কী মূল্য পান? এর কাজকর্ম কি আদৌ প্রয়োজনীয় ? যদি না হয়, তবে এটি বিলুপ্ত করা উচিত। যদি কাজকর্ম চালিয়ে যেতেই হয়, তাহলে কি এটি একটি সরকারী দায়িত্ব হিসেবেই থাকবে ? যদি না হয়, তাহলে কি এর কাজকর্ম একটি বেসরকারী খাতের ফার্ম আরো ভালভাবে গ্রহণ করতে পারবে ? যদি তা না হয়, তবে একে চুক্তিভিত্তিতে অন্য কাউকে দিয়ে দেয়া উচিত । যদি চুক্তি ভিত্তিতে দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে কি ভিন্ন কোনো ভাবে এটি করা যায় ? সবশেষে, সেবাসমূহ কি আরো কম খরচে সরবরাহ করা যায় ? প্রতি কয়েক বছরে প্রত্যেক সরকারী সংস্থা ও কর্মসূচিকে এ প্রশ্নগুলি করা উচিত। নিচে কয়েকটি সরকারী দপ্তরের তালিকা দেয়া হল সেগুলো অর্থের বিনিময়ে সামান্যই মূল্য দিয়ে থাকে।

সমবায় দপ্তর (ডিওসি) — ডিওসি'র মূল কাজ হচ্ছে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার, নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান করা। এই দপ্তরের কর্মীদের সংখ্যা ৪,৭০০ এবং এটি বছরে করদাতাদের ২৭ কোটি টাকা খরচ করে। দেশে ১৩৩,০০০ সমবায় সংস্থা থাকায় এটি হয়তো বিশাল সাফল্য দাবী করতে পারে। তবে, দুঃখজনকভাবে, বেশির ভাগ সমবায় প্রতিষ্ঠান এখন অকার্যকর অবস্থায় আছে। এতে একদিকে যেমন নিয়ন্ত্রক হিসেবে দপ্তরটির ব্যর্থতাকে তুলে ধরা হচ্ছে, অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা প্রতীয়মান করছে। এজন্য এই বিশাল লোকবল কী কাজটি করছে বা কী অর্জন করছে, এ প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হয়। যেহেতু দলগত বা সামাজিক সমাবেশ ঘটানোতে এনজিওগুলির প্রভূত সাফল্য রয়েছে, সেহেতু সমবায় আন্দোলনের জন্য অবিরাম সরকারী সমর্থন বা তার সুযোগের মৌলিক পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নিবন্ধন ডাকের মাধ্যমে করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধান ১৫-২০ জন উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর একটি ছোট দল (এমবিএ বা আইনজীবী) করতে পারেন, যারা বিখ্যাত ফার্ম বা চার্টার্ড একাউন্টেন্টদেরকে কাজটি চুক্তির ভিত্তিতে দিয়ে দিতে পারেন। কর্মীরা হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করতে পারেন, এবং প্রয়োজন হলে, বাইরের আইনজ্ঞ নিয়োগ করে মামলা শুরু করতে পারেন। নিবন্ধন সহায়তায় এবং আর্থিক কার্যসম্পাদনার ও রিপোর্ট দেয়ার বাধ্যবাধকতা কেউ মানছে কি না তার খোঁজ খবর রাখতে আরো বেশি করে কম্প্যুটারের ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত কর্মীদের কিছু সামাজিক খাতে সম্প্রসারণ কর্মী হিসেবে অথবা কৃষিতে অথবা শিক্ষক হিসেবে রেখে দেয়া যেতে পারে।

জনশক্তি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো -- জনশক্তি নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ৭৬টি কার্যালয়ে প্রায় ২,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছে, যাতে করদাতাদের বছরে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানির জন্য জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেয়া। তবে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, এর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব কোথাও পড়েছে। বেশির ভাগ মানুষ নিজেরাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এবং এটিও কোনো অর্থে পরিষ্কার নয় যে, যদি দপ্তরটি না থাকত, তাহলে জনশক্তি রপ্তানি কম হত। কেউ হয়তো ভাবতে পারেন এরকম একটি দপ্তরের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা থাকবে, তবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এরকম দেখা যায়নি যে, দপ্তরটি দুর্নীতি সে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে যা এর ব্যয় যুক্তিযুক্ত করবে। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে প্রশিক্ষণ বেসরকারী করা, যদিও সরকারের একটা ভর্তুকি এটি পেতেই থাকবে, এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যবেক্ষণ করা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি ক্ষুদ্রতর, পেশাদারী এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হবে।

মুদ্রণ ও স্টেশনারী দপ্তর -- এ দপ্তরটির প্রায় ২,০০০ কর্মচারী রয়েছে, যারা করদাতার পকেট থেকে বছরে ৩৫ কোটি টাকা আদায় করে নিচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও বাজেটের মত কিছু কাগজ ও দলিলপত্র মুদ্রণের জন্য নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তার প্রয়োজন হলেও সরকারের সকল মুদ্রণ কাজ কেন কেন্দ্রীয় ভাবে করা হবে – এ বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ ও বেসরকারীকরণের মাধ্যমে অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন সম্ভব ছিল। বিকল্প হিসেবে স্ব-অর্থায়িত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সৃষ্টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

নিবন্ধন দপ্তর -— নিবন্ধন দপ্তরটি ২,১৮৮ লোকজন নিয়ে ৪৯৫টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। এতে করদাতাদের খরচ হয় বছরে ১৫ কোটি টাকা। এ দপ্তরের প্রধান দায়িত্ব হল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধন, বিক্রয়, ক্রয় ও হস্তান্তর; এবং জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু নিবন্ধন করা। এ ক্ষেত্রে কম্প্যুটার ভিত্তিক এবং মানসম্মত পদ্ধতিসমূহ চালু হলে খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়, এবং আরো বেশি সঠিকতার নিশ্চয়তা দেয়া যায়। তাছাড়া, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন যেহেতু স্বেচ্ছামূলক, যারা এসব নিবন্ধন করতে চান, তারা ডাকযোগে তা করতে পারেন – এ ক্ষেত্রে একটি মানসম্মত ফর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তর -— ১০০০ কর্মী সম্বলিত এবং বছরে করদাতার ৭ কোটি টাকার বাজেটসহ এই দপ্তরটি বিশালই মনে হয়। এখন ভূ-উপগ্রহ থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা কম্প্যুটার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।

মৃত্তিকা জরিপ বিভাগ -— এখন যেখানে বেসরকারী জরিপকারীর অভাব নেই, বাংলাদেশ সরকারের কি এ ধরণের একটি দপ্তর থাকা প্রয়োজন ?

সরবরাহ দপ্তর এবং মূল্য ও বাজার তথ্য দপ্তর -— এ দু'টিই অতীতের উত্তরাধিকার, এবং তাদের চালু রাখার ক্ষেত্রে কোনো বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি নেই।

সকল সরকারী দপ্তর ও সংস্থার নিয়মিত এ ধরণের নিরীক্ষার সামনাসামনি হওয়া উচিত। অন্যান্য সংস্থা, যেমন— পাট দপ্তর, বস্ত্র দপ্তর, নাবিক ও অভিবাসন কল্যাণ দপ্তর এবং মোহাফেজখানা ও গ্রন্থাগার দপ্তর অর্থের বিনিময়ে যে মূল্য দিচ্ছে তাও প্রশ্নসাপেক্ষ। সবশেষে, বেসরকারীকরণের পর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কোনো ভুমিকা থাকবে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

- *সরকারী সেবার বেসরকারী সংস্থান* -— কাজকর্ম যে চলবে, তা ধরে নিয়ে বলা যায়, সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে সরকারী সংস্থাগুলি কি তা সবচেয়ে ভাল দিচ্ছে ? না কি এনজিও অথবা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসমূহ ? যেখানে রাষ্ট্র একটি যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণমুখী কাঠামো টিকিয়ে রাখতে মনোযোগী, সেখানে সেবাদানকারীদের মধ্যে কিভাবে প্রতিযোগিতা সূত্রপাত করা যাবে? অর্থায়ন ও সংস্থান —— এ দুটির মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য্য এদের কিভাবে আলাদা করা যায়?

- *সেবার সরকারী সংস্থান* -— কমিশন সেসব সংস্থা এবং সেসব সার্ভিসের ক্ষেত্রে খরচ সাশ্রয়তা বাড়ানো এবং গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির বিকল্প পথ পর্যালোচনা করবে, যেগুলো সরকারী অঞ্চলে রয়ে যায়। বিশেষ করে, প্রতিযোগিতা বাড়াতে, সেবার 'বোঁচকা খুলতে' এবং ব্যবহারকারীদের কাছে জবাবদিহিতা বাড়াতে কোন কার্যপদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে ?

- *নীতি ও পরিচালনা আলাদা করা* -— নীতি ও সম্পদ সম্পর্কে সরকার যে উপদেশ পায় তার মূল উৎস যদি হয় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ-— যাদের সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সরাসরি স্বার্থ জড়িত -— তাহলে যে বিকৃত প্রভাব সৃষ্টি হয় তাকে সর্বনিম্ন অবস্থায় রাখতে নীতি ও পরিচালনকে কিভাবে আলাদা করা যায়?

২.৪৪ **কমিশন চার থেকে ছয় মাস নিচের বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি দিবেন :**

২.৪৫ ***দ্বৈততা এবং অপচয় রোধে সংস্থাগুলিকে বন্ধ করে দেয়া অথবা সুসংহত করা*** -— বেশ কিছু সংস্থা এবং কর্মকাণ্ড আছে যেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গেছে। এগুলোর বেশির ভাগ এখনও প্রশাসনিক স্থিতাবস্থার জন্য টিকে আছে – তবে তালিকাটি এখানেই সীমাবদ্ধ নয়: বস্ত্র মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর (যদি খুবই নিম্নমানের কার্যসম্পাদনার রাষ্ট্রীয় মালিকানার বস্ত্রকলগুলি ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে এদের কাজকর্ম কমে যাবে); পাট মন্ত্রণালয় (অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের নিজেকে গুটিয়ে নেয়া এবং পাটের একটি অতিরিক্ত

আপতকালীন মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে এর দুটি প্রধান কাজ; আমদানী নিয়ন্ত্রক (যথেষ্ট পরিমাণ উদারনৈতিক পদ্ধতিতে বহুলাংশে অপ্রাসঙ্গিক); এবং মূল্য ও বাজার তথ্য দপ্তর যার মূল্য নির্ধারণের ঘোষিত উদ্দেশ্য বিগত বাজার নিয়ন্ত্রণ যুগের একটি উত্তরাধিকার (যেসময় 'ন্যায্য মূল্য' নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফাঁক কমিয়ে আনার অকার্যকর প্রয়াস হাতে নেয়া হত)।

২.৪৬ পরিবর্তিত অর্থনৈতিক দৃশ্যপট এবং নতুন অগ্রাধিকারের কারণে বেশ ক'টি মন্ত্রণালয়/সংস্থার কাজকর্ম এবং ভূমিকা নতুন করে দেখতে হবে। বি-নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারীকরণের ফলে, এবং বেসরকারী খাত উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর ও সমর্থকারী পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কারণে বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যাবলী পর্যালোচনার চাহিদা উপলব্ধ হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ৫.৪৭)।

২.৪৭ অনেক ক্ষেত্রেই সরকার কর্তৃক কর্মকাণ্ড হাতে রাখা হয়তো যুক্তিযুক্ত, কিন্তু লাভের সংগে সম্পদের বর্তমান মাত্রা হয়ত তাতে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। একটি উদাহরণ হচ্ছে সমবায় দপ্তর (বাজেট ২৭ কোটি টাকা এবং লোকবল ৪,৭০০) – যার কার্যকারিতা, সমবায় খাতের অবস্থা বিবেচনায়, অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ।[১৯] অন্য একটি উদাহরণ হচ্ছে সরকারী পরিবহন দপ্তর (বাজেট ১৮ কোটি ১০ লাখ, লোকবল ১,৪০০), যার দায়িত্ব হচ্ছে পরিবহনপুলের যানবাহন পরিচালনা। এই সংস্থার কর্মকাণ্ড নিয়ে যে সাধারণ অসন্তোষ বিরাজমান, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, এটিকে তুলে দিয়ে এর জায়গায় ছোট একটি ইউনিট চালু করা উচিত, যার দায়িত্ব হবে বেসরকারী ফার্মগুলির সংগে ব্যবস্থার মাধ্যমে ভাড়ায় যানবাহন পরিচালনা সমন্বিত করা।

২.৪৮ *বোঁচকা খোলার কর্মকাণ্ড'* – অনেক সরকারী মন্ত্রণালয় বর্তমানে অযৌক্তিকরকম ব্যাপক কর্মকাণ্ড হাতে নিয়েছে, যেগুলো বেসরকারী খাতের হাতে ছেড়ে দেয়া যেত। তাছাড়া সরকারী নীতি সংক্রান্ত উপদেশ আসে এমন সব মহল থেকে যাদের সেবা সরবরাহে সরাসরি স্বার্থ রয়েছে। অতএব নীতি ও পরিচালনাকে আলাদা করে দিতে হবে। অর্থায়ন এবং সেবা যোগানের বিষয় দু'টিও আলাদা করে দিলে সেবা সরবরাহের জন্য প্রসারিত মানদন্ড সৃষ্টি এবং নিম্নমানের কার্যসম্পাদনার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত হতে পারে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন এবং সহজেই শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, তেমন কর্মকাণ্ড সনাক্ত করা সম্ভব কি না – যাদের ছেড়ে দেয়া যায় বা কর্পোরেটভুক্ত করা যায়। নিউজিল্যান্ডে এরকম একটি কাজের বিশাল সম্ভাবনা এই কৌশল ব্যবহারের মধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৪ সাল থেকে পরিবহন মন্ত্রণালয় (যেখানে ৭০০০ মানুষ চাকুরি করত) ক্রমান্বয়ে এর নিয়ন্ত্রণ থেকে এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (এয়ারট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এস ও ই); বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বিমান চলাচল নিরাপত্তা); ট্রানসিট এন জেড (সড়ক পরিকল্পনা ও অর্থায়ন); ট্রাফিক নিরাপত্তা সার্ভিস (ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রয়োগ, এখন পুলিশের হাতে); এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এদেরকে ছেড়ে দেয়। নীতিমুখী এবং তত্ত্বাবধায়ক এই মন্ত্রণালয়টিতে বর্তমানে মাত্র ৪৫ জন মানুষ চাকুরিরত। এই পদ্ধটির বাংলাদেশে সম্ভাব্য প্রয়োগের উদাহরণ:

- *জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়* – এর নীতি সম্পাদন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের জাহাজ চলাচল নীতি সংক্রান্ত একটি বিভাগের হাতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে, যাতে সামগ্রিক পরিবহন নীতিমালাসমূহের সাথে জাহাজ চলাচল নীতিগুলি সমন্বিত হতে পারে। একটি আলাদা মন্ত্রণালয়

---

[১৯] কার্যসম্পাদনাকে পরিমাপযোগ্য উৎপাদনের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে – যেমন অডিটরের সংখ্যা বা সমাপ্ত করা প্রযুক্তি সাহায্য প্রকল্পের সংখ্যা। এ দপ্তরটিকে আরো ছোট একটি দপ্তর হিসবে কল্পনা করা যায়, যেখানে যেসব দল থাকবে তাদের দায়-দায়িত্ব হবে: সমিতির নিবন্ধন, সমিতিগুলোকে আলাদা আলাদা প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান; কম্প্যুটার ব্যবহার করে হিসাব নিরীক্ষণ/প্রতিবেদনের বাধ্যবাধকতা মানা হচ্ছে কি না তা প্রত্যবেক্ষণ করা; এবং সমিতিগুলি নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা না মানলে বাইরের আইনবিদ নিয়োগ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা।

থেকে এটি একটি উন্নত বিকল্প হতে পারে, কারণ এরূপ একটি মন্ত্রণালয় জাহাজ চলাচলে নিজস্ব স্বার্থ আছে, এরকম লোকজনের হাতে 'বন্দী' হয়ে পড়ার একটা বিপদ থেকে যায়। প্রশিক্ষণের কাজকর্ম বেসরকারী সংস্থাগুলি গ্রহণ করতে পারে, যদিও মান অর্জনের সার্টিফিকেট রাষ্ট্র দিতে পারে। ব্যবসায়িক জাহাজ চলাচল কর্মকাণ্ড সরকারের হাত থেকে ছেড়ে দেয়া উচিত। প্রশিক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মত আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে দেয়ার পর বিআইডব্লিউটিএ এবং বিআইডব্লিউটিসি স্ব-অর্থায়নকৃত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া উচিত। উভয় সংস্থাকে বাণিজ্যিক কর্পোরেশন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন, এবং এদের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রত্যবেক্ষণকৃত সুনির্দিষ্ট আর্থিক কার্যসম্পাদনা টার্গেট থাকবে।

- *যোগাযোগ মন্ত্রণালয়* -— সড়ক পরিবহন বিভাগের (আরটিডি) ঝোঁক তত্ত্বাবধান ও প্রত্যবেক্ষণের দিকে সরে যাওয়া উচিত। রাস্তা ও পুলের প্রকৃত নির্মাণ বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত —– যারা পরিকল্পনা, নক্সা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে। অন্যান্য বাণিজ্যিক পরিচালনা, যেমন বিআরটিসি'ও ছেড়ে দেয়া উচিত, এবং যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ (জেএমবিএ)কে একটি স্বাধীন সেতু পরিচালনা কর্তৃপক্ষে রূপান্তরিত করা উচিত যার বেশির ভাগ কাজ বেসরকারী খাতে চুক্তি-ভিত্তিক দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু উল্টো যা ঘটেছে, তা হল: জেএমবিএ'কে সম্প্রতি উন্নত করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিভাগে পরিণত করা হয়েছে, যাতে এর চেয়ারম্যান প্রশাসনিক এবং আর্থিক রেফারেন্সগুলি মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারেন।

- *বাণিজ্য মন্ত্রণালয়* – মন্ত্রণালয়টি বেসরকারী খাতের ব্যবসা ও বাণিজ্যের পরিবেশের জন্য দায়িত্বশীল। মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাণিজ্য-মুখী সংস্থাসমূহ – ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, রাষ্ট্র-মালিকানার দু'টি সাধারণ ও জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান এবং চা-বোর্ড – যতশীঘ্র সম্ভব বেসরকারী করে ফেলা উচিত। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণসহ পরিচালিত হওয়া উচিত। এই অংশগ্রহণ হতে পারে এর বোর্ডে এবং অর্থায়নে। যদি দায়িত্ব কমে যায়, তবে এটি একীভূত বেসরকারী-খাত উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের একটি অংশ হিসেবে বেসরকারী খাতের বৃদ্ধির বাধাসমূহ দূর করতে পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবে (অনুচ্ছেদ ৫.৪৮)।

- *গণপূর্ত বিভাগ* বৌচকা খোলার এক প্রধান প্রার্থী হতে পারে। এর মূল কাজকর্ম -— বেসামরিক কাজের নক্সা করা, কন্ট্রাক্ট দেয়া ও তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি -— একটি ক্ষুদ্র মূলদল করতে পারে, এবং নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংগ্রহ এবং পরিচালনের প্রকৃত কাজ সহজেই চুক্তি ভিত্তিতে অন্যকে দেয়া যেতে পারে/বেসরকারীকরণ করা যেতে পারে।

২.৪৯ কমিশনের ভূমিকা প্রস্তাবিত সমতা আনয়নকারী তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন (পরিচ্ছেদ ৪) এবং সরকারের দক্ষতা নিরীক্ষণে জনগণের বর্ধিত সামর্থ্য এবং দক্ষতা ইউনিটকে সুসমন্বিত করার মাধ্যমে মধ্য মেয়াদে হ্রাস পাওয়া উচিত। অনুমিত হচ্ছে যে, বাজেট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পুনর্মূল্যায়ন জোরের সাথে পরিচালিত করতে হবে (পরিচ্ছেদ ৪), যা খরচ-সাশ্রয়তা এবং যৌক্তিকতার বিষয়গুলিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরবে। উপরোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আসলে এগুলো জনগণের গোচরে আসবে।

২.৫০ কয়েকটি শিল্পোন্নত এবং সদ্য শিল্পায়িত দেশ (এনআইসি) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতি-কৌশলের মাধ্যমে সরকারের চূড়ান্ত বৃদ্ধি ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, **জাপান আইন করে সরকারের বৃদ্ধিতে চূড়ান্তভাবে ছিপি লাগিয়ে দিয়েছে।** আরো সুনির্দিষ্টভাবে, এর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস আইনের অধীনে নির্বাহী শাখা এর প্রশাসনিক বিভাগের কর্মীদের সংখ্যার একটি চূড়ান্ত উর্ধসীমা বজায় রাখতে বাধ্য যাতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, যখনই কোনো মন্ত্রী কোনো জরুরী অগ্রাধিকার মোকাবেলায় একটি অধিদপ্তর স্থাপনের প্রস্তাব দিবেন, তিনি (প্রশাসনিক আইনবলে) অন্য একটি দপ্তরে সমান সংখ্যক কর্মী হ্রাস করতে বাধ্য থাকবেন। **আরেকটি কৌশল হচ্ছে সেকেলে বিষয়কে চিহ্নিত করতে এবং ছাঁটাই করে ফেলতে 'সূর্যাস্ত আইন'সমূহের মাধ্যমে অন্তঃস্থাপিত পদ্ধতি প্রবর্তন করা।** সূর্যাস্ত আইন একটি কর্মসূচি পরিচালনার সময়সীমা বেঁধে দেয়। অবশ্য কর্মসূচিটি পুনরায় চালু হবার কর্তৃত্ব পেলে ভিন্ন কথা, তবে এতে পর্যালোচনার বাধ্যবাধকতাটি ঠিকই চলে আসে।

২.৫১ বাজেটকে পরিবর্তনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। বেশ ক'টি পদক্ষেপের মধ্যে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, সরকারী বিনিয়োগ কার্যক্রমের পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় সরকারী অথবা দাতা সংস্থাটিকে এই বিষয়টি যুক্তির সাথে তুলে ধরতে হবে যে কেন রাষ্ট্র – প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একটি নতুন কর্মকাণ্ড হাতে নেবে, একই সঙ্গে, এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে, এই কার্যক্রমে বাংলাদেশের (এবং অন্যান্য দেশের) সেবা সরবরাহ উদ্যোগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের দলে আনা

২.৫২ সরকারের হ্রাসকৃত ভূমিকার জন্য অবিশ্যম্ভাবীভাবে অসংখ্য কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়বেন। এটি একটি খুবই সংবেদনশীল বিষয় – শুধু যারা চাকুরি হারাবেন, তাদের জন্য উদ্বেগ হিসেবে নয়, বরং কর্মহীনতার আরো সাধারণ অভিঘাতের জন্যও। বিভিন্ন দেশের সরকার এ বিষয়টি নিয়ে ভাবিত যে, চাকরী ছাঁটাই সরাসরি শহুরে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়াবে, যার ফলে রাজনৈতিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিকর ও নিয়ন্ত্রণ-দুঃসাধ্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি হবে। যদিও এসব উদ্বেগ সহজেই বোঝা যায়, অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, এগুলো অকারণে হতাশাব্যঞ্জকও হয়েছে। স্বেচ্ছায় অথবা জোর করে ছাঁটাই অনেক দেশেই হয়েছে। ঘানায় ৪৫,০০০ সরকারী কর্মী ছাঁটাই হয়েছে (মোট সংখ্যার ১২ শতাংশ); আর্জেন্টিনা সাফল্যজনকভাবে ১২০,০০০ সরকারী কর্মী ছাঁটাই করেছে (২০ শতাংশ); এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে চিলি তার বেসামরিক প্রশাসন থেকে ৩০,০০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছে (৫০ শতাংশ)। বাংলাদেশও সুপ্রনীত অতিরিক্ততা ও পুনঃপ্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২৩,০০০ এসওই কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে পাট ও রেলওয়ে খাতের কর্মীরা আছে। বর্তমানে চালু কর্মসূচিগুলির সংগে যোগ করে বিভিন্ন ধরনের **নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্বারা সমর্থিত এবং অর্থায়িত একটি স্বচ্ছ ছাঁটাই কর্মসূচি** হাতে নেয়া হলে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে আনা অনেকটা সম্ভব হবে। (সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

ঘর ২.২. সার বিপণন বেসরকারীকরণ

এই কেস সমীক্ষা বেসরকারীকরণের আগে ও পরে সার ব্যবসার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সার বিপণন প্রায় একচেটিয়াভাবে একটি সরকারী দপ্তর --- কৃষি অধিদপ্তর – করেছে। এই দায়িত্বটি পরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র হাতে ন্যস্ত হয়। বিএডিসি যানবাহন সংগ্রহ করত এবং থানা পর্যায়ে সার মজুত করত। খুচরা বিপণন বেসরকারী ডিলারদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, যারা একটি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে শাসিত হত। সার বিপণন অবনিয়ন্ত্রণের প্রায় প্রথম পর্যায়ে --- যা ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮-এর মধ্যে সংঘটিত হয় – বিএডিসি থানা পর্যায় থেকে সরে গিয়ে বাজারে এর উপস্থিতি সীমিত করতে শুরু করে। সংস্থাটি ৭৫টি প্রাথমিক বিতরণ পয়েন্ট থেকে আসা বেসরকারী ডিলারদের কাছে সার বিক্রি করত, এবং ডিলাররা পরবর্তী পর্যায়ের বিপণনের বিষয়টি দেখত। পরবর্তী বছরগুলিতে বাজার উদারনৈতিককরণের জন্য আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, ডিলারশিপ পেতে যেসব সীমাবদ্ধতা ছিল, সেগুলো তুলে দেয়া হয়, খামার পর্যায়ের মূল্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়, এবং স্থানিক যাতায়াতের ওপর বাধানিষেধ দূর করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে, সরকার সারের ওপর থেকে ভর্তুকি তুলে দেয় এবং বাজারজাতকরণের সকল বাধানিষেধ সরিয়ে নেয়।

বেসরকারী খাত এখন অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে বিপণন–সংগ্রহের সকল পর্যায় ব্যবস্থাপনা করছে, এবং সারা দেশে সার বিতরণ দেখাশোনা করছে। মাত্র দুই বছরে ফলাফল হয়েছে খুবই আশাব্যঞ্জক : সার প্রাপ্যতা (এবং ব্যবহার) ১৯৮৮/৮৯ এর ১৫ লক্ষ টন থেকে ১৯৯০/৯১ তে ২১ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে, এর ফলে খাদ্য উৎপাদনও বেড়েছে। বাজারও অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে, যা মোট ফারাকের (গ্রোস মার্জিনের) ক্রমহ্রাস থেকে প্রতীয়মান হয়। ইউরিয়া সারের (অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত) খামার পর্যায়ের মূল্য ১৯৮৮/৮৯ সালের ২৪৮ টাকা (৫০ কেজি ব্যাগ) থেকে ১৯৯০/৯১ এ ২৩৬ টাকায় নেমে এসেছে। এবং দক্ষতা-মুনাফা থেকে কৃষকরা উপকৃত হয়েছে। সর্বোপরি, বেসরকারীকরণের ফলে ভর্তুকি দেয়া এবং লোকসানের জন্য বিএডিসি'র বাজেটে যে ক্ষতি হয়েছিল সে রাস্তাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। ৮৯ অর্থ বছরে ওই ক্ষতি ছিল ১৩০ কোটি টাকা।

বেসরকারী খাতে সার বিপণনে সাফল্য ভবিষ্যতের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে থেকে যাবে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকরা বিষয়টি ঠিকমত অনুধাবন করেছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে সরবরাহে হঠাৎ সংকট সৃষ্টি হতে দেননি। বাজারের একটা বিশেষ অংশ থেকে সরকার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং বেসরকারী ব্যবসায়ীদের একই সাথে ঐ স্থান পূরণ করতে উৎসাহিত করেছে। তবে এজন্য প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহী বেসরকারী উদ্যোক্তার, কাজেই সরকার উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এবং সার ব্যবসায়ে একদল নতুন ব্যবসায়ীকে জড়িত করার জন্য প্রযুক্তিগত সাহায্য দেয়ার উদ্যোগ নেয়। বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেলে অবশ্য এ ধারণাটি ক্রমশ লব্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদের আর অভাব থাকেনি। এ পদক্ষেপের ফলে সংস্কারের বিরুদ্ধ শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার জন্য একটি শক্তিশালী স্বার্থ গড়ে ওঠে। সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে এবং যাতায়াত ও ডিলারশিপের বাধানিষেধসহ দক্ষ পরিচালনার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী অনেকগুলি বাধা অপসারণ করে। একই সাথে সরকার এই ব্যবসায়ে ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্মুক্তকরণের মত পদক্ষেপ গ্রহণ করে – এমনকি এই নতুন ব্যবসায়ে কিভাবে সহায়তা দিতে হবে সে লক্ষ্যে ব্যাংকারদেরকে প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি নিবিড়ভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা হয় যাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রযুক্তিগত সহায়তা সব সময় পাওয়া যায়।

সার বিপণনে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়ায় বাজারের শক্তিগুলি সামনে চলে এসেছে এবং প্রতিযোগিতা বেড়েছে। চাষীদের কাছে সার প্রাপ্তি এতে বেড়েছে এবং দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে – যা ইউরিয়ার মূল্যের গ্রোস-মার্জিন এবং খামার পর্যায়ে মূল্য হ্রাস থেকে দেখা যাচ্ছে। বেসরকারীকরণ, এবং একই সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ, স্পষ্টতই ব্যবহারকারীদের লাভবান করেছে। সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ মূল্য আন্তঃসীমান্ত মূল্যের নিচে নেমে আসায় এবং সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে কয়েক বছরের জন্য সার দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। এই দুষ্প্রাপ্যতার কারণ না তলিয়ে দেখে সরকার সেখানে হস্তক্ষেপ করেছিল।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধি – সাফল্যের শিক্ষাগুলি কাজে লাগানো

এই পরিচ্ছেদে সরকার ও এনজিওদের দেয়া বেশ কয়েকটি সেবার সমীক্ষা করা হয়েছে, এবং কোথায় কাজ হয়েছে এবং কোথায় হয়নি – এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের সাফল্যের পেছনে যেসব মূল প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয় সক্রিয় ছিল, সেগুলোর ওপর এসব সমীক্ষায় আলো ফেলা হয়েছে। তাছাড়া, সুনির্দিষ্টভাবে, এ পরিচ্ছেদে বিকেন্দ্রীকরণ, সেবা সরবরাহে এনজিও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আরো বেশি ব্যবহার, এবং অনেকগুলি সংস্কারাধীন দেশে যে এজেন্সি কনসেপ্ট বা সংস্থার ধারণা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা গ্রহণ করা যায় কি না, তা খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে।

"এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণাদি রয়েছে যে, প্রায় সবগুলি সংগঠনগত কাঠামোই নীতি-নির্ধারকের কাছে একটি ভুল চিত্র তুলে ধরে, এবং সংগঠনটি যত বড় এবং কর্তৃত্বমূলক হবে, ততই এ সম্ভাবনাটি উজ্জ্বল হবে যে, এর শীর্ষ নীতি-নির্ধারকরা সম্পূর্ণ মনগড়া পৃথিবীতেই বাস করবেন।" কেনেথ ই বোল্ডিং

সাফল্যের ঘটনা

৩.১ এনজিও এবং বেসরকারী খাত ও দাতাদের সাথে সরকারও জনসেবা সরবরাহের জন্য বিকল্প এবং অনেক বেশি খরচ সাশ্রয়ী পদ্ধতি খুঁজছে। জনসেবা সরবরাহের নতুন পন্থা খুঁজে বের করার জন্য এবং একই সাথে অন্যত্র কাজে লাগানোর মত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকার অনেকগুলি উদ্ভাবনী পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছেন। আটটি কেইস সমীক্ষা এই বিকল্প পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল; উদ্দেশ্য ছিল (১) যতগুলি সম্ভব প্রকারভেদ তুলে আনা; (২) শ্রেষ্ঠ চর্চাসমূহ সনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির তুলনা করা; এবং (৩) উন্নত কার্যসম্পাদনা নির্ধারণ করে যেসব হেতু, সেগুলো চিহ্নিত করা। কেইস সমীক্ষাগুলির পরিধিতে নিচের প্রতিষ্ঠান/সংগঠনগত বিন্যাস অন্তর্ভুক্ত হয়েছে: একই রকমের কাজকর্ম সম্পাদন করছে এমন দুটি ভিন্ন সরকারী সংস্থা (ঘর ৩.১); একটি সরকার-মালিকানার আবশ্যকীয় সেবা দান প্রতিষ্ঠান এবং একটি সরকারী ব্যবস্থাপনার কিন্তু গ্রাহক-মালিকানার আবশ্যকীয় সেবা দান প্রতিষ্ঠান (ঘর ৩.২); একটি সফল সরকারী কর্মসূচি (ঘর ৩.৩); সরকার ও এনজিওদের দেয়া একই ধরনের সার্ভিস (ঘর ৩.৪); একটি সফল সরকারী দপ্তর (ঘর ৩.৫); এবং সফল বাংলাদেশ সরকার-এনজিও উদ্যোগসমূহ (ঘর ৩.৬)।

---

১. কেনেথ ই বোল্ডিং, রিচার্ড টি ইলি বক্তৃতা, আমেরিকান ইকোনোমিক এসোসিয়েশনের ৭৮তম বার্ষিক সভা।

ঘর ৩.১ অর্থায়ন থেকে সরবরাহ পৃথকীকরণ — একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কয়েকটি স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংযোগ রক্ষা এবং তত্ত্বাবধান ভূমিকাসমূহ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিজস্ব নির্মাণ ও পরিকল্পনা নক্সা ইউনিট (বিপিডিইউ) স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়, যে ইউনিটটি আসলে ৩৪ জন কর্মী সমন্বয়ে ছোট একটি সেল হিসেবে কাজ করবে। নিয়মানুযায়ী, গণপূর্তের নক্সা, নির্মাণ, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে পড়ে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থাপত্য দপ্তর স্থাপত্য নক্সার জন্য দায়ী, এবং প্রকৃত বাস্তবায়নের জন্য পিডব্লিউডি ফোর্স একাউন্ট ও বেসরকারী ঠিকাদার ব্যবহার করে। পিডব্লিউডি একটি বৃহৎ, কেন্দ্রীভূত সংগঠন, যার আছে ৫,৪০০ জন স্থায়ী কর্মচারী, এবং যার দপ্তরসমূহ সারা দেশে বিস্তৃত। অতীতে যে কোনো সরকারী সংস্থাকে যে কোনো নির্মাণ কাজের জন্যে পিডব্লিউডির হাতে প্রয়োজনীয় তহবিল তুলে দিতে হয়েছে। সেবা প্রদানের জন্য পিডব্লিউডি প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ১৫.৫ শতাংশ গ্রহণ করে থাকে। গুণগত মান ও সময়মত কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে পিডব্লিউডির কার্যসম্পাদনা মোটেও সন্তোষজনক নয়। এই উঁচু কার্যপরিচালনা ফি ছাড়াও, পিডব্লিউডি বিলম্ব এবং ব্যয়বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য বিখ্যাত; তা ছাড়া এর নির্মাণের মানও খুবই নিচু। যদিও থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহ নির্মাণে ১৭ বছর বিলম্ব অস্বাভাবিক ব্যাপারই বটে, *সম্পূর্ণ তহবিলের নিশ্চয়তা দেয়ার পরও পাঁচ বছরের বিলম্ব মোটামুটি সাধারণ ঘটনা।* যদি পছন্দের বিষয়টি থাকত, তবে বেশির ভাগ সরকারী দপ্তর পিডব্লিউডি'র ওপর নির্ভর না করে সরাসরি বেসরকারী ঠিকাদার নিয়োগ করত।

বিপিডিইউ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে কয়েকটি নির্বাচিত বেসরকারী কনসালটেন্ট ফার্মকে নক্সা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধানের কাজের ঠিকা দেয়। এর ফল হয়েছে ইতিবাচক : কাজ শেষ করতে নির্ধারিত ব্যয় ও সময় থেকে অতি সামান্যই বেশি লাগল; মান হল উন্নত, এবং সর্বোপরি বেসরকারী কনসালটেন্ট যে ফি দাবী করল, তা অনেক কম – প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫-৭ শতাংশ। এই পরীক্ষামূলক উদ্যোগের সাফল্য নির্ভর করেছে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ক্লায়েন্ট-এজেন্ট সম্পর্কের উপর, সময়মত এবং মানসম্পন্ন কার্যসম্পাদনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং আমলাতান্ত্রিক বিলম্বের অনুপস্থিতির উপর।

এই উদ্ভাবনী পন্থা ও বিষয়টি হাতে কলমে দেখিয়েছে যে, যদি কোনো বিশেষ সরকারী কর্মকাণ্ড ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়, তাহলে যথাযথ কার্যসম্পাদনা-ভিত্তিক জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা সম্ভব। একটি বিশেষজ্ঞ ইউনিটের মাধ্যমে এবং মূল পক্ষ (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়) ও এজেন্ট (বেসরকারী ঠিকাদার)-এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে এ উদ্যোগটি গণপূর্তের কাজ চুক্তিভিত্তিক বহিঃস্থ সংস্থার হাতে ন্যস্ত করার সুফল প্রদর্শন করেছে। অন্য একটি সরকারী সংস্থা যেসব কাজ প্রথাগতভাবে করে আসছে, তার কিছু চুক্তিভিত্তিক বেসরকারী খাতে ন্যস্ত করার মাধ্যমে চুক্তির শর্তগুলি জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতামূলক হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি, এবং স্টিয়ারিং কমিটি নামে আরো একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রত্যবেক্ষণ করেছে – এবং এভাবে সময়মত কাজ বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই শুধু নয়, বরং সার্বিক মান ও খরচ সাশ্রয়তা বজায় রাখার জন্যও কনসালটেন্ট ও নির্মাণ ঠিকাদারদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

ঘর ৩.২ 'পাওয়ার গেম' – পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পিবিএস) এবং ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (ডেসা)

দুটি সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠানের --- পিবিএস এবং ডেসার – মধ্যে কার্যসম্পাদনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের যথাযথ পদ্ধতিকেই তুলে ধরে। উভয় সংস্থাই বিদ্যুৎ বিতরণ ক্ষেত্রে কর্মরত, এবং উভয়েই বিপিডিবি থেকে পাইকারী হারে বিদ্যুৎ ক্রয় করে। তাদের পরিচালনা ক্ষেত্র অবশ্য আলাদা – ডেসা হচ্ছে শহুরে বিদ্যুৎ বিতরণকারী, যেখানে পিবিএস গ্রামীণ এলাকায় সীমাবদ্ধ। তবে তাদের আরো বেশি উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা হচ্ছে পরিচালনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে। পিবিএস হচ্ছে সমবায়ী অলাভজনক বিদ্যুৎ বিতরণ ইউনিট, যার তত্ত্বাবধান করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), যেখানে ডেসা, যা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)-র একটি উত্তরসুরি, অনেক বেশি প্রথাগতভাবে পরিচালিত হয়। কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এছাড়াও আরো অনেক উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। পিবিএসকে এখন সফল এবং অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে ডেসাকে রাষ্ট্রের অদক্ষতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা হয়।

ডেসার সংগে তুলনায় পিবিএসসমূহ কার্য পরিচালনার প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে অনেক বেশি দক্ষতা অর্জন করেছে, যেমন সিস্টেম লস, কর্মচারী ব্যয়, অনাদায়ী একাউন্ট, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, এবং ভোক্তা-কর্মচারী অনুপাতের ক্ষেত্রে। ৯৪ অর্থবছরে ডেসার সিস্টেম লস ছিল ৩১ শতাংশ, যেখানে পিবিএসগুলির ছিল ১৫ শতাংশ। একই সময়ে প্রদেয় বিলের শতকরা হিসাবে উভয় প্রতিষ্ঠানের আদায় ছিল যথাক্রমে ৭৮ শতাংশ ও ৯৮ শতাংশ। একই বছরে বিল আদায়-ক্রয় এর অনুপাত ছিল ডেসার জন্য ৫৪ শতাংশ, এবং পিবিএসমূহের জন্য ৮৩ শতাংশ। প্রতি জন ডেসা কর্মী মাত্র ৯২ জন গ্রাহককে সেবা দেয়, যেখানে পিবিএস-এর সংখ্যা হচ্ছে ১৮৮, যদিও ডেসার অধিকারভুক্ত এলাকায় গ্রাহকের ঘনত্ব অনেক বেশি। নিম্নমানের আদায় প্রয়াসের জন্য ডেসার অর্থবছর ৯৪ এর শেষে একাউন্টস রিসিভ্যাবল বা প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছিল ৭.৬ মাসের প্রদেয় গড় বিলের সমান, যেখানে পিবিএস এর ক্ষেত্রে এটি মাত্র ২.২ মাস।

সবশেষে, পিবিএসগুলোর জন্য গ্রাহকরাই হচ্ছে কর্তা। পিবিএস -এর অসাধারণ সাফল্যের মূলে রয়েছে গ্রাহক-সন্তুষ্টির দিকে দৃষ্টি, একটি সমবায়ী-মালিকানা বোধ, এবং সামষ্টিক দায়িত্বজ্ঞান। এ ছাড়াও আছে সকল গ্রাহকের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা, এবং প্রতিটি পিবিএস-এর পরিচালনা বোর্ডের মাসিক সভা। গ্রাহক সমস্যা মোকাবেলা করতে এবং তাদের মতামত জানতে পিবিএস-এর গ্রাহক সেবা কর্মকর্তারা রয়েছেন। তাছাড়া, পিবিএস অনেকগুলি অভিযোগ কেন্দ্র খুলেছে, এবং গ্রাহকের দাবীকে তাৎক্ষণিকভাবে মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তুলনায় গ্রাহকের মতামত নির্ধারণের জন্য ডেসার কোনো কার্যপদ্ধতিই নেই।

ঘর ৩.৩. উদ্বুদ্ধকরণ, সমাবেশ ঘটানো এবং প্রত্যবেক্ষণ – সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) হচ্ছে সফল জনসেবা সরবরাহের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক যুগ্মভাবে উদ্ভাবিত এ কর্মসূচিটি ১৯৮৫ সালে চালু হবার পর থেকেই টিকাদান উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করে। হাম-এর বিরুদ্ধে পূর্ণ টিকাদানকৃত শিশুর সংখ্যা যেখানে শুরুতে ছিল মাত্র দুই শতাংশ, এই কর্মসূচি মাত্র ছ'বছরে এই সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া, জরিপে দেখা গেছে, টিকা দেয়া হয়নি এরকম শিশুদের তুলনায় অনুর্ধ-পাঁচ শিশুমৃত্যু নাটকীয় ভাবে কমে গেছে। যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ শিশুকে টিকা দেয়া হয়েছে, সেসব জনগোষ্ঠীতে এই হার ৪০ শতাংশ কম।

ইপিআই'র অসাধারণ সাফল্যের পেছনে তিনটি কারণ দেখানো যায়: উদ্বুদ্ধ কর্মীদল, সামাজিক সমাবেশ এবং প্রত্যবেক্ষণ। যদিও ইপিআই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পড়ে, এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন যথেষ্ট পরিমান বিকেন্দ্রীকৃত। ইপিআই স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের তাদের ওয়ার্ড অথবা ভৌগোলিক এলাকার জন্য পরিকল্পনা করতে কার্যকরভাবে উদ্বুদ্ধ করে, যার ফলে ওয়ার্ডগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রতিটি স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে মাসিক টার্গেট নির্ধারিত থাকে, যার ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপকদের এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অন্যান্য দলগুলির তুলনায় তাদের কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা করতে এবং উন্নত করতে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে, এর ফলে মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা সুবিধাজনক স্থানে – যেমন মানুষের 'দোর গোড়ায়' – সেবা সরবরাহ বজায় রাখতে, এবং নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে কাজ শেষ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

ইপিআই-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর ব্যাপক সমাবেশ ঘটানোর কর্মসূচি। সরকার প্রচার মাধ্যম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং এনজিওদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা কাজে লাগিয়ে একটি কার্যকর সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম হাতে নেয়। এই কর্মসূচির প্রতি অনুকূল সাড়া জাগানোর জন্য টেলিভিশন ও সিনেমার ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করা হয়। এই সমাজিক সমাবেশ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

সরকার ও এনজিও কর্তৃক কার্যকর কর্মসূচি প্রত্যবেক্ষণের ফলে সেবা প্রদানে কোনো ফাঁক থাকার সম্ভবানা রহিত হয়েছে। কার্যসম্পাদনা রিপোর্টগুলি নিয়মিত তৈরি হয়, এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ফিডব্যাকও নিয়মিত পরিচালিত হয়। নির্বাচিত কর্মকর্তারাও মাঝে মাঝেই টিকাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। উদ্বুদ্ধকরণ, সমাবেশ ঘটানো ও প্রত্যবেক্ষণের গুরুত্ব যে কতটা অপরিসীম, ইপিআই কর্মসূচি তা প্রমাণ করে।

ঘর ৩.৪. প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা সরবরাহের বিকল্প পদ্ধতিসমূহ

প্রাথমিক স্বাস্থ্য — যদিও একটি বিশাল গ্রামীণ স্বাস্থ্য অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশংসা দাবী করতে পারে, সেবার মান কিন্তু সাধারণত নিচু। সরকারী খাতের নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে ৩৬০টি থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৩,৪০০টি ইউনিয়ন উপ-কেন্দ্র, যেগুলো থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে – অন্তত কাগজে কলমে – স্বাস্থ্য সেবা যোগান দিচ্ছে। এসব থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বিরাট সংখ্যক ডাক্তার ও অন্যান্য সহায়ক কর্মী নিয়োগপ্রাপ্ত, কিন্তু সরকারী ক্লিনিকগুলিতে খুব কম সংখ্যক রোগীই চিকিৎসা নিতে আসেন – এবং যারা আসেন, তারা ভয়ানকভাবে অপ্রতুল সেবা পেয়ে থাকেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (ব্র্যাক), যা প্রসারণামূলক এবং প্রতিষ্ঠানমূলক স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে নিয়োজিত বৃহৎ এনজিওগুলির একটি, যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৭২ সাল থেকে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে এর প্রধান বিষয় করে শুরু করে ব্র্যাক ধীরে ধীরে তার সেবার প্রসার ঘটিয়েছে এবং একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কার্যক্রম (এইচপিপি) প্রস্তুত করেছে। এ সংস্থা মহিলা ও শিশুদের একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্যাকেজ উপহার দেয় – যার অন্তর্ভুক্ত মাতৃযত্ন, পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ, টিকাদান এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টিশিক্ষা। এই সেবাগুলি নানা উপ-কেন্দ্রে এবং ব্র্যাকের নিজস্ব প্রসব-পূর্ব সেবা কেন্দ্রে পাওয়া যায়; তবে প্রাথমিকভাবে, জনগোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীরা এসব সেবা দিয়ে থাকেন।

সরকারী স্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে জনগণের বিশ্বাসের অভাব প্রতিফলিত করে এ তথ্যটি যে, রোগে ভুগছে এরকম মানুষের মাত্র ১৫ শতাংশ ক্লিনিকগুলিতে যায়। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জনগণের অসন্তোষ এই অভিযোগে প্রতিফলিত হয় যে, "সরকারী ক্লিনিকে লোক যায় মরতে, ভাল হয়ে আসতে নয়।" ব্র্যাকের সাফল্য হচ্ছে এই যে, এর ক্লিনিকগুলিতে তুলনামূলকভাবে অনেক রোগীর ভিড় বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ব্র্যাক যেসব এলাকায় সেবা প্রদান করে, সেখানে গর্ভধারণকারী ৭৩ শতাংশ মহিলা ক্লিনিকের সুবিধা নেন, যেখানে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে এ হার ৩২ শতাংশ।

সরকারী স্বাস্থ্য সেবার অবস্থা কেন এত খারাপ? প্রথমত নিয়োগ থেকে শুরু করে কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণের অভাব রয়েছে। ডাক্তারদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন করা হয়, এবং বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়, যেগুলো ডাক্তারদের পছন্দমত নাও হতে পারে। এর ফলে এসব ডাক্তারের কার্যসম্পাদনা এলাকা সম্পর্কে ধারণা থাকে খুব কম, এবং তাদের মনোবল এবং/অথবা নির্ধারিত কর্তব্য সম্বন্ধে অঙ্গীকারের অভাব দেখা দেয়। ব্র্যাকের কাজকর্ম একেবারেই আলাদা। এর স্বাস্থ্য কর্মীদের নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়, এবং তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। তারা চাকুরির ব্যাপ্তি অনুযায়ী নয়, বরং কার্যসম্পাদনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতি পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয়ত ব্র্যাকের কার্যসম্পাদনা মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া রয়েছে। গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে দ্বারে-দ্বারে স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহে ব্র্যাকের অভিজ্ঞতার ফলে এর সরবরাহ কার্য-পদ্ধতিতে জনগণের আস্থা স্থাপনের বিষয়টি সুগম হয়েছে। সংস্থাটি দেশের প্রতিটি ঘরে লবন-গুড়ের সরবত বা ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপীর (ওআরটি) বাণী প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে, এবং এ কাজের জন্য মহিলা সম্প্রসারণ কর্মী ব্যবহার করে প্রথাগত মহিলা-পুরুষ বাধা অপসারণ করেছে।

তবে, ব্র্যাকের এইচপিপি বাংলাদেশের মাত্র ২০ শতাংশ গ্রামে বিস্তৃত, এবং মাত্র কিছু নির্বাচিত সেবা সেখানে অন্তর্ভুক্ত। এটিকে এখনো সরকার প্রদত্ত সেবার পূর্ণাঙ্গ বিকল্প হিসেবে ভাবা যাবে না। তা সত্ত্বেও ব্র্যাকের সাফল্য এটি প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্য সেবা এনজিওদের মাধ্যমে সফলভাবে দেয়া যেতে পারে। অন্যান্য দেশ থেকেও একই ধরনের ইতিবাচক উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন, থাইল্যান্ডে সেবা প্রদান করে জনগোষ্ঠী-মুখী প্রাথমিক পরিচর্যা গ্রুপসমূহ, যাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য সমবায় বলা হয়। এদের কাজের জন্য সরকার তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়।

প্রাথমিক শিক্ষা — সরকার হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান যোগানদার -- মোট প্রায় ৭৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ ভাগ সরকার পরিচালনা করে। তবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য এনজিওরা প্রধান যোগানদার -- মোট ১২ লাখ ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির প্রায় ৭৬ শতাংশ এনজিওদের স্কুলেই হয়। ব্র্যাক একাই সরাদেশে এ ধরনের অসংখ্য স্কুল পরিচালনা করে, যার ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংখ্যা পাঁচ লাখ। প্রভাব সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে বেশিরভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেয়া শিক্ষা নিম্নমানের, বিশেষ করে কী দেয়া হচ্ছে তার (যেমন -- শেখানো পাঠক্রম, পাঠ্যবই, বা শিক্ষক/ছাত্র অনুপাত) বা ফলাফলের (যেমন – শিক্ষা শেষ করার হার বা শিক্ষা-অর্জন) বিচারে যখন পরিমাপ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে, ১৯৯১ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্কুল ছেড়ে দেয়ার (ঝরে পড়ার) হার ছিল মোট ছাত্রসংখ্যার ৬০ শতাংশ এবং কোনো শ্রেণীতে পুনঃভর্তির হার ছিল ২৩.৪ শতাংশ। একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি পাঁচ বছরের আবর্তন শেষ করতে গড়ে ৭ বছর লেগে যায়। তুলনায়, ব্র্যাকের স্কুলগুলি অনেক ভাল করছে। তাদের তিন বছরের কর্মসূচিতে ঝরে পড়ার হার মাত্র ২ শতাংশ, এবং যদিও কোনো নির্ভরযোগ্য উপাত্ত পাওয়া যায়নি, পুনঃভর্তির হারও অনেক কম বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সরকারী স্কুলগুলির তুলনায় এনজিওদের স্কুলগুলি শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিবেচনা করে স্কুলের সময়কে অনেক স্থিতিস্থাপক করেছে এবং এগুলো বাড়ির অনেক কাছে অবস্থিত। তাছাড়া, এ স্কুলগুলিতে যেসব পদ্ধতি এবং উপকরণ ব্যবহার করা হয়, সেগুলো শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহকে মনে রেখে করা হয়েছে। জনগোষ্ঠীর জড়িত হওয়ার বিষয়টিও অনেক বেশি, এবং সামাজিক সমাবেশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে কার্যকর চাহিদা সৃষ্টি এবং বিকেন্দ্রীকৃত স্থিতিস্থাপক পরিচালন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সৃষ্টিও এনজিও স্কুলগুলির সাফল্যের পিছনে অবদান রেখেছে।

তুলনায় সরকারী স্কুলগুলি অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত। সরকার চালিত প্রাথমিক বিদ্যায়গুলির অনেক সমস্যাই ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রায়ত্বকরণের পদক্ষেপে খুঁজে পাওয়া যাবে, যখন ৩৬,১৬৫ স্কুলকে একটি অনড় কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের অধীনে আনা হয়, যে আমলাতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ছিল জটিল, বহুস্তর বিশিষ্ট এবং ঋজু। স্কুল ব্যবস্থাপনা ও জনগোষ্ঠীর ভেতর পারস্পরিক অসন্তোষ সেবার মান দ্রুত কমিয়ে আনে। বস্তুত জনগোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্নতায় ভুগতে থাকে। এই পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে – যেমন কোনো কোনো ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ উন্নত করা হয়েছে এবং জনগোষ্ঠীগুলিকে অংশগ্রহণের বেশি সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত সমাধান হবে দায়-দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া – এবং স্থানীয় সরকার প্রয়োজনবোধে এনজিওদের বা বেসরকারী খাতের হাতে কর্মকাণ্ডগুলি ছেড়ে দিতে পারে।

ঘর ৩.৫. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর: একটি দক্ষ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর, যা সাধারণত এলজিইডি নামে অভিহিত, ১৯৭০ এর দশকে স্থানীয় সরকার বিভাগে একটি ছোট সেল হিসাবে যাত্রা শুরু করে। আজ এলজিইডি তার গ্রামীণ অবকাঠামো নিয়ে দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দ্বিতীয় বৃহত্তম বাস্তবায়নকারীদের একটি। অর্থবছর '৯৫ তে এর বাজেট ও কর্মসূচি ছিল মোট ১২০০ কোটি টাকার (৩০ কোটি ডলার)। এলজিইডিকে সেবা সরবরাহকারী এবং দাতারা সবচেয়ে দক্ষ এবং কার্যকর সরকারী সংগঠনগুলির একটি বলে মনে করেন। এটি প্রমাণ করে যে বিচক্ষণ সাংগঠনিক চর্চার মাধ্যমে একটি সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে এবং খরচ-সাশ্রয়ীভাবে কাজ করতে পারে। এলজিইডি'র সফল পরিচালনার পেছনে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে সেগুলো হল:

- *বিকেন্দ্রীকরণ* -- এলজিইডি-র অধিকাংশ (৯০ শতাংশ) কর্মী থানা পর্যায়ে কর্মরত; বস্তুত যে কোনো মাঠ পর্যায়ের সরকারী সংগঠনের মধ্যে এর কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি আনুষ্ঠানিক হারে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আছেন।

- *পেশাদারিত্ব* -- এলজিইডি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদারী কর্মীবাহিনী এবং দক্ষতার অবিরাম উন্নতির ওপর জোর দেয়ার জন্য সর্বজনবিদিত। থানা, জেলা ও সদর দপ্তর পর্যায়ে কর্মীদের জন্য এর একটি সু-প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি রয়েছে। প্রতিবছর এর ১৫টি জেলা কেন্দ্র ৩০,০০০ প্রশিক্ষণার্থী দিবসে ৪০ টি কোর্স বাস্তবায়ন করে। বেসরকারী খাতের অনুরূপ এলজিইডি ব্যবস্থাপনা কর্মীদের অসাধারণ অর্জনের জন্য স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। সংস্থার ম্যাগাজিনে অথবা প্রশংসাপত্রে, বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য কর্মীদের নির্ধারণে এবং আধা-বার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে এ চর্চাটি হয়ে থাকে। এসবের ফলে কর্মী মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।

- *প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি* – সংগঠনটির ব্যবস্থাপনা তথ্যপদ্ধতি (এমআইএস) ১৯৮৭ সালে শুরু হয়, যখন কুড়িগ্রামের গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচিতে একটি কম্প্যুটারাইজড প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এলজিইডির শীর্ষ ব্যবস্থাপকরা এমআইএসকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ১৯৯৩ সাল থেকে সকল এলজিইডি প্রকল্প প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার একটি সমন্বিত ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ চলছে।

- *অনানুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ* – এলজিইডি ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াজাত করার সময়-সাপেক্ষ চর্চাটিকে পাশ কাটিয়ে গেছে। ফাইল চালাচালির ওপর ভিত্তি করে যে লিখিত যোগাযোগ চালু রয়েছে, তা ব্যবহার না করে এই সংগঠনটি টেলিফোন ও ফ্যাক্স সংযোগের মাধ্যমে অনেক পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

- নেতৃত্ব – এলজিইডি-র প্রধান নির্বাহী সংগঠনটির সংগে প্রায় এক দশক ধরে আছেন। এলজিইডি সম্পর্কে জ্ঞাত সরকার/দাতা সংস্থার কর্মকর্তারা তাঁকে নতুন কর্মীদের জন্য ধারাবাহিকতা ও উদ্বুদ্ধকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক উৎস বলেই জানেন।

- *দলগত কাজ* – সংগঠনটি ভাল দলগত কাজের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সংগঠনের কর্ম-উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত এবং অর্জনের অনুভূতিটিও তীক্ষ্ণ। উর্ধতন ব্যবস্থাপকরা দীর্ঘ সময় কাজ করেন এবং উচ্চমানের কর্মতৎপরতা ও ফলাফল বজায় রেখে ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী কর্ম-নৈতিকতা তৈরি করেছেন। এর ফলে কম সরকারী বেতন, জবাবদিহিতার অভাব এবং অপর্যাপ্তভাবে নির্ণিত কর্ম-উদ্দেশ্যের সংগে সম্পর্কিত সাধারণ অনুদ্দীপনাগুলিকে মোটামুটিভাবে মোকাবেলা করা সহজ হয়েছে।

- *বৃহত্তর উদ্দেশ্যবোধ* -- এলজিইডি জোরেসোরে এর প্রধান উদ্দেশ্যটি অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে, যা হল 'তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের সেবা করা'। জনগণের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেয়ার ফলে এলজিইডি প্রকল্পগুলির উচ্চ সাফল্য হার অর্জিত হয়েছে। এই প্রথমবারের মত পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলি প্রকৌশলীদের স্বীকৃতি দিচ্ছে।

ঘর ৩.৬. সরকার-এনজিও সহযোগিতার কয়েকটি সফল উদাহরণ

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দরিদ্রদের জন্য আয়-সৃষ্টিকারী ঋণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য এনজিওদের তহবিল যোগানের জন্য পিকেএসএফ একটি শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৯০ সালে স্থাপিত হয়, এবং এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ১১০টি এনজিওকে ৪৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে; এনজিওগুলি আবার ২৫০,০০০ দরিদ্র মানুষকে অর্থ যুগিয়েছে। প্রায় ৯০০ এর বেশি এনজিও তহবিলের জন্য আবেদন করলেও ফাউন্ডেশন মাত্র ১১০টিকে বাছাই করেছে। সকল পক্ষের অর্থ ফেরত হার প্রায় ১০০ ভাগ। এই সাফল্যের পেছনে কী কাজ করেছে ?

- *একটি নিরপেক্ষ এবং পেশাদারী বোর্ড* – পিকেএসএফ-এর বোর্ডে আছেন প্রখ্যাত এবং যোগ্য পেশাদারী ব্যক্তিরা, যাদের বেশির ভাগ এসেছেন বেসরকারী খাত থেকে।
- *বিচক্ষণ নিয়োগ প্রক্রিয়া* – পিকেএসএফ-এর অধিকাংশ পেশাদার কর্মী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে। তাদের ন্যূনতম দুটি প্রথম বিভাগ এবং মাষ্টার্স ডিগ্রী থাকতে হয়।
- *স্বায়ত্তশাসিত চরিত্র* – নিয়োগ, পরিচালন নীতিমালা এবং বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ বোর্ডের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যার ফলে ভালো কর্মী নিয়োগ দিতে তাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- *সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট* – পিকেএসএফ এর একটি সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট রয়েছে যার ফলে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

এখন পর্যন্ত একটি দুর্বলতা অবশ্য রয়ে গেছে যে, এর প্রধান নির্বাহী অফিসার হচ্ছেন অল্প মেয়াদে প্রেষণে প্রেরিত একজন উর্ধতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তবে সম্প্রতি ঠিক করা হয়েছে যে, প্রধান নির্বাহীকে বোর্ড (সরকার নয়) নির্বাচন ও নিয়োগ দেবে।

পিকেএসএফ মডেলটি দু'টি উপায়ে অন্যত্র প্রয়োগ হতে পারে: (১) অন্যান্য খাতের জন্য – যেমন স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো, এবং শিক্ষা – পিকেএসএফ ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এগুলো এনজিওদের তহবিল যোগান দেবে, যাদের জন্য একটি দক্ষ পেশাদারী মধ্যস্থতাকারীর সংগে লেনদেন করাটা অনেক সহজ হবে; (২) রাষ্ট্রীয়-মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি কর্পোরেট মডেল হিসেবে। যদি বাংলাদেশ সরকার এসওই-দের পিকেএসএফ -এর মত কাজ করতে দেন, তাহলে এসওই-দের বিপুল লোকসান কমে আসবে এবং সারা দেশটিরই উপকার হবে। এসওই বোর্ডগুলিতে সরকারী কর্মকর্তারা থাকার ফলে নীতি পরিচালন ও বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে এগুলোর স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে না করদাতার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, না নাগরিকদের চাহিদা মেটানো হয় – উভয়েই বর্তমান কর্মপদ্ধতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পানি ও স্যানিটেশন(ওয়াটসান)

স্থানীয় ও বিদেশী এনজিওদের সহযোগিতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠী কিভাবে তাদের পানি ও স্বাস্থ্যবিধানের উন্নতি সাধন করতে পারছেন এক্ষেত্রে এর প্রমাণ রেখেছে সরকার-এনজিও সহযোগিতা। ১৯৮০-৮১ সালে স্বাস্থ্যবিধান মেনে চলার হার ছিল মাত্র দুই শতাংশ, এবং ওয়াটসান ক্ষেত্রে এনজিও-র অংশগ্রহণ ছিল অসন্তোষজনক। কিন্তু পানি ও স্বাস্থ্যবিধানের আন্তর্জাতিক দশকের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৯০-৯১ সালের মধ্যেই এনজিওরা এই হার ১৬ শতাংশে উন্নত করতে সক্ষম হয়, এবং বর্তমানে এ হার ৩৫ শতাংশ। গত দশকে টিউবওয়েল-এর ব্যাপ্তিও একইভাবে বেড়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যার ৯৬ শতাংশ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েল ব্যবহার করে। গত দশকে এনজিও ফোরাম নামে একটি শীর্ষ সংস্থার অধীনে এনজিওরা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ৮৫ লক্ষ মানুষের কাছে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যবিধান পৌঁছে দিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এবং প্রান্ত-শহর অঞ্চলে ১০০,০০০ টিউবওয়েল স্থাপন করেছে, এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে বিশ লাখ পায়খানা বসিয়েছে। কিন্তু এর জন্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক বা

আর্থিক সহায়তা প্রায় ছিলই না। এদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকার ১৯৯৬ এর জুনের মধ্যে তাদেরকে প্রধানমন্ত্রীর ৫০ শতাংশ স্বাস্থ্যবিধান টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য বলেছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার তাদের ৪০ কোটি টাকা দিয়েছে। এ কাজের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ছ'মাসের মধ্যে অতিরিক্ত বিশ লাখ পায়খানা বিতরণ ও স্থাপন করা। তুলনায়, গণস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল দপ্তরের ক্ষমতা হল বার্ষিক ১০০,০০০ পায়খানা বিতরণ ও বসানো। এনজিওরা এই বিশাল অবদান রাখতে শুধু যে রাজিই হয়েছে, তা নয়, তারা একটি নীতিগত পরিবর্তনও এনেছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব কর্মসূচির অধীনে, সাহায্যপ্রাপ্তদের ভর্তুকিসহ ৪০০ টাকা হারে পায়খানা দেয়া হয় (যাতে ভর্তুকির পরিমানই দাঁড়ায় ২৫০ টাকা)। এনজিওরা পুরো ৬০০ টাকাই আদায় করে, এবং ভর্তুকি দিতে অস্বীকার করে। এনজিওদের মতে এই ভর্তুকি অপ্রয়োজনীয়।

কেইস সমীক্ষাগুলি থেকে যা দেখা গেল

৩.২ উপরের কেইস সমীক্ষাগুলি কতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক উপাদানকে সামনে নিয়ে আসে – যেসব উপদান অনেকগুলি জনসেবা কার্যক্রমকে সাফল্য দিয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করেছে যেসব উদ্দীপক বিষয়, সেগুলোতে পরিবর্তন এনেছে নিচের মূল বিবেচ্যসমূহ : বিকেন্দ্রীকৃত পরিচালনা; উচ্চ পর্যায়ের জবাবদিহিতা; সেবার চাহিদা; জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ; ব্যবহারকারীর মতামত; ব্যক্তিগত মালিকানা; উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া এবং সংগঠন; কাজ বাইরে ঠিকা দেয়া; এবং কার্যকর সরকার-এনজিও অংশীদারিত্ব। এসব বিষয় প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করেছে, গ্রাহকদের হাতে সম্পদ ও তথ্য পৌঁছে দিয়েছে এবং একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতায় নিয়ে এসেছে। সার্বিকভাবে "সরকারী সেবা সামগ্রীর" বাজার সৃষ্টির একটি প্রভাব এতে পড়েছে, যা বেসরকারী বাজারকে অনুকরণ করেছে।

৩.৩ ***বিকেন্দ্রীকরণ*** – বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি উন্নয়ন শিক্ষা হল এই যে, উচ্চ পর্যায়ের গ্রাহক-সন্তুষ্টিসহ সকল কর্মসূচির বেশির ভাগই বিকেন্দ্রীকৃত। এটি সেসব কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য যেখানে শীর্ষ পর্যায় থেকে নিরন্তর তত্ত্বাবধান এবং ব্যবহারকারীদের থেকে তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রয়োজন। একটি জরিপ মতে, বাংলাদেশ সচিবালয় ও সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে বর্তমানে সাতটি স্তর রয়েছে।

৩.৪ কম কেন্দ্রীভূত পদ্ধতির সুফলসমূহ বিকেন্দ্রীকৃত ইপিআই কর্মসূচির সাফল্য থেকেই প্রতীয়মান। উল্লেখ্যযোগ্য এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ইপিআই কর্মসূচির প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত তহবিল নিয়ন্ত্রণ করেছে স্থানীয় সরকার। স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদেরও তাদের নিজেদের ভৌগোলিক অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্টেইকহোল্ডার বা যারা ঝুঁকি নেন তাদের অংশগ্রহণ পিবিএস কর্মসূচিরও শক্তিশালী দু'টি উপাদান। যদিও আরইবি প্রাথমিকভাবে একটি পিবিএস স্থাপনে সাহায্য করে, এবং বিদ্যুৎ লাইন স্থাপনে সহযোগিতা দেয়, ধীরে ধীরে বেশির ভাগ কর্তৃত্ব কিন্তু পিবিএস এর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। প্রতিটি পিবিএস-র নিজস্ব কর্পোরেট কাঠামো রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পিবিএস মহাব্যবস্থাপক তিনটি শীর্ষ কর্মকর্তার পদ ছাড়া অন্য সকল পদে নিয়োগের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ।

৩.৫ তবে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে একটি সাবধানবাণী। বিকেন্দ্রীকরণ এবং দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া এক জিনিষ নয়। নিম্ন পর্যায়ে কর্তৃত্বের যাতে অপব্যবহার না হয়, সেটি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে ত্রুটিহীন প্রত্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে কর্তৃত্ব এবং প্রভাব তাদেরই দেয়া যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবার মান বাড়ানো; কিন্তু একই সাথে ফলাফলের জন্য এবং কায়েমি স্বার্থের চাপ মোকাবেলা করার জন্য তারা দায়ী থাকবেন। একটি বিচক্ষণ প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি অনেকটা সুরক্ষা দিতে পারে। তবে সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা

হচ্ছে ব্যবস্থাটিতে যাতে স্টেইকহোল্ডার বা যারা ঝুঁকি নেন তাদের মতামত প্রতিফলিত হয়, তা নিশ্চিত করা: অর্থাৎ, শিক্ষাক্ষেত্রে পিতামাতাদের; বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য গ্রাহকদের; এবং থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীদের।

৩.৬ *কার্যসম্পাদন-ভিত্তিক জবাবদিহিতা* – বেশিরভাগ সরকারী কর্মসূচি ব্যর্থ হয় জবাবদিহিতার অভাবের জন্য। এ সমস্যার সিংহভাগ তৈরি হয় দপ্তরগুলির অভ্যন্তরীণ ভুলক্রটি সংশোধনের জন্য বহিঃস্থ চেক এন্ড ব্যালেন্সের অভাবে। অনেকগুলি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেখানে একই ব্যক্তি চুক্তিভিত্তিক একটি কাজ প্রদান করেন, তার বাস্তবায়ন এবং তত্ত্বাবধানও করেন। আরেকটি দুর্বল এলাকা হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের স্বচ্ছ ব্যবস্থার অভাব। বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাভাবিকভাবে গৃহীত কর্ম-উদ্দেশ্যের বিপরীতে ভালো কার্যসম্পাদনকারীকে পুরস্কৃত করে এবং যারা সবসময় খারাপ কার্যসম্পাদনা করে তাদের অব্যাহতি দিয়ে কর্মী মনোবল চাঙ্গা রাখে। একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে একই মাত্রার শৃঙ্খলা কখনো অর্জিত না হলেও কিছু কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান কার্যসম্পাদন-ভিত্তিক জবাবদিহিতার বিষয়টি চালু করতে শুরু করে দিয়েছে।

৩.৭ ইপিআই কর্মসূচির অধীনে প্রতিটি স্থানীয় সরকার কেন্দ্রে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ছিল যাতে প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য মাসিক টার্গেট টাঙ্গানো থাকত। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপকরা এতে দ্রুত তাদের নিজেদের কার্যসম্পাদনা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যেতেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানে পদক্ষেপ নিতেন। বিভিন্ন পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক দল টিকাদান কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদের পর্যবেক্ষণ লিখে রাখার জন্য একটি চেকলিষ্ট নিয়ে যেত। পরে মাঠকর্মীরা তার ফলো-আপ করত। কার্যসম্পাদন-ভিত্তিক জবাবদিহিতা সমগোত্রীয়দের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে, এবং এটি নিশ্চিত করে যে গ্রাহক সেবা নিয়মিত এবং উচ্চ-মানের হচ্ছে। একই থানার ভিতরে কার্যসম্পাদনায় ভিন্নতা প্রতিযোগিতামূলক চাপ তৈরি করে যার ফলে কর্মীরা তাদের কার্যসম্পাদন উন্নত করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

৩.৮ পিবিএসগুলির উদ্দীপক যোগানোর একটি কার্যকরী কাঠামো আছে। বেতন কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বিস্তারিত কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন পদ্ধতিও তারা প্রয়োগ করে। প্রতিটি পদে অনেকগুলি বেতন স্কেল রয়েছে যেখানে, বার্ষিক কার্যসম্পাদনা সন্তোষজনক হলে, বেতন বাড়ার সুযোগ থেকে যায়। কর্মীদের স্কেলে লাফ দিয়ে ওঠার সুযোগ রয়ে যায়। পিবিএস উদ্দীপক-কাঠামোর বিস্তারিত নিয়মনীতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আরইবি পিবিএস এর সাথে বার্ষিক ভিত্তিতে এর কার্যসম্পাদনা টার্গেট নির্ধারণ করে, এবং বোনাসের পাশাপাশি খারাপ কার্যসম্পাদনার জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। অন্যদিকে, ডেসার একটি কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে যা শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ। বাস্তবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয় এবং ডেসার পদ্ধতি কখনো কার্যকরী করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, সকল ডেসা কর্মী (ইউনিয়নের চাপে) বিশেষ বোনাস হিসেবে এক মাসের বেতন আদায় করে নিতে সক্ষম হন, যদিও টার্গেট অর্জিত হয়নি। তাদের যুক্তি ছিল, টার্গেট খুবই দুরূহ, কাজেই অর্জন সম্ভব নয়। পিবিএস পরিচালনা সাফল্যের আরেকটি কারণ হচ্ছে নিয়োগ-ছাঁটাই-এ ঋজুতার অনুপস্থিতি। আরইবি তার মহাব্যবস্থাপক, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও জেলা ব্যবস্থাপকদের অব্যাহতি দিতে পারে; মহাব্যবস্থাপকও তার অধীনে এ তিনজন ছাড়া যে কোনো কর্মীকে অব্যাহতি দিতে পারেন। পিবিএস এর মিটার পাঠকরা বার্ষিক চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যা সন্তোষজনক কার্যসম্পাদনের ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য। অন্যদিকে, ডেসার কর্মীরা সরকারী কর্মচারীদের দেয়া নিরাপত্তা ভোগ করেন, এবং যে কোনো শৃঙ্খলাগত ব্যবস্থার আওতা থেকে তারা কার্যতঃ স্বাধীন।

৩.৯ ***কর্মী উদ্বুদ্ধকরণ*** -– অনেক সফল কর্মসূচিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কর্মী উদ্বুদ্ধকরণ অর্জিত হয়েছে উন্নত নিয়োগ, বাজার-ভিত্তিক বেতন এবং কার্যসম্পাদনা স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি। উদ্বুদ্ধ কর্মীদের জন্য নিয়োগ থেকেই শুরু করতে হয়। ব্র্যাক চাকুরির ধরন ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বিজ্ঞাপনেই উল্লেখ করে দেয় – যেমন কোথায় কাজ করতে

হবে অথবা কর্মীকে মাঠের কাজের কতভাগ সময় ব্যয় করতে হবে। এর ফলে ব্র্যাকের একজন ডাক্তার গোড়া থেকেই ঐ নির্দিষ্ট কাজ হাতে নিতে প্রস্তুত হতে পারেন। সরকারী কর্মসূচিতে ডাক্তারদের জন্য অবশ্য অবস্থাটা একেবারেই আলাদা। এদের নিয়োগ প্রদান করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা, কিন্তু কর্মস্থল বা কাজের প্রকৃতির বিষয়টি অন্ধকারেই থাকে। নিয়োগ প্রাপ্তির পর ডাক্তাররা দীর্ঘ তদবিরের মাধ্যমে পছন্দসই কর্মস্থলে নিয়োগ পাওয়ার জন্য লেগে পড়তে পারেন। তবে তাদের পছন্দসই কর্মস্থল সাধারণত প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চল হয় না— অথচ তাদের সেবার সবচেয়ে বেশি চাহিদা সেখানেই। স্থির করা টার্গেটের বিপরীতে কার্যসম্পাদন প্রত্যবেক্ষণ করে ব্র্যাক তার কর্মীদের সবসময় তৎপর রাখে। ব্র্যাকে পেশাদারী অগ্রগতি এবং পদোন্নতি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যসম্পাদনের সংগে সম্পর্কিত। ব্র্যাকের একটি সহজ ও কার্যকর ছাঁটাই পদ্ধতিও রয়েছে। তুলনায়, সরকারী চাকুরি হচ্ছে সারাজীবনের জন্য। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, ব্র্যাকের ডাক্তারদের "বাজার ভিত্তিক" বেতন দেয়া হয় যাতে উদ্দীপকের সংগে জবাবদিহিতার ভারসাম্য রক্ষা হয়।

৩.১০ *সেবার চাহিদা সৃষ্টি* – সমাজ-মুখী বেশ কয়েকটি কর্মসূচি বিফল হয়েছে শুধু পরিকল্পনার অভাবের জন্য। এগুলো ব্যর্থ হওয়ার একটি সাধারণ কারণ হচ্ছে জনগোষ্ঠীর ভিতরে আগ্রহ সৃষ্টির, এবং তাদের মধ্যে সেবার চাহিদা সৃষ্টির অক্ষমতা। কর্মসূচিকে সফল করতে হলে সম্ভাব্য সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সেবা/সামগ্রীর জন্য চাহিদা সৃষ্টি এবং তা সরবরাহ উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১১ উদাহরণস্বরূপ, ইপিআই-র যোগাযোগ পরিকল্পনায় এ বিষয়টির ওপর জোর দেয়া হয় যে, একটি সফল কর্মসূচি নির্ভর করবে টিকার জন্য চাহিদা সৃষ্টির ওপর। টিকাদান কর্মসূচির শুধুমাত্র 'অনুভূত সুফল' রয়েছে, যা অধিকাংশ অশিক্ষিত গ্রামীণ টার্গেট জনগোষ্ঠীর কাছে তাৎক্ষণিক আবেদন রাখতে হয়তো সক্ষম হবে না। ইপিআই কর্মসূচিতে চাহিদার নিশ্চয়তার জন্য সকল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, আগ্রহ এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয়। সকল ধরনের প্রচার মাধ্যমে এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহায়তার ওপর নির্ভর করে এই কর্মসূচি সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারীদের একত্র করে। তবে পরিবার ও শিশুদের আকর্ষণ করার জন্য সিনেমা ও টিভি তারকাদের ব্যবহার বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছে। এটি ছিল হাতে গোনা সামাজিক কর্মসূচিগুলির একটি যেখানে সরকার তার সবগুলি সংস্থাকে জড়িত করতে পেরেছিল, এবং সরকারী কর্মকর্তাদের অঙ্গীকার আদায়ে সক্ষম হয়েছিল।

৩.১২ ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিগুলি এমন কিছু উদাহরণ তুলে ধরে যেখানে সেবার জন্য চাহিদা সৃষ্টি সাফল্যের একটি উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সহজে পৌঁছানো যায় না এমন শিশুদেরকেও এ থেকে সুবিধা আদায় করার জন্য আকর্ষণ করতে সফল হয়েছে। এটি করা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন আয়-সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করে, যাতে শিশুরা স্কুলে যাবার সময় পায়। অন্যদিকে, পিতামাতার মধ্যেও ব্র্যাকের কার্যক্রম মেনে চলার জন্য এক ধরনের দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা হয়। চাহিদাকে আরো গুরুত্ব দেয়ার জন্য ব্র্যাকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা কার্যক্রমকে ১৯৯১ সালে পুনর্বিন্যস্ত করে একে নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচি নাম দেয়া হয়। এতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল, কিশোরীদের শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য প্রচেষ্টাসমূহ বজায় রাখা। ব্র্যাকের খাবার স্যালাইন জনপ্রিয় করাটা সফল চাহিদা সৃষ্টির আরেকটি উদাহরণ।

৩.১৩ *জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সমাবেশ ঘটানো* -— আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঐকমত্য এটি প্রমাণ করেছে যে, সফল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক সমাবেশ ঘটানো। সহজ ভাষায় বিষয়টি এভাবে বলা যায় যে, অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে স্টেইকহোল্ডার বা ঝুঁকিগ্রহণকারীরা উন্নয়ন উদ্যোগ শুরু করেন এবং এর নিয়ন্ত্রণ ভাগ করে নেন। কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি যাদের নিয়ে হবে, তারা এর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান নেবেন এবং তাদের মতামত প্রকল্প পরিকল্পনাতে প্রতিফলিত হতে

হবে। বেশ কিছু প্রকল্প সদিচ্ছামূলক সমর্থনের অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কেইস সমীক্ষাগুলি পূর্বাপর সামাজিক সচেতনতার গুরুত্বকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।

৩.১৪ জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে ব্র্যাক তার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিকে সফল করতে পেরেছে। প্রতিটি স্কুলে পাঁচ সদস্যের একটি গ্রাম কমিটি আছে, যাতে আছেন শিক্ষক, সমাজনেতা এবং ব্র্যাক কর্মকর্তা। এই কমিটি নিয়মিত সভা করে স্কুলের এবং ছাত্র/ছাত্রীদের সমস্যা নিরসন নিয়ে আলোচনা করে। এই সভাগুলি শিক্ষকদের তাদের শিক্ষকতায় আরো বেশি আগ্রহী হতে, রীতিমত ক্লাস নিতে এবং ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে স্পষ্টতই উদ্বুদ্ধ করেছে। অভিবাবকরাও তাদের সন্তানদের রীতিমত স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হয়েছেন। অন্যদিকে, সরকারী স্কুলগুলিতে সমাজের অংশগ্রহণের অভাব রয়েছে। ১৯৭৩ সালের স্কুল রাষ্ট্রায়াত্তকরণের একটি দুঃখজনক দিক ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন এবং অংশগ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়া। এদিন ইতিহাসের একটি চক্র শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। দু'দশক পর, সরকার আবার জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে; সম্প্রতি সরকার-চালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সরকার স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি চালু করেছে। মূল সমস্যা অবশ্য এখনও রয়ে গেছে, এবং সেটি হচ্ছে জবাবদিহিতার অভাব। সরকার নিযুক্ত শিক্ষকের জনগোষ্ঠীর ডাকে সাড়া দেয়ার কোনো আর্থিক আগ্রহ নেই, কারণ তার বেতন সরকারী কোষাগার থেকে পাওয়াটা নিশ্চিত।

৩.১৫ ইপিআই কর্মসূচিতে জোরদার জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আছে। এই কর্মসূচি দপ্তরের প্রধান, পেশাজীবি ও সমাজনেতাদের সংগে ইউনিয়ন-পর্যায়ের সভার আয়োজন করে। এসব সভায় টিকাদান কেন্দ্র এবং যানবাহনের ধরন ইত্যাদি স্থানীয় পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নির্ধারণ করা হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে জনগোষ্ঠীগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারে। গ্রাহকরা তাদের নিজেদের বাড়িতে টিকাদান অধিবেশনের প্রস্তাব দিয়ে তাদের সমর্থন এবং উদ্যম প্রতিফলিত করেছেন।

৩.১৬ ব্র্যাকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচিটিও কার্যকর সামাজিক সমাবেশ ঘটানোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি সচেতনতা সৃষ্টি দিয়ে শুরু করে। গ্রাম পর্যায়ের দুঃস্থ মহিলাদের চিহ্নিত করে ২৫ জনের লক্ষ্যভুক্ত দলে সংগঠিত করা হয়। এই দলগুলি তখন সময়ান্তিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি তথ্য বিতরণ করে। লক্ষ্যভুক্ত দল থেকে নেয়া সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। এ কমিটি গ্রাম স্বাস্থ্যকর্মী ও সনাতন ধাত্রী হিসেবে প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করে। এসব সমাজ-ভিত্তিক প্রয়াসকে বহিঃস্থ সার্ভিস সরবরাহের সংগে যুক্ত করা যায়, যাতে দক্ষতার মাত্রা বৃদ্ধি সম্ভব হয়। সরকারের জন্য যে চ্যালেঞ্জটি বাকি থাকে, তা হল সামাজিক সমাবেশ ঘটানোর জন্য যে এ ধরনের উপায় গ্রহণ করা।

৩.১৭ *ব্যবহারকারীদের বক্তব্য এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি* – যেকোনো সেবার জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে গ্রাহক সন্তুষ্টি। এ ধারণাটি সরকারী খাতের সংস্থাগুলির কাছে মাত্র অতি সম্প্রতি স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে। গ্রাহকের অংশগ্রহণ বিষয়ে পিবিএস এর একটি শিক্ষণীয় -- যদিও সীমিত -- অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রাত্যহিক অভিযোগ মেটানোর কার্যকর একটি পদ্ধতি ছাড়াও, প্রতিটি পিবিএস বছরে দু'থেকে তিনবার গ্রাহকদের সভা অনুষ্ঠান করে। এসব সভায় পিবিএস কর্মকর্তারা, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং গ্রাম উপদেষ্টারা অংশগ্রহণ করেন। বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) সময় গ্রাহকরা পিবিএস এর কর্মীদের সংস্পর্শে আসেন। একটি এজিএম-এর কুয়োরাম হচ্ছে ১০০ জন সদস্য। পিবিএস সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আগ্রহের মাত্রা প্রতীয়মান হয় এ তথ্যটি থেকে যে প্রতিটি এজিএম-এ সাত থেকে আট হাজার গ্রাহক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এসব সভায় তাদের দাবী ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে আগ্রহের সাথে শোনা হয় এবং যথাসাধ্য মেটানো হয়। গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া

আহ্বানের এরকম কোনো পদ্ধতি ডেসায় নেই; পক্ষান্তরে, ডেসা গ্রাহকদের এক বিশাল অংশ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া সংস্থা এবং এর শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের কাছে জিম্মি।

৩.১৮ বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে সরকারী সংস্থাগুলি অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি পিতৃসুলভ মনোভাব গ্রহণ করেছে। শিল্পোন্নত দেশে সরকারী সংস্থাগুলি অবশ্য গ্রাহক/ভোক্তাদের মতামত জানতে অনেক বেশি প্রয়াস নিচ্ছে। সরকারী সংস্থাগুলিকে বেশি করে গ্রাহক-উদ্দিষ্ট করাটাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, গ্রাহক-উদ্দিষ্ট সেবাসমূহে দক্ষতা বেশি, অপচয় কম; গ্রাহকদের পছন্দ করার ক্ষমতা দেয়া হয়; আরো বেশি উদ্ভাবন উৎসাহিত হয় এবং সেবাদানকারী পছন্দ করার সিদ্ধান্তটি রাজনীতিমুক্ত থাকে; এবং সামাজিক ন্যায়নীতির জন্য অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩.১৯ *মালিকানা* -- গত তিন দশকের অভিজ্ঞতা থেকে সুস্পষ্টভাবে সরকারী মালিকানার নেতিবাচক দিকগুলি প্রতীয়মান হয়েছে, বিশেষ করে সরকারী খাত যে কোনো প্রতিযোগিতা থেকে সংরক্ষিত থাকায়। সরকারী খাতের মালিকানা দায়িত্বহীন কর্মী প্রতিপালন করে, প্রতিযোগিতামূলক চাপ হ্রাস করে, এবং লাভজনক অবস্থা অর্জনে উদ্দীপনা দুর্বল করে। অন্যদিকে যদি ভোক্তা/গ্রাহকদের কোম্পানীর মুনাফায় একটি স্টেইক থাকে, এবং এর ব্যবস্থাপনায় একটি কণ্ঠ থাকে, তাহলে ফলাফল সাধারণত অনেক বেশি ইতিবাচক হয়। কেইস সমীক্ষাগুলি এ বিষয়টি জোরের সাথে প্রমাণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পিবিএসগুলি গ্রাহকদের মালিকানার সমবায়। তাছাড়া এগুলো না-লাভ না-ক্ষতি ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, এবং অর্জিত মুনাফা সকল গ্রাহকের মধ্যে হ্রাসকৃত বিদ্যুৎ হারের মাধ্যমে বন্টন করা হয়। অন্যদিকে, ডেসা একটি রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের সকল শৃঙ্খলে বন্দী। একটি সোজা সংস্কার হবে ডেসাকে পিবিএস ধরনের সংস্থায় রূপান্তরিত করা।

৩.২০ ***উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া ও সংগঠন*** – আদর্শিক ভাবে পাবলিক সার্ভিসকে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের গ্রাহকের কাছে ছড়িয়ে পড়া উচিত। সুনির্দিষ্ট স্থানীয় সমস্যা ও চাহিদার প্রতি এর নমনীয় সাড়াদানের সামর্থ্য থাকা উচিত। দুঃখজনকভাবে, সরকারী নিয়ম ও বিধিসমূহে মেনে চলাকেই জোর দেয়া হয়, যার ফলে উদ্ভাবন ও নমনীয়তা দেখাতে কর্মীরা সাহস পান না।

৩.২১ ব্র্যাকের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে উচ্চ মাত্রার নমনীয়তা প্রদর্শন করে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রুপের সুবিধাপ্রাপ্তদের নিয়ে যেসব কর্মসূচি চলছে, সেগুলিতে সমস্যা-সমাধানের চাবিকাঠি হিসেবে একে বিবেচনা করা যায়। ব্র্যাক জনগোষ্ঠীতে বসবাসরত আধা-পেশাদারী শিক্ষকদের নিয়ে এবং গ্রামের শিশুদের চাহিদা ও আগ্রহের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে একটি তিনবছরের পাঠক্রম তৈরি করে। এসব উদ্ভাবনা লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের স্কুলে আকর্ষণ করতে বিশেষভাবে সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছে।

৩.২২ স্থানীয় পর্যায়ে নমনীয়তা প্রদর্শন পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ডেরও একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র, বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্র এবং ফিলিপাইনের পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ব্যবস্থাপনা চার্টগুলি আরইবি গ্রহণ করেছে। আরইবি একটি আধুনিক, গতিশীল প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে কার্যসম্পাদনার ওপর ভিত্তি করে পুরস্কার ও তিরস্কারের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়। অন্যদিকে, ডেসা হচ্ছে সরকারী খাতের সংগঠনগত কাঠামোর একটি উদাহরণ, যেখানে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আমলাতান্ত্রিক পুরস্কার-পদ্ধতি প্রচলিত। ডেসা তার জনক সংগঠন পিডিবি'র কর্পোরেট সংস্কৃতির ভারে নুয়ে পড়েছে (অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং ইউনিয়নবাজী)।

৩.২৩ **ঠিকা দেয়া** – সরকারের একটি চিরন্তন সমস্যা হচ্ছে সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। অতীতে প্রায়শই এটি বিশ্বাস করা হত যে, ব্যয় নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সরকার কর্তৃক নিজেই জনসেবা সরবরাহ দেয়া। এখন

অবশ্য, সারা বিশ্বের সরকারগুলি দু'টি পৃথক ভূমিকা স্বীকার করে নিচ্ছে: সেবার জন্য পয়সা দেয়া এবং সেবা সরবরাহ। জনসেবার বিধানগুলি যদি চুক্তির মাধ্যমে বাইরের কাউকে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতা-লাভ অর্জন সম্ভব। এর ফলে একটি সুবিধা হবে যে একচেটিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা নতুন নতুন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে, যার ফলে খরচ বাঁচবে এবং গুণমান উন্নত হবে। বস্তুত একসময় যখন 'পাবলিক' সেবাসমূহ আর 'পাবলিক' থাকবে না, অর্থাৎ বেসরকারী সেবায় পরিণত হবে, তখন সরকারের হাত থেকে অর্থ যোগানের কাজটিও নিয়ে নেয়া যাবে। কেইস সমীক্ষাগুলি এ ধরনের পরিবর্তনের সুফল প্রতিপন্ন করে।

৩.২৪ বিপিডিইউ যখন এমন একটি কাজের জন্য বেসরকারী নির্মাতার দ্বারস্থ হয়, যা সাধারণতঃ সরকারী খাতে করা হয়, তখন বেসরকারী খাতের দক্ষতার একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের গোচরে আসে। এই উদাহরণ, এ বিষয়টিও প্রতীয়মান করে যে সরকারী কার্যপরিচালনাকে একটি অভিন্ন সমগ্র হিসেবে ভাবা ঠিক নয়। বেসরকারী খাতের কনসালটেন্সি-সেবার জন্য টেন্ডার দেয়ার মাধ্যমে বিপিডিইউ কম খরচের সুবিধাটি আদায় করতে পেরেছিল। কনসালটেন্টদের সম্মানী মোট খরচের ৫-৭ শতাংশ পর্যন্ত ছিল, যেখানে পিডব্লিউডির দেয়া সম্মানী প্রচলিতভাবে ১৫.৫ শতাংশ। সর্বোপরি, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির নির্মাণ অনেক দ্রুত শেষ হয়েছিল। পিডব্লিউডি পরিচালিত একই ধরনের প্রকল্পে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটেছে।

৩.২৫ সরকার তার সমন্বিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে এনজিওদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার জন্য তহবিল যোগান দেয়। সেবা-প্রদানের বিষয়টি সফলভাবে অন্যের হাতে চুক্তির মাধ্যমে তুলে দেয়ার এটি একটি উদাহরণ।

৩.২৬ ভোটারদের কাছে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ বাংলাদেশ সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হয়তো অর্থায়ন এবং প্রত্যবেক্ষণের দায়িত্বটি নিজেদের হাতে রাখতে চাইবে। কিন্তু যেখানেই সম্ভব তারা প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রকৃত উৎপাদন ও সরবরাহের বিষয়টি এনজিও এবং বেসরকারী খাতের হাতে চুক্তিভিত্তিক হস্তান্তর করতে পারে। তাদেরকে এভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও দেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্ব, যেমন 'আফরামাজ' (affermage) নামক ফরাসী পদ্ধতিটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাপনা ও ইজারাচুক্তিগুলি অবশ্য সাবধানতার সাথে তৈরি করতে হবে যাতে রাষ্ট্রের পরিসম্পদের অবচয় না হয়। বেসরকারী খাতে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন ছাড় দেয়ার সুযোগও রয়েছে, এবং এসব ক্ষেত্রে সাধারণত বিদেশী বিনিয়োগকারীরা জড়িত হন। উদাহরণ হিসেবে, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ-পরিচালনা-মালিকানা, এবং নির্মাণ-পরিচালনা-হস্তান্তর চুক্তির উল্লেখ করা যায়।[২] এ ধরনের ব্যবস্থা যাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীর কাছে আকর্ষণীয় হয়, সেজন্য একটি যথাযথ নীতি ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন।

৩.২৭ ***সরকার ও এনজিও অংশীদারিত্ব*** – অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমীক্ষা হচ্ছে সরকার ও এনজিওর সম্পূরক চরিত্রের একটি ভাল উদাহরণ। যদিও সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী সকল শিশুর কাছে পৌঁছাতে চায়, কোনো কোনোশ্রেণীর শিশুর কাছে পৌঁছানো সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষকরে গ্রামাঞ্চলের অতি দরিদ্র শিশুদের কাছে। ব্র্যাকের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম মৌলিকভাবে এই দুঃস্থ শ্রেণীকে শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ে আসার জন্য তৈরি। তৃতীয় শ্রেণী শেষ করে এসব শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দেয়। সরকারী তহবিল প্রাপ্ত সমন্বিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার ও এনজিওদের মধ্যে অংশীদারিত্বের একটি চমৎকার উদাহরণ।

---

[২] এ ধরনের ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে তাদের প্রয়োগযোগ্যতার আলোচনার জন্য দেখুন : "বাংলাদেশ ; সুস্থিতকরণ থেকে প্রবৃদ্ধি" (ফ্রম স্ট্যাবিলাইজেশন টু গ্রোথ) , প্রতিবেদন নং ১২৭২- বি.ডি, বিশ্ব ব্যাংক, মার্চ ১৭, ১৯৯৪

৩.২৮ এনজিওসমূহ এবং তাদের স্থানীয় জ্ঞান ইপিআই এর আওতা দ্রুত বৃদ্ধি করতে অত্যন্ত মূল্যবান প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিজের পক্ষে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা সম্ভব ছিল না। চুক্তির মাধ্যমে টিকাদানকারীদের, ব্যবস্থাপকদের এবং যোগাযোগ রক্ষাকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য এনজিওদের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা পৌঁছানো কঠিন এমন অঞ্চলে ইপিআই সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ ঘটাতে সহায়তা করে। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে: রাজশাহী বিভাগ, যেখানে সর্বজনীন শিশু টিকাদান ব্র্যাক এবং অন্য একটি এনজিও – রংপুর দিনাজপুর পল্লী সমিতির সমন্বিত প্রচেষ্টায় অর্জন করা সম্ভব হয়। একইভাবে, ব্র্যাকের নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবাসমূহ বিদ্যমান সরকারী সেবাসমূহের সাথে সহজেই সংযুক্ত হয়। এর কর্মীরা গ্রাম-কর্মীবাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সহায়তায় যুগপৎ সেবা প্রদানে সরকারী কর্মচারীদের পাশাপাশি কাজ করছে।

৩.২৯ পানি ও স্যানিটেশন আরেকটি এলাকা যেখানে এনজিও'রা কার্যকর ও উন্নত কার্যসম্পাদনা দেখিয়েছে। একইভাবে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এনজিওদের মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ পরিচালিত করে সরকারের দারিদ্র-বিমোচন উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করার একটি উদ্ভাবনী পন্থা। কাজেই সরকার হয়তো তার সমাজনীতির লক্ষ্যগুলি পূরণে এনজিওদের আরো বেশি ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারে।

সাফল্যের শিক্ষা কাজে লাগানো

৩.৩০ কেইস সমীক্ষাগুলি থেকে সেবার মান ও খরচ-সাশ্রয়তা উন্নত করার আশাপ্রদ নির্দেশনা দেখা যাচ্ছে। নিচের রূপরেখা অনুযায়ী সংস্কারের লক্ষ্যে সরকারের ভিতরে বর্তমানে যেসব ভাল কাজ হচ্ছে, সেগুলি সূচনাবিন্দু হিসেবে গণ্য হতে পারে।

- ***বিকল্প সেবা সরবরাহ প্রণালীগুলি পরীক্ষা করা*** -– প্রতিটি সরকারী কাজকর্ম দু'টি দিক থেকে পূর্ণমূল্যায়ন করতে হবে। প্রথমত, এটি কি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে, নাকি স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়া ভাল হবে ? দ্বিতীয়ত, অর্থায়ন বা তহবিল যোগান এবং সেবা প্রদানকে কি আলাদা করা যায়, না কি তারা সমন্বিত থাকবে ? বাংলাদেশ সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থ যোগান এবং সেবা প্রত্যবেক্ষণ করতে পারে, কিন্তু যেখানে সম্ভব প্রকৃত উৎপাদন এবং সরবরাহ, প্রতিযোগিতামূলক দর-হাঁকার মাধ্যমে এনজিও অথবা বেসরকারী ফার্মের হাতে চুক্তি ভিত্তিক ছেড়ে দেয়া উচিত।

- ***গ্রাহক সন্তুষ্টির ওপর জোর দেয়া*** – যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেবা প্রদানকারী হতেই হয়, তার মূল বিবেচনা হওয়া উচিত গ্রাহকের সন্তুষ্টি। সরকারের সংগঠন এবং এর কাজকর্ম, উদ্দীপক কাঠামো, মানবসম্পদ ব্যবহার এবং জবাবদিহিতার পদ্ধতিগুলি – সকল কিছুরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গ্রাহকদের প্রাপ্তি, ব্যবহার এবং সন্তুষ্টি বাড়ানো। সেবার মান ও প্রাপ্যতা সম্পর্কে গ্রাহকদের মতামত প্রকাশের ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

৩.৩১ প্রস্তাবিত ***সরকার সংস্কার ও দক্ষতা ইউনিট জাতীয় কমিশন*** (অনুচ্ছেদ ২.৪১) এবং এর সাথে শক্তিবর্ধিত বাজেট ও ব্যয় নিরীক্ষণ/প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি (পরিচ্ছেদ ৪) এসব শিক্ষাকে কাজে পরিণত করার হাতিয়ার হিসেবে পরস্পরের শক্তি বাড়াতে পারে।

৩.৩২ নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে জনসেবা সরবরাহ বাড়াতে এবং একটি নতুন উপায় – কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবসায়-মুখী সংস্থা সৃষ্টি – গ্রহণ করতে এনজিও ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা জোরদার করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)সমূহের ভূমিকা জোরদার করা

৩.৩৩ বাংলাদেশে এনজিওরা ব্যষ্টিক পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় তাদের উদ্ভাবনা এবং দক্ষতার জন্য একটি বিশিষ্ট পরিচিতি অর্জন করেছে। তাদের কোনো কোনোটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে, যেমন গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাক। স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন (ঘর ৩.৬) এনজিওদের একটি অগ্রাধিকার হয়ে আছে: গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ব্যাপকভিত্তিক সরকারী স্বাস্থ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল জাতীয় ওষুধ নীতির প্রসারে পথিকৃতের কাজ করেছে। এনজিও উদ্ভাবনার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, এনজিও ফোরাম কর্তৃক প্রণীত একটি কর্মসূচি, যেখানে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যবিধান প্রচারণায় মসজিদের ইমামদের ব্যবহার করা হয়েছে।

৩.৩৪ বেশিরভাগ দেশে সরকার ও এনজিওসমুহের মধ্যে অবিশ্বাসের সম্পর্ক বিদ্যমান, এমনকি যখন তাদের অভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে তখনও।[৩] তবে গত দশক জুড়ে, বাংলাদেশ সরকার ক্রমাগত এনজিওদের সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদেরকে জাতীয় লক্ষ্যসমূহ পূরণে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু আরো ব্যাপক কোনো সহযোগিতামূলক কৌশল নির্ণয় করা হয়নি। এর পেছনে কতগুলি কারণ রয়েছে:

(১) ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওদের নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষ করে বাইরে থেকে যেগুলো তহবিল পায়। বিদেশী তহবিল প্রাপ্ত এনজিওদের কর্মসূচি, প্রকল্প এবং তহবিল বিতরণ অনুমোদন করার ক্ষেত্রে ব্যুরোর হাতে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকার ও এনজিওদের মধ্যে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে; (২) সরকার কতগুলো এনজিও'র জবাবদিহিতা নিয়েও উদ্বিগ্ন, কিন্তু সমান্তরাল সার্ভিস সৃষ্টি এবং পূর্বে সমন্বিত পদ্ধতিগুলিকে একটি অদক্ষ ও জোড়াতালিপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার ঝুঁকি সম্পর্কেও সরকারের ব্যাপকতর উদ্বেগ রয়েছে। সরকার বর্তমানে সচেষ্ট রয়েছে সকল এনজিওর হিসাবপত্র বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষকদের দ্বারা পরীক্ষা করানো নিয়ে, এবং তাদের বার্ষিক হিসাব বাংলাদেশ সরকারের কাছে পেশ করার বিধান রেখে এনজিওদের আর্থিক জবাবদিহিতা নিয়ন্ত্রণ করেছে; (৩) এমন একটি ঝুঁকি থেকে যায় যে, সময়ে এনজিওগুলি ব্যবসা অথবা আমলাতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে, যার ফলে তাদের তৃণমূল চরিত্র এবং তাদের আদি সমাজ-মুখিনতা হারিয়ে যাবে। অবশ্য, যদি এনজিওরা না ভাল করে, সরকারের আর্থিক সহায়তা সে ক্ষেত্রে দ্রুত প্রত্যাহার করে নেয়া যায়; (৪) বর্তমানে, বাংলাদেশ সরকার মাত্র কয়েকটি এনজিও'র সংগে কাজ করছে; অনেক এনজিওই সরকারের সংগে সরাসরি সংযোগে উদ্বিগ্ন, এজন্য যে, এতে আনুষঙ্গিক আমলাতান্ত্রিক বাধাবিপত্তি বাড়বে; এবং (৫) অনেক এনজিও'র তহবিল আসে বিদেশ থেকে এবং এর ফলে দক্ষতা উৎসাহিত হয়, কারণ তাদের তহবিলের জন্য প্রতিযোগিতা করতে হয়। অবশ্য এর অর্থ এ-ও দাঁড়ায় যে, এনজিওগুলি বিদেশী দাতাদের বিষয়সূচি দ্বারাই পরিচালিত হবে। তবে আকর্ষণীয় এবং নতুন মত ও পথ এবং উদ্ভাবনাগুলিকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। এনজিওরা অবশ্যই আইনের অধীন, কাজেই অন্য কোনোভাবে এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ঠিক হবে না।

---

৩ এমনকি যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার রয়েছে, সেখানেও এনজিওদের সংগে সম্পর্ক অস্বস্তিকর। সরকার এনজিওদের সম্ভাব্য তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সন্দেহ করে, এবং এনজিওরা সরকারের উদ্দেশ্যকে সন্দেহ করে।

৩.৩৫ যদিও এনজিও তহবিল প্রাপ্তি এবং নীতি নির্ধারণের জবাবদিহিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে উদ্বেগ রয়েই যায়, তবুও এ ব্যাপারে ভিন্নমত সামান্যই যে বাংলাদেশে জনসেবা সরবরাহে তাদের গুরুত্ব রয়েছে। গত দুই দশকে এদের বৃদ্ধি একদিকে যেমন তাদের দক্ষতা এবং সেবা প্রদানে তাদের সুখ্যাতিকে প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে মৌলিক সেবাসমূহ যোগান দিতে সরকারের ক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে মোহভঙ্গকেও তুলে ধরে। এনজিওদের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা জোরদার করতে নিচের পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে [৪]:

- *নিবন্ধন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া সুসমন্বিত করা* – নিবন্ধন প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও স্বচ্ছ করার জন্য এদের সংশোধনের লক্ষ্যে সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আরো সুনির্দিষ্টভাবে, নিবন্ধনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার সময় ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৩০ দিনে নিয়ে আসতে হবে। আবেদনপত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা ঐ এনজিওকে আবেদনপত্র গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে। সর্বোপরি, যদি এনজিওকে নিবন্ধন দেয়া না হয়, তাহলে ঐ অস্বীকৃতির কারণগুলি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে।

- *নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়গুলির সংস্কার* – বর্তমানে নিবন্ধন ও প্রত্যবেক্ষণের নিয়মগুলিতে বেশ কিছু অস্পষ্ট দিক আছে; যেমন এনজিওদের প্রতিষিদ্ধ (debar) করতে "অসামাজিক" এবং "রাষ্ট্র-বিরোধী" কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এসব ঢিলেঢালা সংজ্ঞা ব্যবহার বৈষম্যের আশংকা সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে যার ফলে গড়িমসি এবং উৎকোচের সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া, একবার কোনো এনজিও'র নিবন্ধন হয়ে গেলে এর নবায়নের আর প্রয়োজন নেই, যদি না এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান নিয়মে প্রতি পাঁচ বছরে নিবন্ধন নবায়ন করতে হয়। যতদূর সম্ভব, এনজিওদের জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকাটি এনজিও ব্যুরোর হাত থেকে তাদের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এডাবকে দিয়ে দেয়া উচিত। তাছাড়া, একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, এডাবকে এনজিওদের হাতে নেয়া বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প পর্যালোচনার একক দায়িত্ব দেয়া উচিত। এ কাজটি বর্তমানে এনজিও ব্যুরো করছে।

- *উন্নত কার্যসম্পাদনা তথ্যের প্রসার* – এনজিওদের উন্নয়ন বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য সরকারকে উৎসাহী করতে ব্যুরোর উচিত ষান্মাসিক ভিত্তিতে ভালো কার্যসম্পাদনার ওপর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলো থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে বিতরণ করা। এ প্রক্রিয়া বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন মন্ত্রণালয়গুলিকে এবং তাদের মাঠ পর্যায়ের ইউনিটগুলিকে এনজিও/বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে সংবেদনশীল করবে।

- *অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নে সংশ্লিষ্টতা* – আরো সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার/এনজিওর মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনায় আরো বেশি এনজিও অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে একটি সরকার-এনজিও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

---

৪ এ বিষয়গুলি বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিতব্য নানা দেশ-ব্যাপী এক গুচ্ছ সমীক্ষার প্রতিপাদ্য (এর একটি বাংলাদেশ এর ওপর), যার শিরোনাম "রাষ্ট্র ও স্বেচ্ছাসেবী খাতের মধ্যকার সম্পর্ক।" এসব সমীক্ষায় সম্মত জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহে আরো পরিপূর্ণভাবে অবদান রাখার জন্য এনজিওদের সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে প্রভাব নিচয়ের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে নীতিসমূহ সনাক্ত করা হবে।

- *প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা জোরদার করা* -– এনজিওদের প্রত্যবেক্ষণ প্রণালী এবং হিসাব নিরীক্ষণ চর্চার ভিতরে মিল সামান্যই। এনজিও কার্যপরিচালনার এদিকটি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অবশ্য যেখানে করদাতাদের পয়সা জড়িত থাকে না, সেখানে জবাবদিহিতা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত কড়াকড়ি অনভিপ্রেত।

স্থানীয় সরকার: অনুদ্ঘাটিত সম্ভাবনা

৩.৩৬ বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো এবং নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাগুলি অবশ্য তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং অংশগ্রহণমূলক বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন এবং জনসেবা সরবরাহের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সকল বৈশিষ্টই রয়েছে। কিন্তু এই কাঠামোটি দুটি কারণের জন্য দক্ষতার সাথে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে:

- *সিদ্ধান্ত গ্রহণের অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ* – সংবিধানে স্থানীয় সরকারের প্রতি দৃঢ় সমর্থন থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের ওপর অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং এদেরকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে ওই সুবিধাগুলি পাওয়া জটিল করে তুলেছে।[৫] বেশির ভাগ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখনও কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত হয়। প্রায়শই এসব সিদ্ধান্তে একজন পরিচালক বা মহাপরিচালক – এমনকি একজন মন্ত্রীও জড়িত হয়ে পড়তে পারেন। বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বেশ কিছু নিষ্ফল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, কিন্তু পদ্ধতিটি এখনও অতিরিক্ত কেন্দ্রীভূত রয়েই গেছে।

- *অকার্যকর নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থাসমূহ* -– এগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুর্বল প্রশাসনিক সামর্থ্য, সীমিত আর্থিক ও মানবসম্পদ ভিত্তি, এবং নগণ্য জন-অংশগ্রহণ।

৩.৩৭ **সংবিধানে বলা হয়েছে যে, "প্রজাতন্ত্রের সকল প্রশাসনিক ইউনিটের স্থানীয় সরকারকে আইনানুগভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত সংস্থার হাতে অর্পণ করা হবে" (আর্টিকল ৫৯-৬০), কিন্তু স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়টির এখনও নিস্পত্তি হয়নি। জাতীয় সংসদে একটি বিল ১৯৯২ সাল থেকে ঝুলে আছে।** বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে একটি মূল বাধা হল গ্রামাঞ্চলের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারাবার ভয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে শাসক দলগুলির অনীহা। কেন্দ্রীয় সরকার ধরে নেয় যে, স্থানীয় সরকারগুলি অনিবার্যভাবে জাতীয় সরকারের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। এটি নাও হতে পারে। বস্তুত স্থানীয় সরকারের হাতে দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর করে দিলে যদি জনসেবা ও সামগ্রী সরবরাহে কোনো ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে তার জন্য প্রাপ্য নিন্দাও তাদের ভাগে পড়বে, এবং এতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক সুবিধাও হতে পারে। স্থানীয় সরকারগুলি এভাবে 'সেফটি ভাল্ব' হিসেবে কাজ করতে পারে, কারণ তারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি জনগণের অসন্তোষ নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে। ক্ষমতার দায়িত্ব অর্পণের বিরুদ্ধে আরেকটি রাজনৈতিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করবেন। তবে একথাও যুক্তি দিয়ে বলা যায় যে, এটি এখনই ঘটছে – কেন্দ্র থেকে আসা আমলাদের স্থানীয় গণ্যমান্যরা বস্তুত 'দখল' করে রাখেন। জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যে সংরক্ষিত হবে, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়তাই হচ্ছে নিয়মিত এবং সুষ্ঠু নির্বাচন; এবং বিভিন্ন নাগরিকদল ও এনজিওসমূহ মিলে এ লক্ষ্যে ভোটার শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। আরেকটি সংশ্লিষ্ট -

---

৫ "সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র উৎসাহিত করবে।" *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান,* আর্টিকল ৯।

প্রশু'গার
বাংলাদেশ লোক - প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমস্যা হচ্ছে স্থানীয় কর বৃদ্ধিতে স্থানীয় সরকারের প্রমাণিত অনীহা। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দরিদ্র, শুধুমাত্র গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই কর দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের যোগসাজশের জন্য রাজস্ব আদায় নিম্ন পর্যায়েই রয়ে গেছে।

৩.৩৮ যেসব জনসেবা সামগ্রী ও সরবরাহ স্কেল বা মাত্রা নির্ভর নয়, এবং যেগুলোতে বড় ধরনের কোনো স্পিল-অভার এফেক্ট বা অন্য ধরনের বহিঃস্থতা নেই, সেগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।[৬] এর মধ্যে থাকবে প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুবিধা, স্থানীয় অবকাঠামো ইত্যাদি। এ ধরনের পরিবর্তন অবশ্য নির্ভর করবে স্থানীয় সরকারের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি গড়ে তোলা সাফল্যের ওপর। বাংলাদেশ সরকারের উচিত হবে নিচের বিষয়গুলি বিবেচনা করা :

- ***স্থানীয় সরকারের জন্য আইনগত কাঠামো মজবুত করা*** -- ১৯৭২ সাল থেকে জারি করা ২২টি এ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্স যুক্তিযুক্তকরণ প্রয়োজন।

- ***যথাযথ আকারের স্থানীয় সরকার ইউনিট উন্নয়ন*** -- এটি করতে হলে স্কেল বা মাত্রা অর্থনীতি কাজে লাগাতে হবে, এবং একই সংগে দেখতে হবে যে, ইউনিট বা এককগুলি যাতে এত বড় না হয় যে, ব্যাপক সরাসরি অংশগ্রহণ, নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাছে পাওয়া এবং একটি সত্যিকার আগ্রহী স্থানীয় জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠা তাতে বাধাগ্রস্ত হয়। সরকারের আকৃতির এমন একটি সর্বোচ্চ মাত্রা আছে যা দক্ষতা-সহায়ক। বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের প্রধান ইউনিট হল ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি)। গ্রামের মতই এতে তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা থাকে। পুনরুজ্জীবিত স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে ইউপিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। তবে একটি ইউপি'র গড় জনসংখ্যা মাত্র ২৬,০০০ এর মত; এটি পেশাদারী ও প্রযুক্তিগত কর্মীদের নিয়োগ করার মত অথবা জনসেবার মাত্রা বা স্কেল-এর অর্থনীতি কাজে লাগাবার মত বড় নয়। ইউপিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা হয়তো সম্ভব, তবে জনসেবাসামগ্রী সরবরাহের জন্য ইউপিগুলি সঠিক মাধ্যম নাও হতে পারে। কাজেই সর্বনিম্ন আকৃতির এমন একটি ইউনিট নির্ধারণ করতে হবে, যা ছোটখাটো অবকাঠামোমূলক প্রকল্প হাতে নিতে এবং প্রয়োজনীয় বেতনাদি ও নাগরিক সুবিধাদি দিতে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারবে। তবে এসব ইউনিটের মধ্যে বৈষম্য থেকেই যাবে যা সবচেয়ে অনুকূল কাঠামো গড়ে তোলার সময় বিবেচনায় আনতে হবে।[৭]

- ***মৌলিক জনসেবাসমূহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার কাছে হস্তান্তর*** – এ ধরনের একটি ব্যবস্থার খসড়া তালিকায় থাকতে পারে: প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ; পানি সরবরাহ; কম গুরুত্বপুর্ণ রাস্তা ঘাট। স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রকৃত সেবাসরবরাহকারী হতে হবে, যেসব সেবা এনজিও অথবা বেসরকারী খাতে – এমনকি সরকারী সংস্থাগুলোর হাতে – চুক্তিভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে; যদিও সার্বিক নক্সা, প্রত্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের হাতে থাকবে।[৮]

---

৬. সেবাসামগ্রী সরবরাহ করবে এমন পর্যায়ের সরকার যা সেবা সরবরাহে বিভিন্নমুখী পছন্দ মেটাবার তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে।

৭ পৌর সভাগুলি এবং গ্রামীণ এলাকাগুলির সীমানা নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক সংগঠন সংক্রান্ত আরো অনেক বিষয়ও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

৮ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: *গুড গভর্ণমেন্ট ইন বাংলাদেশ: এ প্র্যাকটিকাল এজেন্ডা ফর চেঞ্জ,* প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯-৪৭।

- ***স্থানীয় সরকার কর্মচারী নিয়োগের জন্য নমনীয় পদ্ধতি*** -- স্থানীয় সরকারগুলির প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগরী কর্মী প্রাপ্তির যথেষ্ট সুবিধা থাকতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদের তারা সরাসরি নিয়োগ করতে পারে, তবে বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীদের প্রেষণে পাঠানোর ব্যবস্থাও থাকতে পারে – অবশ্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট উদ্দীপকের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- ***স্থানীয় সরকারসমূহের অর্থায়ন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস*** – এ পদ্ধতিটি জোরদার করার লক্ষ্যে একটি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ হবে স্থানীয় সরকারগুলোর কাছে সহজপ্রাপ্য সম্পদ বৃদ্ধি করা। অর্থায়নের কয়েকটি সম্ভাব্য পথ আছে। *প্রথমত*, জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মাত্রার মত কিছু নির্ণায়ক বিবেচনায় এনে তৈরি একটি ফর্মূলামাফিক সরকারী মঞ্জুরি স্থানীয় সরকারকে দেয়া যেতে পারে। *দ্বিতীয়ত*, সমরূপ মঞ্জুরি বা ম্যাচিং গ্রান্টস এর একটি ব্যবস্থা থাকতে পারে যার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারসমূহ তাদের বাজেটের অর্থ বন্টনের ওপর ভিত্তি করে স্লাইডিং স্কেলে মঞ্জুরি পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়িত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার/দাতারা ৩ঃ১ অনুপাতে মঞ্জুর করতে পারে। *তৃতীয়ত*, সরকার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকারগুলিকে স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য তহবিল হস্তান্তর করতে পারে। *চতুর্থত*, স্থানীয় সরকারগুলোকে খরচ-ভিত্তিক ব্যবহারকারী মাশুল এবং জমি বা সম্পত্তির ওপর স্থানীয় কর আরোপের মাধ্যমে তাদের প্রকল্পগুলোর জন্য সম্পদ সংগ্রহ করার কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকারগুলি সংস্কারকৃত ভূমি কর এবং এ থেকে প্রাপ্ত অর্থের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। যদিও ভাবা যেতে পারে যে, কর সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত, এটি প্রাপ্ত অর্থের কিছু অংশ যে এলাকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে সে এলাকার জন্য আলাদা করে রাখা যেতে পারে। একই সাথে, এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে স্থানীয় রাজস্ব আদায়ের দুর্বলতা পুষিয়ে নেয়ার জন্য মঞ্জুরি-পদ্ধতি যাতে না ব্যবহৃত হয়।

এজেন্সি - বিকল্প

৩.৩৯ ব্যবসা-বহির্ভূত উন্নত জনসেবা (পাবলিক সার্ভিস) সমূহ সরবরাহের একটি প্রক্রিয়া হচ্ছে এজেন্সি বা সংস্থা পদ্ধতি (পরিশিষ্ট: ৩), যা যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডে গ্রহণ করা হয়েছে। এজেন্সি হচ্ছে সরকারের মধ্যে একটি ব্যবস্থাপনা ইউনিট যার দায়িত্ব হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনা টার্গেট অর্জন করা। এর দায়িত্বে থাকেন একজন প্রধান নির্বাহী যিনি সরাসরি একজন মন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ। কঠোর ব্যয়, দক্ষতা এবং মানসম্পর্কিত টার্গেট অর্জনের জন্য ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব স্বীকার করার বিনিময়ে (ঘর ৩.৭) প্রধান নির্বাহী যেভাবে মনে করেন সেভাবে এজেন্সী চালাতে পারেন। এজেন্সী-ধারণাটি এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, দক্ষ এবং কার্যকর সেবা সরবরাহ সবচেয়ে ভালভাবে অর্জিত হয় গ্রাহক সরবরাহকারী-ভিত্তিতে – এক্ষেত্রে 'গ্রাহক' হচ্ছেন মন্ত্রী, এবং 'সরবরাহকারী' হচ্ছে এজেন্সি। দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী, যাকে সচিব ও অন্যান্য নীতি নির্ধারকরা প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে থাকেন, এজেন্সিকে সম্পদ বণ্টন করেন, এর টার্গেট নির্দিষ্ট করে দেন, এবং কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন করেন। এজেন্সী পদ্ধতি প্রচলনে যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ড হচ্ছে পথিকৃৎ। যুক্তরাজ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রায় ১০০ এজেন্সি গড়ে উঠেছে। বেসামরিক প্রশাসনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এখন এজেন্সি পদ্ধতিমত চলছে।

ঘর ৩.৭. এজেন্সি উদ্দেশ্য নির্ধারণ – যুক্তরাজ্যের প্রিজন সার্ভিস

প্রিজন বা কারা সার্ভিসের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

– বন্দীদের প্রহরাধীন রাখা।
– নিয়ম, শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা।
– বন্দীদের জন্য শোভনীয় অবস্থা নিশ্চিত করা, এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ অন্যান্য চাহিদা মেটানো।
– বন্দীদের আপত্তিকর আচরণ সংশোধন করতে ইতিবাচক শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ এবং দায়িত্বশীল জীবন যাপন করতে দেয়া।
– সমাজে ফিরে যেতে বন্দীদের সহায়তা দেয়া।
– পার্লামেন্ট কর্তৃক যোগান দেয়া সম্পদ সর্বোচ্চ দক্ষতাসহ ব্যবহার করে কারাগারে সেবা সরবরাহ করা।

কারা সার্ভিসের মূল কার্যসম্পাদনা সূচকগুলি হল :

– কারাগার প্রতিষ্ঠানগুলি এবং প্রহরা থেকে পলায়নের সংখ্যা।
– কর্মী, বন্দী ও অন্যান্যদের ওপর হামলার সংখ্যা।
– কম সংখ্যক বন্দীদের জন্য নির্ধারিত নিবাসন ইউনিটগুলিতে রাখা প্রকৃত বন্দীদের অনুপাত।
– ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্যবিধান পেতে পারে সেরকম বন্দীদের সংখ্যা।
– সপ্তাহে বন্দীরা অর্থপূর্ণ কাজে যে সময় কাটান তার গড় (ঘন্টা হিসাবে)।
– যেসব কারা প্রতিষ্ঠানে বন্দীরা সপ্তাহের পাঁচ কর্মদিনে অন্তত ১২ ঘন্টা লক-আপের বাইরে কাটান, সেসব কারা প্রতিষ্ঠানের বন্দীদের অনুপাত।
– যেসব কারা প্রতিষ্ঠানে বন্দীরা সর্বনিম্ন ভিজিটিং সুযোগের চেয়ে বেশি সুযোগ লাভ করেন, সেসব কারা প্রতিষ্ঠানের বন্দীদের অনুপাত।

৩.৪০ বর্তমান প্রতিবেদনে এই বিশ্বাসটি প্রতিফলিত হয়েছে যে, **বাংলাদেশে ব্যবসায় বহির্ভূত পাবলিক সার্ভিস সংস্থাগুলি এ ধারণাটি গ্রহণ করতে পারে।** বাংলাদেশী প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলি বৃটিশ সিভিল সার্ভিস থেকে গৃহীত। কিন্তু নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসনের ভিতরে পরিবর্তন আনার জন্য উদ্যম এবং দক্ষতারও অভাব নেই। তাছাড়া, কয়েকটি সংস্থাকে (যেমন – পানি উন্নয়ন বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, ইত্যাদি) রূপান্তরিত করার জন্য মৌলিক সংবিধিবদ্ধ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও বর্তমান। **সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সরকার যেন আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে গিয়ে বর্তমান দু থেকে তিনটি বোর্ড/ ব্যুরোকে পিকেএসএফ মডেল অনুযায়ী সাজিয়ে, এবং যুক্তরাষ্ট্র মডেলের জবাবদিহিমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিক/ জবাবদিহিমূলক সংস্থায় পরিণত করে। মনে রাখতে হবে, *নিচের দিকে কোনো ঝুঁকি নেই– শুধু উপরের দিকে নাগরিকদের জন্য পুরস্কারই আছে।***

৩.৪১ এ ছাড়া, পাবলিক সার্ভিস বা জনসেবার অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড আছে যেখানে অগ্রবর্তী ভিত্তিতে এজেন্সী পদ্ধতি পরীক্ষা করা যায়:

- যেসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের সরকার/জনগণ আন্তঃক্রিয়া ঘটে, এবং যেখানে সেবার মান উন্নত করার জরুরী চাহিদা রয়ে গেছে।

- যেসব ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড যথেষ্ট বিযুক্ত এবং ফলাফল/উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাপযোগ্য, যার ফলে পরিচালনা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে অর্পন করা যায়।

- যেসব ক্ষেত্রে শুধু আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসমন্বিত এবং উন্নত করেই দক্ষতা মুনাফা অর্জন করা যায়।

৩.৪২ বাংলাদেশে এই উদ্যোগ সম্প্রসারণের বিপক্ষে একটি আপত্তি হতে পারে এই যে, এর ফলে বর্তমানে যত পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে বেশি সংখ্যক উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা প্রয়োজন হবে। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি শ্রেণীতে দুই থেকে তিনজনের বেশি প্রার্থী থাকার প্রয়োজন নেই। নির্বাচন বা নিয়োগের মূলনীতি হওয়া উচিত:

- সংস্থা/সংগঠন প্রধানকে পরিবর্তনের পক্ষে উদ্যমী এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় যোগ্য হতে হবে।

- প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলির জন্য প্রাথমিকভাবে সংগঠন/সংস্থার সংবিধিবদ্ধ কাজকর্মের যেন কোনো পরিবর্তন না হয় – কারণ এতে প্রক্রিয়াটি ধীরগতির হয়ে পড়বে। তবে ধারণা করা যায় যে, অগ্রবর্তী কর্মসূচি থেকে আইন প্রণয়নগত পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে।

- সংস্থা/সংগঠনের কাজকর্মের স্ববৃত্তাবদ্ধ হওয়ার সামর্থ্য থাকতে হবে, এবং অন্য একটি সরকারী সংগঠনের সেবার ওপর যেন খুব বেশি নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।

- বাস্তব ফলাফলের সম্ভাবনা থাকতে হবে।

৩.৪৩ কর্মকর্তাদের সংগে আলোচনাক্রমে নিচের প্রার্থী তালিকা প্রস্তাব করা হল। প্রাথমিক অগ্রবর্তী কর্মসূচির জন্য এদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে।

(১) জনগণের সংগে উচ্চ মাত্রার আন্তঃক্রিয়া আছে এমন প্রার্থী :

শিক্ষা – এক বা দুই জেলায় পাঁচ থেকে দশটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়।
স্বাস্থ্য – মহানগরী, জেলা ও স্থানীয় এলাকার পাঁচ থেকে দশটি হাসপাতাল।
পরিবহণ – মোটরযান লাইসেন্স প্রদান কর্তৃপক্ষ, বিমান বন্দর ব্যবস্থাপনা।
গণপূর্ত – স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তর।

(২) যাদের কাজ ইতোমধ্যেই বিযুক্ত, তেমন প্রার্থী:

শিল্প –– কোম্পানী নিবন্ধন অফিস।
রাজস্ব – শুল্ক কালেক্টরেট (ঢাকা বিমান বন্দর)।
আইন শৃঙ্খলা – ঢাকা মহানগর পুলিশ বাহিনী।
সংস্থাপন – অফিস ও ব্যবস্থাপনা শাখা।
অর্থ – অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ শাখা।
সামাজিক খাত – এনজিও ব্যুরো।

৪. জবাবদিহিতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি

এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের জনগণ তাদের সরকার ও জনসেবাসমূহের (পাবলিক সার্ভিস) জবাবদিহিতা কিভাবে নিশ্চিত করতে পারবেন, তার উপায়গুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই মূল্যায়ন শুরু করা হয়েছে জাতীয় সংসদ ও প্রধান সংবিধিবদ্ধ প্রত্যবেক্ষণ সংস্থাগুলি থেকে। অতপর এ পরিচ্ছেদে জনগণের আরো বেশি সরাসরি অংগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, সাধারণ ভাবে আরো বেশি খোলামেলা সরকার এবং দুর্নীতি নির্মূলের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। যেসব সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কাঠামো জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের অদক্ষতা সমাধানকে প্রভাবিত করে।

"........নগরগুলির জন্য কৌটিল্য কর্তৃক লিপিবদ্ধ একটি নিয়ম আপনাদের কৌতূহল সৃষ্টি করবে। যে কেউ রাস্তায় ধুলো ফেললে তার জরিমানা হত। কেউ রাস্তায় কাদা অথবা পানি জমতে দিলে তাকেও জরিমানা করা হত। এসব নিয়ম বলবৎ করায় পাটলীপুত্র এবং অন্যান্য শহর নিশ্চয় ছিল সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর। আমাদের পৌরসভাগুলি যদি এ ধরনের কিছু নিয়ম চালু করত!" জয়াহেরলাল নেহেরু, গ্লিম্পসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি(১৯৩৪)।

৪.১ অর্থনৈতিক প্রশাসনের যে কোনো সমীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কেন আরো ভাল অর্থনৈতিক প্রশাসনের অধিকার দাবী করে না, এবং ভাল প্রশাসন নিশ্চিত করার প্রথাগত ও সংবিধানগত পদ্ধতিগুলি কেন কাজ করে না। এর উত্তর রয়েছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ন্ত্রণকারী সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর অদক্ষতার মধ্যে।

৪.২ শুধু জবাবদিহিতার অভাবই নয়, বরং জবাবদিহিতার প্রকৃতিও বাংলাদেশের সমগ্র সরকারী খাত জুড়ে একটি প্রধান সমস্যা । জাতীয় সংসদ থেকে পিওন পর্যন্ত বিস্তৃত জবাবদিহিতার ধারাবাহিকতাটি দুর্বল এবং অস্পষ্ট; এর অনেকগুলি সংযোগ বিন্দু বিচ্ছিন্ন – উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক চুক্তি বাস্তবায়িত করা বা এসওইসমূহে চুরি রোধ করা। ৪০ জন উর্ধতন কর্মকর্তার এক সাম্প্রতিক জরিপে বিলম্বিত সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহিতার অভাবকে জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৬.১৩)। সাধারণভাবে, বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাগুলির হিসাবরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ দুর্বল; তারা আইন সভার বা আইন সংস্থাগুলির কঠোর কোনো নিরীক্ষার সম্মুখীনও হয় না এবং বাজারের আর্থিক শৃঙ্খলার অধীনও তারা নয়। সরকারী কর্মচারীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জানানোর ক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনা মানের অভাব রয়েছে। সর্বোপরি, সংস্থাগুলি জনগণের চাহিদা সম্পর্কে অমনোযোগী; সরকারী প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ সামান্যই এবং কর্মকর্তারা যখন তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, তখন তার প্রতিকার আদায়ের কার্যকর সামর্থ নাগরিকদের থাকে না। জবাবদিহিতার এই অভাব সরকারের প্রতিটি পর্যায়েই প্রযোজ্য। সাধারণ জনগণের সংগে আদান-প্রদান করেন তেমন নিম্ন পর্যায়ের আমলাদের থেকে নিয়ে সচিবালয় বা মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে যারা নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তারা সবাই এর আওতায় আসেন। সব শেষে, যারা নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণ করেন, তাদের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাবে রয়েছে। জবাবদিহিতা একটি ব্যাপক বিষয়। এই প্রতিবেদনে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে :

(১) জবাবদিহিতা প্রয়োগ করার জন্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাগুলির বর্ধিত ক্ষমতা ও সামর্থ; (২) নির্বাহী সংস্থাগুলির জবাবদিহিতা বাড়াতে প্রণালী উদ্ভাবন; (৩) ব্যবহারকারীদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি; (৪) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি; এবং (৫) দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাসমূহকে শক্তিশালী করা

সরকারের সংসদীয় জবাবদিহিতা

৪.৩ একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদীয় জবাবদিহিতা হচ্ছে ভাল প্রশাসনের দৃঢ় ভিত্তি। সংসদ সদস্যদের একটি দায়িত্ব হচ্ছে, সরকারের ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা – এবং এটি নিশ্চিত করা যে, সরকার জনগণের চাহিদার প্রতি মনোযোগী, করদাতার অর্থের জন্য দায়বদ্ধ, এবং নির্বাচকমণ্ডলীর প্রকৃত সমস্যা মোকাবেলায় উদ্যোগী। বাস্তবে অবশ্য বাংলাদেশে সংসদীয় জবাবদিহিতা ঠিকমত কাজ করেনি। এর অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে একটি, কিছু নির্বাহীর স্বপক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্য অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ার সংগে সম্পর্কিত (যে সমস্যাটি অবশ্য সবচেয়ে প্রাচীন কিছু গণতন্ত্রেও রয়ে গেছে[১]) এবং অন্যগুলি তৈরি হয় প্রচলিত সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি না মেনে চলার জন্য।

৪.৪ সাংসদরা রাজনৈতিক সমস্যার জন্যও বাধাগ্রস্ত হন। এঁদের বেশির ভাগই খুব কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন – তাদের নিজস্ব অফিস, বেতনভুক কর্মচারী অথবা গবেষণার সুযোগ-সুবিধাও থাকে না। এর ফলে নানা বির্তক ও কমিটি সভাগুলিতে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও জ্ঞানের তাদের অভাব থাকে। তাছাড়া নির্বাচনী এলাকার লোকজনের নানা অনুরোধ রাখতেও তাদের অসুবিধা হয় – যেমন তথ্য যোগান দেয়া, বা তাদের পক্ষে সরকারী সংস্থাগুলিতে দেন-দরবার করা।

৪.৫ নির্বাহী বিভাগের সংসদীয় তত্ত্বাবধান ব্যর্থ হওয়ার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের জন্য যে সামঞ্জস্য বা সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। এটি আংশিকভাবে সংবিধানের বিধানসমূহের প্রতিফলন। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। ১৯৯০ সালের পর রাষ্ট্রপতির হাতে আগে যেসব নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত ছিল, সেগুলোর কোনো উল্লেখযোগ্য সংশোধন ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।[২] তবে পদ্ধতিটি বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত, যাতে এখনও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির আবহটি রয়ে গেছে। সকল মন্ত্রিপরিষদ ভিত্তিক সংসদীয় পদ্ধতিই কিছু না কিছু এই নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে সমস্যাগ্রস্ত।

৪.৬ সংসদে সাধারণত নীতি ও আইন প্রণয়নের ওপর অপর্যাপ্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত অনেক বিষয় সংসদে আলোচিতই হয়না। বেশির ভাগ নীতি গোপনে নির্ধারিত হয় এবং এমনকি সংসদেও ঘোষিত হয় না। এ জন্য এটি আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয় যে, এসব নীতি সম্পর্কে জনগণের জ্ঞান খুবই সীমিত এবং এদের বাস্তবায়নও উদ্যমের সাথে হয় না। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, বিবাদমূলক বিষয়ের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য সংসদের জড়িত হওয়ার অনেক সুবিধা রয়েছে। বেসরকারীকরণ এরকম একটি বিষয়।

---

[১] যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য স্থাপিত প্রসিজ্যুর (পদ্ধতি) কমিটি (১৯৭৮) মত প্রকাশ করে যে, "সমস্যার মূল হচ্ছে ... সংবিধানের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে সুবিধার পাল্লা সরকারের পক্ষেই এতটা ভারি যে এতে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে এবং তা আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রের যথাযথ কাজ করার পক্ষে প্রতিকূল।" *মেকিং পার্লামেন্ট ইফেকটিভ*, সিদ্দিকী, এল.কে. এবং অন্যান্য, ঢাকা (১৯৯৪)।

[২] একটি প্রধান উদাহরণ হচ্ছে, বিশাল রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের স্থানে প্রায় একই রকমের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় চালু করা, যা সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত নিরূপনকারী হিসেবে কাজ করে চলেছে।

উদাহরণস্বরূপ, আর্জেন্টিনাতে মেনেম সরকার বেসরকারীকরণ এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিগুলি আইন সভায় বিস্তারিত বিতর্কের জন্য পেশ করে। তুলনায় বাংলাদেশে, বেসরকারীকরণ বোর্ড একটি নির্বাহী আদেশে তৈরি হয়েছিল, এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারী করতে হবে, সেগুলো হয় দাতাদের চাপে অথবা আর্থিক বাধ্যবাধকতার কারণে চিহ্নিত করা হয়। যদিও এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে সংসদীয় বিতর্ক বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হ্রাস করতে পারত – সরকারের কেউ কেউ যুক্তি দেখান এতে পদ্ধতিটি আরো শ্লথ হয়ে পড়ত – তবুও হিসাব নিলে দেখা যাবে, জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক হলে সংস্কারের বৈধতা ও সমর্থন বেড়ে যায়।

৪.৭ জনগণের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা- বিতর্কের অভাব যে আরেকটি ভ্রান্ত তথ্যের জন্ম দিয়েছে, তা হল আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত। এই কর্মসূচির মূল উপাদানগুলি সরকারের নিজস্ব মানি এন্ড ব্যাংকিং কমিশনই প্রস্তুত করেছিল, এবং সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও ইউএসএইড এর মত দাতারা তাতে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু "সরকারের নিজস্ব সংস্কার কর্মসূচি"র ওপর জনগণের আলোচনা-বিতর্কের অভাব মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণার জন্ম দিল যে, সংস্কার বিষয়টি বাইরে থেকে চালিত।

৪.৮ গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় তত্ত্বাবধান ও আইন প্রণয়নগত কাজকর্মের অনেকটাই স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির করার কথা। কিন্তু এসব কমিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকার্যকর। কার্যবিধির অধীনে এসব কমিটির কাজকর্ম খুবই সীমিত, এবং তারা আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে মৌলিক স্বার্থগত সংঘাতের জন্য। প্রতিটি কমিটির সভাপতি হচ্ছেন একজন মন্ত্রী, যার মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধান ঐ কমিটির করার কথা। বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ও সরকারী দলের পেছনের সারির সাংসদের এ জন্য সতর্কপ্রহরী হিসেবে ভূমিকা পালনের কোনো সুযোগ প্রায় থাকে না।

৪.৯ প্রশ্নোত্তর পর্বেও মন্ত্রীদের জেরা করার সুযোগ সাংসদদের তেমন একটা থাকে না। যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য অনেক সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সময় রয়েছে, যে সময় সাংসদরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারেন; কিন্তু বাংলাদেশে সেটি অনুপস্থিত। এমনকি, যখন কোনো প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রীর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তখনও ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দাঁড়ান। বাংলাদেশে বস্তুত প্রধানমন্ত্রী কখনো সংসদের ফ্লোর থেকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হন না।[৩]

৪.১০ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা মৌলিক দুটি বিষয় এগুলো অর্জনের জন্য বাংলাদেশকে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। ভাল প্রশাসনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ যে, সংশ্লিষ্ট সকলে দক্ষতা বৃদ্ধি ও জাতীয় জীবনে সংসদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে যাবেন। এই প্রচেষ্টার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বকে। সংসদীয় নিরীক্ষা এবং তত্ত্বাবধানে নিজেদের ন্যস্ত করতে সরকারী দলের সুস্পষ্ট আগ্রহ দেখাতে হবে। একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, একটি দ্বিপক্ষীয় **সংসদীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হোক। নিচের রূপরেখা মতে সংসদীয় তত্ত্বাবধান জোরদার করার জন্য একটি সুস্পষ্ট এ্যাকশন প্ল্যান** তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা ও দেশব্যাপী লোকজনের সংগে কথাবার্তা বলতে এই টাস্ক ফোর্সকে সুযোগ দেয়া হোক।

- *সাংসদদের অফিস ও পর্যাপ্ত গবেষণা সুবিধা প্রদান* – যথাযথভাবে সাজানো অফিস, বেতনভূক কর্মচারী – যা গ্রন্থাগার ও গবেষণা সুবিধাদি যথেষ্ট উন্নত করবে – এবং প্রয়োজন হলে অনুসন্ধানী কাজের জন্য তহবিল ব্যবস্থা।

---

৩ রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা উল্লেখ করেছেন যে যুক্তরাজ্যে "....যে ব্যক্তি সপ্তাহে দু'বার প্রশ্নোত্তর পর্বের সম্মুখীন হন, তিনিই সবচেয়ে বেশি কথা বলেন – অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী।" *মেকিং পার্লামেন্ট ইফেকটিভ*, সিদ্দিকী, এল.কে. প্রমুখ, ঢাকা (১৯৯৪)।

- ***মন্ত্রীদের প্রশ্ন করার মত পরীক্ষিত সংসদীয় চর্চা চালু করা*** – সংসদীয় তত্ত্বাবধানকে জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রীর সাপ্তাহিক প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু করা এবং মন্ত্রীদের সংসদে নিয়মিত ভিত্তিতে প্রশ্নের উত্তর দেয়ায় বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা সুদূর প্রসারী সুফল বয়ে আনবে। এতে সংসদীয় তত্ত্বাবধানের আরেকটি উপায়ও সৃষ্টি হবে -- সাংসদরা মন্ত্রীদের চিঠি দেবেন, যেহেতু মন্ত্রীদের উত্তর অসন্তোষজনক হলে সাংসদরা বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করতে পারবেন।

- ***স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির পদ্ধতি জোরদার করা*** – প্রথম অগ্রাধিকারটিই হওয়া উচিত পাবলিক একাউন্ট কমিটিকে শক্তিশালী করা। সাধারণভাবে, কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করতে হলে তাদের ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন ও সংসদে পেশ করার আগে সকল প্রণীত আইন পরীক্ষা করে দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব (এবং সম্পদ) দেয়ার জন্য সংসদের কার্যবিধির সংশোধন করতে হয়। সম্ভাব্য স্বার্থের বিরোধ নির্মূল করার জন্য মন্ত্রীদের এসব কমিটির সভাপতি হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত। ***গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগগুলি সংসদীয় অনুমোদন লাভের জন্য পেশ করা*** -- যুক্তরাষ্ট্রের মত এখানেও গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় এবং নির্বাহী পদে প্রস্তাবিত প্রার্থীদের একটি উন্মুক্ত শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় অনুমোদন লাভের জন্য উপস্থিত করা হলে একটি ভাল চর্চার ঐতিহ্য সৃষ্টি হবে। এই পথে কিছুটা বাধা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এতে মূল পদগুলিকে উচ্চতর পেশাদারী ও নৈতিকতার মান অর্জনে বাধ্য করবে।

- ***স্থায়ী সংসদীয় সমর্থন ও তত্ত্বাবধান সংস্থাসমূহ সৃষ্টি*** – এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস এবং জেনারেল একাউন্টিং অফিস-এর অনুরূপ। প্রথমটি কংগ্রেসকে বাজেট/অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন দিয়ে থাকে, আর দ্বিতীয়টি চলমান সরকারী কর্মসূচিগুলোর খরচ-সাশ্রয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন করে থাকে। এ ধরনের ভারসাম্যমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, আইএসইডি ও মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য প্রাপ্তি আরো সহজ করার সংগে সংগে "পরিবর্তনের শক্তি" হিসেবেও জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে।

- ***সংবিধান অনুযায়ী একজন ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি*** -- ন্যায়পালের অফিসের মত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কোনো কর্তৃপক্ষ যদি নির্বাহী সংস্থাগুলির কাজকর্ম প্রত্যবেক্ষণ করে, এবং বিরোধ ও অভিযোগের বিচার করে, তাহলে তা হবে একটি অত্যন্ত মূল্যবান পদক্ষেপ।

কম্পট্রলার ও অডিটর জেনারেল

৪.১১ যে কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে স্বচ্ছ আর্থিক জবাবদিহিতার নিশ্চয়তা বিধানের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি। বাংলাদেশে সরকারের আর্থিক প্রত্যবেক্ষণের মূল দায়িত্ব কম্পট্রলার ও অডিটর জেনারেল (সিএজি)'র দপ্তরে ন্যস্ত। এই দপ্তরের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী সাহায্য থেকে পাওয়া অর্থায়নকৃত উন্নয়ন ব্যয়সহ সকল সরকারী ব্যয় প্রশাসনিক, আইনগত এবং সংসদীয় আবশ্যকতা পূরণ করছে কি না তার সত্যতা আগে ও পরে (এক্স-পোস্ট) যাচাই করা। সিএজি বর্তমানে সকল সরকারী সংস্থা, এসওই এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটসমূহের নিয়ন্ত্রণমূলক ও সার্টিফিকেশন হিসাব নিরীক্ষণ করে থাকে। এই প্রথাগত হিসাব নিরীক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবহেলা বা জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী টাকার কোনো লোকসান হচ্ছে কি না অথবা নিয়মবিধি থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটছে কিনা, তা খুঁজে বের করা। এসব হিসাব নিরীক্ষণ সরকারী সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় খুঁজে বের করার জন্যও কাজে লাগানো হয়ে থাকে। সিএজি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করে সংবিধান।

৪.১২ সিএজি'র প্রতিবেদনে ব্যয়কারী সংস্থাসমূহের সন্তোষজনক এক্স-পোস্ট নিরীক্ষা পাওয়া যায় না। এর অনেকগুলি কারণ রয়েছে:

- *কর্মীদের দক্ষতার দুর্বলতা* – সিএজি'র একজনও চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নেই।

- *সেকেলে ধারণা ও পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার* – সিএজি'র হিসাব-নিরীক্ষকরা এখনও ১৯৩৮ সালের হিসাব নিরীক্ষণ নির্দেশিকার ওপর নির্ভরশীল, যা সামান্য পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে। হিসাব নিরীক্ষণের কাজটি একটি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ কাজ হিসেবে না দেখে জালিয়াতি ও অনিয়ম খুঁজে বের করার উপায় হিসেবে দেখা হয়। লেনদেনের মূল্য যাই হোক, এর সত্যতা যাচাই করাটাই এ প্রক্রিয়ার মূল প্রতিপাদ্য। এবং যদিও কার্যসম্পাদনা বা 'অর্থের বিনিময়ে মূল্য' অডিটের কথা নিরীক্ষণ নির্দেশিকায় উল্লেখ করা আছে, সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য একাজটি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

- *হিসাবরক্ষণ ও হিসাব-নিরীক্ষণ এর দ্বৈত দায়িত্ব* – এই দ্বৈততা হিসাব নিরীক্ষণ কাজের সত্যশীলতা খর্ব করে। তাছাড়া যে কর্মীরা এ কাজটি করছেন, তারা একই ক্যাডারের সদস্য হওয়ার জন্য বিষয়টি আরো জটিল হয়ে পড়ে।

- *রিপোর্টসমূহের অপর্যাপ্ত কাভারেজ* – যার প্রতিপাদ্য নীতি সংক্রান্ত উদ্দেশ্য অর্জনের কার্যকারিতার পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রথাগত হিসাব নিরীক্ষণ। হিসাব নিরীক্ষণগুলি খরচ-সাশ্রয়তা প্রয়াসের বদলে আর্থিক ব্যবস্থাপনার 'মেনে চলার' দিকগুলির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

- *প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব* – যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী ও অন্যান্য সম্পদের অভাবে এই বিলম্ব ঘটে। হিসাব নিরীক্ষণ দপ্তরগুলিতে ইংরেজি টাইপরাইটার, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্টেনো-টাইপিস্ট এবং সহায়ক অফিস যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। শুধুমাত্র ১৯৯৪-৯৫ সালে, বিদেশী সাহায্য প্রাপ্ত প্রকল্প অধিদপ্তরকে ৬৫০টি হিসাব নিরীক্ষণ করতে হয়েছিল, এবং এজন্য তিনজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত ৪০টি দল ছিল। প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন যখন কয়েক বছর পরে প্রকাশিত হয় (৫-৮ বছরের বিলম্ব অসাধারণ কিছু নয়), আর্থিক অযথার্থতা অথবা প্রশাসনিক অবহেলার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে, বিশেষ করে ম্যানেজারদের যেখানে ঘনঘন বদলি করা হয়।

- *সংহতির অভাব এবং রিপোর্টের নিম্নমান* – এই অভাব ও দুর্বলতাগুলি সিএজি'র এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটসহ হিসাব নিরীক্ষণ তথ্য যোগানদাতা অন্যান্য সংস্থার কর্মীদের অযোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের অভাবকেই তুলে ধরে। সিএজি'র অফিস থেকে প্রেষণে প্রেরণের ক্ষেত্রে নিরুৎসাহের জন্য এবং বেসরকারী ফার্মকে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটগুলিতে যোগ্য হিসাবরক্ষক সংগ্রহে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

- *ফলো-আপ কাজে অপর্যাপ্ত মনোযোগ* – যখন বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলি হিসাব নিরীক্ষণ নিয়মকানুন থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে দ্রুত এবং কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। তাছাড়া কোনো হিসাব নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ৪৫ দিন সময় দেয়ার যে ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত, তাও কালেভদ্রে প্রয়োগ করা হয়।

৪.১৩ জাতীয় সংসদ এবং এর পাবলিক একাউন্ট কমিটি (পিএসি) কে যেহেতু সিএজি'র প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করতে হয়, এর ভুলত্রুটি সরকারের জবাবদিহিতার ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। এর ফলে বিদেশী সাহায্য ব্যবহারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশির ভাগ দাতা সংস্থা চায় যে, বার্ষিক অডিটকৃত প্রকল্প-হিসাব এবং আর্থিক বিবরণী যেন সময়মত পেশ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে খুব কমই সেসব সময়মত দেয়া হয়। সিএজি-সম্পর্কিত নিচের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলি, যেগুলো ওডিএ সাহায্যপ্রাপ্ত CORBEC এবং এর ফলো-আপ RIBEC প্রকল্পে খতিয়ে দেখা হয়েছে, সেগুলো আরো দ্রুত পরিচালিত হওয়া উচিত:

- সিএজি'র হাতে ***সম্পদের প্রাপ্যতা বাড়াতে হবে***। পেশাদারী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করতে – এবং এটি ল্যাটেরাল বা আড়াআড়ি নিয়োগ ও বেতনভাতার ক্ষেত্রে আরো বেশি নমনীয়তা আনয়নের মাধ্যমে করা সম্ভব। একই সাথে হাজার হাজার কেরাণীকে পর্যায়ভিত্তিক অব্যাহতি দিতে হবে। সহায়ক সুযোগ সুবিধাকে আধুনিকীকরণ করতে হবে।

  - সিএজি কর্তৃক হিসাব নিরীক্ষণের বিকল্প হিসেবে ***হিসাব নিরীক্ষণ ফার্মগুলিকে সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা*** সিএজি, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির হাতে দিতে হবে। এই নিয়োগ পারিশ্রমিকের বাজার দর অনুযায়ী করতে হবে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ ব্যবস্থা সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী বাতিল করে দেয়া হয়, যে বিধানে উল্লেখ ছিল যে, সর্বোচ্চ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা হিসাবে সিএজি'র একক কর্তৃত্ব থাকবে ।[৪]

  - ***দ্রুত প্রারম্ভিক হিসাব নিরীক্ষণ চালু*** -— সংসদীয় পাবলিক একাউন্টস কমিটি সিএজি নির্ধারিত "লং ফর্ম নিরীক্ষা প্রতিবেদন" দাবী করে। কিন্তু এই পদ্ধতিটির পরিবর্তে আরো সংক্ষিপ্ত "শর্ট ফর্ম নিরীক্ষা প্রতিবেদন" চালু করা উচিত।

  - ***প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করা*** —— অভ্যন্তরীণ (পেশাদার সংস্থাসমূহের সাথে ব্যবস্থাক্রমে) এবং বৈদেশিক —— উভয় প্রশিক্ষণ।

  - ***পদ্ধতিগত প্রসিজ্যুরাল জবাবদিহিতা থেকে ফলাফল বা উৎপাদন (আউটপুট)-মুখী জবাবদিহিতায় সরে যাওয়ার লক্ষ্যে সুসমন্বিত হিসাব নিরীক্ষণ চালু করা*** – এ ক্ষেত্রে খরচ সাশ্রয়তা ও অর্থের-বিনিময়ে-মূল্য অডিট পদক্ষেপগুলি জড়িত থাকবে। যুক্তরাজ্যে বেশির ভাগ সরকারী খাতের সংস্থার জন্য এটি বাধ্যতামূলক, এবং কানাডা[৫] ও অন্যান্য ওইসিডি-ভুক্ত দেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত। সুসমন্বিত হিসাব নিরীক্ষণের জন্য এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় যে সিদ্ধান্ত প্রণেতারা সরকারী নীতি ও কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন, কার্যসম্পাদনা মান নির্দিষ্ট করে দেবেন, এবং এসব মান অর্জিত হচ্ছে কি না প্রত্যবেক্ষণ করবেন। সুসমন্বিত হিসাব নিরীক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হবে (ক) মানসম্পন্ন পরিমাপকের বিপরীতে ভিন্ন ভিন্ন সার্ভিসের

---

৪ বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির অডিট বিলম্বের জন্য সৃষ্ট সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরে সিএজি'র অধীনে ১৯৯০ সালে বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পের হিসাব নিরীক্ষণ অধিদপ্তর (ডিওএএফএপি) স্থাপন করা হয়। তবে বিওএএফপি অডিট আবশ্যকতার অনেক পেছনে পড়ে আছে (শুধুমাত্র এ বছরেই ৬০০ প্রকল্প/উপ-প্রকল্প) এবং এর তিন সদস্যের ৪৭টি দল এ পর্যন্ত মাত্র ১৬০টির হিসাব নিরীক্ষণ করেছে। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি প্রকল্প কাঠামোগুলোকে (যেমন এলজিইডির অধীনে পল্লী সড়ক প্রকল্প) বাইরের হিসাব নিরীক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন।

৫ দেখুন : *ইফেকটিভনেস : রিপোর্টিং এন্ড অডিটিং ইন দি পাবলিক সেক্টর*, কানাডিয়ান কম্প্রিহেনসিভ অডিটিং ফাউন্ডেশন (১৯৮৭)।

কার্যসম্পাদনা, (খ) একই রকমের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত অনেকগুলি সংস্থার সংগে তুলনায় একটি আপেক্ষিক কার্যসম্পাদনা পরিমাপ, এবং (গ) কর্মসূচিগুলি যে ব্যয়বহুল এবং অদক্ষ শ্বেতহস্তী নয়, তা নিশ্চিত করার জন্য দক্ষতার পরীক্ষা (যেমন নির্মিত সড়কের মাইল প্রতি ব্যয়) এবং কার্যকারিতা (যেমন ভ্রমণ খরচ হ্রাস)। এ ধরনের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য প্রয়োজন হবে কার্য পরিচালানা ক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং বহু ক্ষেত্র থেকে আসা হিসাব নিরীক্ষণ দল।

- *হিসাব নিরীক্ষণকে হিসাবরক্ষণ কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক রাখা* – হিসাবরক্ষণের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য এটি প্রয়োজন।

৪.১৪ সিএজিকে যে আরেকটি পদক্ষেপ জরুরী ভিত্তিতে নিতে হবে : তা হল বাণিজ্যিক এসওই – যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, এনসিবিসমূহ, বিআইডব্লিউটিসি, বিএসইসি ইত্যাদির বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষণের মান উন্নত করা। এসব নিরীক্ষণের সমস্যা হচ্ছে অডিটের আওতা কতটুকু সে ব্যাপারে সংজ্ঞার অভাব এবং একেবারেই অপ্রতুল হিসাব নিরীক্ষণ ফি। উদাহরণস্বরূপ, বেশির ভাগ এনসিবিগুলির বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষকদের মাত্র ৫-৬ হাজার ডলার দেয়া হয় –অথচ এদের শাখার সংখ্যা হাজার হাজার এবং ঋণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। কেন্দ্রীয় (বাংলাদেশ) ব্যাংক এর হিসাব নিরীক্ষকদের মাত্র ২,০০০ ডলার, এবং অনেক এসওই ১,০০০ ডলারেও কম দিয়ে থাকে। এ জন্য আশ্চর্যের কিছু নেই যে, হিসাব নিরীক্ষকরা তাদের কাছে প্রত্যাশিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। শত শত কোটি টাকার সরকারী পরিসম্পৎ এবং তহবিল যেখানে জড়িত সেখানে এটি অত্যাবশ্যকীয় যে বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষণ হবে সুসমন্বিত এবং সময়ানুবর্তী। জরুরী ভিত্তিতে **সিএজিকে তার অডিটরদের শীর্ষ দলের সহযোগিতায় একটি মডেল হিসাব নিরীক্ষণ পরিসর/কার্যপরিধিসমূহ (ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নির্দেশিকা ব্যবহার করে) তৈরি করা উচিত, এবং সম্ভাব্য ব্যক্তি-মাসের আবশ্যকতা নির্ধারণ করা উচিত, যা হিসাব নিরীক্ষণ নিয়োগ এবং হিসাব নিরীক্ষণ ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি এসওই ব্যবহার করতে পারে।**

নির্বাহী বিভাগের ভিতরে জবাবদিহিতা বাড়ানো

সরকারী বাজেটের কেন্দ্রিকতা

৪.১৫ বাজেট হচ্ছে সেই উদ্দীপক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অংশ যে ব্যবস্থার অধীনে সরকারী কর্মচারীরা কাজ করেন। কাজেই বেশির ভাগ সংস্কারাধীন দেশে (ঘর ৪.১) বাজেট সংস্কার কার্যসম্পাদনা ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। একই সাথে, তা সরকারের আকৃতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং "অর্থের বিনিময় মূল্য" দাবী করে সরকারী খাতের দক্ষতা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। বস্তুত বাজেট হচ্ছে সরকার-ব্যাপী একমাত্র কৌশল যা সরকারী খাতের ব্যয়ের মান ও গতি পথ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরগুলিকে তাদের ব্যয়/কর্মী/বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের পরিণতির (পরিচালনগত বাধানিষধ এবং আর্থিক উদ্দীপক/জরিমানার বিচারে) মুখোমুখি হতে হয়, তখন ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক বেশি সংহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাজেট পদ্ধতির নির্ঝঞ্ঝাট পরিচালনার পেছনে একটি সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা উচিত, যা বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য পেশাদারী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনীর সমর্থন পাবে। তবে কোনো বাজেট পদ্ধতিকে একটি কার্যকর নীতি-হাতিয়ার হওয়ার জন্য অবশ্যই (১) ফলাফল ও কার্যসম্পাদনের ওপর জোর দিতে হবে, যাতে সম্পদ বন্টন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তসমূহ সবচেয়ে অনুকূল ফলাফল অর্জন করতে পারে; (২) একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সংগে সম্পর্কিত হতে হবে যা নীতি-লক্ষ্যসমূহের মধ্য-

মেয়াদী কাঠামো উপহার দেবে; (৩) বাজেট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ত্রুটিহীন প্রত্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে; (৪) ফিডব্যাক প্রাপ্তির এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট প্রদানের ত্রুটিহীন প্রণালী থাকতে হবে; এবং (৫) বিচক্ষণ প্রশাসনিক পদ্ধতি ও চর্চার একটি সহায়ক কাঠামো থাকতে হবে; যা নিশ্চিত করবে যে, ব্যয়-কর্মসূচিগুলি শুধুমাত্র হিসাব নিরীক্ষণ নিয়ম মেনে না চলে প্রকৃত ফলাফলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, এবং কঠোর বাজেট সীমাবদ্ধতার ভিতরে দক্ষ সম্পদ বন্টন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া হবে। যদি শেষোক্ত শর্তটি সন্তোষজনকভাবে মানা না হয়, তবে এরকম একটি বিপদ থেকে যায় যে, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রয়োগের প্রচেষ্টায় বাজেটের ব্যবহার হয়তো আর্থিক (ব্যয়) সংকোচনের বিচারে সমষ্টিক অর্থনীতিগত উদ্দেশ্য অর্জন করবে কিন্তু এটি করতে গিয়ে সম্পদ বন্টনে হয়তো গুরুতর বিকৃতি ঘটতে পারে।

৪.১৬ বাংলাদেশের সংবিধানে বাজেট প্রক্রিয়ার মৌলিক আইনগত কাঠামো দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ৮১ থেকে ৯২ সংখ্যক আর্টিকলে বাজেটগত প্রক্রিয়ার চাহিদাসমূহের রূপরেখা নির্দেশ করা আছে। বাজেট দু'টি ভাগে পেশ করা হয় -— রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের। যদিও অর্থ বিভাগের সচিব বাজেট প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন, তাঁকে সহায়তা করেন একজন অতিরিক্ত সচিব যার অধীনে আছে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের দু'টি শাখা – যেগুলোর দায়িত্বে আছে যথাক্রমে একজন করে দু'জন যুগ্ম-সচিব। রাজস্ব বাজেট শাখার দায়িত্ব থাকে প্রতিটি পর্যায়েই মন্ত্রীর বাজেট উপস্থাপনা মিলিয়ে দেখা ও পরীক্ষা করে দেখা থেকে শুরু করে সারসংক্ষেপ নির্ণয় এবং সংসদে এর পরিক্রমণ থেকে শুরু করে এর প্রকাশনা পর্যন্ত। অন্যদিকে উন্নয়ন বাজেট শাখা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রস্তুত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে উন্নয়ন বাজেটে রূপান্তরিত করে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের বাজেট পঞ্জিকা (পরিশিষ্ট ৪) বাজেট প্রণয়নের সময়সূচি এবং প্রক্রিয়ার একটি ধারণা দেয়।

৪.১৭ বাংলাদেশে একট দক্ষ বাজেট পদ্ধতির খুব কম মৌলিক উপাদানই বর্তমান। প্রধান দুর্বলতাগুলি হল :

- বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়— এরকম নিয়ম-কানুন একসাথে সহজে পাওয়া যায় না। এগুলো বিভিন্ন দলিলপত্রে ছড়িয়ে আছে।

- একদিকে, বিদ্যমান বাজেট পঞ্জিকা অতিশয় দীর্ঘ। এসব শুরু হয় বর্তমান আর্থিক বছর শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই এবং এর ফলে ব্যয় প্রবণতাসমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ বাধা প্রাপ্ত হয়। এটি চলতে থাকে অর্থ বছরের একেবারে শেষ পর্যন্ত। অন্যদিকে, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্লেষণের সময় থাকে খুবই কম।

- বাজেটে মধ্য মেয়াদী ব্যয় ও রাজস্ব কাঠামোর অভাব রয়েছে।

- বাজেট কর্মীদের বিশেষ চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণ, বা বাজেট সংক্রান্ত যোগ্যতা অথবা সরকারী ব্যয় বিশ্লেষণের যোগ্যতা আছে সামান্যই – অথবা একেবারেই নেই; অথচ বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে একটি কঠিন কাজ।

- বাজেট প্রক্রিয়ার শুরুতে সম্পদের অপ্রতুলতা বাজেট প্রণয়নের আগে ভাগেই বাজেট সিলিং স্থাপনের বিষয়টি নাকচ করে দেয়। জনশক্তি ব্যয় ছাড়া এমন কোনো অর্থায়নের নিশ্চয়তা নেই, যা দিয়ে বাজেটভুক্ত মন্ত্রণালয় তার পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।

- রাজস্ব বাজেটগুলি তৈরি করা হয় ইনক্রিমেন্টাল ভিত্তিতে। কাজেই, বিগত বছরগুলির সঠিক আর্থিক বিবরণী না থাকার মানে হচ্ছে এই যে ইনক্রিমেন্টাল বৃদ্ধিগুলি একটি ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তি থেকে অনুমান করা হচ্ছে। ইনক্রিমেন্টাল বাজেট প্রণয়ন অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে না, অথচ ব্যয়বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

- বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূল প্রয়াস হচ্ছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও দপ্তরের বিদ্যমান জনশক্তি সেবাসমূহ বজায় রাখা। এ জন্য নতুন কোনো কর্মকাণ্ড অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে দাঁড়ায় – ব্যয়ের কোনো বিকল্প হিসেবে নয়। এতে চারদিকে গজিয়ে ওঠা সরকারের জন্য তা অন্তর্নিহিত একটি বেগ সঞ্চার করে। সংস্থাপন সংখ্যাসমূহ এবং বেতন-ভাতার ব্যয় পূর্বনির্ধারণের ফলে বাজেটের ৬০-৭০% ভাগই অঙ্গীকার করা হয়ে যায়; এর ফলে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি বা পুনর্বণ্টনের সুযোগ বলতে গেলে আর থাকে না।

- রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট আলাদা আলাদা করে প্রণীত হলেও তারা বহিঃস্থ বিবেচনায় পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, রাজস্ব বাজেট – যা সরকারের পৌনঃপুণিক ব্যয় তুলে ধরে – অনেকাংশে ঐতিহাসিক হেতু দ্বারা চালিত হয়, যেগুলো বিগত বছরের ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত। এতে একবারে একটি বছরের হিসাব করা হয়। অন্যদিকে, উন্নয়ন বাজেট দাতাদের তহবিল প্রাপ্তি এবং বর্ধিত হারে রাজস্ব বাজেটের অধীনে পৌনঃপুণিক ব্যয় মেটানোর পর সম্ভাব্য সঞ্চয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাজেটের এই অবশিষ্টাংশ চরিত্র তহবিলের অনিশ্চয়তাকে, এবং পরিকল্পনার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যয়কারী ব্যবস্থাপকদের দায়ী করার সমস্যাকে, আরো বাড়িয়ে তোলে। তাছাড়া, রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে কিছুটা কৃত্রিম বিভাজনের জন্য সম্পদের সার্বিক বণ্টন দক্ষতা অর্জন দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ বাজেট মৌলিকভাবে একটি হিসাবরক্ষণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, যা একটি বিশেষ বছরের জমা খরচ তুলে ধরে।

- বাস্তবে, মন্ত্রণালয়গুলি তাদের বাজেট সরাসরি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কাজেই মন্ত্রণালয়গুলি তাদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বাজেট উপস্থাপন সম্পর্কে বাজেট প্রক্রিয়া অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ভালভাবে জানতে পারে না – তখন ঐসব উপস্থাপনাতে সংশোধনী আনতে গেলে সার্বিক প্রক্রিয়াতে বিলম্ব সৃষ্টি হয় এবং পরিবর্তন সমন্বিত করার আর সময় থাকে না।

- মন্ত্রণালয়গুলির বিভিন্ন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে এবং ঐ ভিত্তিতে তহবিল দিতে খুব সামান্যই চেষ্টা করা হয়। কর্মসূচিসমূহকে কদাচিৎ সামূহিক দৃষ্টিতে দেখা হয়; বরং সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট চলমান রাজস্ব ব্যয়ের থেকে আলাদা কতগুলো প্রকল্পের সম্মিলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাজেট প্রণয়নে বাজেটভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলির সচিব বা মন্ত্রীর অসম্পৃক্ততা, সুনির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের অনুপস্থিতি এবং ইনক্রিমেন্টাল বাজেট প্রণয়ন নীতির প্রতি আনুগত্য মন্ত্রণালয়গুলিকে সেবার চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট তৈরি করার বা তাদের ভৌতিক এবং আর্থিক কার্যসম্পাদনা পরিমাপ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

৪.১৮ বাংলাদেশ সরকার বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং এ জন্য একটি কারিগরী সাহায্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের সংস্কার (RIBEC) নামে অভিহিত। রিপোর্ট এবং সরকারী হিসাব উপস্থাপনা, কম্প্যুটার পদ্ধতি চালু এবং একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনা তথ্যের পদ্ধতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত সংস্কার সাধন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে সম্প্রতি,

প্রকল্পটি ধীর গতির হয়ে গেছে এবং এর অধিকাংশ উদ্দেশ্য হয়তো অপূর্ণ রয়ে যাবে। অর্থ বিভাগে একটি নীতি বিশ্লেষণ সেলও খোলা হয়েছে। এই সেলটি অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করে আর্থিক নীতি বিষয়ে উপদেশ দিবে বলে আশা করা যায়।

৪.১৯ RIBEC প্রকল্প বাজেট পদ্ধতিকে উন্নত করবে বলে আশা করা গেলেও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রয়োগে এবং কার্যসম্পাদনা ও বিকল্প বিষয়গুলি তুলে ধরতে একটি হাতিয়ার হিসেবে বাজেটের সম্ভাবনা পরিপূর্ণভাবে অর্জন করতে হলে আরো অনেক সংস্কার সাধন করতে হবে। সুদূরপ্রসারী সংস্কার সাধনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে বাজেট প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক নানা আয়োজন (যেমন নিয়ম, নীতি, পদ্ধতি) কিভাবে সম্পদ বন্টন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী উদ্দীপকসমূহকে প্রভাবিত করে, তার একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে একটি বাজেট পদ্ধতি তৈরি করতে হবে, যা আর্থিক শৃঙ্খলা সমন্বিত করতে সাহায্য করবে, কৌশলগত অগ্রাধিকারের সংগে সম্পর্ক রেখে ব্যয় বিন্যাস নিশ্চিত করবে এবং বাজেট সংক্রান্ত সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা উৎসাহিত করবে। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, একটি সংস্কার কর্মসূচি প্রস্তুত করতে বাংলাদেশ যেন নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মালাবী, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে। এই মৌলিক সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি পর্যায় ভিত্তিক এবং বিবর্তনবাদী পদ্ধতি গ্রহণ প্রস্তাব করা হচ্ছে, যা বেশির ভাগ দেশেই (নিউজিল্যান্ড ছাড়া) গ্রহণ করা হয়েছে। এতে নতুন উদ্যোগ সীমিত হবে, বাস্তবায়ন ক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত ভার কমবে এবং RIBEC সংস্কারসমূহ বাস্তবায়িত হবে।

ঘর ৪.১. নির্বাচিত কিছু দেশে বাজেট সংস্কার

নিউজিল্যান্ড

ঘর ১.৬-এ যেমন দেখানো হয়েছে, নিউজিল্যান্ড কতগুলো বৈপ্লবিক আর্থিক/বাজেট সংস্কার হাতে নেয়। নিউজিল্যান্ডের সংস্কারের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা হচ্ছে সর্বব্যাপী – যেমন, প্রধান নির্বাহীর সংগে সম্পাদিত চুক্তিতে ফলাফল/উৎপাদনকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা, বাজেটগত অর্থ বরাদ্দ নেয়াকে সুস্পষ্টভাবে ক্রয়কৃত উৎপাদন (আউটপুট) এর উপর ভিত্তি করা এবং সরকারের নীট মূল্য দেখিয়ে ব্যালেন্স শীট বা স্থিতিপত্র প্রকাশ। এছাড়া, আইনসভা নিয়মিত বিরতিতে এসব পদক্ষেপ জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিধানও সৃষ্টি করেছে।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া একটি মধ্য-মেয়াদী ব্যয় কাঠামো (MTEF) চালু করেছে, যা বাজেট প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকে সামগ্রিক আর্থিক পরিমাপকের মধ্যে কৌশলগত অগ্রাধিকার পরিবর্তনের ওপর নিবদ্ধ করেছে। দেশটি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যা বাজেটভুক্ত সংস্থাগুলিকে যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছে, এবং তাদেরকে সঞ্চয়ের বিভিন্ন পথ বেছে নিতে উদ্দীপনা দিয়েছে। একই সময়ে সংস্কারসমূহ ফলাফলের ওপর জোর দিয়েছে এবং জবাবদিহিতা চালু করতে সচেষ্ট হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও স্বচ্ছতাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এটি সবচেয়ে ভালভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এই আবশ্যকীয়তার মধ্যে যে অগ্রবর্তী প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে একটি সমন্বয় যোজনা প্রকাশ করতে হবে, যাতে বার্ষিক বাজেট ব্যয় অগ্রবর্তী হিসাবের বিপরীতে কতটা পরিবর্তন করা হয়েছিল, এবং একই সাথে, এসব পরিবর্তনের কারণ ও তাদের বছর-বহির্ভূত গূঢ়ার্থ উল্লেখ করতে হবে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা

দেশটি অর্থ বছরের শেষ মাসগুলিতে "হারানোর চাইতে খরচ করে ফেলার" মনস্তত্ত্ব নিবারণ করার জন্য বার্ষিক আবর্তে স্থিতিস্থাপকতা সংযোজন করেছে, বাজেটকে কর্মসূচির আকারে উপস্থাপিত করেছে, এবং দপ্তরগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদনের ব্যাপ্তি ও আকার জোরদার করেছে।

মালাবী

MTEF এর মাধ্যমে ব্যয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণের জন্য মালাবী একটি সুসমন্বিত কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

৪.২০ পরবর্তী ১২-১৮ মাসের জন্য প্রথম পর্যায়ে মাত্র ক'টি উদ্যোগই প্রস্তাব করা হল যেগুলো NCRG/দক্ষতা ইউনিটের কাজ সমর্থন করার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, এবং যেগুলো যে কোনো মৌলিক বাজেট সংস্কারের একটি অংশ হয়ে দাঁড়াবে:

- **একটি বাজেট বিশ্লেষণ ইউনিট (BAU) স্থাপন** – এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট শাখায় স্থাপিত হবে, এবং এতে অত্যন্ত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন (পিএইচডি/এমবিএ) পেশাদার অর্থনীতিবিদ এবং আর্থিক বিশ্লেষকদের সমন্বয়ে একটি মূল দল নিযুক্ত হবে। বর্তমানে বাজেট অফিসারদের স্থলাভিষিক্ত হবার পর BAU হবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মূলধারার প্রধান শাখা, যার দায়িত্ব হবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে আসা বাজেট অনুরোধ নিয়মিত পর্যালোচনা করা; ব্যয়ের যথার্থতা যাচাই করা এবং বন্টন সম্পর্কে সুপারিশ রাখা। ইউনিটটি মধ্য থেকে দীর্ঘ মেয়াদে এ ধরনের প্রশ্ন মোকাবেলায় স্বাধীন ব্যাখ্যা দেয়ার সামর্থ্য গড়ে তুলবে: কোনো বিশেষ সংস্থা জনগণের কাছে যথাযথভাবে সেবা সরবরাহ করছে কি ? বিশেষ খাতসমূহে রাষ্ট্রকে কি এখনও হস্তক্ষেপ করতে হয়? একটি বিশেষ সরকারী ব্যয় যুক্তিযুক্ত করতে বাজার ব্যর্থতার লক্ষণ কি বর্তমান ? ঈপ্সিত সেবা মাত্রা অর্জন করার জন্য বেসরকারী খাত বা এনজিওকে কি কোনো বিশেষ সংস্থার কাজকর্ম সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে চুক্তিভিত্তিক দিয়ে দেয়া যায় ?

- ***বাজেটের "গ্রাহক-বান্ধব" দিকটি উন্নত করা।*** এতে জনগণের মধ্যে আলোচনা-বিতর্কের মান বাড়বে।

- ***প্রকল্প ছক (প্রজেক্ট প্রফর্মা ফর্মাট) সংশোধন করা*** – শক্তি-সংস্থাগুলি যাতে বর্তমান কর্মপন্থা গ্রহণ করার আগে সেবা সরবরাহের বিকল্প উপায় নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়, সেজন্য সরকারী বিনিয়োগ কর্মসূচি পর্যালোচনা এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া (যেমন প্রকল্প ছক পর্যালোচনা) ব্যবহার করা। প্রস্তাব করা যাচ্ছে যে, প্রকল্প ছকে একটি মানসম্মত প্রশ্নমালা যুক্ত করা হোক, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে, দাতা ও সরকারী সংস্থা উভয়ই বিকল্পগুলি গুরুত্বের সংগে পর্যালোচনা করবে।

এই "বাজার পরীক্ষার" মানসম্মতকরণ এক সময় শুধু নিয়ম মাফিক/রীতিবদ্ধ কিছু সাড়া সৃষ্টির পর্যায়ে নিপতিত হতে পারে, তবুও সংস্থাগুলিকে চ্যালেঞ্জপূর্ণ অবস্থায় নিয়ে এসে এবং জাতীয় কমিশনের নির্বাহী পরিষদ (ECNEC) সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে পদ্ধতিটিকে ধীরে ধীরে ঈপ্সিত গন্তব্যে ধাবিত করা যাবে।

ঘর ৪.২. এজেন্সি-উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ: ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টি গভর্নমেন্ট, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

সাধারণ জেলা (ডিস্ট্রিক্ট) আদালত

সাধারণ জেলা আদালতের লক্ষ্য হচ্ছে আদালতের সামনে উপস্থাপিত বিষয়গুলির বিচার নিষ্পত্তি করা। এর নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী রয়েছে :

- আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুযোগ সুবিধা ও যন্ত্রপাতির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আদালতের সামনে উত্থাপিত বিষয়ে সকলেই যাতে মামলার সকল পর্যায়ে সময়মত শুনানি লাভ করেন, তা সবসময়ের জন্য নিশ্চিত করা।

- সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- অর্থ-বহির্ভূত উপায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মামলা-পূর্ব মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা চালু রাখা।

উদ্দেশ্যাবলীর সংগে সঙ্গতি রেখে কার্যসম্পাদনা প্রত্যবেক্ষণের জন্য জেলা আদালতে নতুন মামলার সংখ্যা সহ ব্যবস্থাপনা সূচক ব্যবহৃত হয়। অপরাধমূলক দুষ্টাচরণ, প্রাথমিক শুনানী, ট্রাফিক আইন লংঘন, দেওয়ানী মামলা, এবং ছোটখাটো দাবীর ক্ষেত্রে মাপকাঠি হচ্ছে শুনানির মোট সংখ্যা। মামলা-পূর্ব সেবা, ব্যক্তিগত অঙ্গীকারপত্র সংক্রান্ত সাক্ষাৎকার, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত উকিলের সাক্ষাৎ, এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ বা মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব শুনানীর ক্ষেত্রে সূচক হচ্ছে প্রত্যয়ন বা সার্টিফিকেশন; আর ম্যাজিস্ট্রেট পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত সূচকসমূহ হচ্ছে ইস্যুকৃত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও অন্যান্য লেনদেন।

পুলিশ বিভাগ

পুলিশ বিভাগের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা পুলিশসেবার জন্য সকল অনুরোধে সাড়া দেয়া, এবং অপরাধ ও দুর্ঘটনা থেকে মানুষ ও সম্পত্তি সুরক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘটনা-পূর্ব ও ঘটনা-পরবর্তী কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

বিভাগের উদ্দেশ্যাবলী হল :

- পুলিশ সেবার জন্য অনুরোধে সাড়া দেয়ার সময়ের হার ১৯৯২ পঞ্জিকা বছর পর্যায়ে রাখা।
- প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ডাকাতির হার ৩০.৮ টি ঘটনায় সীমাবদ্ধ রাখা।
- ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের হার প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ৫৯.৭ টি ঘটনায় সীমাবদ্ধ রাখা।
- লক্ষ্যভুক্ত অপরাধসমূহ -- ডাকাতি, চুরি ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ -- নিষ্পত্তির (ক্লিয়ারেন্স) হার ১৯৯২ পঞ্জিকা বছরের প্রকৃত হারের পর্যায়ে রাখা, অর্থাৎ যথাক্রমে ৪১.৬, ২১.৯ ও ১৪.৭।
- মাঁতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর এবং বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর জন্য গ্রেপ্তারের সংখ্যা পাঁচ বছরের গড় হারের পর্যায়ে রাখা বা উন্নীত করা।
- ১৯৯২ পঞ্জিকা বছরের রেকর্ড করা ট্রাফিক দুর্ঘটনার সংখ্যাবৃদ্ধি শূন্যে নিয়ে আসা। মৃত্যু/ব্যক্তিগত আঘাতের জন্য এই সংখ্যা ঐ বছর ছিল ৪,৬৭৮ এবং সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ছিল ১১,৬৩৭।

পুলিশ বিভাগকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবিচল থাকতে সাহায্য করে যেসব ব্যবস্থাপনা সূচক, সেগুলো হচ্ছে: পুলিশসেবার জন্য অনুরোধে সাড়া দেয়ার গড় সময়, এবং প্রতি ১০,০০০ জনসংখ্যায় ডাকাতি, চুরি ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের হার।

৪.২১ RIBEC সংস্কার ও উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি যদি শেকড় মেলে, তাহলে এ সুপারিশ দেয়া যায় যে, সরকারের ওয়ার্কিং গ্রুপ ও RIBEC কনসালটেন্টরা মিলে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার একটি পর্যালোচনা করবেন (ঘর ৪.১) এবং মৌলিক সংস্কারের জন্য একটি পর্যায়ভিত্তিক কর্মসূচি তৈরি করবেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এসব সংস্কারের উদ্দিষ্ট হবে :

- উৎপাদন/ফলাফল ও বাজেট বণ্টনের মধ্যে যোগসূত্র নির্ণয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রতি মন্ত্রণালয়ের (এবং এর সংস্থাগুলির) উচিত হবে বাজেট/বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দলিলে এর মূল উদ্দেশ্য, কার্যসম্পাদনা টার্গেট এবং গত বছরের অর্জন উল্লেখ করা। মজার ব্যাপার হল, শুধুমাত্র অর্থ মন্ত্রণালয় ছাড়া – যার অর্জন ও লক্ষ্যসমূহ বাজেটে/সরকারী দলিলপত্রে পরিষ্কারভাবে থাকে এবং যা অধিকতর জবাবদিহিতা ও জনগণের মধ্যে বিতর্ক/আলোচনা সৃষ্টি করে – অন্য কোনো মন্ত্রণালয়/ সংস্থা তাদের অর্জন বা লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো তথ্য সংস্থান বা প্রকাশ করে না। সহজ উদ্দেশ্যাবলী (যেমন, লোকসান কমানো, নির্মিতব্য সড়কের কি.মি. হিসাব, নির্মিতব্য স্কুলের সংখ্যা, নিয়োগদান করা হবে এমন শিক্ষকের সংখ্যা, গৃহীতব্য টিকাদান কর্মসূচি, বাস্তবায়নমুখী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা) কোনো বিস্তারিত বিদেশী সাহায্য বা সময় সাপেক্ষে সমীক্ষা ছাড়াই নির্ধারণ করাটা মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলির সামর্থ্যের মধ্যেই আছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি মন্ত্রণালয়/সংস্থা দক্ষতা ইউনিটের সহায়তায় ৩-৪ টি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত একটি সহজ পদ্ধতি ৬-১২ মাসের মধ্যেই বেশ দ্রুত তৈরি করতে পারে। সময়ে এটি আরো পরিশোধিত এবং সম্প্রসারিত হতে পারে, যখন তথ্য উৎপাদন ও প্রত্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, এবং কার্যসম্পাদনা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য জাতীয় সংসদ/জনগণের চাহিদা বাড়বে।

- একটি মধ্য-মেয়াদী রাজস্ব ও ব্যয় কাঠামোর মধ্যে বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপন – এটি বাজেট ও সমষ্টিক অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর সম্পর্ক আরো সংহত এবং স্বচ্ছ করবে, আরো অধিক নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা আরোপ করবে এবং নতুন কর্মসূচি/প্রকল্পের জন্য সম্পদ প্রাপ্যতা প্রকাশ করবে।

- বেতন বিল বৃদ্ধির জন্য "বহু সীমাবদ্ধতার" (মাল্টিপ্‌ল কনস্ট্রেইন্টস) টার্গেট চালু করা। অর্থাৎ জিডিপির ক% বেশি নয়, আবার ঋণ সার্ভিসসহ মোট ব্যয়ের খ% এর বেশিও নয়।

- রাজস্ব ও মূলধন বাজেটের আইটেমগুলি সুসংহত করা, যা প্রতিটি বিযুক্ত ও আলাদা প্রকল্প/কর্মসূচিতে ব্যয়ের (পৌণঃপুনিক ও মূলধন) একটি সুসমন্বিত চিত্র দিবে।

- বাজেটভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলির বাজেট সেলগুলি শক্তিশালী করা।

- বর্তমানে অর্থ বছরের শেষে সম্পূরক বরাদ্দ সংক্রান্ত যেসব অনুরোধ আসে সেগুলোর অনুমতি দেয়ার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা বন্ধ করে বাজেট সীমাবদ্ধতাকে আরো কার্যকর করা। এ পদ্ধতিটি বর্তমানে বস্তুত শুধুমাত্র অননুমোদিত ব্যয়কে বৈধতা দেয়। সকল সম্পূরক বরাদ্দের অনুরোধ অর্থ বছর শেষ হওয়ার অনেক আগে জমা দেয়া উচিত।

বাস্তবায়ন, প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ

৪.২২ বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন, প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (IMED) মাধ্যমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার একটি বিস্তারিত পদ্ধতি প্রস্তুত করে ফেলেছে। এই সংস্থাটি প্রকল্পসমূহের সকল নিয়মমাফিক প্রত্যবেক্ষণের এবং ব্যয় ও ভৌত লক্ষ্যমান (বেঞ্চমার্ক) অর্জন সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পর্যালোচনা প্রস্তুত করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত। ছাড়া IMED বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য সত্যায়িত করার জন্য পরিদর্শন কাজও পরিচালনা করে থাকে। বাস্তবায়ন সম্পর্কে IMED একটি কেন্দ্রীয় ও নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করে, তবে এর তথ্য যেহেতু মৌলিক নয় – অন্যখান থেকে পাওয়া, অর্থাৎ সংস্থাগুলি দ্বারা সরবরাহকৃত – সেজন্য এর ভূমিকা থেকে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে। এ সংস্থা মূল্যায়ন অপেক্ষা প্রত্যবেক্ষণকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

৪.২৩ IMED এর কার্যপরিচালনার কয়েকটি দিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে :

- এর ম্যান্ডেটের সংকীর্ণতা। যেহেতু এর আওতায় আছে প্রকল্পসমূহ – ব্যয় কর্মসূচিসমূহ নয়– সরকারী ব্যয়ের সার্বিক কার্যকারিতা প্রত্যবেক্ষণের সুযোগ এ সংস্থাটির নেই। একটি প্রত্যবেক্ষণ সংস্থাকে অগ্রসংকেত প্রদানকারী পদ্ধতি হিসেবেও কাজ করতে হবে, যাতে সম্পদের কোনো অপব্যবহার রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এটি সিএজি'র মত সংস্থাগুলির 'ঘটনার-পর' জবাবদিহিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদন।

- IMED কে যে সীমিত কাজকর্ম করতে দেয়া হয়েছে, তাতেও সংস্থাটি অনেক সময় অকার্যকারিতা প্রদর্শন করে। এই দিকটি নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখা উচিত যেহেতু এ ধরনের আরো সমস্যা একটি পুনঃসজ্জিত ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংস্থা পরিচালনা করার সময় দেখা দিতে পারে।

- বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকদের ভিতর প্রত্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব IMED -এর কাছে হস্তান্তরের প্রবণতা দেখা গেছে, যার ফলে দ্রুত এবং কার্যকর সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের সামর্থ্য নষ্ট হয়েছে।

- ব্যয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য অতিরিক্ত জোর দেয়া হয়েছে, অথচ ভৌত অর্জন এবং বাস্তবায়ন সময়সূচি অথবা প্রকল্পের নক্সার পরিবর্তন আনতে পারে এরকম সমস্যাকে যথেষ্ট বিবেচনায় আনা হয়নি।

- IMED সম্পূর্ণ হওয়া প্রকল্পগুলি পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করে না – এবং এজন্য প্রকল্প নক্সা ও বাস্তবায়নে উন্নতি ও পরিমার্জনার কোনো নির্দেশনাও দেওয়া হয় না।

৪.২৪ IMED-কে এর বর্তমান কাজকর্ম আরো ভালভাবে করার জন্য এবং সার্বিক নীতি বাস্তবায়ন মূল্যায়নের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী করতে হবে। এ লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে হল :

- *আরো শক্তিশালী করে তোলা IMED -কে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে স্থানান্তর করা* – যেসব সংস্থা সার্বিক প্রশাসনের জন্য কম পদ্ধতিগত গুরুত্ব বহন করে, সেগুলো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরিয়ে নেয়া উচিত। IMED তখন হয়ে দাঁড়াবে সরকারের উন্নয়ন, পৌণঃপুনিক, নীতি সংক্রান্ত,

নিয়ন্ত্রণমূলক ইত্যাদি সকল ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রত্যবেক্ষণ এবং এদের সময়মত ফিডব্যাক দেয়ার জন্য প্রধান নির্বাহীর মূল প্রহরী সংস্থা। IMED ও দক্ষতা ইউনিট (পরিচ্ছেদ ২) যদি একই স্থানে থাকে, তবে এটি নিশ্চিত করা যাবে যে, একটি অন্যটির শক্তিবৃদ্ধি করবে এবং সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে। এভাবে, IMED এর মূল্যায়ন কাজের ফলাফল দক্ষতা ইউনিট তার শিক্ষণীয় বিষয় ও শ্রেষ্ঠ চর্চার প্রচারণার কাজে ব্যবহার করতে পারে।

- ***এর ম্যান্ডেট ব্যাপকতর করা*** -– বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত প্রধান ব্যয় কর্মসূচিগুলির সময়মত পর্যালোচনা দিতে সক্ষম একটি দল গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিকভাবে, IMED কে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহত্তর কর্মসূচির ওপর মনোনিবেশ করতে হবে এবং প্রতিটি সংস্থার ভিতরে অভ্যন্তরীণ প্রত্যবেক্ষণ কৌশল তৈরির তত্ত্বাবধান করতে হবে। যেসব দেশ (যেমন কলম্বিয়া, কোরিয়া) কেন্দ্রীভূত মূল্যায়ন ব্যবস্থায় বিনিয়োগ করেছে, সেসব দেশের উদাহরণ পর্যালোচনা করা লাভজনক হবে। এই ব্যবস্থা কেন্দ্রে একটি কৌশলগত মূল্যায়ন দল সৃষ্টি করেছে এবং একই সাথে সে দলকে উৎপাদন/ফলাফলের বিচারে বাজেটভুক্ত দপ্তর ও সংস্থাগুলির কার্যসম্পাদনা পর্যালোচনার শক্তিশালী ম্যান্ডেট দিয়েছে।

- ***এর প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও প্রতিবেদন ছকগুলি উন্নত করা*** – উদাহরণ হিসেবে IMED-কে মন্ত্রণালয়গুলিতে প্রত্যবেক্ষণ ইউনিটগুলির ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজ চুক্তিভিত্তিক অন্যত্র দেয়ার জন্য একে কিছু পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হল, একটি ষান্মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ, যা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করা উচিত। জনগণের কাছে সহজে তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করলে জবাবদিহিতা উন্নত হবে।

<u>অন্যান্য পদক্ষেপ</u>

৪.২৫ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর মধ্যে জবাবদিহিতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা বাংলাদেশ সরকারের <u>রুলস অফ বিজিনেস</u>-এ (পরিচ্ছেদ ৬) ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এবং কর্তৃত্বের কাঠামো নিয়ে বিভ্রান্তি থাকার জন্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে মন্ত্রণালয়ে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কে, সে ব্যাপারে মতানৈক্য। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে কার্যসম্পাদনা উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি। তৃতীয় একটি সমস্যা হল এই যে, উর্ধতন ব্যবস্থাপকরা সময়মত এবং পর্যাপ্ত তথ্য পান না: বেশির ভাগ মন্ত্রণালয়ে অর্থ ও পরিচালনা কাজের জন্য ভাল ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতির অভাব রয়েছে, এবং যাদের বড় মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় আছে, তারা নির্দেশ এবং প্রত্যবেক্ষণ শর্তাবলী সেখানে পাঠাতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলির মধ্যে জবাবদিহিতা আরো বাড়াবার জন্য দু'দফা পদক্ষেপ নিতে হবে।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামোগুলোর পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য ***রুলস অফ বিজিনেস পরিবর্তন*** (পরিচ্ছেদ-৬)।

- মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর মধ্যে ***ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি উন্নত করার জন্য*** একটি কর্মসূচি চালু করা। এর ফলে সরকারী কর্মকাণ্ড ও কার্যসম্পাদন প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার জন্য এবং আরো সময়মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিসংখ্যান দেয়ার জন্য একটি উপাত্তভিত্তি (ডাটাবেজ) তৈরি হবে।

গ্রাহকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি

"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ......." (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকল ৭)।

৪.২৬ খুব কম উন্নয়নশীল দেশই জনগোষ্ঠীর ওপর সেবা সরবরাহের প্রভাব, বা তাদের কাছে এর উপকারিতার মূল্যায়ন করে থাকে। বেসরকারী খাতে গ্রাহকই হচ্ছে রাজা, কিন্তু জনসেবা বা পাবলিক সার্ভিস সাধারণত ইনপুট এবং নিয়ম মেনে চলার দ্বারা প্রভাবিত হয়। জনগণকে খুব বেশি হলে গ্রাহক হিসেবে, এবং আরো সাধারণভাবে সুযোগলাভকারী হিসেবে দেখা হয়, এবং সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা নিজেদের দেখেন উপকারীর ভূমিকায়। গ্রাহক/ভোক্তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পাওয়ার কোনো ব্যবস্থাই নেই। এমনকি ব্যবসায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হয় যেসব এসওই তারাও কখনো গ্রাহক-জরিপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। রাষ্ট্রীয় সংস্থার ব্যবস্থাপনা যে জরিপ বিরোধী হবে তা আন্দাজ করা যায়, কারণ এগুলোকে তারা তাদের কার্যসম্পাদনা উন্নত করার জন্য চাপ হিসেব বিবেচনা করে – এবং সঙ্গত কারণেই। বেসামরিক প্রশাসন এখনও উপনিবেশী আমলের কর্তৃত্বমূলক আচরণ, পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা এবং গোপনীয় আলাপ-আলোচনার রীতিনীতি মেনে চলে কিন্তু জনসেবার কোনো পরিমণ্ডল সৃষ্টির অব্যর্থ কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ তা দিতে পারে না। বাংলাদেশে সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা "গোপনীয় ফাইল"-এর প্রথাগত পদ্ধতি এবং জনগণের সাথে ন্যূনতম আদান-প্রদানের ঐতিহ্যে লালিত। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণ কোনো নাগরিক যদি তার লিখিত কোনো প্রশ্নের, অভিযোগের বা অনুরোধের দ্রুত উত্তর পেয়ে যান, তাহলে সেটি হবে একটি বিরল ঘটনা। কোনো বিশেষ আমলাতান্ত্রিক উদ্যোগ তখনি নেয়া হয়, যখন সংগঠিত কোনো মহল চাপ সৃষ্টি করে – যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, বা বাইরের দাতারা, অথবা প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তি। সাধারণ নাগরিকদের দাবী ও প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকারী কাজকর্ম নির্ধারিত করার যে অবিরাম প্রয়াস গ্রহণ করা উচিত, তার কোনো লক্ষণই বলতে গেলে দেখা যাচ্ছে না।

৪.২৭ অদূর ভবিষ্যতে যখন গণতন্ত্র ও তথ্যযুগ দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করবে, এবং প্রত্যাশা বাড়বে, ভোটারদের অনীহা হয়তো অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই দৃশ্যপটের প্রেক্ষিতে, সরকারের মনোযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ-মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। ঘর ৪.৩ এ মনোযোগ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য ওইসিডি দেশগুলো যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যে 'অর্থের বিনিময়ে মূল্য' ধারণাটিকে 'নাগরিক সনদ' হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রে বেশির ভাগ সংস্থাকেই সেবার ক্ষেত্রে তাদের কার্যসম্পাদনা মানসমূহকে জনসমক্ষে ঘোষণা করতে হচ্ছে। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ মটর ভেহিক্ল্ তার গ্রাহকদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর কয়েকটি সেবা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; এই মান থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটলে গ্রাহকের অভিযোগ জানাবার অধিকার থাকে, অথবা এর পরিবর্তে ডিজ্‌নীওয়ার্ল্ডে যাবার একটি টিকেটও গ্রাহক পেয়ে যেতে পারেন। সরকার পুনরাবিষ্কারের উদ্যোগটির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহকৃত সেবা প্রদানে সরবরাহকারীর জন্য নিচের নীতিগুলি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করেছেন :

- গ্রাহক কী ধরনের ও কী মানের সেবা চাইছেন, তা খুঁজে বের করার জন্য ঘনঘন জরিপ পরিচালনা করা;
- এসব জরিপের বিপরীতে পরিমাপকৃত মান ও ফলাফল প্রকাশ করা;
- "ব্যবসায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ" যে, তার বিপরীতে সর্বনিম্ন (বেঞ্চমার্ক) কার্যসম্পাদনা স্থির করা;
- সেবা উৎস এবং সরবরাহের উপায় – উভয় ক্ষেত্রে পছন্দের বিষয় রাখা;
- তথ্য, সেবা এবং অভিযোগ পদ্ধতি সহজপ্রাপ্য করা;
- গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং
- নিম্নমানের সেবার জন্য ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া।

ঘর ৪.৩. নাগরিকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগসমূহ

সাম্প্রতিক সময়ে ওইসিডি দেশগুলির সরকার প্রশাসন ও নাগরিকদের মধ্যে সম্পর্কসৃষ্টি ও সম্পর্কোন্নয়নকে অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করছে। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি সরকার জনগণের প্রতি আরো বেশি মনোযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ।

১. **পদ্ধতিগত পদক্ষেপ :** নাগরিকের চাহিদার প্রতি প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলিকে বেশি মনোযোগী করার জন্য অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে আছে পদ্ধতিগত ও আইন প্রণয়নগত পদক্ষেপ এবং ভাষা উন্নয়ন; বিভিন্ন ফর্মের নক্সা; লাল ফিতা কাটা; পদ্ধতিসমূহ দ্রুততর করা; কর্মী প্রশিক্ষণ, এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা। আরো সুনির্দিষ্টভাবে, এগুলোর মধ্যে আছে : নাগরিকদের সংগে যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ অধিদপ্তর স্থাপন যাতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বেসরকারী খাতে প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত; পদ্ধতি ও ফর্মসমূহ সহজতর করা (ফ্রান্স, নরওয়ে); সকল ব্যবহারকারীর জন্য প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে সুবিস্তৃত এবং ব্যাপক প্রশাসনিক নিয়মাবলী সম্বলিত বর্তমান গ্রন্থগুলিকে সম্পাদনা ও রীতিভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ কমিশন গঠন (ফ্রান্স); সেকেলে ও অপ্রাসঙ্গিক আইন বর্জন করার লক্ষ্যে প্রায় সমগ্র আইন সংহিতা পর্যালোচনা করার জন্য সাত-বছর ব্যাপী একটি কার্যক্রম হাতে নেয়া (অস্ট্রেলিয়া); "ব্যবস্থাপনা রূপরেখা" তৈরি যাতে ফর্ম নক্সা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সুনির্দিষ্ট মান অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এর ফলে ফর্মের সংখ্যা যে শুধু সর্বনিম্ন থাকবে, তা নয় বরং যোগাযোগের সহজতা ও দক্ষতা নিশ্চিত হবে (যুক্তরাজ্য); প্রশাসনে সেবা-মুখিনতার ওপর জোর দেয়া, সেরকম আইন পাশ করা (সুইডেন)।

২. **তথ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপ :** এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে আরো বেশি ও উন্নত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে প্রশাসনকে নাগরিকদের চাহিদা ও অনুভূতির প্রতি আরো মনোযোগী করে তোলা। ব্যাপক ভিত্তিক নীতি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে যথাযথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, প্রসার-মূলক কৌশল ব্যবহার, যোগাযোগ সেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং দলিল-পত্রাদি প্রকাশনা। উদাহরণস্বরূপ, তথ্যের স্বাধীনতা আইন পাশ করা হয়েছে এবং তা সকল সরকারী দলিলপত্র নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে, তবে কোনো দলিলপত্র আইন অনুযায়ী এর আওতার বাইরে থাকলে ভিন্ন কথা (অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে); আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রশাসনিক তথ্য কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্য দেয়া হয় (ফ্রান্স); দপ্তরসমূহ, নীতি সংক্রান্ত সকল নির্দেশিকা, দপ্তরগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম ও প্রক্রিয়াসমূহ, সেসব দলিলপত্র কোথায় পাওয়া যাবে, এবং সংযোগকারী কর্মকর্তাদের ঠিকানা ও ফোন নাম্বারসহ অন্যান্য সকল তথ্য সম্বলিত ডাইরেক্টরি প্রকাশ করা হয়েছে (নিউজিল্যান্ড)।

৩. **পরামর্শমূলক পদক্ষেপ:** জনগণের জীবনের সংগে জড়িত প্রশাসনিক বিষয়ে নাগরিকদের ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য এগুলো হচ্ছে উপায় বিশেষ। উদারহণস্বরূপ, প্রশাসনের সাথে জনগণের যোগাযোগ স্থাপনের সমস্যাগুলি জরিপ করা এবং প্রতিকার করার জন্য একটি লাল ফিতা কমিশন স্থাপন করা হয়েছে (সুইডন); প্রচার মাধ্যমের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং মতামত জরিপ পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে (ফ্রান্স)।

৪. **প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ:** এসব পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে বিশেষ প্রতিষ্ঠান, আপীল আদালত ও সালিস-সভা, কমিশন ও উপদেষ্টামূলক সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক আচরণ ও তাদের অধিকার খর্ব করার প্রচেষ্টা থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা করা। দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আছে: প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণ যাতে আবেদন করতে পারেন সেজন্য একজন ন্যায়পাল নিয়োগ (অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে); লিখিত অনুরোধের ২৮ দিনের মধ্যে সরকারী কর্মকর্তারা নাগরিকদের কোনো সিদ্ধান্তের ওপর তথ্যগত খুঁটিনাটি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ জানাতে বাধ্য থাকার আইনগত ব্যবস্থা (অস্ট্রেলিয়া); সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে নাগরিকদের আইনগত সুরক্ষা মজবুত করার জন্য লোক প্রশাসন আইন পাশ করা (নরওয়ে); প্রশাসনের ইউনিট ও সার্ভিসসমূহের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করার জন্য সরকারের ভিতরে একটি নজরদারী সংস্থা তৈরি করা।

৪.২৮ বাংলাদেশে বহু আগেই উপরের উদাহরণগুলির মত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল, যা ভোটারদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হতে পারত। বলাবাহুল্য এসব পদক্ষেপের বিরোধিতা হবে, বিশেষ করে যারা আরো উন্নত জবাবদিহিতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা সহজে এগুলো মেনে নেবে না। **এই প্রতিবেদন সুপারিশ করছে:**

- ***গ্রাহক সেবা বাড়ানো এবং নাগরিকদের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নতুন সৃষ্ট দক্ষতা ইউনিটের একটি উচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।*** একটি সমান্তরাল উদাহরণ হবে সিঙ্গাপুরের সেবা উন্নয়ন ইউনিট (SIU), যা ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। SIU'র তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে আছে একটি রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক দল, এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিবের নের্তৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি। SIU-কে সহায়তা করার জন্য সরকারের সকল ক্ষেত্র থেকে প্রায় একশ শীর্ষ স্কেলের কর্মকর্তাকে কোয়ালিটি সার্ভিস ম্যানেজার হিসাবে প্রতিটি সংস্থায় নিয়োগ দেয়া হয়। তারা জনগণকে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের কাছে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেন, এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতারা ঐসব অভিযোগ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। SIU-র প্রতি জনগণের প্রতিক্রিয়া হয়েছে ইতিবাচক। দাতারাও যে সমস্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিতে সহায়তা দিয়ে থাকেন সেগুলোর জন্য গ্রাহক-জরিপ একটি প্রাতিষ্ঠানিক আবশ্যকতায় পরিণত করাকে সমর্থন দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

- ***সংস্থাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে গ্রাহক সেবার মান সংজ্ঞায়িত করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি।*** প্রতি বছরের শুরুতে প্রতিটি সংস্থাকে লক্ষ্যভুক্ত গ্রাহকদের সংগে চুক্তির আকারে একটি প্রকাশ্য দলিলে তার গ্রাহক মান (ঘর ৪.৪) নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এটি এই সংস্থার গ্রাহক সেবার মান সংজ্ঞায়িত করবে। এই সেবামানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হবে নিকৃষ্ট এবং অনির্ভরযোগ্য সেবার জন্য (যেমন- পুড়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত বিল, ডেড টেলিফোন লাইন ইত্যাদি) মূল্য ফেরত দেয়া। এসওইগুলি বাংলাদেশের ভোক্তাদের/ গ্রাহকদের যে নিম্নমানের সেবা দেয়, তার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিধান থাকা উচিত, যেহেতু গ্রাহকরা তাদের গ্রাহক পছন্দ প্রয়োগ করতে পারেন না।

ঘর ৪.৪. নাগরিকদের সনদ: যুক্তরাজ্যের উদাহরণ

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী জনসেবাকে গ্রাহকদের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতি আরো মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে উন্নত করার লক্ষ্যে নাগরিক সনদ চালু করেন। এই সনদটি এই স্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে, সকল জনসেবার জন্যই নাগরিকরা সরাসরি, অথবা করের মাধ্যমে, খরচ দিয়ে থাকেন। নাগরিকদের অধিকার রয়েছে দক্ষতার সাথে ও যুক্তিযুক্ত মূল্যে দেয়া উচ্চমানের সেবা-প্রাপ্তির এবং তাদের চাহিদার প্রতি অধিকতর মনোযোগের। যেসব নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ডে, কর প্রশাসনে এবং বিচার কার্যে রাষ্ট্র জড়িত, সেখানে এসব কাজকর্মকেও সততা, দক্ষতা ও সৌজন্যের সাথে চালাতে হবে। নাগরিক সনদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নাগরিককে আরো ক্ষমতা দেয়া। এটি রাষ্ট্রের তরফ থেকে আরো জড়িত হওয়ার ব্যবস্থাপত্র নয়, বরং নাগরিকদের অধিকার এবং তাদের আরো অবহিত হওয়ার এবং নিজেদের মতানুসারে পছন্দ করার অধিকার স্বীকার করে নিয়ে ঘোষিত একটি সরকারী অঙ্গীকার।

এই সনদে বেশ কিছু মূল নীতি সংযোজিত হয়েছে সেগুলো জনসেবা প্রাপ্ত জনগণকে "গ্রাহক" হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব নীতিকে জনসেবার দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেও বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নাগরিকের অধিকারসমূহের মধ্যে আছে:

- *সুস্পষ্ট মান* – এসব মান নির্ধারণ, প্রত্যবেক্ষণ এবং প্রকাশ করতে হবে। এবং এসব মানের বিপরীতে সংস্থাগুলির প্রকৃত কার্যসম্পাদনাও প্রকাশ করতে হবে।

- *তথ্য এবং উন্মুক্ততা* – এর মধ্যে আছে জনসেবাগুলি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কী খরচে এবং কতটা ভালভাবে, এবং দায়িত্বে কে আছেন – এসব বিষয়ে সহজ ভাষায় সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা।
- *পছন্দ ও পরামর্শ* – সরকারী খাতকে গ্রাহকদের পছন্দের অধিকার দিতে হবে। সেবা ব্যবহারকারীদের সাথে নিয়মিত পরামর্শ বৈঠক করতে হবে। সেবা সম্পর্কে এবং এগুলো উন্নত করার অগ্রাধিকারের ব্যাপারে ব্যবহারকারীদের মতামত মাননির্ধারণের সময় বিবেচনায় আনতে হবে।
- *সৌজন্য ও সহায়তামূলক আচরণ* – সরকারী কর্মচারীরা নিজের নাম লেখা ব্যাজ পরবেন; তারা সৌজন্য দেখাবেন ও সহায়তামূলক সেবা দিবেন। যাদের সেবার অধিকার আছে, তারা সমানভাবে সেসব সেবা পাবেন।
- *ত্রুটি সংশোধন* – যেখানে সম্ভব নিরপেক্ষ পর্যালোচনাসহ ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপিত এবং সহজে ব্যবহৃত অভিযোগ পদ্ধতিকে সহজলভ্য করতে হবে। যদি কোথাও ভুল হয়, তাহলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে এই ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করতে হবে।
- *অর্থের বিনিময়ে মূল্য* – জাতি যেটুকু সম্পদ দিতে পারে তার ভিতরে জনসেবার সরবরাহ দক্ষ এবং মিতব্যয়ী হতে হবে। এ ছাড়া মানের বিপরীতে কার্যসম্পাদনার নিরপেক্ষ বৈধতা অর্জন করতে হবে।

ব্রিটিশ রেল যাত্রী-সনদ

এই সনদ প্রতিটি রুটের নির্ভরযোগ্যতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করে, এবং সেবার মান বাড়াতে একটি সুস্পষ্ট অঙ্গীকার এতে অন্তর্ভুক্ত। এই সনদ যাত্রীদের অসুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান নির্ধারণ করে, নামের ব্যাজ পরার বিধান সংযুক্ত করে এবং কার্যসম্পাদনা-সম্পর্কিত বেতনের বিষয়টি নির্দিষ্ট করে।

লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড গ্রাহক সনদ

এই সনদ লন্ডন আন্ডার গ্রাউন্ড (পাতাল রেল)কে একটি নিরাপদ, দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থের বিনিময়ে মূল্য সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছে। এই সনদে একটি নতুন মূল্য-ফেরত স্কীম আছে, যাতে কোনো যাত্রীকে যদি প্লাটফর্মে ঘোষিত সময়ের ২০ মিনিট বেশি অপেক্ষা করতে হয়, অথবা যে ট্রেনে তিনি ভ্রমন করছেন, যদি তার ১৫ মিনিটের বেশি বিলম্ব হয় তাহলে একটি মূল্য ফেরত ভাউচার তাকে দেয়ার বিধান রয়েছে। এ স্কীমটি প্রতিটি স্টেশনে পোস্টারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

আবশ্যকীয় সেবা কোম্পানীগুলি

গ্যাস, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও পানির মত কিছু সরকারী সেবা এখন বেসরকারী খাতেও দেয়া হচ্ছে, এবং যেহেতু একশভাগ প্রতিযোগিতা তৈরি হতে আরো দেরি হবে, অথবা এই প্রতিযোগিতার ধরন সীমিতই থেকে যেতে পারে, সেহেতু গ্রাহকের স্বার্থ দেখাশোনার জন্য এবং প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা/দল স্থাপন করা হয়েছে। সরকারের নতুন কম্পিটিশন এন্ড সার্ভিস (ইউটিলিটিজ) এ্যাক্ট, ১৯৯২ নিয়ন্ত্রণকর্তাদের জন্য (১) মান-নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যবেক্ষণ করতে; (২) গ্রাহকদের মধ্যে মান সম্পর্কে সচেতন হতে; (৩) গ্যারান্টিকৃত মান যেখানে মানা হয় না, সেখানে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে; এবং (৪) অভিযোগ পদ্ধতি উন্নত করতে নতুন সংবিধিবদ্ধ ক্ষমতা দিয়েছে।

৪.২৯ অনেক দেশে ***সেবার মান*** চালু করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যে ১৯৯১ সালে নাগরিক সনদ চালু হয়। ফ্রান্সও উৎসাহের সাথে তার ‘সেবা প্রকল্প’ চালিয়ে যাচ্ছে; কানাডা ‘পাবলিক সার্ভিস ২০০০’ এবং মালয়েশিয়া ‘ভিশন ২০২০’ এর কাজ শুরু করেছে। তবে সফল হতে হলে এসব উদ্যোগে নিম্নোক্ত উপাদনগুলি থাকতে হবে:

- *সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত মান* – প্রতিটি জনসেবা থেকে গ্রাহক যে সেবামান আশা করেন, তা প্রকাশ করতে হবে। এটি জনসমক্ষে ঘোষণা করতে হবে, এবং প্রতিটি সেবাস্থানে -— যেমন হাসপাতাল, স্কুল, রেলওয়ে স্টেশন, পুলিশ স্টেশন, শুল্ক অফিস, বন্দর, ইত্যাদিতে পাওয়ার

ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত কার্যসম্পাদন ঘোষিত মানের বিপরীতে বিচার্য হবে, এবং ফলাফল প্রকাশ করতে হবে।

- *তথ্যের ব্যাপক প্রচার* –– গ্রাহকরা কী সেবা পেতে আশা করতে পারেন, সে সম্বন্ধে তাদের সচেতন হওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। সেবাকেন্দ্রগুলির মধ্যে কার্যসম্পাদনের তুলনা এবং সেগুলো প্রকাশ করা হলে তাতে প্রতিযোগিতা বাড়বে, এবং সেবা উন্নয়নের জন্য চাপ বাড়বে। অবশ্য কতগুলি ক্ষেত্রে, যেমন টিকাদান, নিরাপদ পানি ব্যবহার ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের নিজেদেরকেই প্রাপ্ত সেবাসমূহের পূর্ণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

- *প্রতিকারের কার্যকরী পন্থা* – নাগরিকদের অভিযোগ তুলে ধরতে এবং এগুলো প্রতিকারের জন্য কার্যকর মাধ্যম প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে গ্রাহকদের মূল্য ফেরত দেয়া, এবং সম্ভব হলে, নিকৃষ্ট সেবা প্রদানের জন্য এসওই-দেরকে জরিমানা করা, এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা। এই শেষোক্ত উপায়টি নিয়ে এগিয়ে যেতে হলে সেবাপ্রদানকারীদের আচরণ পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র রক্ষণাত্মকভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে অভিযোগগুলিকে গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়াবার জন্য মূল্যবান তথ্য হিসেবে তাদেরকে বিবেচনা করতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত, সরবরাহকারীরা তাদের দায়-দায়িত্ব যে স্বীকার করছে, সেটি নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহক সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করতে হবে।

- *অর্থের বিনিময়ে অধিক মূল্য* –– দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে, এবং অপচয় নির্মূল করে অর্থের বিনিময়ে মূল্য বাড়ানোর জন্য অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে। প্রতিটি জনসেবার এরূপ উন্নতির জন্য টার্গেট থাকা উচিত, এবং টার্গেট অর্জিত হলে তাদের স্বীকৃতি ও পুরস্কার দেয়া উচিত।

৪.৩০ মন্ত্রণালয়গুলি থেকে লক্ষ্য নির্ধারণ/অর্জন বিবরণী প্রকাশের বিধান করা হলে এবং সেবা মান নির্ধারণ করা হলে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুফল হবে এই যে, সরকার কী করতে চাচ্ছে, কতটা প্রকৃত অর্জন হচ্ছে এবং ফলাফল খরচ সাশ্রয়ী ভাবে এবং ঘোষিত উদ্দেশ্যের সংগে সঙ্গতি রেখে করা হল কিনা –– এসব প্রত্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করার সুযোগ নাগরিকদলগুলি পাবে। নাগরিক দলগুলি তখন প্রতিশ্রুতিমত সেবা প্রদানের জন্য সরকারের সকল পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কার্যসম্পাদনা উদ্দেশ্যাবলীর ক্ষেত্রে, দক্ষতা ইউনিটের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশী সংস্থাগুলি নিজেরাই কোনো ব্যাপক বহিঃস্থ সাহায্য বা দীর্ঘ সমীক্ষা ছাড়া সেবামান নির্ধারণে সক্ষম হবে (যেমন, শুল্ক বিভাগ কর্তৃক পণ্য খালাস করার; প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ক্ষেত্রে মূল্য ফেরত দেবার; জমির মালিকানা নিবন্ধনের; অতিরিক্ত বিল সংশোধন করার; অত্যাবশ্যকীয় সেবার সংযোগ দানের ক্ষেত্রে সময় বেঁধে দেয়ার; গ্রাহক-অভিযোগের সংখ্যা হ্রাস করা; সময়মত যানবাহন ছেড়ে যাওয়ার; ইত্যাদি)। ***গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হবে এটি নিশ্চিত করা যে, প্রত্যবেক্ষণ কাজটি সংস্থাগুলির নিজস্ব রিপোর্ট অনুযায়ী হচ্ছে না, এবং তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় ও মান নিশ্চয়তা করার ক্ষেত্রে একটি বহিঃস্থ সংস্থা (যেমন ন্যায়পালের দপ্তর) জড়িত।***

স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

৪.৩১ সরকারের জবাবদিহিতার ভিত্তি হল স্বচ্ছতা এবং উন্মুক্ততা – দায়বদ্ধ থাকার জন্য সরকারের সংস্থাগুলির কর্মকাণ্ডকে দৃশ্যমান হতে হবে। দেশের নিরাপত্তার সংগে জড়িত কিছু বিষয় ছাড়া আর সকল

ক্ষেত্রেই তথ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে জনগণের অধিকার হতে হবে অবাধ। সরকারী নীতিসংক্রান্ত তথ্যের ব্যাপক প্রচার জনগণের মধ্যে শিক্ষিত বির্তকের জন্ম দেয়; এটি নীতি প্রণয়ন উন্নত করে, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা সহজ করে এবং দক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশে এক বিশাল সংখ্যক কর্মকাণ্ড জনগণের গোচরের বাইরে রয়ে গেছে। এ ব্যাপারটি আংশিক হলেও উপনিবেশী আমল থেকে চলে আসা উত্তরাধিকার।

৪.৩২ আমলারা স্বভাবতই গোপনীয়তা নিয়ে আবিষ্ট, এবং কোনো তথ্য জনগণকে খোলামেলাভাবে সরবরাহ করাকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেন -- সে তথ্য যতই নিরীহ হোক না কেন। এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যটি *ইয়েস মিনিস্টার* নামক হাসির সিরিজের কেবিনেট সচিব চরিত্রটির একটি মন্তব্যে ধরা পড়ে – "উন্মুক্ত সরকার কথাগুলোর মধ্যেই অসঙ্গতি রয়েছে। আপনি উন্মুক্ত হতে পারেন --অথবা আপনার সরকার থাকতে পারে।" কথাটি অবশ্যই কৌতুক করে বলা। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে তিনটি প্রধান কারণ রয়ে গেছে:

৪.৩৩ প্রথমত অনেক সরকারী কর্মকতার পেশাদারী জ্ঞানের অভাব রয়েছে, কাজেই তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ্যের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাস অনুপস্থিত। এর ফলে সতর্ক আমলারা "সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিয়ম" মেনে চলেন, এবং প্রায় সবকিছুতেই ব্যক্তিগত বা গোপনীয় লেবেল লাগিয়ে দেন। তারা সবসময়ই চিন্তিত থাকেন যেন তারা এমন কিছু প্রকাশ করে না ফেলেন, যা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারকদের জন্য বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। তারা নিজেদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা ছেড়ে দিতেও অনিচ্ছুক থাকেন। এর ফলে তারা 'গোপনীয়','সীমিত', 'ব্যক্তিগত', ইত্যাদি লেবেল লাগানোতে অতি-উৎসাহী হয়ে ওঠেন। *উদাহরণস্বরূপ, সাহায্যদাতাগোষ্ঠির সভার মেমোরেন্ডাম বা স্মারক 'সীমিত' বলে নির্ধারিত হয় যদিও এতে এমন কিছুই থাকে না যা জনগণ থেকে দূরে রাখতে হবে।* বরং এটিকে গণসচেতনতা তৈরির জন্য এবং অর্থনীতি যেসব প্রশ্নের ও বিষয়ের সম্মুখীন সেসব ব্যাপারে ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করার স্বপক্ষে চমৎকার যুক্তি রয়েছে।

৪.৩৪ দ্বিতীয়ত যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া সরকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রকাশ করাকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট আইনে একটি সুস্পষ্ট অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯২৩ সালের সরকারী গোপনীয়তা আইন, এবং ১৯৭৯ সালের গভর্ণমেন্ট সার্ভেন্টস কনডাক্ট রুলস (সরকারী কর্মচারীদের আচরণবিধি) সকল সময়ে একজন সরকারী কর্মচারীকে গোপনীয়তার অঙ্গীকারে বেঁধে রাখে। সরকারী কর্মচারীদের আচরণবিধির ১৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এখানে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে কোনো সরকারী কর্মচারীকে এমনকি "*অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদেরকে* সরকারের অথবা বাইরের কোনো ব্যক্তিকে বা সাংবাদিকদের কোনো সরকারী দলিলের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করতে, অথবা তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে হাতে আসা কোনো তথ্য যোগান দিতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে" (বাঁকা হরফ যুক্ত হয়েছে)।

৪.৩৫ আমলারা বিশ্বাস করেন যে, বেশি তথ্য প্রকাশ করা হলে সরকারী কর্মচারী এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভূদের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক নষ্ট নয়, যদিও, অন্যান্য দেশের মত, এ বিষয়টিও তথ্য চালান করার পথে অন্তরায় হয় নি। তবুও, সুনির্দিষ্ট গোপনীয়তার নিয়মনীতি এবং নিষেধমূলক আইন থাকা সত্ত্বেও "গোপনীয় সরকারী কাগজপত্র ফেরি করার" ব্যাপারটি বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে একটি লাভজনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.৩৬ অনেক দেশেই এখন এ বিষয়টি স্বীকৃত যে, গোপনীয়তার জন্য দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান হ্রাস পায়। তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল – এতে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনগণের সজাগ দৃষ্টির সামনে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, অর্থনৈতিকভাবে সেগুলোর যুক্তিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এর ফলে অনেকগুলি

দেশ আইন পরিবর্তন করে অনেক বেশি উন্মুক্ত সরকার নিশ্চিত করার প্রয়াস পেয়েছে। নিউজিল্যান্ডের অফিসিয়াল সিক্রেটস এ্যাক্ট (দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন)-এ বলা হয়েছে, গোপনীয় বলে নির্দিষ্ট করা না হলে সকল তথ্য সকলের জন্যই উন্মুক্ত। এই আইনের অধীনে তথ্যের উৎপাদকই এর প্রকাশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, মন্ত্রী নন। এমনকি, যদি মন্ত্রীও কোনো কিছু গোপনীয় বলে সিদ্ধান্ত নেন, তবুও অফিসিয়াল ইনফরমেশন কমিশনার -- যিনি ন্যায়পালও বটে – জনস্বার্থে তা নাকচ করে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে তথ্যের ব্যাপক স্বাধীনতা আইন রয়েছে, এবং কংগ্রেস চাইছে যে, এটি আরো বিস্তৃত হোক। ***এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান উৎসাহিত ও বৈধ করার জন্য দাপ্তরিক (সরকারী) গোপনীয়তা আইন এবং সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি পরিমার্জনা করার ব্যাপারে ঐকান্তিক চিন্তাভাবনা করা হোক।***

৪.৩৭ প্রতিবেদনটি অন্যান্য অনেক দেশে চালু আরো কয়েকটি ব্যবস্থা বাংলাদেশ অনুসরণ করার জন্য সুপারিশ করছে:

- *স্বচ্ছতা সম্পর্কে একটি সরকারী নীতি ঘোষণা করা।*
- *সরকারী খাতের স্বচ্ছতার ব্যাপারে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা,* যা বিভিন্ন পেশাজীবী ও বৃত্তিমূলক শ্রেণী থেকে নেয়া নিরপেক্ষ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে, এবং যার কাজ হবে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ সুপারিশ করা।
- *সকল নির্বাচিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তার আয় ও কর প্রদান ট্যাক্স রির্টানে যেমনটি আছে সেরকম প্রকাশ করা* । এ ধরনের একটি পদক্ষেপ শুধু যে কর প্রয়োগের নৈতিক বৈধতাই বৃদ্ধি করবে তাই না, বরং সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর কর আইনসমূহের সংগে সঙ্গতি রেখে তাদের আয় সঠিকভাবে জানানোর জন্য চাপও বাড়বে।
- *ব্যাংক ঋণ খেলাপীদের একটি নিয়মিত তালিকা প্রকাশ করা* । আগের মত শুধু এ্যাড-হক ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিলেই চলবে না।
- *তথ্য ও রিপোর্ট প্রচার বাড়ানো* -- জাতীয় সংসদ ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে এসওইদের বার্ষিক প্রতিবেদন, IMED প্রতিবেদন, দাতাদের কাছে দেয়া সমষ্টিক অর্থনৈতিক এবং প্রকল্প তথ্য, সরকারী/বেসরকারী খাতকে দেয়া কর কনসেশনের পরিমাণ ও পাবলিক কর্মকর্তাদের বিনামূল্যে দেয়া সেবাসমূহ (যেমন, বিমান টিকেট, যানবাহন, ইত্যাদি) নিয়মিত সহজপ্রাপ্য করার মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

৪.৩৮ এই উন্মুক্ততা সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে যোগাযোগ উন্নত করবে। সরকারী ও বেসরকারী খাতের মিথষ্ক্রিয়া সরকার কি করছে —– এবং আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ —– সরকার কী করতে ব্যর্থ হচ্ছে, এটি জানার অধিকার যে করাদাতাদের রয়েছে তা নিশ্চিত করবে।

"আপনি বলছেন আমরা ক্ষমতাবান মানুষ, এবং সুবিধা গ্রহণ করি। কিন্তু মহোদয়, পদের তাহলে লাভটা কী যদি তা থেকে আমরা উপকৃত না হই ?" হেনরি ভানসিটার্ট, ফোর্ট উইলিয়াম, বাংলা-র গভর্নর(১৭৬১)।

৪.৩৯ সকল সমাজেই সরকারী দুর্নীতির সমস্যা রয়েছে, কিন্তু এর মাত্রা এবং এর সাথে জড়িত সামাজিক কলঙ্কের তীব্রতাটি, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকম হয়। বেশির ভাগ বাংলাদেশী নাগরিক মনে করেন, সরকারের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি রয়েছে। এটি সমাজের সকল অংশকে কলুষিত করে, এবং রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যন্ত এর বিস্তার। অসাধুতা এবং অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রী করে দেয়ার চর্চা যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা সরকারের ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট করে; ভুল অর্থনৈতিক পছন্দের জন্ম দেয়; নীতি প্রয়োগে সরকারের সামর্থ সীমিত করে; দরিদ্রকে মূল্য দিতে বাধ্য করে; এবং বেসরকারী খাত-মুখী প্রবৃদ্ধির কৌশলকে হুমকির সম্মুখীন করে। আরো অশুভ লক্ষণ হল, সরকারী দুর্নীতির প্রতি সমাজের ধিক্কার আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। জনগণের উন্নাসিকতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কোনো কর্মকর্তা যদি অবৈধ অর্থোপার্জন এড়িয়ে চলেন, তবে তাকে মৃদু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হয় – যেন তার সাহস ও উদ্যমের অভাব রয়েছে। সংক্ষেপে, মানুষ যেন হাল ছেড়ে দিচ্ছে, এবং যার সাথে যুক্ত হয়েছে এই বিশ্বাস যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে কোনো প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৪.৪০ দেশের দুর্নীতি সমস্যার অনেকটাই আগের অ-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সময় থেকে উদ্ভুত, যা ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়া নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের পদ্ধতিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রেসিডেন্টরা তাদের কর্তৃত্ব অন্যায্যভাবে আরোপ করে অনেকগুলি নিয়োগ দেন। পদোন্নতি অথবা আন্তঃক্যাডার বিচলন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য একটি মন্ত্রী কমিটি বাছাই করত এবং সিনিয়র সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে কোনো মতামত সেক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াত। মন্ত্রীরাও জুনিয়র কর্মকর্তাদের কাছে সরাসরি তদবির করে বেসামরিক প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটি ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন, কারণ যারা "তদবির রক্ষা করেন"[৬] তাদের পদোন্নতি হবে, এরকম একটি ধারণা নিতে তাদের উৎসাহিত করা হত। অবশ্য ১৯৯১ সালে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার ক্ষমতায় আসলেও একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চাহিদার সংগে সঙ্গতি রেখে আগের বিকৃত পদ্ধতি আর বিন্যাসগুলিকে ঠিক করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

৪.৪১ দুর্নীতি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে, এটি ছদ্মবেশে একটি কর ব্যবস্থা। সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ কর ব্যবস্থার মাধ্যমে বেশি বেতন দেয়ার পরিবর্তে মানুষ জনসেবার জন্য শেষ পর্যন্ত কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে মূল্য শোধ করে।[৭] যখন আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ সর্বব্যপ্ত হয়, তখন এদের পাশ কাটানোর জন্য দুর্নীতি একটি উপায় হয়ে দাঁড়ায়। কর্মকর্তাদের তখন ঘুষ দিতে হয় যাতে এসব অর্থহীন নিয়মকানুন এবং

---

[৬] অসাধুতা নিরসনের জন্য নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত তদন্ত এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার প্রয়োগ পদ্ধতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়ক হবে। "সিঙ্গাপুরে যে কোনো ধরনের দুর্নীতির জন্য শাস্তি হচ্ছে বেসামরিক প্রশাসন থেকে প্রত্যাহার। এ ছাড়া, বরখাস্তকৃত সরকারী কর্মচারীরা বেসরকারী খাতে অবাঞ্ছিত।" *দি ইস্ট এশিয়ান মিরাকল,* বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৩), পৃঃ ১৮০।

[৭] কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে এ ধরনের ঘুষ একটি বন্ধকী (hypothecated) বা নির্দিষ্ট করে রাখা (earmarked) কর, যেহেতু শুধু প্রকৃত সেবা ব্যবহারকারীরা ঘুষের মাধ্যমে এর মূল্য দিয়ে থাকে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বল্প পরিসরে করা হলে দুর্নীতির খরচ অনেক বেশি হতে পারে বলে ধারণা করা যায়। অনেক কর্মকর্তাকে একটি বিশেষ সেবা দেয়ার কর্তৃত্ব দেয়া হলে খরচ কমে যায়। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল ব্যবসা করতে গিয়ে কয়েক ডজন কর্মকর্তাকে কিনতে হয়, যাদের প্রত্যেকেই আমলাতন্ত্রের এক একজন "একচেটিয়া স্বত্বধারী"। দেখুন: "দুর্নীতি" শ্লাইফার এ, এবং ভিশন, আর, *কোয়ার্টারলি জার্নাল অফ ইকোনোমিকস,* ১৯৯৩।

বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা না হয়। এ ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত মনে হলেও, দুর্নীতির ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার জন্য রাজস্ব আদায়ের স্বচ্ছ উপায়ের তুলনায় এতে অদক্ষতা থাকে অনেক বেশি। ঘুষের "চালু হার", উদাহরণস্বরূপ, সবার কাছে জানা নাও থাকতে পারে, এবং ঘুষ দেয়ার পরও কোনো নিশ্চয়তা থাকে না যে কাজটা হবে কি না। এভাবে 'উৎকোচ' আদায়ের মধ্য দিয়ে আমলারা স্পষ্টতই ব্যবসা করার খরচ বাড়িয়ে দেন।

৪.৪২ সরকারী মহলে দুর্নীতির ব্যাপকতার অনেকগুলি কারণ রয়েছে, যার বেশ কিছু সাংস্কৃতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক। তবে এই প্রতিবেদনে মূল দৃষ্টি সাংগঠনিক এবং নীতি সংক্রান্ত কারণগুলির ওপর নিবদ্ধ। এসব ব্যাখ্যা সরকার সম্পর্কে 'ব্যক্তিগত স্বার্থ'-র দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয়– যা রাষ্ট্র পরিচালকদের ওপর প্রয়োগ করে নব্য-ধ্রূপদবাদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণাগুলি। এ তত্ত্বে ধরে নেয়া হয় যে, যারা সরকারের বিভিন্ন পদে আসীন, তারা তাদের সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টাই করবেন, তবে ভোটারদের কাছে জবাবদিহিতার জন্য এই স্বার্থের বিষয়টি খুব ব্যাপক হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

৪.৪৩ নিচের সহজ কাঠামোটি দুর্নীতির কারণ নির্ণয় এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার একটি উপযোগী হাতিয়ার হিসেবে দেখা যায় :

$$\mathbf{C = M + D - A - S}$$ [৮]

এখানে C হচ্ছে দুর্নীতি, M হচ্ছে একচেটিয়াত্ব, D হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা, A হচ্ছে জবাবদিহিতা এবং S হচ্ছে সরকারী খাতের বেতন। যেখানে বিশেষ ক্ষমতা ও একচেটিয়াত্ব আছে, জবাবদিহিতা দুর্বল এবং সরকারী কর্মচারীদের বেতন থাকে কম, সেখানে দুর্নীতি ক্রমশ বাড়বে। বাংলাদেশে সরকারী দুর্নীতির প্রধান কারণগুলি হল :

- *নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ* – ব্যাপক ও অস্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো উৎকোচ গ্রহণের একটি উর্বর পরিবেশ তৈরি করে। আইনগত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে কোনো কার্যকর প্রতিকার লাভ সম্ভব হয় না বলে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য কাউকে কোনো শাস্তিও পেতে হয় না।

- *সরকারের ভিতর স্বচ্ছতার অভাব* – বাংলাদেশ সরকারের নানা সিদ্ধান্তের বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির দুরূহতার জন্য সন্দেহজনক অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয় না।

---

[৮] এটি দুর্নীতির সমীকরণের (C = M + D - A) একটি সম্প্রসারিত রূপ, যে সমীকরণটি প্রথম রবার্ট ক্লিটগার্ড (ইউনিভার্সিটি অফ নাটাল, দক্ষিণ আফ্রিকা) উদ্ভাবন করেছিলেন ।

- *শক্তিশালী ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রভাব* –– অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী বাণিজ্য, কোনোটাই কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়ার বিরোধী নয়।[৯] অনেক বিদেশী কোম্পানী ধরে নেয় যে ঘুষ দেয়া হল ব্যবসার নানা ব্যয়ের একটি, এবং অনেক দেশে, এরূপ 'কমিশন'কে বৈধ ব্যবসায়ী ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১০]

- *সরকারী কর্মচারীদের কম বেতন* –– নীতি নির্ধারক ও আমলাদের বেতনভাতা প্যাকেজ (পরিচ্ছেদ ৭) ক্রমশ কমে যাওয়া, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর, তাদের মধ্যে অবৈধ পন্থায় আয় বাড়িয়ে নেয়ার লোভ বাড়িয়ে তুলেছে।[১১]

- *আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা* – দুর্নীতি ধরা পড়ার পরও শাস্তির সম্ভাবনা প্রায় থাক না।

- *দুর্নীতির স্বয়ম্ভর বৃত্ত* – বেসামরিক প্রশাসনের সুনাম ক্রমশ ক্ষুন্ন হওয়ায়, এবং উৎকোচ গ্রহণের বিষয়টি সহজ হওয়া ও বেড়ে যাওয়ায় 'প্রতিকূল নির্বাচনের' (adverse selection) একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এটি সাধারণ ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যারা বেসামরিক প্রশাসনের চাকুরির জন্য আবেদন করেছেন, তাদের অনেকেই জনসেবা, পেশাগত গর্ব, অথবা মর্যাদার বিবেচনা থেকে উদ্বুদ্ধ না হয়ে, উৎকোচ গ্রহণের সম্ভাবনা ও হিসাব নিকাশ থেকেই উদ্বুদ্ধ হন। বেসামরিক প্রশাসনে সাম্প্রতিককালে নিয়োগপ্রাপ্তরা প্রথাগতভাবে বেশি মর্যাদাবান প্রশাসনিক বা পররাষ্ট্র সার্ভিস অপেক্ষা রাজস্ব সার্ভিসগুলি যে বেছে নিচ্ছেন, এটি কোনো কাকতালীর ব্যাপার নয়।

৪.৪৪ তবে এ বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করতে হয় যে, আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি সমাজ থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়; এটি সমাজের বিদ্যমান আচরণগত বিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রতিফলন। সরকারের ভিতর দুর্নীতি টিকে থাকে বেসরকারী খাত ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বহু মানুষের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও দোষের বড় ভাগটা নিতে হবে। দুর্নীতির বিস্তারের পেছনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল রাজনৈতিক অসদাচরণ বৃদ্ধি। যেসব রাজনৈতিক নেতা তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রচুর অর্থ

---

৯ বহিঃস্থ দাতারা দুর্নীতি বজায় রাখতে বিদেশী সাহায্যের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়ে সাহায্য দেয়া প্রকল্পগুলিতে সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এবং স্বচ্ছতা বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে। এটি প্রতিফলিত হয়েছে "সরকারী উন্নয়ন সহায়তায় উন্নত সংগ্রহ চর্চা" (ওইসিডি - ১৯৮৬) ধরনের দলিলপত্রে। প্রতিযোগিতামূলক দর-হাঁকার প্রক্রিয়াগুলি নিশ্চিত করতে উন্নয়ন সহায়তার আর্থিক দিক সংক্রান্ত ওইসিডি/ডিএসি ওয়ার্কিং পার্টির প্রচেষ্টা বিদেশী সাহায্য-পুষ্ট প্রকল্পসমূহে ব্যবহৃত হচেছ।

১০ ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর মত সংস্থাসমূহ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য একটি নীতি কাঠামো তৈরির প্রচেষ্টায় সমর্থন দিচ্ছে। এসব দেশের সরকারদের সাথে লেনদেনের সময় কিছু আচরণ বিধি মেনে চলার জন্য বিদেশী কোম্পানীগুলিকে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার অবৈধ প্রয়াস গ্রহণ না করা।

১১ বেসামরিক প্রশাসনের সংগে বেসরকারী খাতের বেতনভাতা প্যাকেজের তুলনা হয়তো পূর্ব এশিয়ার বেসামরিক প্রশাসনের সার্বিক মান নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। একটি নিরীক্ষায় বলা হয়েছে, "এটি আশ্চর্যজনক নয় যে, সিঙ্গাপুর – এ অঞ্চলে যার সবচেয়ে যোগ্য এবং সৎ আমলাতন্ত্র রয়েছে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয় – আমলাদেরকে সবচেয়ে বেশি বেতন দিয়ে থাকে।" ধনী অর্থনীতির দেশগুলি অবশ্যই তাদের আমলাদের আরো ভাল বেতন দিতে পারে, কিন্তু "উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য চ্যালেঞ্জটি হল যেসব ক্ষেত্রে তারা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি অনেক বেশি কার্যকরভাবে পুনঃপ্রয়োগ করতে পারবে, সেসব ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সম্পদ একত্রিত করা।" *দি ইস্ট এশিয়ান মিরাকল*, বিশ্বব্যাংক (১৯৯৩), পৃঃ ১৭৮।

'বিনিয়োগ' করেছেন (নির্বাচনী ব্যয়ের বৈধ সর্বোচ্চ মাত্রাটি প্রকটভাবে লঙ্ঘন করে) একবার ক্ষমতা গ্রহণের পর টাকা বানাবার সুযোগ যে তারা হাতছাড়া করবেন না, তা আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রায়শই তারা দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ী স্বার্থের যোগসাজশে এ কাজটি করেন। এর ফলে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রীকরণকে সমর্থন করেন, এবং এমন ধরনের কাজ বেছে নেন, যেগুলোতে পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ-সুবিধা এবং উৎকোচের সুবিধা থাকবে – যেমন রাষ্ট্রমালিকানার ব্যাংকগুলোর পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হওয়া। রাজনৈতিক দুর্নীতি দলগুলোর তহবিল সংগ্রহের উৎসও বটে, এবং সমর্থকদের ব্যাপক আর্থিক সাহায্য লাভের কোনো পদ্ধতি এখানো বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি। রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি সমগ্র জনসেবার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। প্রবাদে আছে, "মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে।"

৪.৪৫ **দুর্নীতির মূল্য** -- দুর্নীতির অর্থনৈতিক মূল্য সম্পূর্ণভাবে পরিমাপ করা খুবই কঠিন, তবে এমন কিছু লেনদেন ব্যয় এবং বিশেষ ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডগুলোতে বিলম্বের ব্যাপারটি রয়েছে, যেগুলো চিহ্নিত করা যায় (ঘর ৫.৩)। বেসরকারী খাতের দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতি সম্ভাব্য একটি বিশাল ও অনিশ্চিত খরচ-উপাদান যোগ করে এবং সম্পদকে অনুন্নয়নমূলক নীতি উদ্বুদ্ধ উৎকোচের দিকে পরিচালিত করে।[১২] এ ছাড়া দুর্নীতি বেসামরিক প্রশাসনে প্রচুর অদক্ষতার জন্ম দেয়: এতে সরকারী প্রকল্পগুলির ব্যয় ও সময় বেড়ে যায় (ঘর ৬.১); এতে উৎকোচ আদায়ের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নীতি নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি হয় (যেমন আমদানী কুয়োটা বা নির্দিষ্ট অংশ বিধান চালু করা বা একচেটিয়াত্ব লাইসেন্স প্রদান), এবং বিশেষ কিছু দলকে সুবিধা দেয়ার জন্য নীতি বাস্তবায়নে বিকৃতি ঘটে। অনেকে বলেন যে, দুর্নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুরুতর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে যথেষ্ট দুর্নীতি রয়েছে, কাজেই, বাংলাদেশ সম্পর্কে অতটা কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী না নিলেও চলবে।[১৩] এটি অবশ্যই একটি অসমর্থনযোগ্য এবং দায়িত্বহীন কৈফিয়ত যা পচনকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। নৈতিকতা বা সামাজিক ন্যায়নীতির প্রসঙ্গটি বাদ দিলেও, এটি মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ভাল করছে দুর্নীতির জন্য নয়, বরং দুর্নীতি সত্ত্বেও। অতি সম্প্রতি এসব দেশ (যেমন কোরিয়া) দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ওপর চড়াও হচ্ছে।

৪.৪৬ **দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ** -- বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার দুর্নীতির নিন্দা করেছে এবং বিক্ষিপ্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা এর অন্তর্নিহিত কাঠামোগত বিষয়গুলি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। বেশির ভাগ দুর্নীতি নির্মূলের কর্মসূচি নিয়ম ও পদ্ধতির উন্নত প্রয়োগের ওপর মনোযোগ দিয়েছে -- যে পদ্ধতিটি প্রয়োগকারী ব্যক্তিদের সাধুতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় ভিতর থেকে ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে, এবং দুর্বল বিচার ব্যবস্থা একে বাধাগ্রস্ত করেছে। দুর্নীতিকে 'ব্যক্তিগত অসদাচরণ' হিসেবে দেখার প্রবণতার ফলে শাস্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা বেড়েছে। এর কিছু প্রভাব হয়তো ছিল, কিন্তু এতে দুর্নীতি সমীকরণ: $M + D - A - S$ (অনুচ্ছেদ ৪.৩৬) দ্বারা সংজ্ঞায়িত মূল সমস্যাগুলির ব্যাপারে কিছু করা হয়নি।

---

[১২] নীতি-উদ্বুদ্ধ উৎকোচকে অনেক ক্ষেত্রেই হয় দক্ষতা ও বাজার ব্যর্থতার বিচারে যুক্তিযুক্ত করা – যেমন প্যাটেন্ট পদ্ধতির অধীনে দেয়া বাড়তি টাকার ক্ষেত্রে। এসব নীতি উদ্বুদ্ধ উৎকোচের বিশ্লেষণ নির্ভর করে একজন একচেটিয়া স্বত্বধারীর হ্রাসকৃত সরবরাহ এবং প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের ওপর গতিশীল প্রভাবের (যেমন, অদক্ষতা সমর্থনের প্রবণতা) মত বিষয় থেকে স্থির লোকসান প্রাক্কলনের ওপর।

[১৩] পলিটিক্যাল এন্ড ইকোনোমিক রিস্ক কনসালটেন্সি (PERC) নামক হংকং ভিত্তিক ফার্মের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিদেশ থেকে আগত ম্যানেজাররা (প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে) মনে করেন যে, এশিয়ার বেশির ভাগ দেশ তাদের দেশগুলো থেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। তবে দুর্নীতি থেকেও এসব ম্যানেজাররা সরকার ও বিচার পদ্ধতিতে অদক্ষতা এবং দলভিত্তিক রাজনীতিতে "দুর্নীতি দমন"কে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য বেশি বিরক্ত। *দি ইকোনোমিস্ট*, মে ২৭শ ১৯৯৫। পৃ: ৭১

৪.৪৭ বাংলাদেশে ক্ষমতাশীল রাজনীতিবিদ ও আমলারা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে কখনো বিচারের সম্মুখীন হন না। সংসদীয় প্রয়োগ পদ্ধতিগুলি যে ব্যর্থ হচ্ছে এ সত্যটি তারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। একটি দুর্নীতি দমন ব্যুরো রয়েছে বটে, তবে এটি বহুলাংশে অকার্যকর। মামলা তদন্ত করতে গড়ে তিন বছর সময় লাগে, এবং এসব মামলার মাত্র ১৫ শতাংশ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ১৯৯৪ সালে দুর্নীতি দমন ব্যুরো প্রায় দশহাজার অভিযোগ পেয়েছিল, এবং এসবের ভিত্তিতে ১,৫৮৪ মামলা দায়ের করা হয়। তবে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে মাত্র ৩৬৫ জন ব্যক্তি দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলিতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, এবং এদের মধ্যে মাত্র ৯৫ জন ছিলেন কর্মকর্তা। তদন্তের জন্য মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতির জন্য সংস্থাটিকে এখন ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয়। বস্তুত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকাণ্ডের খামখেয়ালীপূর্ণ চরিত্রের জন্য, এবং এর কর্মকর্তারা অযৌক্তিকভাবে হয়রানি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব থাকায় এ সংস্থাটি সরকারের বিলম্ব ও অদক্ষতার আরো একটি উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এ ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ যে এ সংস্থাটি ভীতি ও কর্ম-বিবসতা সৃষ্টি করেছে।

ঘর ৪.৫. দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

উন্নত ও অনুন্নত অনেক দেশ দুর্নীতির সমস্যা মোকাবেলা করেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে চিলি, সিঙ্গাপুর এবং অস্ট্রেলিয়ার মত কয়েকটি দেশ যেসব উদ্ভাবনী পন্থা গ্রহণ করেছে, নিচে তাদের বিবরণ দেয়া হল:

১. **চিলির উদাহরণ: দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জাতীয় পদক্ষেপ হিসেবে একচল্লিশটি সুপারিশ।** চিলিয়ান কমিশন ফর পাবলিক ইথিকস (জনৈতিকতা বিষয়ক কমিশন)এর গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হল :

- জনৈতিকতা বিষয়ে একটি জাতীয় নীতির খসড়া করা, এবং তা বাস্তবায়িত করা।
- সরকারী কর্মচারীদের মর্যাদা এবং তাদের বেতন বৃদ্ধি করা। মেধা-পদ্ধতি উন্নত করা।
- সরকারী খাতে সততার নীতিমালা তৈরি করা।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নির্ধারণ করতে পদ্ধতিসমূহ পর্যালোচনা করা।
- প্রভাব খাটানোর ব্যবসা এবং বিশেষ অধিকার তথ্যের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- সরকারী দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিধিবিধান উন্নত করা।
- পাবলিক সার্ভিসে ঢুকেছেন বা ছেড়ে যাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের পরিসম্পৎ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারে ঘোষণা দেয়ার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা।
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে (আইন সভার সদস্যরা) যখন তাদের নিজেদের স্বার্থে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করেন, তখন তাদের বহিষ্কার করা।
- স্বার্থের বিরোধ সংক্রান্ত আইন প্রেসিডেন্টসহ সকল শীর্ষ কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার জন্য সম্প্রসারণ করা।
- বেসরকারী হিসাবরক্ষণ ফার্মগুলিকে উচ্চ পর্যায়ের কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত হিসাব নিরীক্ষণ করতে দেয়া।
- গোপন সরকারী একাউন্টসমূহ এবং বিশেষ ক্ষমতাধীন নির্বাহী ব্যয় যদি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত না হয়, তাহলে সেগুলো উচ্ছেদ করা।
- দুর্নীতি দমন অভিশংসকের অফিস প্রতিষ্ঠা করা।
- তথ্য স্বাধীনতা আইন চালু করা।
- সরকারী সংস্থাগুলি যাতে নিয়মিতভাবে জনগণের কাছে তাদের স্থিতিপত্র এবং কার্যাবলী প্রতিবেদন প্রকাশ করে তার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা।

২. সিঙ্গাপুরের উদাহরণ

সিঙ্গাপুর দুর্নীতি সমস্যাটি কমিয়ে আনতে পেরেছে কারণ এর দুর্নীতি দমন রণ-কৌশলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

- সরকারী আমলাতন্ত্রের ভিতরে ও বাইরে দুর্নীতি নির্মূল করার প্রতি রাজনৈতিক নের্তৃত্বের – বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউর – অঙ্গীকার।
- দুর্নীতির সুযোগ ও প্রয়োজন উভয় কমিয়ে এনে সুসমন্বিত দুর্নীতি দমন পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ।
- একটি দুর্নীতিমুক্ত দুর্নীতি দমন সংস্থা সৃষ্টি ও চালু রাখা, যেখানে দুর্নীতির মামলাসমূহ তদন্ত করার জন্য এবং দুর্নীতি দমন আইনসমূহ প্রয়োগ করার জন্য যোগ্য কর্মীরা রয়েছেন।
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের অন্যতম একটি কৌশল হল বেসরকারী খাতের বেতনের অনুরূপ সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন প্যাকেজ বাড়িয়ে দিয়ে দুর্নীতির প্রতি আগ্রহ নষ্ট করা।

৩. অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ: দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ কমিশন

১৯৮৮ সালের 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ কমিশন আইন' অনুযায়ী গঠিত কমিটিটি একটি সংবিধিবদ্ধ কমিটি, যা সরকার থেকে স্বাধীন, কিন্তু এর তদন্তসমূহ সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে এবং জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির মাধ্যমে জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। কমিশন তদন্ত, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং গণশিক্ষার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনতে সচেষ্ট।

তদন্ত

- *জনগণের অভিযোগ* — কমিশন জনগণের উপর নির্ভর করে, এবং বস্তুত জনগণকে নিজ থেকে এগিয়ে এসে দুর্নীতিমূলক আচরণ সম্বন্ধে খবর দিতে উৎসাহিত করে।
- *সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদন* — যেমন বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, স্থানীয় এবং পৌর সরকার এবং অন্যান্য সরকারী খাতের সংস্থাসহ সরকারী কর্তৃপক্ষের মুখ্য কর্মকর্তাদের একটি দায়িত্ব হচ্ছে সন্দেহজনক দুর্নীতিমূলক আচরণ রিপোর্ট করা।
- *সংসদীয় রেফারেন্স* — পার্লামেন্টের উভয় কক্ষই যে কোনো বিষয়ে কমিশনের কাছে তদন্তের জন্য পাঠাতে পারে।
- *সহযোগিতামূলক তদন্ত* — কমিশনের তদন্তকারীরা মাঝে মাঝে অন্যান্য কর্তৃপক্ষের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সংগে ঘনিষ্টভাবে কাজ করেন।

নিরোধ

- আইন, পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালীতে পরিবর্তন সম্পর্কে সরকারী খাতকে উপদেশ দেয়া।
- ১৯৯০ থেকে একটি দুর্নীতি-নিরোধ-কৌশল চালু রয়েছে, যাতে নিচের নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত : নিরাময় থেকে প্রতিরোধ অনেক ভাল; দুর্নীতি নিরোধ একটি ব্যবস্থাপনা কর্ম; এবং জবাবদিহিতা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

গণশিক্ষা

শিক্ষা ইউনিটের উদ্দেশ্য হল :

- জনগণকে কমিশনের কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত করা এবং নাগরিকেরা কমিশনের কাজে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন, তা দেখানো।
- সরকারী খাতের কর্মীদের এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থেকে যে নৈতিক মান জনগণ আশা করতে পারে, সে সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- সামাজিক যেসব দৃষ্টিভঙ্গি দুর্নীতির পথ করে দেয়, সেগুলো চ্যালেঞ্জ করা।

সংবাদ মাধ্যম ইউনিটের উদ্দেশ্যাবলী হল:

- দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব যে নিউ সাউথ ওয়েলসের সকল নাগরিকের কাছে উদ্বেগের বিষয় তা তুলে ধরা।
- দুর্নীতির ব্যাপারে কিছু একটা যে করা যায় ও করা উচিত, তা দেখানো এবং
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

৪.৪৮ দুর্নীতির উৎসে আঘাত দেয়ার একটি প্রণালীবদ্ধ প্রয়াস জরুরী হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, বিধিনিষেধ ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ও অস্বচ্ছ কাঠামোতে প্রোথিত অসদাচরণের ও উৎকোচ গ্রহণের সুযোগ নির্মূল করা। এ প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ীও যদি বেসামরিক প্রশাসনকে জোরদার করা হয়, তবুও সকল অন্তর্নিহিত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাসহ বিশাল নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামোটি সঠিকভাবে প্রত্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এর থেকে আরো বেশি প্রায়োগিক পদ্ধতি হবে দুর্নীতি গজিয়ে ওঠে যে নিয়ন্ত্রণমূলক ঝোঁপঝাড়ে, সেগুলো কেটে ফেলে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি জনগণের দৃষ্টির নিচে নিয়ে আসা। এর ফলে অবশিষ্ট নিয়মকানুনের সংখ্যা কমে যাবে, এবং প্রশাসন সহজতর হবে। নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা করার সময় আমলাতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় আনতে হবে। অসদাচরণের সুযোগ কমিয়ে আনাকে উন্নত নৈতিক মান অর্জনের প্রয়াসের সংগে সংযুক্ত করতে হবে। এলক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ ও চাকুরির মর্যাদা এবং বেতনভাতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গোষ্ঠিচেতনাকে উন্নত করতে হবে। কার্যসম্পাদনা অথবা গ্রাহক-সন্তুষ্টির সংগে সম্পর্কিত আর্থিক উদ্দীপক ও বোনাস এবং মেধা-পুরস্কার[১৪] ও প্রবর্তন করতে হবে।

৪.৪৯ দুর্নীতি কমানোর জন্য আরো প্রয়োজন সরকারের ভিতর খোলামেলা ভাব এবং এর পরিচালনা পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা উন্নত করা। অন্যান্য দেশ এ বিষয়টাকে কিভাবে মোকাবেলা করেছে, তার কিছু উদাহরণ ঘর ৪.৫ এ দেয়া হল। এগুলো থেকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, সরকার ও নাগরিকরা বিবেচনার জন্য কিছু ধারণা পেতে পারেন। একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে, সুপারিশ করা হচ্ছে যে, **দুর্নীতি সংক্রান্ত সকল বিষয় পর্যালোচনার জন্য দুর্নীতি নির্মূল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হোক**। টাস্ক ফোর্সে থাকবেন সরকারী কর্মকর্তা, সাংসদ, এবং গণ্যমান্য নাগরিক। এই টাস্ক ফোর্সের বিবেচনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিচে দেয়া হল:

দুর্নীতি দমন ব্যুরো

- ব্যুরোর তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন যা আইন কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে; এবং একজন সংবিধিবদ্ধভাবে নিযুক্ত ও সুরক্ষিত পাবলিক প্রসিকিউটরকে মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও কর্পোরেশনের উর্ধতন কর্মকর্তাদের তদন্তের কর্তৃত্ব প্রদান। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে থাকবেন চাকুরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সচিব পর্যায়ের ব্যক্তিরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

- ব্যুরোকে জোরদার করার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদের পরিকল্পনা গ্রহণ।

---

[১৪] গোষ্ঠিচেতনা বৃদ্ধির গুরুত্ব থাইল্যান্ডে রাজ্যের সেবার জন্য রাজকীয় পদক প্রদানের বিষয়টি থেকে দেখা যায়। সাধারণ নাগরিকরা এরকম পদক পাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ দিতেও রাজি, এবং এসব পদকের মূল্য যে কতটা, এ থেকে তা প্রতীয়মান হয়। দেখুন: "দি ভ্যালু অফ প্রেস্টিজ: থাই রয়্যাল ডেকোরেশনস", *দি ইস্ট এশিয়ান মিরাকল*, বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৩), পৃঃ১৭৮।

সাধারণ

- দুর্নীতি মোকাবেলার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী কর্মসূচি প্রণয়ন।

- একটি গণসচেতনতা প্রচারাভিযান শুরু। সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার ব্যাপারে নাগরিকদের সামর্থ্য বৃদ্ধি (এ বিষয়টি আগে প্রস্তাব করা হয়েছে) এবং এই তথ্যকে আমলাতান্ত্রিক ও আইনগত মারপ্যাঁচ বাদ দিয়ে সহজ ভাষায় আরো ব্যাপকভাবে বিতরণ করা। তবে অনেক বেশি অবহিত নাগরিকদের আরো বিস্তারিত কারিগরী তথ্য প্রদান যেন এতে ব্যাহত না হয়।

- সরকারী গোপনীয়তা আইন পরিবর্তন করা।

- সরকারী কনট্রাক্ট সম্পর্কে তথ্য সহজপ্রাপ্য করা। শুরু হিসেবে, সকল প্রধান কনট্রাক্টের সারসংক্ষেপিত তথ্য যোগান দেয়া উচিত, যেখানে সকল প্রতিযোগীর দরপত্র উল্লেখ করে চূড়ান্ত বাছাইয়ের কারণগুলি বর্ণনা করতে হবে।

- প্রবিধানের ভীড় কমানো এবং এদের বিন্যাস উন্নয়ন। বেসামরিক প্রশাসনে বেতনভাতা বাড়ানো। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা প্রবর্তন করা এবং ন্যায়পালের দপ্তর স্থাপন করা।

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং শৃঙ্খলাকারী প্রণালীগুলি যুক্তিযুক্তকরণ।[১৫]

- জনসেবার উন্নত মান বজায় রাখতে উদ্ভাবনমূলক উদ্দীপক ব্যবস্থা গ্রহণ।[১৬]

- দুর্নীতি রোধে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি তৈরিতে ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর মত সংস্থাগুলির সাথে সক্রিয় সহযোগিতা বজায় রাখা।

---

[১৫] যে কোনো শৃঙ্খলামূলক সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা ঠিক ততখানি, যতখানি বিশ্বাসযোগ্যতা আছে এর সদস্যদের। যারা বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবেন, তাদেরকে তাদের মান ও সততার জন্য নির্বাচন করা উচিত। বর্তমান পদ্ধতি ভেঙ্গে-পড়া শীর্ষ পর্যায়ের নৈতিক কর্তৃত্বের অভাবকেই তুলে ধরে, যা সুস্পষ্টভাবে নির্ণীত জনসেবার মানের সংগে সঙ্গতি রুখার জন্য ব্যবহৃত দমনমূলক শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক।

[১৬] জাতির জন্য সেবার স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কার ও পদকের মূল্য খাটো করে দেখার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশে বর্তমানে জনসেবার জন্য একমাত্র পদক বা খেতাব শুধু সামরিক সাহস প্রদর্শনের জন্যই দেয়া হয়।

৫. সরকারী শাসন এবং বেসরকারী খাতের কর্মকাণ্ড

সরকারী নীতিসমূহ কিভাবে বেসরকারী খাতকে প্রভাবিত করে এই পরিচ্ছেদে তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে নিয়মনীতির ও প্রবিধানসমূহের জটিল গোলকধাঁধার দিকে, যার মধ্য দিয়ে নাগরিক, উদ্যোক্তা এবং ফার্মসমূহকে পথ খুঁজে নিতে হয়। এরপর এ পরিচ্ছেদ আইন ও বিচার পদ্ধতির বিভিন্ন দুর্বলতাসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। সব শেষে, বেসরকারী খাতের কাজকর্মের প্রসার ঘটাতে চায় এমন তিনটি সরকারী সংস্থার কার্যসম্পাদনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ কয়েকটি জনসেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা ছাড়াও বেসরকারী খাতের জন্য সামর্থ্য বাড়ায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি নিশ্চিত করতে, এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের জন্য একটি দৃঢ় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ রকম একটি পদ্ধতির তিনটি মূল উপাদান হচ্ছে :

- বিধিবিধানের একটি ত্রুটিহীন পদ্ধতি, যা বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত করবে এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করে একই সংগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ বাড়াতে একটি অর্থবহ কাঠামো উপহার দিবে।

- একটি নির্ভরযোগ্য আইনগত কাঠামো এবং দক্ষ বিচার পদ্ধতি, যা অর্থনৈতিক সুযোগে সমান অংশীদারী হওয়া এবং বাজারের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র নিশ্চিত করবে।

- বেসরকারী খাতের কর্মকাণ্ডে সহায়তা দেয়ার জন্য কার্যকর সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ।

নাগরিক, ফার্মসমূহ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক অভিন্ন ক্ষেত্র

"দড়িটা বানানো হয়েছিল কর্ণেল বৃক্ষের ছাল দিয়ে, এবং এটি এত চালাকির সাথে বাঁধা হয়েছিল যে, কেউ দেখতে পায়নি এটি কোথায় শুরু হয়েছে বা শেষ হয়েছে। কাজেই আলেক্সান্ডারের জন্য তখন এটির গ্রন্থিমোচন ছিল সত্যিই একটি ধাঁধাঁ .... অনেকে বলেন আলেক্সান্ডার গ্রন্থিটি তার তরবারি দিয়ে কেঁটে চিৎকার করে ওঠেন, আমি পেরেছি দড়িটা খুলতে ...." (অ্যারিয়ান)[১]

"বাজে ভাবে বানানো আইনী জুতা মানুষের পায়ে বিঁধে" (চৈনিক প্রবাদ)।

৫.২ রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'রেগুলেশন' বা 'নিয়ন্ত্রণ' বা 'প্রবিধান' শব্দটির অর্থ হচ্ছে "জনগোষ্ঠির কাছে যে কর্মকাণ্ডগুলি মূল্যবান, সেগুলির ওপর কোনো সরকারী সংস্থার অবিরাম এবং সংহত নিয়ন্ত্রণ"।[২] নিয়ন্ত্রণের এই ধারণাতে ফৌজদারী বিচার পদ্ধতির প্রথাগত ক্ষেত্রগুলি অনুপস্থিত। বরং এতে রপ্তানি এক বিশাল বৈচিত্রের শিল্প ও শিল্প-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড। এবং এর অনেকগুলির আইন ও বিচারগত রূপ রয়েছে।

---

১ *দি ক্যাম্পেইনস অফ আলেক্সান্ডার*, অ্যারিয়ান, পেঙ্গুইন (১৯৭১), পৃঃ১০৫।

২ সেল্‌জনিক, পি, 'ফোকাসিং অর্গানাইজেশনাল রিসার্চ অন রেগুলেশন' নোল, আর রচিত *রেগুলেটরি পলিসি এন্ড দি সোশ্যাল সাইন্সেস* (১৯৮৫)এ অন্তর্ভুক্ত ; পৃঃ ৩৬৩।

এই প্রতিবেদনে নিয়ন্ত্রণের দুটি বিস্তৃত ক্ষেত্র বিবেচনা করা হয়েছে, যথা — সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরিধিতে যেসব বিষয় আছে, যেগুলোর মধ্যে আছে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, পরিবেশ, এবং গ্রাহক নিরাপত্তা। যেখানে অনিয়ন্ত্রিত বাজারটি গ্রাহকের পছন্দ মেটাতে ব্যর্থ হয় অথবা যেখানে বাজার-লেনদেনের স্পিল- ওভার বা বাড়তি কিছু প্রভাব (বা বহিঃস্থতা) রয়েছে, যেমন দুষণ (যা এমন মানুষজনেরও স্বার্থের হানি করে

যারা এর সাথে সরাসরি যুক্ত নয়), সেখানে এই নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ অনেক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং এটি মৌলিকভাবে একচেটিয়া ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত।[৩]

৫.৩ নিয়ন্ত্রণের আধিক্যের অনেকগুলি ব্যাখ্যা রয়েছে, তবে বিতর্কটি সাধারণত 'জনস্বার্থ তত্ত্ব'[৪] কে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোটি এমন সব আইনে পরিপূর্ণ, যেগুলো জনস্বার্থে দৃশ্যত কর্তৃত্বমূলক প্রতিক্রিয়া থেকে করা হয়েছে। জনস্বার্থে হস্তক্ষেপের সবচেয়ে প্রচলিত যৌক্তিকতাগুলি হল:

- *অ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উৎপত্তি ঠেকানো* — প্রযুক্তিগত বা অন্যান্য কারণে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত হতে পারে, এবং এভাবে স্বাভাবিক একচেটিয়াত্ব সৃষ্টি হতে পারে — যেমন পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে গ্রাহক নিরাপত্তা ও দক্ষতা বিধানের জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়।

- *ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যের ভারসাম্য সংশোধন* — কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লেনদেন 'স্পিল-ওভার' বা বাড়তি প্রভাব অথবা 'বহিঃস্থতা' সৃষ্টি করতে পারে, যেমন দূষণ, যার পরিধি যারা সরাসরি যুক্ত তাদের বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে। এর ফলে ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যের মধ্যে যে বিভাজন সৃষ্টি হয়, তা ঠিক করতে রাষ্ট্র কর আরোপ বা ভর্তুকি দেয়ার জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে।

- *বাজার তথ্য উন্নত করা* — কার্যকর বাজারের জন্য সহজবোধ্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকা প্রয়োজন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহক/ভোক্তা যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করতে — বা তথ্য পেলেও তা বুঝতে — অসুবিধা ভোগ করতে পারেন। এর ফলে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, এবং বাজারের দক্ষতা হ্রাস পায়। কাজেই গ্রাহক/ভোক্তাকে সুরক্ষা দিতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। রাষ্ট্র এটি বাধ্যবাধকতামূলক করতে পারে যে, কেবল দামের ভিত্তিতে পছন্দ করা যায় না এমন

---

[৩] ব্যাপকতা, বাজার শক্তিসমূহের উপর অভিঘাত, এবং প্রত্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের সহজতার ওপর নির্ভর করে নিয়ন্ত্রণের ধরনগুলিতে প্রচুর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত কমান্ড-এন্ড-কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণের অধীনে যেসব কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়া হয়, সেগুলি খুব কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িত, এবং কর্মকাণ্ড শুরু হওয়ার আগে সুনির্দিষ্ট ছাড়পত্র গ্রহণ প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত, নির্দেশরেখা বা গাইডলাইন ব্যবহারেও সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ থেকে যায়, যার লঙ্ঘন হলে আইনানুগ জরিমানা দিতে হয়। তৃতীয় একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, প্রতিক্রিয়ামূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি (ঔষধ শিল্প) যার অধীনে নিয়ন্ত্রণকারীরা কোনো একটি নতুন সামগ্রী অনুমোদন করবেন কি না সে ব্যাপারে এক্স-পোস্ট সিদ্ধান্ত দেন। চতুর্থ একটি শ্রেণী হচ্ছে তথ্য প্রদানগত নিয়ন্ত্রণ, যেখানে ফার্মসমূহকে তাদের সামগ্রী বা সেবার ব্যাপারে গ্রাহক/ভোক্তাদের তথ্য সরবরাহ করতে হয়, যা ঐ শিল্পের জন্য কার্যকরভাবে মান নির্ধারণ করে। পঞ্চম একটি শ্রেণী হচ্ছে বিকেন্দ্রীকৃত নিয়ন্ত্রণ, যার অধীন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা ফার্মসমূহ নিজেরাই প্রত্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী।

[৪] এ ক্ষেত্রে লেখালেখির একটি সংক্ষিপ্ত ও হালনাগাদ পর্যালোচনার জন্য দেখুন : ওগাস,এ, *রেগুলেশন : লিগ্যাল ফর্ম এন্ড ইকোনোমিক থিওরি*, ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৯৪।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার ঢাকা

সামগ্রী ও সেবার জন্য সর্বনিম্ন মান থাকতে হবে —— যেমন আর্থিক সার্ভিসসমূহ, ওষুধ, ডাক্তারী সার্ভিস অথবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা।

- *সামাজিক বা ন্যায়নীতি সম্পর্কিত বিবেচনা* —— রাষ্ট্রের কিছু সামাজিক লক্ষ্য থাকতে পারে যার প্রসার তার কাম্য; রাষ্ট্রের সামাজিক মানও থাকতে পারে যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ হোক রাষ্ট্র তা চায় না। এর মধ্যে থাকতে পারে সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে ব্যাপকতর চিন্তা-ভাবনা, অথবা কোনো কোনো দুস্থ জনগোষ্ঠি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা। কাজেই রাষ্ট্র কিছু নিয়ন্ত্রণমূলক প্রবিধান চালু করতে পারে, যেমন কর্মস্থলে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে।

৫.৪ এসব হস্তক্ষেপের সবগুলোই জনস্বার্থ প্রসারের জন্য তৈরি হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীতে ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থের খাতিরে এসব হস্তক্ষেপের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সেসব সরকারী কর্মকর্তার স্বার্থ থাকতে পারে, যারা প্রবিধানসমূহ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও এসবের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছেন। অথবা এর মধ্যে অনেক বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোক জড়িত হতে পারেন, যারা নিয়মনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেন —— যাকে বলা হয় "নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র দখল"।[৫]

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা —— নিয়ন্ত্রণ নয়, গলা টিপে ধরা

৫.৫ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় —— এমনকি নিজের ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও —— বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে দেয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেশির ভাগ দেশী ও বিদেশী বেসরকারী খাত এখন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত। তবে এ থেকে প্রাপ্ত লাভ অনেকটাই খেয়ে ফেলেছে ঘন "প্রশাসনিক ঝোপঝাড়" এবং সরকারী একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দমনমূলক ক্ষমতা। আবার একই সংগে, অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ অতি-নিয়ন্ত্রিত, এবং সিংহভাগ প্রবিধানেরই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিচারে টিকে থাকতে পারার কথা নয়। তবে সমস্যা শুধু প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ বা মূল্য নিয়েই নয় —— বেশির ভাগ কুফল দেখা দেয় এদের ওলটপালট চরিত্র থেকে, যেখানে অনুপাত বা সঙ্গতির কোনো বালাই নেই। সরকার যেন প্রায়শই একই সংগে সকল পর্যায়ে গৌণ এবং মূখ্য, ব্যাপক এবং সীমিত ঝুঁকি মোকাবেলা করছে, অথচ সব কিছুতেই সমান উৎসাহ উদ্যম প্রদর্শন করছে। এর একটি প্রধান কারণ এই যে, এসবের অন্তর্নিহিত সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থাটি কোনো সঙ্গতিপূর্ণ আইন সংহিতা নয় বরং একটি 'প্রত্নতাত্ত্বিক স্তূপ' যার প্রতিটি স্তরে প্রতিফলন ঘটেছে সমসাময়িক সংবাদ শিরোনাম, এবং ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক আবেগ। এর ফলে সমগ্র বিষয়টির মূল্যের প্রতি এবং সুফল/সুবিধার সংগে মূল্যের সম্পর্কের প্রতি খুব কমই মনোযোগ দেখানো হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, অপ্রয়োজনীয় বিধিবিধান *সাধারণ নাগরিকের জীবনে প্রচুর হয়রানি সৃষ্টি করে, এবং একই সাথে জনগণের সুফল সর্বনিম্ন পর্যায়ে এনে ফার্মসমূহের জন্য খরচ সর্বোচ্চ করেছে।*

৫.৬ অন্যান্য অনেক খাতেও বিধিবিধান/নিয়ন্ত্রণ একই রকমের সর্বব্যাপী। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ব্যাপক ভূমিকার জন্য একটি বিশাল আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে, এবং একটি শ্বাসরুদ্ধকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। উর্ধতন কর্মকর্তারা বেশির ভাগ সময় কাটান নীতি বা কর্মসূচি নিয়ে নয়, বরং শিক্ষক নিয়োগ বা বদলির মত নিয়মমাফিক কাজ নিয়ে, যার সাথে অবশ্য জড়িয়ে আছে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎকোচ আদায়ের বিষয়।

---

৫ এক্ষেত্রে লেখালেখির পর্যালোচনার জন্য দেখুন: উইলসন জি, "সোশ্যাল রেগুলেশনস এন্ড এক্সপ্ল্যানেশনস অফ রেগুলেটরি ফেইলার", *জার্নাল অফ পলিটিক্যাল স্টাডিজ* কলাম ৩২, (১৯৮৪)।

একটি যুৎসই উদাহরণ হচ্ছে কোনো মাধ্যমিক স্কুলের স্বীকৃতি/অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন। এটি একটি দীর্ঘ এবং পরিশ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া, এবং আবেদনকারীকে ৩১টির মত শর্ত পূরণ করতে হয়। স্বীকৃতি নবায়নের জন্য আবেদনকারী স্কুলগুলোর প্রায় ৪০% কে দু'বছর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

৫.৭ এই সাঁড়াশি চাপ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ, প্রবিধানসমূহকে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে দাঁড় করানোর, এবং এসবের প্রণয়নে জনগণের একটি কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জরুরী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণমূলক চর্চার অনেকগুলি কুফল রয়েছে। প্রথমত, নিয়ন্ত্রণগুলি হচ্ছে পরিব্যাপ্ত এবং অপ্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়ত, এগুলো প্রায়ই অস্পষ্ট এবং প্রয়োগকারীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল; তৃতীয়ত, এদের প্রয়োগ দুর্বল এবং অত্যাচারমূলক; চতুর্থত, বিধিবিধান তৈরির প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ; এবং পঞ্চমত, নিয়ন্ত্রণকারী এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগকারী, অনেক ক্ষেত্রে, একই ব্যক্তি।

৫.৮ *পরিব্যাপ্ত, সেকেলে এবং অপ্রয়োজনীয়* — যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের মত বাংলাদেশেরও আছে হাজার হাজার বিধিবিধান। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্য হল যে, এর অনেকগুলিই সেকেলে, বিরোধপূর্ণ, এবং দৃশ্যত কোনো জনস্বার্থ অর্জনে অসমর্থ। দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হিসেবে বলা যায় :

(১) "নির্দিষ্ট করা দু'টি স্যুটকেসের" বেশি সংখ্যক স্যুটকেসে করে আনা ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য কাস্টমস ডিউটি/ভ্যাট দিতে হবে; তৃতীয় স্যুটকেসটিতে যদি বই থাকে, তবে তা হবে শুল্ক মুক্ত (কাস্টমস ডিক্লারেশন ফর্ম)। একজন স্থানীয় লোকের মন্তব্য : "মানুষ কিভাবে তাদের স্যুটকেস গোছাবে, সে ব্যাপারেও কর কর্তৃপক্ষের পছন্দ রয়েছে — জিনিসপত্র ঠাসা দুটি স্যুটকেস, হাল্কাভাবে ভর্তি করা তিনটি স্যুটকেস থেকে অগ্রাধিকার পাবে। তা ছাড়া, কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন বইপত্র মনের জন্য ক্ষতিকারক, কাজেই এক স্যুটকেসের বেশি বই হলে তার ওপর কর বসাতে হবে।"

(২) দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পরিদর্শকদের বুকের ছাতি অন্ততঃ ৩০ ইঞ্চি হতে হবে, এবং তাদের উচ্চতা হতে হবে অন্তত ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি (দুর্নীতি দমন আইন)। উচ্চতা ও বুকের মাপের সংগে দুর্নীতি দমন বিভাগের একজন কর্মকর্তা হওয়ার মধ্যে সম্পর্কটা যে কি, তা পরিষ্কার নয়।

(৩) প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে পিকদানী থাকতে হবে, এবং পায়খানা কর্মস্থল থেকে ৩০ গজ দূরে হতে হবে (ফ্যাক্টরী আইন, ১৯২৩)। পায়খানা সম্পর্কে বিধান হয়তো যুক্তিযুক্ত ছিল যখন এসবের অবস্থা ছিল আদিম, কিন্তু এখন এ বিধানটি নিতান্ত সেকেলে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও, একজন ভ্রাম্যমান ফ্যাক্টরী পরিদর্শক এ নিয়ম ভংগের জন্য মালিককে জরিমানা করতে পারেন (অথবা ঘুষ আদায় করতে পারেন)।

(৪) কোনো বিমান সংস্থা যদি বিমান বা ইঞ্জিন বিক্রী করতে চায়, এমনকি বিদেশেও, তাহলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে (বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন)। দেশের ভিতরে চলাচলকারী বিমানের ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা মান নির্ধারণের ব্যাপারটি বোঝা গেলেও, বিদেশে সেগুলো বিক্রীর জন্য অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রেও অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে। একসময়, যখন বিশ্বের সর্বত্র বিমান সংস্থাগুলি ছিল নিয়ন্ত্রিত, এটি প্রচলিত ছিল, কিন্তু অতীতের সেই নিয়ম এখনও চলছে। বিমান সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের

CONFINED

প্রবিধান প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। সে যাই হোক, ভাড়া নির্ধারণ আসলে করে বাজার — ট্রাভেল এজেন্ট এবং যাত্রী যেখানে দুই পক্ষ। সে ক্ষেত্রে এ নিয়মটির প্রয়োজন নেই।

(৫) ফ্যাক্স বসানোর জন্য শুধু যে আলাদা ফ্যাক্স লাইন প্রয়োজন, তা নয়, বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড থেকে অনুমতিও নিতে হয়। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটে গেছে তার প্রেক্ষিতে এই প্রবিধানটি সেকেলে এবং ঐ বিপ্লব থেকে বহু দূরে।

(৬) যে কোনো সময় একজন সরকারী কর্মকর্তাকে বিদেশ যাবার সময় ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের একটি 'নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট' দেখাতে হয়। এই প্রবিধানের কোনো জনস্বার্থ সম্পর্কিত যুক্তি নেই, এবং এতে অযথা কাগজ চালাচালি আর উর্ধতন কর্মকর্তাদের সময়ের শ্রাদ্ধ হয়।

(৭) ৫,০০০ মার্কিন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা থাকলে তার ঘোষণা দিতে হয় (বৈদেশিক মুদ্রা আইন)। এই পরিমাণের ভিত্তি এবং এই বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অনেক দেশে (যেমন যুক্তরাষ্ট্রে) কালো-টাকা সাদা করার খবর রাখার জন্য একই রকমের বিধান রয়েছে, তবে বাংলাদেশে এটি কোনো সমস্যা বলে মনে করা হয় না। এ ধরনের প্রবিধান অপ্রয়োজনীয়, এবং বিশেষ করে বিদেশে বসবাসকারী ইমিগ্রেন্টদের জন্য একটি সমস্যা। তারা ভাল বিনিময় হারের জন্য তাদের সঞ্চয় হুন্ডি বা ব্যাংকের মাধ্যমে না এনে নগদ টাকায় নিয়ে আসেন। তবে এটি করতে গেলে তারা শুল্ক কর্মকর্তাদের খপ্পরে পড়বেন এবং এসব কর্মকর্তারা সাধারণত নিয়ন্ত্রণহীন।

(৮) যব-লট বা স্টক-লট পণ্য আমদানী করা যায় না (আমদানী নীতি অর্ডার)। এই আদেশটির বলতে গেলে কোনো জনস্বার্থ যৌক্তিকতা নেই। উল্টো বরং গ্রাহক/ভোক্তাদের জন্য এটি ক্ষতিকারক। কারণ প্রচুর হ্রাসকৃত মূল্যে গ্রহণযোগ্য মানের সামগ্রী পাওয়া গেলে লাভ হত তাদেরই।

(৯) প্রতিযোগিতা-বিরোধী প্রবিধানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে: বাংলাদেশে পণ্যবাহী বিমান অবতরণের অনুমতি দেয়ার আগে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিমানের "প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকারের" শরণাপন্ন হওয়া; আমদানীকৃত সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃক ৬০% সারচার্জ ধরা।

(১০) মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোর লেবার এ্যাটাশেদের একটি আবশ্যকীয় কাজ হল ঐসব দেশের সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ওয়ার্ক ভিসা সত্যায়িত করা, যদিও ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসগুলি তাদের সরকার থেকে সরাসরি ঐসব ভিসার অনুলিপি পেয়ে থাকে।

(১১) বিদেশে মজুত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে দাম মেটানো পণ্য আমদানী করতে অনুমতি প্রয়োজন।

(১২) পাসপোর্ট ইস্যু করার জন্য প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা দ্বারা ছবি সত্যায়ন করতে হয় এবং পুলিশের সার্টিফিকেট প্রয়োজন পড়ে। এর কারণ যদিও অপব্যবহার রোধ — এবং এই যুক্তিটিও বোধগম্য — তবুও এই আবশ্যকতার ফলে কতটুকু লাভ হয়, তা সন্দেহজনক। এটি বরং সিংহভাগ আইন মান্যকারী নাগরিকদের জন্য বিড়ম্বনার কারণ হয়, যদিও যারা জালিয়াতি করবে, তারা এতে বাধাগ্রস্ত হয় না।

(১৩) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যে শুধু যারা দেশে ঢুকে তাদের পাসপোর্ট ও ভিসা দেখে তাই নয়, যারা দেশ ছেড়ে যাচ্ছে তাদেরটাও দেখে। এ জন্য কোনো জনস্বার্থ যুক্তি আছে বলে মনে হয়না। এতে শুধু শুধু অপ্রয়োজনীয় হয়রানিই বাড়ে, এবং ইমিগ্রেশনের কর্মীদের চাকুরি এবং উৎকোচ আদায়ের পথ করে দেয়।

(১৪) গ্যাস লাইনের সংযোগ দেয়ার আগে গ্যাস কোম্পানী বাড়ির মূল মালিকানা দলিল দেখতে চায়। এটি যুক্তির বিরুদ্ধে। গ্যাস কোম্পানীর যা প্রয়োজন, যেমন বহু দেশে আছে, আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা, নিরাপত্তা এবং অগ্রিম জমা।

(১৫) কোনো সরকারী কর্মকর্তা কোনো বিদেশী নাগরিককে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে অথবা বিয়ে করার আশ্বাস দিতে পারবেন না (সরকারী কর্মচারীদের বিবাহ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৬)। শুধু স্পর্শকাতর অবস্থানে কর্মরত কর্মকর্তাদের ছাড়া এ ধরনের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে সরকারের হস্তক্ষেপ করা অভিপ্রেত নয়।

(১৬) খামারগুলির জন্য সর্বোচ্চ জমি মালিকানার পরিমাণ ৬০ বিঘা (ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৮৪)। এতে বাংলাদেশে কার্যকরভাবে প্ল্যান্টাশন ধরনের (বড় আকারের) কৃষিকাজ সম্ভাবনা নাকচ হয়।

(১৭) স্ক্র্যাপ, মানচিত্র ও চার্ট, অথবা আমদানীকৃত পণ্য তাদের আদি অবস্থায় রপ্তানি করা যায় না (রপ্তানি নীতি অর্ডার)। এতেও জনস্বার্থের কোনো যুক্তি নেই; এবং আমদানীর ক্ষেত্রে এর আরো অর্থ হল যে, বাংলাদেশীরা ট্রানশিপমেন্ট উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না — যা উপসাগরীয় দেশগুলিতে একটি প্রধান ব্যবসা।

(১৮) যখনই নতুন কোনো ফ্যাক্টরী ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়, ফ্যাক্টরীসমূহের মূখ্য পরিদর্শককে তা অবহিত করতে হয়; মূখ্য পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়া কোনো প্রাপ্তবয়স্ক কর্মী যে কোনো একটি দিনে একসংগে দুটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে পারবে না। মূখ্য পরিদর্শক কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন (ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৬৫)।

(১৯) গরুর দুধ ও মহিষের দুধকে ভেজাল মিশ্রিত বলে গণ্য করা হবে যদি এতে চর্বির পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৫% ও ৫% এর কম থাকে (বিশুদ্ধ খাবার অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯)। তবে মজার ব্যাপার হল চর্বির এই হার অনেক ওইসিডি দেশে ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করা হয়।

(২০) কোনো বিমান সংস্থা যদি গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং চালু করতে চায়, তবে তাকে বাংলাদেশ বিমানের অনুমতি নিতে হবে। একটি বিমান সংস্থা বিমান বন্দরে তাদের বিশ্বজোড়া সংযোগ দেয়া নিজস্ব কম্প্যুটারাইজড্ চেক-ইন পদ্ধতি চালুর অনুরোধ করেছিল। কিন্তু বিমান এটি নিয়ে গড়িমসি করে যাচ্ছে। বরং বিমানের নিজস্ব পদ্ধতি গ্রহণ করতে, অথবা বর্তমানের অ-যান্ত্রিক চেক-ইন পদ্ধতি চালিয়ে যেতে সংস্থাটিকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

(২১) দক্ষিণ এশিয়ার ছায়াছবি আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যদিও এগুলো বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ভিডিও স্টোরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া এগুলো স্যাটেলাইট টেলিভিশনের

মাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে, যার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তথ্য প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের বিধিনিষেধ অর্থহীন ও সেকেলে হয়ে পড়েছে।

৫.৯. ***অস্বচ্ছ এবং স্বেচ্ছাচারমূলক*** — ভাল প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরকম একটি উদ্বেগজনক বিষয় হল এই যে অনেক প্রবিধানকে যেন ইচ্ছে করেই উন্মুক্ত এবং অস্বচ্ছ করে রাখা হয়। এতে নিয়ন্ত্রণকারী আমলাতন্ত্রের মান ও সততা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত আস্থা প্রতিফলিত হয় বটে, তবে তাদেরকে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগের এক বিশাল সুযোগ দিয়ে দেয়া হয়। দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ:

(১) মালপত্র হিসেবে সংগে আনা অথচ "ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর জিনিস" – এর অধীনে ঠিক পড়ে না এরকম সব কিছুর জন্য কাস্টমস ডিউটি/ভ্যাট দিতে হয় (কাস্টমস ডিক্লারেশন ফর্ম)।

(২) কোনো বাংলাদেশী নাগরিক 'ফেরত নেয়া হবে' ভিত্তিতে একটি মাইক্রো-কম্প্যুটার আনতে পারবেন — তবে এ ক্ষেত্রে তাকে একটি "*ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা*" দিতে হবে (বাঁকা হরফের শব্দগুলির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি)। *ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা* কি কোনো অঙ্গীকার, ব্যাংক গ্যারান্টি, স্বাক্ষরকৃত ঘোষণা, অথবা কী? ক্লান্ত যাত্রীকে এ বিষয়টি কোনো বন্ধুবৎসল ইন্সপেক্টরের সংগেই ফয়সালা করতে হয়।

(৩) স্টেইনলেস স্টীলের স্ক্র্যাপ আলাদা আলাদা কেইসভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে রপ্তানি করা যায় (রপ্তানি নীতি, ১৯৯৪)। এর অর্থনৈতিক যুক্তি সন্দেহজনক, কিন্তু আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবে, সেরকম কোনো নির্ণায়ক এই নীতিতে নেই।

(৪) আমদানী নীতি অর্ডার (১৯৯৩-৯৫) "পুরোনো, যব-লট, স্টক-লট" সামগ্রী এবং "শ্রেষ্ঠমানের" বিলেট নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এসব শব্দের কোনো সংজ্ঞা, অথবা মূল্যায়নকারী যেসব নির্ণায়কের ভিত্তিতে এগুলো শ্রেণীবদ্ধ করবেন সেসব এ অর্ডারে নেই।

(৫) *"অন্যান্য"* (শব্দটির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি) আমদানীকৃত খাদ্য সামগ্রীর জন্য তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা প্রয়োজনীয় (আমদানী নীতি অর্ডার, ১৯৯৩-৯৫)। এই অবর্ণিত এবং অস্বচ্ছ নীতিটি প্রায়শই কাস্টমস কর্মকর্তারা খাদ্য আমদানীকারকদের এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে (যেমন, যেসব কাপড় বুননকারীরা ভুট্টার স্টার্চ আমদানী করেন) হয়রানি করার জন্য ব্যবহার করেন।

মাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে, যার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তথ্য প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের বিধিনিষেধ অর্থহীন ও সেকেলে হয়ে পড়েছে।

৫.৯. ***অস্বচ্ছ এবং স্বেচ্ছাচারমূলক*** — ভাল প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরকম একটি উদ্বেগজনক বিষয় হল এই যে অনেক প্রবিধানকে যেন ইচ্ছে করেই উন্মুক্ত এবং অস্বচ্ছ করে রাখা হয়। এতে নিয়ন্ত্রণকারী আমলাতন্ত্রের মান ও সততা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত আস্থা প্রতিফলিত হয় বটে, তবে তাদেরকে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগের এক বিশাল সুযোগ দিয়ে দেয়া হয়। দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ:

(১) মালপত্র হিসেবে সংগে আনা অথচ "ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর জিনিস" – এর অধীনে ঠিক পড়ে না এরকম সব কিছুর জন্য কাস্টমস ডিউটি/ভ্যাট দিতে হয় (কাস্টমস ডিক্লারেশন ফর্ম)।

(২) কোনো বাংলাদেশী নাগরিক 'ফেরত নেয়া হবে' ভিত্তিতে একটি মাইক্রো-কম্প্যুটার আনতে পারবেন — তবে এ ক্ষেত্রে তাকে একটি "*ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা*" দিতে হবে (বাঁকা হরফের শব্দগুলির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি)। *ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা* কি কোনো অঙ্গীকার, ব্যাংক গ্যারান্টি, স্বাক্ষরকৃত ঘোষণা, অথবা কী? ক্লান্ত যাত্রীকে এ বিষয়টি কোনো বন্ধুবৎসল ইন্সপেক্টরের সংগেই ফয়সালা করতে হয়।

(৩) স্টেইনলেস স্টীলের স্ক্র্যাপ আলাদা আলাদা কেইসভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে রপ্তানি করা যায় (রপ্তানি নীতি, ১৯৯৪)। এর অর্থনৈতিক যুক্তি সন্দেহজনক, কিন্তু আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবে, সেরকম কোনো নির্ণায়ক এই নীতিতে নেই।

(৪) আমদানী নীতি অর্ডার (১৯৯৩-৯৫) "পুরোনো, যব-লট, স্টক-লট" সামগ্রী এবং "শ্রেষ্ঠমানের" বিলেট নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এসব শব্দের কোনো সংজ্ঞা, অথবা মূল্যায়নকারী যেসব নির্ণায়কের ভিত্তিতে এগুলো শ্রেণীবদ্ধ করবেন সেসব এ অর্ডারে নেই।

(৫) "*অন্যান্য*" (শব্দটির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি) আমদানীকৃত খাদ্য সামগ্রীর জন্য তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা প্রয়োজনীয় (আমদানী নীতি অর্ডার, ১৯৯৩-৯৫)। এই অবর্ণিত এবং অস্বচ্ছ নীতিটি প্রায়শই কাস্টমস কর্মকর্তারা খাদ্য আমদানীকারকদের এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে (যেমন, যেসব কাপড় বুননকারীরা ভুট্টার স্টার্চ আমদানী করেন) হয়রানি করার জন্য ব্যবহার করেন।

মাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে, যার ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তথ্য প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের বিধিনিষেধ অর্থহীন ও সেকেলে হয়ে পড়েছে।

৫.৯. ***অস্বচ্ছ এবং স্বেচ্ছাচারমূলক*** — ভাল প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এরকম একটি উদ্বেগজনক বিষয় হল এই যে অনেক প্রবিধানকে যেন ইচ্ছে করেই উন্মুক্ত এবং অস্বচ্ছ করে রাখা হয়। এতে নিয়ন্ত্রণকারী আমলাতন্ত্রের মান ও সততা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত আস্থা প্রতিফলিত হয় বটে, তবে তাদেরকে স্বেচ্ছাচারমূলক ক্ষমতা প্রয়োগের এক বিশাল সুযোগ দিয়ে দেয়া হয়। দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ:

(১) মালপত্র হিসেবে সংগে আনা অথচ "ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালীর জিনিস" – এর অধীনে ঠিক পড়ে না এরকম সব কিছুর জন্য কাস্টমস ডিউটি/ভ্যাট দিতে হয় (কাস্টমস ডিক্লারেশন ফর্ম)।

(২) কোনো বাংলাদেশী নাগরিক 'ফেরত নেয়া হবে' ভিত্তিতে একটি মাইক্রো-কম্প্যুটার আনতে পারবেন — তবে এ ক্ষেত্রে তাকে একটি "*ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা*" দিতে হবে (বাঁকা হরফের শব্দগুলির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি)। *ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা* কি কোনো অঙ্গীকার, ব্যাংক গ্যারান্টি, স্বাক্ষরকৃত ঘোষণা, অথবা কী? ক্লান্ত যাত্রীকে এ বিষয়টি কোনো বন্ধুবৎসল ইন্সপেক্টরের সংগেই ফয়সালা করতে হয়।

(৩) স্টেইনলেস স্টীলের স্ক্র্যাপ আলাদা আলাদা কেইসভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে রপ্তানি করা যায় (রপ্তানি নীতি, ১৯৯৪)। এর অর্থনৈতিক যুক্তি সন্দেহজনক, কিন্তু আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবে, সেরকম কোনো নির্ণায়ক এই নীতিতে নেই।

(৪) আমদানী নীতি অর্ডার (১৯৯৩-৯৫) "পুরোনো, যব-লট, স্টক-লট" সামগ্রী এবং "শ্রেষ্ঠমানের" বিলেট নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এসব শব্দের কোনো সংজ্ঞা, অথবা মূল্যায়নকারী যেসব নির্ণায়কের ভিত্তিতে এগুলো শ্রেণীবদ্ধ করবেন সেসব এ অর্ডারে নেই।

(৫) *"অন্যান্য"* (শব্দটির সংজ্ঞা দেয়া হয়নি) আমদানীকৃত খাদ্য সামগ্রীর জন্য তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা প্রয়োজনীয় (আমদানী নীতি অর্ডার, ১৯৯৩-৯৫)। এই অবর্ণিত এবং অস্বচ্ছ নীতিটি প্রায়শই কাস্টমস কর্মকর্তারা খাদ্য আমদানীকারকদের এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে (যেমন, যেসব কাপড় বুননকারীরা ভুট্টার স্টার্চ আমদানী করেন) হয়রানি করার জন্য ব্যবহার করেন।

ঘর ৫.১ : ভাল আইন কিভাবে মন্দ হয়ে যায়

চেরনোবিল পরমাণু শক্তিকেন্দ্রের দুর্ঘটনাটির প্রভাব এখনো বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে পোল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত দুধে দূষণ পাওয়া গেলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানী নীতি অর্ডার (১৯৯৩-৯৫)'তে একটি শর্ত জুড়ে দেয় যে, *যে কোনো দেশ* থেকে *সকল* আমদানীকৃত খাদ্যদ্রব্যকে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই পরীক্ষা রপ্তানি বন্দর এবং বাংলাদেশ, উভয় স্থানে করতে হবে।

খাদ্যদ্রব্য যে দূষিত হওয়া উচিত নয়, এরকম সর্বৈব যুক্তিযুক্ত একটি আবশ্যকতা একজন সামান্য আমলার হাতে একটি মারাত্মক হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। অধিকাংশ কালেক্টরেটে অবশ্য এই আবশ্যকতাকে অবহেলা করা হয়, যেহেতু বেশির ভাগ দেশ থেকে আসা খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেই এই ঝুঁকিটি থাকে না। তবে বিশেষ কোনো কর্মকর্তা হঠাৎ করে উৎকোচ গ্রহণের উপায় হিসেবে এই প্রবিধানটি প্রয়োগ করতে পারেন। যখন আইনটি প্রয়োগ করা হয়, তখন আমদানীকারককে ঢাকাস্থ আণবিক শক্তি কমিশনে সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে দুই মাস সময় লেগে যেতে পারে, এবং প্রতিটি পণ্যের প্রতিটি পরিদর্শনের জন্য ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। এদিকে আমদানীকৃত চকলেট গলে যাবে, আপেল পচে যাবে এবং চাল নষ্ট হবে — এগুলোর জন্য আবার অতিরিক্ত ফি দিতে হবে।

সম্প্রতি বেসরকারী খাতে জরুরী ভিত্তিতে আমদানীকৃত চালের ক্ষেত্রে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রকট আকার ধারণ করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এই উদ্ভট প্রবিধানটি রহিত করার জন্য অনুরোধ করে, কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই সাধারণ প্রবিধানের ক্ষেত্রে অনড় থাকে। মন্ত্রণালয়টি শুধু একটি বিশেষ রেয়াত দেয়।

অতি উৎসাহী কাস্টমস কর্মকর্তারা একই আইন ভুট্টার মাড়ে-র মত শিল্প সামগ্রীর (যা বস্ত্রশিল্পে সাইজিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়) ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন।

(৬) সরকার বাণিজ্য সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে অনেক ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে — যেমন তাদের লাইসেন্স বাতিল করা, তাদের নির্বাচন বাতিল করা, তাদের নির্বাহী কমিটিগুলির ক্ষমতা অধিগ্রহণ করা অথবা তাদের উপধারাগুলি সংশোধন করতে নির্দেশ দেয়া (ট্রেড অর্গানাইজেশন অর্ডার)। এই নিগ্রহমূলক আইন যে শুধু বেসরকারী খাত উন্নয়ন চেতনার একেবারে বিপরীত তা নয়, এতে কোন বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই।

(৭) যে কোনো ফ্যাক্টরীর সম্প্রসারণের জন্য মূখ্য পরিদর্শকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতে পারে, এবং ক্যান্টিনসমূহে পরিবেশন করা খাদ্য সম্পর্কে সরকার নিয়ম তৈরি করতে পারে (ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৬৫)।

(৮) যদি কোনো পরিদর্শকের কাছে এটি *প্রতীয়মান হয় যে* হিউমিডিফিকেশন বা আর্দ্রতা সৃষ্টির জন্য পানি *কার্যকর ভাবে* পরিশোধিত নয়, অথবা দালানের যে কোনো অংশ বা যন্ত্রপাতি *নিরাপত্তার জন্য হুমকি,* তাহলে তিনি নোটিশ জারি করতে পারেন (ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৬৫)। বাঁকা হরফের শব্দগুলি সংজ্ঞায়িত নয়, এবং অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারমূলক — যে বিষয়টি নিঃসন্দেহে পরিদর্শকরা কাজে লাগান, যেহেতু তারাই একমাত্র বিচারক।

(৯) বেসরকারী খাতে পেট্রোলিয়াম আমদানীর অনুমতি দেয়া হয় শুধুমাত্র *"অন্যান্য"* আইনগত বিধিবিধান (SRO) পূরণ করে *"সরকারের"* কাছ থেকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হলে। সংবিধিবদ্ধ প্রবিধান অর্ডারে (SRO) অবশ্য সরকার কে, অথবা এসব "অন্যান্য" নিয়মকানুন ও বিধিবিধান কি, সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দেয় না (ঘর ৫.২)।

ঘর ৫.২ লুব্রিকেন্ট থেকে সাপের তেল

১৯৯৫ সালের জানুয়ারিতে একটি বাংলাদেশী ফার্ম তার ১০০ ভাগ রপ্তানিমুখী উৎপাদনের জন্য ২৪ কোটি টাকা (৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার) মূল্যের নিটিং বা বুনন যন্ত্রপাতি আমদানী করে। যন্ত্রপাতি বসিয়ে চালু করার সময় দেখা গেল যন্ত্রপাতি চালু করার আগে লাগাতে হয় এরকম একটি বিশেষ লুব্রিকেন্ট তেল প্রস্তুতকারক ভুল করে পাঠায়নি। যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী এটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, ঐ বিশেষ লুব্রিকেন্ট — যা শুধু তারাই সরবরাহ করে — যদি ব্যবহার করা না হয়, তা হলে নিশ্চয়তাপত্র বাতিল হয়ে যাবে। ফার্মটি ৮০,০০০ টাকার (২,০০০ মার্কিন ডলারের) একটি ঋণপত্র খুলল, এবং অতপর একটি দীর্ঘ কাহিনীর সূচনা হল। ১৯৯৫ এর মার্চের প্রথম দিকে লুব্রিকেন্টের চালানটি কাস্টমস আটক করে, যেহেতু পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর আমদানীর নিয়ম হল :"অন্যান্য [অসংজ্ঞায়িত] আইনগত বিধিবিধান (SRO) পূরণ করে সরকারের [অসংজ্ঞায়িত] কাছ থেকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত হলেই শুধু বেসরকারী খাতে পেট্রোলিয়াম আমদানীর অনুমতি দেয়া হয়।" ফার্মটি জ্বালানী এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে এ মর্মে প্রতিবাদ জানায় যে তাদের আমদানী ব্যবসায়িক কারণে নয়, বরং সুনির্দিষ্টভাবে তাদের ফ্যাক্টরীতে ব্যবহারের জন্য। এদিকে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (এ ধরনের আমদানীর একক নিয়ন্ত্রক) ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হল, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সময় লাগলো তিন মাস। চালানটি ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৯৫ এর মে মাসে, যার মধ্যে ফ্যাক্টরীটি চালু করতে তিন মাস দেরী হয়ে গেছে — এবং রপ্তানি বিক্রীতে লোকসান ৪ কোটি টাকায় (১০ লক্ষ মার্কিন ডলার) দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো দালাল ধরতে পারলে হয়তো সেটা হত সময়োপযোগী একটি কাজ।

এই উদাহরণটি প্রবিধানসমূহের অযৌক্তিতাই শুধু তুলে ধরে না, আমলাতান্ত্রিক কোনো সিদ্ধান্ত পেতে যে দীর্ঘ বিলম্ব হয়, সেটিও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। এবং এসবই হচ্ছে উদ্যোক্তার আর অর্থনীতির বিশাল মূল্য দেয়ার বিনিময়ে। অথচ এ জন্য কোনো জবাবদিহিতা অথবা কোনো ক্ষতিপূরণের বালাই নেই।

(১০) *সরকারের* অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশীদের বিমানের টিকেট দেয়া যেতে পারে, যদি তারা বাংলাদেশে তাদের বেতন গ্রহণ করে থাকেন, অথবা যদি তাদের নিয়োগকর্তা বিমান ভাড়া বহন করে থাকেন (বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিধি, ১৯৯৫)। টিকেট ইস্যু করার ক্ষেত্রে *সরকারের* [অসংজ্ঞায়িত] হস্তক্ষেপ অর্থনীতির যুক্তির বিরুদ্ধে যায়, এবং এটি এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের গভীর পক্ষপাতিত্বের আরেকটি উদাহরণ।

(১১) চাল/গমের ভূষি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি প্রয়োজন হয়, এবং মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদা কেইসভিত্তিতে এই অনুমতি দেয় যদি মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়/পশুপালন অধিদপ্তর *কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার* মধ্যে এবং *যুক্তিযুক্ত মূল্যের* ভিতরে (বাঁকা হরফের শব্দগুলি অসংজ্ঞায়িত) এ সামগ্রীগুলোর বিপণনের ব্যবস্থা করতে/সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়।

৫.১০ ***ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল প্রয়োগ*** — সৌভাগ্যক্রমে নাগরিকদের এবং ফার্মসমূহকে "আইনের আক্ষরিক প্রয়োগ" মেনে চলতে হয় না। তবে এর মানে এ নয় যে, তাদের হয়রানি, চাঁদাবাজি বা খরচের সামনাসামনি হতে হয়না। বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধানসমূহের প্রয়োগ সর্বোতভাবে নিম্ন-পর্যায়ের স্বল্প বেতনভুক কর্মকর্তাদের হাত দিয়েই হয়। যে কেউ বেসরকারী ব্যবসায় কার্যক্রম শুরু করতে চাইলে তাকে এসব অসংখ্য ছোটখাটো

আমলার দ্বারস্থ হতে হয়, এবং আমলারা দৃশ্যত: নিয়মবিধির বেড়াজালের প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগান। প্রকৃতপক্ষে তারা এসব বিধিবিধানের স্বেচ্ছাচারী চরিত্র ও অস্বচ্ছতা কাজে লাগিয়ে উৎকোচ আদায় করেন। তা ছাড়া, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব বিধিবিধান শুধু তাদেরই জানা থাকে, যারা এগুলো প্রয়োগ করেন। এর ফলে নৈতিক মানের অধঃপতন ঘটে, এবং যেসব ব্যবসায়ী "নিয়ম বাঁকিয়ে" কর্মকর্তাদের কৃপালাভে সিদ্ধহস্ত, তারা প্রতিযোগিতায় বহুদূর এগিয়ে থাকেন। এটি এমন একটি পদ্ধতি যা নিয়ন্ত্রণকারী এবং নিয়ন্ত্রণের অধীন ব্যক্তি সকলকেই দুর্নীতিবাজ করে। নাগরিকরা আজকাল রাষ্ট্র কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া বিধিবিধান মেনে চলতে কোনো নৈতিক বাধ্যবাধকতা অনুভব করেন না, যেহেতু এগুলোর প্রয়োগ হয় নির্বাচিত ক্ষেত্রে — বিশেষ করে যখন কোনো ব্যক্তি উৎকোচ দিতে সক্ষম হন না, বা রাজী হন না।

৫.১১ নিয়ন্ত্রণ প্রথার ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং জনস্বার্থ প্রবিধানসমূহ প্রয়োগে দুর্বল সামর্থ্য। অথচ এসব জনস্বার্থ প্রবিধান একটি বাজার অর্থনীতির সুশৃঙ্খল আচরণের জন্য অপরিহার্য। এটি অংশত এজন্য যে এসব প্রবিধানের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারীদের ধারণা এবং এসব অর্জনে তাদের অঙ্গীকার অত্যন্ত ভাসাভাসা। অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থান্বেষী মহলকে মোকাবেলা করার রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এজন্য দায়ী। প্রয়োগের ব্যর্থতা অর্থনীতির জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ। বিলম্ব এবং লেনদেনের উচ্চ মূল্য ছাড়াও প্রচুর সরাসরি ক্ষতিও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকিং খাতে দুর্বল তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিষ্ঠান ধসে পড়তে পারে, এবং ধসে যাওয়া প্রতিষ্ঠানকে জনগণের করের টাকাতেই উদ্ধার করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্রে সঞ্চয় ও ঋণ সমিতিগুলি (সেভিং এন্ড লোন এসোসিয়েশন) বন্ধ হয়ে যাওয়ায় করদাতাদের ২০,০০০ কোটি ডলারের এক সুবিশাল ক্ষতি হয়েছে । বাংলাদেশেও ব্যাংকিং অবস্থা এরকম ভাবেই নিচের দিকে যাচ্ছে। গত দু'বছরে কিছু উদ্ধারমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, কিন্তু ক্ষতি যথেষ্ট হয়ে গেছে।[৬] বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিভাগের দুর্বল সামর্থের জন্য ব্যাংকসমূহের হঠাৎ হঠাৎ তত্ত্বাবধান খুব বেশি হলে উপর-সর্বস্ব। এর ফলে 'ইনসাইডার লেন্ডিং'[৭] পাওনা ঋণের ভুল শ্রেণীকরণ, শ্রেণীবদ্ধ ঋণের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা — এবং সবচেয়ে গুরুতরভাবে, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী ব্যবসায়ী ব্যাংকগুলির মূলধন পর্যাপ্ততার আবশ্যকতা মেটাতে ব্যর্থতা সৃষ্টি হয়।[৮]

---

৬ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি পুনঃমূলধন যোগান দিতে বাংলাদেশ সরকারের বাজেটভুক্ত খরচ ১৯৯২ সালে ছিল ১৭৩০ কোটি টাকা, এবং ১৯৯৩ সালে ১৪৬০ কোটি টাকা — যা মোট জিডিপির ৪ শতাংশের সমপরিমাণ। তবে এটি নিমজ্জিত তুষারস্তূপের ওপরের অংশটুকু মাত্র — কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পোর্টফলিওর (যেমন পাটখাতে দেয়া অনাদায়যোগ্য ঋণ) বিরাট অংশ এখনও পুনঃমূলধন যোগানের আওতায় আসেনি।

৭ এই বিষয়টি ১৯৯৫/৯৬ বাজেটের ঘোষণার পর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের উপস্থিতিতে একটি সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত হয়েছিল। গভর্ণরের বক্তব্য ছিল যে, ঋণ খেলাপ ও ইনসাইডার লেন্ডিংএর সমস্যাগুলি সমাধানে অসুবিধা আইন-বিচার পদ্ধতির অপূর্ণতাকেই তুলে ধরে। *ডেইলী স্টার,* জুন ১৮, ১৯৯৫, পৃঃ১।

৮ বেসরকারীকৃত ব্যাংকের কর্পোরেট প্রশাসন উন্নত করার ক্ষেত্রে অসুবিধা সম্পর্কে দেখুন : "কন্ট্রোলিং ইনসাইডার কন্ট্রোল : ইস্যুস অফ কর্পোরেট গভার্নেন্স ইন ট্রানজিশন ইকোনমিজ" , আওকি, এম. *কর্পোরেট গভার্নেন্স ইন ট্রানজিশন ইকোনমীজ* গ্রন্থে সংকলিত; আওকি, এম. এবং কিম, এইচ. কে. (সম্পাদিত) ইডিআই, বিশ্বব্যাংক, ওয়াশিংটন ডি.সি. (১৯৯৫)।

৫.১২ সদ্যজাত সিকিউরিটি বাজারে সিকুইরিটিজ এন্ড এক্সজেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এর অধীনে নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থা উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, এসইসি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান নয়; এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যরত যা আমলাতান্ত্রিক স্তরবৃদ্ধিই শুধু করে না, বরং বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়ের কাছে "কর্তৃপক্ষ সম্পর্কীয়" ভুল সংকেতও পাঠায়। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ ব্যাংকিং সম্পর্কিত আইনসমূহ এখনও বিনিয়োগকারীদের কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা অপরিষ্কার। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে এসইসি বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর ওপর একটি আইন জারি করার পর্যায়ে প্রায় এসে গেছে, সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে বিনিয়োগ ব্যাংকগুলি তার নন-ব্যাংকিং ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটস আইনের (১৯৯৩) আওতায় পড়ে। এ দুটি আইনের অধীনে মূলধন সম্পর্কিত আবশ্যকতা যে শুধু ভিন্ন, তা নয়, এরকম একটি বিভ্রান্তিমূলক নিয়ন্ত্রণ-অবস্থাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে আগ্রহী হয় না।

৫.১৩ *প্রবিধান প্রণয়নের ক্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া* — বাংলাদেশে সকল নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধানের উৎপত্তি আইন থেকে। আইন প্রণয়নকারীরা তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য মূল আইনের মাধ্যমে বিন্যস্ত করেন, কিন্তু সহায়ক নিয়ম, বিধিবিধান/প্রবিধান ও নির্দেশিকা তৈরির কাজ নির্বাহী শাখার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়। এই ফলো-আপ প্রক্রিয়াটিই সহায়ক প্রবিধানসমূহ গজিয়ে ওঠার জন্য দায়ী। রাজউক গৃহনির্মাণ নীতি থেকে শুরু করে দুর্নীতি দমন নির্দেশিকা পর্যন্ত অসংখ্য ভারি গ্রন্থে এবং সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণমূলক অর্ডার (এসআরও) গুচ্ছের মধ্যে এসব লিপিবদ্ধ থাকে।

৫.১৪ প্রবিধানসমূহ তৈরি করার মূল দায়িত্ব থাকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহের। তবে প্রকৃত কারিগরী ক্ষেত্রে সাধারণত: দক্ষতা বা অভিজ্ঞতার অভাব দেখা যায়। এসব সংস্থার নিজস্ব আইনগত খসড়া প্রণয়নের সামর্থ্যও থাকেনা। অনেক ক্ষেত্রে (যেমন পরিবেশগত আইনের ক্ষেত্রে) উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবিধান তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয় অ-বিশেষজ্ঞ এবং জুনিয়র আমলাদের ওপর। এজন্য এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে বিস্তারিত খুঁটিনাটিসহ সহায়ক প্রবিধান প্রায়শই অপ্রতুল, অস্বচ্ছ এবং স্ব-বিরোধী — অনেক সময় অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে। কাজের উপর তত্ত্বগতভাবে কিছু নিয়ন্ত্রণ অবশ্য থাকে; যেমন খসড়া বিধিগুলি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি এবং আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তলিয়ে দেখেন, কিন্তু এই কমিটিগুলির নিজেদেরই কুশলী দক্ষতা এবং খসড়া প্রণয়ন সামর্থের অভাব রয়েছে।

৫.১৫ খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি প্রধান অপূর্ণতা হচ্ছে এই যে, যেসব মানুষের জীবনের সংগে প্রবিধানগুলি সম্পর্কিত হবে, তাদের কোনো মতামত সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অপরাধ সংক্রান্ত প্রবিধান রচনায় সকলের মতামত নেয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু বেশির ভাগ অর্থনৈতিক প্রবিধান রচনার সময় ব্যবহারকারীদের মতামত নেয়াটা উপকারী হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে সরকারী গোপনীয়তার ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রবিধানসমূহ জনগণের গোচরের বাইরে তৈরি করা হয়। সংস্কারাধীন বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশ আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক হতে চেষ্ট — যেমন প্রস্তাবিত প্রবিধানগুলি কতটা ক্রুটিহীন এবং গ্রহণযোগ্য এ বিষয়ে তারা প্রকাশ্য শুনানী অনুষ্ঠান করছে। এটি অবশ্য বেশির ভাগ ওইসিডি দেশে প্রমিত চর্চা। বাংলাদেশেও এ ধরনের কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত দু'বছরে 'নির্বাচিত, অ-স্পর্শকাতর' এসআরও সমূহের খসড়া বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে ভাগাভাগি করে তৈরি করার বীরোচিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একই রকমভাবে, বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংরক্ষণ বিল নিয়ে এনজিও, বিশেষজ্ঞ দল ও দাতাদের সংগে পরামর্শ করার চেষ্টা করেছে।

৫.১৬ *বস্তুনিষ্ঠ দূরত্বের অভাব* — নিয়ন্ত্রণমূলক অন্য সমস্যাটি হল এই যে নিয়ন্ত্রণকারী ও প্রয়োগকর্তা প্রায়শই একই ব্যক্তি। এটি শুধু যে প্রতিযোগিতার ধারণার বিপরীত, তাই নয়, বরং এটি জবাবদিহিতার বিষয়টিকেও বাধাগ্রস্ত করে। একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হল টেলিযোগাযোগ খাত, যেখানে নিয়ন্ত্রণমূলক বিধানগুলি মাত্র সম্প্রতি সরকারী খাতের পরিচালক বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) থেকে

আলাদা করা হয়েছে। তবুও ডাক ও তার মন্ত্রণালয় বিটিটিবি'র ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় বিটিটিবি'র প্রতি দৃশ্যত পক্ষপাতমূলক। বিভাজন রেখাগুলিও স্পষ্ট নয়। একটি ভাল উদাহরণ হল সেলুলার সার্ভিসের জন্য চলমান দর হাঁকাহাঁকির বিষয়টি। ডাক ও তার মন্ত্রণালয় বাধ্যবাধকতা দিয়ে দিয়েছে যে বিদেশে যে কোনো কল বিটিটিবি'র মাধ্যমে করতে হবে। আন্তঃজেলা কলগুলোও বিটিটিবি'র মাধ্যমে করতে হবে, যদিও বিটিটিবি নিজেই নিজের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। ডাক ও তার মন্ত্রণালয় আরো চাচ্ছে যে আন্তঃসংযোগ পরীক্ষামূলক "গ্রহণ" বিটিটিবি'র টেস্টিং রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে করতে হবে। অন্য একটি অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) নিয়ন্ত্রক ভূমিকা। এই সংস্থার একচেটিয়া স্বত্ব ব্যবসাখাতকে বেসরকারী করার বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির সংগে সম্পূর্ণ বেমানান। এর ফলে বেসরকারী খাতের পেট্রোলিয়াম কোম্পানীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান নিয়মের অধীনে, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কোনো বেসরকারী আমদানীকারককে আমদানী করার জন্য বিপিসি'র অগ্রিম অনুমতি লাগে। এজন্য আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আজ পর্যন্ত কোনো বেসরকারী খাতের কোম্পানী এই ব্যবসায় ঢুকতে সক্ষম হয়নি (ঘর ৫.২)। এরকম একটি স্বার্থের বিরোধ দেখা দিয়েছে বিমান চালনা শিল্পে, যার উৎপত্তি বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) এবং জাতীয় পতাকাবাহী বিমান-এর মধ্যে বিভাজন রেখাটি অস্পষ্ট হওয়াতে। এর ফলে বেসামরিক বিমান সংস্থা উন্নয়নে গুরুতর সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বল্প পাল্লার উড্ডয়ন ও অবতরণ বা স্টল সার্ভিস প্রবর্তনে বেসরকারী খাতের দু'বছর সময় লেগেছে। এর থেকে আরো বেশি উদ্বেগজনক হচ্ছে সিএএবি'তে বিদ্যমান এই চিন্তাটি যে এর অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জাতীয় বিমান সংস্থার স্বার্থ রক্ষা করা। এর ফলে একটি নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে এর দক্ষতা অনেকটাই খর্ব হয়েছে। যুক্তরাজ্য মডেলের নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি (OFGAS, OFTELC, OFWAT, ইত্যাদি) প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করে, এবং একই সময়ে তারা যেসব অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলিতে ভোক্তা/গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

৫.১৭ *নিয়ন্ত্রণের বিকৃত প্রভাব* — বর্তমান প্রক্রিয়ায় বেসরকারী খাতের উদ্যোগের ওপর প্রচণ্ড বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এর ফলে ব্যবসার অনিশ্চয়তা ঝুঁকি বাড়ছে, এবং বিলম্ব এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ার উচ্চমূল্যের জন্য অতিরিক্ত খরচ বাড়ছে। উদারনীতি গ্রহণের ফলে লাভের অংশটি সংকুচিত হয়ে আসছে বলে এই খরচ অনেক বেশি অসহনীয় হয়ে উঠছে (ঘর ৫.৩)। গার্মেন্টস তৈরির প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য যেসব লাইসেন্স প্রয়োজন, সেগুলো এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ তুলে ধরে। গত দশকে এই শিল্পের অভাবিত প্রবৃদ্ধির আংশিক কারণ হচ্ছে সরকারের সদয় অবহেলার একটি প্রারম্ভিক নীতি। এখন এই শিল্পটি অসংখ্য প্রবিধান ও নিয়ন্ত্রণের খপ্পরে পড়েছে। একজন নতুন বিনিয়োগকারীকে এখন একডজন মূল লাইসেন্স ও ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় (ব্যবসা, আমদানী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, টেক্সটাইল নিবন্ধন এবং ফ্যাক্টরী নির্মাণ লাইসেন্স, ইত্যাদি)। এর কয়েকটি প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে নবায়ন করতে হয়। ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়ার শ্লথগতি এবং স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতি ব্যবসা ঝুঁকি ও ব্যয় আরো বাড়িয়ে তুলে। কিছু কিছু অনুমোদন একে অন্যের সংগে শর্তসাপেক্ষ, এবং একটি ক্রমধারায় এদের জন্য আবেদন করতে হয় — যা আরো বিলম্ব ঘটায় । এসব লাইসেন্সের প্রায় প্রতিটির জন্য নির্ধারিত দাপ্তরিক ফি থেকে অনেক বেশি টাকা উৎকোচ হিসেবে দিতে হয়। এসব উৎকোচ দিতে হয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। সকল প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পর, এবং কাজ শুরু হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি আরেক সেট নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যার একটি বিরাট অংশ কাস্টমস ও কর বিভাগ সংক্রান্ত।[৯]

---

[৯] গার্মেন্টস শিল্পে দুটি নিয়ন্ত্রণকে দক্ষ কার্যপরিচালনার অন্তরায় বলে বিবেচনা করা হয়: প্রথমত, এই বাধ্যবাধকতাটি যে প্রস্তুতকারকরা শুধুমাত্র ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি (ঋণপত্র)'র ভিত্তিতে আমদানী করার অনুমতি পাবেন — এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান নিয়মানুযায়ী তারা যে বিদেশী মুদ্রায় তাদের আয়ের ৫ শতাংশ রেখে দিতে পারেন, তা থেকে টাকা নিয়ে আমদানী চাহিদা মেটাতে তাদের অনুমতি দেয়া হয় না; এবং দ্বিতীয়ত, নিজস্ব ডাইং ও ফিনিশিং সুবিধা না থাকলে গ্রে (অসম্পূর্ণ) কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা। প্রথম নিষেধাজ্ঞা আগের বছরগুলির বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতাকে প্রতিফলিত করে, এবং রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতামূলক উৎস ও বাজার বহুমুখীকরণ থেকে বঞ্চিত করে। দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটি আমদানী উদারকরণের সার্বিক নীতির পরিপন্থী।

৫.১৮ সম্ভবতঃ সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়টি হল এই যে, অন্যান্য ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জন্যও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এসব সমস্যা এক দশক ব্যাপী ব্যাপকভাবে প্রতিশ্রুত বি-নিয়ন্ত্রণকারী উদ্যোগের পরেও রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক মাপকাঠির অন্য প্রান্তে রিক্সাওয়ালারাও এ ধরনের সমস্যার সামনাসামনি হন। ইউএনডিপি/বাংলাদেশ সরকারের একটি সমীক্ষায় (১৯৯২) একটি আনুমানিক হিসাব করা হয় যে, নিয়ন্ত্রকরা যে অবৈধ অর্থ আদায় করেন, তা কর্মকর্তাদের বর্তমানে লাইসেন্স ফি বাবদ আদায়কৃত (ঘোষিত) ১ কোটি টাকা থেকে দশগুণ বেশি হতে পারে। তবে রিক্সা সংক্রান্ত প্রবিধানগুলি যদি সদভাবে প্রয়োগ করাও হয় — যার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে — দেখা যাবে সেগুলিতে প্রচুর দুর্বলতা রয়ে গেছে। এখনও সুস্পষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা — যেমন যাত্রী বা মালামালের ওপর সীমাবদ্ধতা — অবহেলিত হচ্ছে, অথচ বেশ কিছু অদ্ভুত নিয়ম বজায় রাখা হচ্ছে, যেমন বাঁকানো হুড থাকা অথবা পেছন-দেখার আয়না না থাকার ওপর বাধ্যবাধকতা।

৫.৩ বাংলাদেশে ব্যবসা করার লুক্কায়িত ব্যয়

'স্পীড মানি' বা কাজ তাড়াতাড়ি করার জন্য দেয়া ঘুষ হচ্ছে বাংলাদেশে ব্যবসা জীবনের বাস্তবতা। এই খেলাটি যিনি খেলতে নামবেন, তাকে অলিখিত নিয়ম অনুসারেই খেলতে হবে।

অত্যাবশ্যকীয় সেবার সংযোগ পাওয়া — এটি একটি হতাশাব্যঞ্জক এবং ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার হতে পারে। বেশির ভাগ অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রতিষ্ঠানে সংযোগের জন্য এত আবেদনপত্র জমা হয়ে আছে যে তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এ জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার সময় একটি সাধারণ ব্যাপার, অবশ্য যদি কেউ লাইন ভেঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বাজারের দামটি মিটাতে আগ্রহী না থাকেন। প্রারম্ভিক 'স্পীড মানি' — যার একটা হিসাব নিচে দেয়া হল — ধরিয়ে দেয়ার পর সময়ান্তরে আরো অর্থ প্রদান করতে হয়, যাতে সরবরাহে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, এবং মেরামতি কাজ থাকলে তা দ্রুত হয়, বিশেষ করে ঘনঘন বিঘ্ন ঘটতে পারে সেরকম অত্যাবশ্যকীয় সেবার ক্ষেত্রে। গ্রাহকরা যাতে কোনো ভৌতিক বিল না পান, তা নিশ্চিত করতে ঘুষ দিতে হয়। আর এসব বিলের বিরুদ্ধে আবেদন করাও দুঃসাধ্য।

- *বিদ্যুৎ* — উদ্যোক্তা যদি দ্রুত (ধরুন এক সপ্তাহের মধ্যে) সংযোগ চান, তাহলে উৎকোচের পরিমাণ একটি হাই টেনসন তারের জন্য ১০০,০০০ - ১৫০,০০০ টাকা (২,৫০০ - ৩,৭৫০ ডলার) এবং লো টেনসন তারের জন্য ১০,০০০ - ১৫,০০০ টাকা (২৫০ - ৩৭৫ ডলার)।

- *গ্যাস* — সংযোগ পাওয়ার গড় সময় হল ৩ মাস, এবং নির্দিষ্ট সরকারী ফি হচ্ছে ৩,০০০ টাকা (৭৫ ডলার)। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য দিতে হয় ৪০,০০০ টাকা (১,০০০ ডলার)।

- *পানি* — সংযোগ পাওয়ার জন্য গড় সময় হল ৩ থেকে ৪ মাস। এক সপ্তাহের মধ্যে সংযোগ পেতে হলে উৎকোচ দিতে হবে ১৪,০০০ - ২০,০০০ টাকা (৩৫০ - ৫০০ ডলার)।

- *টেলিফোন* — গড় অপেক্ষা-সময় এ ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ বছর। এক সপ্তাহে সংযোগ পাওয়ার জন্য উৎকোচ দিতে হবে ৫০,০০০ - ৭০,০০০ টাকা (১,২৫০ - ১,৭৫০ ডলার)।

গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী স্থাপন — এ জন্য এক ডজনেরও বেশি লাইসেন্স ও অনুমোদন বা পারমিটের প্রয়োজন, যার কিছু প্রতিবছর নবায়নযোগ্য। এদের মধ্যে আছে :

- *ব্যবসা বা ট্রেড লাইসেন্স* — পৌর কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স ও বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন পেতে যে অসংখ্য ধাপ অতিক্রম করতে হয়, সেজন্য প্রায় একবছর সময় লেগে যায়। ব্যবসায়ীকে পুরো জিনিসটি এক সপ্তাহের মধ্যে নিয়ে আসতে ৫,০০০ - ৮,০০০ টাকা (১২৫ - ২০০ ডলার) ঘুষ দিতে হয়।

আলাদা করা হয়েছে। তবুও ডাক ও তার মন্ত্রণালয় বিটিটিবি'র ওপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে, এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় বিটিটিবি'র প্রতি দৃশ্যত পক্ষপাতমূলক। বিভাজন রেখাগুলিও স্পষ্ট নয়। একটি ভাল উদাহরণ হল সেলুলার সার্ভিসের জন্য চলমান দর হাঁকাহাঁকির বিষয়টি। ডাক ও তার মন্ত্রণালয় বাধ্যবাধকতা দিয়ে দিয়েছে যে বিদেশে যে কোনো কল বিটিটিবি'র মাধ্যমে করতে হবে। আন্তঃজেলা কলগুলোও বিটিটিবি'র মাধ্যমে করতে হবে, যদিও বিটিটিবি নিজেই নিজের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে। ডাক ও তার মন্ত্রণালয় আরো চাচ্ছে যে আন্তঃসংযোগ পরীক্ষামূলক "গ্রহণ" বিটিটিবি'র টেস্টিং রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে করতে হবে। অন্য একটি অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) নিয়ন্ত্রক ভূমিকা। এই সংস্থার একচেটিয়া স্বত্ব ব্যবসাখাতকে বেসরকারী করার বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির সংগে সম্পূর্ণ বেমানান। এর ফলে বেসরকারী খাতের পেট্রোলিয়াম কোম্পানীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বর্তমান নিয়মের অধীনে, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর কোনো বেসরকারী আমদানীকারককে আমদানী করার জন্য বিপিসি'র অগ্রিম অনুমতি লাগে। এজন্য আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আজ পর্যন্ত কোনো বেসরকারী খাতের কোম্পানী এই ব্যবসায় ঢুকতে সক্ষম হয়নি (ঘর ৫.২)। এরকম একটি স্বার্থের বিরোধ দেখা দিয়েছে বিমান চালনা শিল্পে, যার উৎপত্তি বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) এবং জাতীয় পতাকাবাহী বিমান-এর মধ্যে বিভাজন রেখাটি অস্পষ্ট হওয়াতে। এর ফলে বেসামরিক বিমান সংস্থা উন্নয়নে গুরুতর সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বল্প পাল্লার উড্ডয়ন ও অবতরণ বা স্টল সার্ভিস প্রবর্তনে বেসরকারী খাতের দু'বছর সময় লেগেছে। এর থেকে আরো বেশি উদ্বেগজনক হচ্ছে সিএএবি'তে বিদ্যমান এই চিন্তাটি যে এর অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে জাতীয় বিমান সংস্থার স্বার্থ রক্ষা করা। এর ফলে একটি নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে এর দক্ষতা অনেকটাই খর্ব হয়েছে। যুক্তরাজ্য মডেলের নিরপেক্ষ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি (OFGAS, OFTELC, OFWAT, ইত্যাদি) প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করে, এবং একই সময়ে তারা যেসব অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলিতে ভোক্তা/গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

৫.১৭ *নিয়ন্ত্রণের বিকৃত প্রভাব* — বর্তমান প্রক্রিয়ায় বেসরকারী খাতের উদ্যোগের ওপর প্রচণ্ড বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এর ফলে ব্যবসার অনিশ্চয়তা ঝুঁকি বাড়ছে, এবং বিলম্ব এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ার উচ্চমূল্যের জন্য অতিরিক্ত খরচ বাড়ছে। উদারনীতি গ্রহণের ফলে লাভের অংশটি সংকুচিত হয়ে আসছে বলে এই খরচ অনেক বেশি অসহনীয় হয়ে উঠছে (ঘর ৫.৩)। গার্মেন্টস তৈরির প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য যেসব লাইসেন্স প্রয়োজন, সেগুলো এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ তুলে ধরে। গত দশকে এই শিল্পের অভাবিত প্রবৃদ্ধির আংশিক কারণ হচ্ছে সরকারের সদয় অবহেলার একটি প্রারম্ভিক নীতি। এখন এই শিল্পটি অসংখ্য প্রবিধান ও নিয়ন্ত্রণের খপ্পরে পড়েছে। একজন নতুন বিনিয়োগকারীকে এখন একডজন মূল লাইসেন্স ও ক্লিয়ারেন্স নিতে হয় (ব্যবসা, আমদানী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, রপ্তানি ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, টেক্সটাইল নিবন্ধন এবং ফ্যাক্টরী নির্মাণ লাইসেন্স, ইত্যাদি)। এর কয়েকটি প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে নবায়ন করতে হয়। ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়ার শ্লথগতি এবং স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতি ব্যবসা ঝুঁকি ও ব্যয় আরো বাড়িয়ে তুলে। কিছু কিছু অনুমোদন একে অন্যের সংগে শর্তসাপেক্ষ, এবং একটি ক্রমধারায় এদের জন্য আবেদন করতে হয় — যা আরো বিলম্ব ঘটায় । এসব লাইসেন্সের প্রায় প্রতিটির জন্য নির্ধারিত দাপ্তরিক ফি থেকে অনেক বেশি টাকা উৎকোচ হিসেবে দিতে হয়। এসব উৎকোচ দিতে হয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। সকল প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পর, এবং কাজ শুরু হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি আরেক সেট নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যার সম্মুখীন হয়, যার একটি বিরাট অংশ কাস্টমস ও কর বিভাগ সংক্রান্ত।[৯]

---

[৯] গার্মেন্টস শিল্পে দুটি নিয়ন্ত্রণকে দক্ষ কার্যপরিচালনার অন্তরায় বলে বিবেচনা করা হয়: প্রথমত, এই বাধ্যবাধকতাটি যে প্রস্তুতকারকরা শুধুমাত্র ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি (ঋণপত্র)'র ভিত্তিতে আমদানী করার অনুমতি পাবেন — এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান নিয়মানুযায়ী তারা যে বিদেশী মুদ্রায় তাদের আয়ের ৫ শতাংশ রেখে দিতে পারেন, তা থেকে টাকা নিয়ে আমদানী চাহিদা মেটাতে তাদের অনুমতি দেয়া হয় না; এবং দ্বিতীয়ত, নিজস্ব ডাইং ও ফিনিশিং সুবিধা না থাকলে গ্রে (অসম্পূর্ণ) কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা। প্রথম নিষেধাজ্ঞা আগের বছরগুলির বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতাকে প্রতিফলিত করে, এবং রপ্তানিকারকদের প্রতিযোগিতামূলক উৎস ও বাজার বহুমুখীকরণ থেকে বঞ্চিত করে। দ্বিতীয় নিষেধাজ্ঞাটি আমদানী উদারকরণের সার্বিক নীতির পরিপন্থী।

- *ফ্যাক্টরী নির্মাণ লাইসেন্স* — যদিও প্রক্রিয়াটিতে এক মাস লাগার কথা, বাস্তবে এতে আরো দীর্ঘ সময় লাগে, এবং ঘুষও এ জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে: যার পরিমাণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য ৫০০ টাকা, ফ্যাক্টরীসমূহের মূখ্য পরিদর্শকের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য ৫,০০০ - ৮,০০০ টাকা (১২৫ - ২০০ ডলার) এবং ফ্যাক্টরী লাইসেন্সের জন্য ৫,০০০ টাকা (১২৫ ডলার)।

একজন গার্মেন্টস রপ্তানিকারকের জন্য আমলাতন্ত্র ও দুর্নীতির কারণে খরচের পরিমাণ (৩১০,৫২০ টাকা বা ৭,৭৬৩ ডলার) একটি ব্যবসা শুরুর জন্য আনুমানিক প্রারম্ভিক সরকারী খরচের (৯১,৬৪০ টাকা বা ২,২৯১ ডলার) ৩৪০ শতাংশ হয়ে দাঁড়ায়। এর সাথে বার্ষিক নবায়ন খরচগুলি যোগ করলে অবৈধ অর্থ প্রদানের পরিমাণ ৭১২% এ উন্নীত হয়।

৫.১৯ নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যাগুলি আরো প্রকট হয়ে দাঁড়ায় অন্যায় বা প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারের কোনো ঘটনা ঘটলে তার দ্রুত নিষ্পত্তির কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে। ভোটারদের কাছে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়ার যে অভাব রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষজন আমলাতান্ত্রিক হয়রানির ঘটনা ঘটলে অসহায় হয়ে পড়েন, সাধারণ নাগরিকরা প্রবিধানসমূহ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য পেতেই অসুবিধায় পড়েন, এগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় তাদের জানা সম্ভব হয় না। নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধানের গোলক ধাঁধায় পথ খুঁজতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সহায়ক ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হন, যাদের অন্য পরিচয় হল 'দালাল'। দাপ্তরিক সহযোগিতা পাওয়ার জন্য ব্যয় সহ একটি ফি-এর বিনিময়ে এসব দালাল প্রয়োজনীয় অনুমোদন যোগাড় করে (ঘর ৫.৪)। চূড়ান্ত ফল হচ্ছে একটি নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি, যা এর উদ্দেশ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিতে উত্তীর্ণ হতে যে শুধু ব্যর্থ হয়, তা নয়, বেসরকারী খাতের জন্যও এটি একটি গুরুতর সমস্যা।

ঘর ৫.৪ : নিয়ন্ত্রণমূলক এবং আমলাতান্ত্রিক গোলক ধাঁধায় পথ খোঁজা

বাংলাদেশে একজন বিনিয়োগকারীকে প্রায়শ প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণ ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য উদ্ভাবক ও তৎপর পদ্ধতির সন্ধান করতে হয়। একমাত্র কার্যকর সমাধানটি হয়ে দাঁড়ায় একজন দালাল অর্থাৎ পেশাদার ঘুষদাতা নিয়োগ করা। যখনই কোনো সরকারী প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, ঐ দালালেরও আবির্ভাব ঘটে। একটা ফি এর বিনিময়ে সে অসংখ্য আইন সম্পর্কিত ফর্ম কিনবে এবং পূরণ করবে, যথাযথ ব্যক্তির কাছে সেগুলো পেশ করবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুমতি বা দলিলপত্র আদায় করবে। সবচেয়ে সহজ যেসব লেনদেন, যেমন বিবাহের লাইসেন্স বা পাসপোর্ট যোগাড় করা, তাতে কয়েক ঘন্টা বা কয়েকদিন বা একযুগ লেগে যেতে পারে: এটি নির্ভর করবে এ জন্য দালাল নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, অথবা তাকে কত দেয়া হয়েছিল, তার ওপর।

এই সহায়তাকারী ব্যবসাটি অবশ্য বিশেষজ্ঞতা-ভিত্তিতে চলে: কোনো কোনো দালাল শুধু কাস্টমস এর বিষয় দেখাশোনা করে; অন্যরা পুলিশের কাজ, রিক্সা বা গাড়ির লাইসেন্স, জনশক্তি রপ্তানি, বিবাহ বা ব্যবসা খোলার বিষয় নিয়ে কাজ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বের করা এত কঠিন যে, এক সরকারী সংস্থা অন্য আরেকটি সরকারী সংস্থা থেকে এরকম কিছু বের করার জন্য দালাল নিয়োগ করেছে, এরকম ঘটনা অশ্রুতপূর্ব নয়।

দালাল কার্যকর হয় এজন্য যে, সে আমলাতান্ত্রিক গোলক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে তার পথটি ভালই চিনে, এবং সর্বোপরি এ জন্য যে, আমলাদের সংগে সে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। প্রভাব বিক্রয়কারী, প্রটোকল বিশেষজ্ঞ ও দালালরা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা হতে পারে। যদি কারো এই সৌভাগ্য হয় যে ঠিক সরকারী দপ্তরটিতে তার একজন বন্ধু আছে, অথবা বন্ধুর বন্ধু আছে, তাহলে দালালের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তবে বন্ধুত্বের রাস্তার চেয়েও দালালের রাস্তা অনেক সময় অনেক বেশি দ্রুত এবং কার্যকর হয়।

দালাল সাধারণতঃ বাংলাদেশের আরেক প্রতিষ্ঠান, 'মাস্তানদের' সাথে, গলায়-গলায় কাজ করে। যদি দালালের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে, সে কাজটি মাস্তান তার হয়ে করে। মাস্তানদের মাফিয়ার মত একটি সহিংস পরিচিতি আছে। তারাও কাজ আদায় করে, তবে এমন এক মূল্যে যা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা আইন শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে, এবং ভাল প্রশাসনের সংগে মৌলিকভাবে তা বিরোধমূলক।

ভাল নিয়ন্ত্রণমূলক ডিজাইনের বৈশিষ্টসমূহ

৫.২০ আজ পর্যন্ত প্রবিধানমূহকে সংহত বা যৌক্তিক করার কোনো পদ্ধতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে সাধারণ নাগরিকেরা প্রতিদিন অসংখ্য বিড়ম্বনার শিকার হন, এবং উদ্যোক্তারা প্রায়শই দেখতে পান যে, বিভিন্ন পর্যায় থেকে অসংখ্য ক্লিয়ারেন্স, অথবা একই সংস্থার বিভিন্ন শাখা থেকে সিদ্ধান্তের বৈধকরণ তাদের যোগাড় করতে হয়। এ সমস্যাটি আরো জটিল হয় নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে কর্তৃত্ব বজায় রাখার দ্বন্দ্বের ফলে। অর্থনৈতিক মূল্য বা সুফলের পদ্ধতিগত মূল্যায়নও অনুপস্থিত।[১০] যেসব সুপ্রণীত প্রবিধান সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত, সেগুলোর সুফল সর্বোচ্চ করা ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারশক্তি বা বন্টনগত দক্ষতার ওপর যে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বনিম্ন করার উদ্দেশ্য হাতে নিতে হবে (ঘর ৫.৫)। নিয়ন্ত্রণ পরিহার নিরুৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তার সাথে কার্যকর প্রয়োগ ও প্রত্যবেক্ষণের প্রশাসনিক খরচ কমিয়ে আনার একটি যুক্তিযুক্ত ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি যথাযথ ডিজাইনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

ঘর ৫.৫ কার্যকর নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারের মৌলিক বিষয়াদি

নতুন পদ্ধতির মূল উপাদানগুলি হল:

- *সবচেয়ে কম অনুপ্রবেশী ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার।*
- *নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা।*
- *সহজ নিয়ম ব্যবহার করা* — যেগুলো সহজে প্রত্যবেক্ষণ করা যায়।
- *কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধান প্রয়োগ করা* — আচরণ নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধানের পরিবর্তে যেগুলো মাঝে মধ্যে শুধু প্রয়োগ করতে হয়। আচরণ নিয়ন্ত্রণ প্রশাসনিকভাবে দুরূহ, এবং এর জন্য বিস্তারিত তথ্য ও নিরন্তর প্রত্যবেক্ষণ প্রয়োজন।
- *নিয়ন্ত্রণ বিকেন্দ্রীকরণ করা* — এটি নিয়ন্ত্রণকে শুধু যে আরো বেশি জবাবদিহিমূলক করে, তাই না, এটি সরকারকে বিভিন্ন পছন্দের মধ্যে তুলনা করতেও সক্ষম করে।
- *নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া* — যাতে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে যোগাযোগ কমে আসে।
- *নিয়মকানুন কমিয়ে আনা এবং সহজ করা* — প্রবিধানসমূহ হওয়া উচিৎ স্বচ্ছ এবং বুঝার জন্য ও প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য সহজ। সকল প্রবিধানেরই নির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ মাপকাঠি থাকা উচিত, যার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এসব মাপকাঠি প্রতিটি কার্যালয়ে — যেখানে নাগরিকেরা নিয়ন্ত্রকদের সংগে দেখা করতে আসেন — টাঙ্গিয়ে দেয়া উচিত।
- ঋজু এবং বিকৃতিমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিবর্তে *প্রতিক্রিয়ামূলক এবং উদ্দীপক নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করা।*
- *মূল্য-সুফল বিশ্লেষণ আবশ্যকীয় করা* — যখন নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক প্রস্তাব রাখা হবে, সরকারী সংস্থাগুলিকে সকল ব্যয় এবং সুফল চিহ্নিত করতে, এবং যেখানে সম্ভব সংখ্যায় প্রকাশ করতে বাধ্য করা উচিত। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ব্যয় এবং একই সাথে বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের ব্যয়কে লাভের বিপরীতে পরিমাপ করা উচিত। এতে ঝুঁকি হ্রাস (ঝুঁকিসমূহের বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর নির্ভর করে) অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধানসমূহকে একই ধরনের পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার অধীনে আনা উচিত।
- *যথাযথ প্রক্রিয়া ও প্রকাশ্য পরামর্শের নিশ্চয়তা দেয়া* — জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নতুন আইন প্রণয়নের একটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা হওয়া উচিত, এবং একই সাথে উন্মুক্ত শুনানিও অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, যাতে তথ্য সরবরাহ করা যায় এবং জনগণের মতামত নেয়া যায়। নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন জানানোর একটি ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

---

[১০] ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করা হয় যা প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল সরকারী কোনো সংস্থার জন্য নতুন প্রবিধান জারির আগে, এবং এ ব্যাপারে আইনগত কোনো বাধা না থাকলে, মূল্য-সুফল (কস্ট বেনিফিট) বিশ্লেষণ পরিচালনা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এই নির্দেশটি গত দু'দশকে জারি করা এ ধরনের অন্যান্য আদেশের সমতুল্য। তবে এ ধরনের নির্দেশ কার্যকর করার সমস্যাটি সম্প্রতি অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট এন্ড বাজেট কর্তৃক পরিচালিত এক বছরের নিরীক্ষায় প্রতিফলিত হয়েছে — আরো কঠোর বিশ্লেষণ কিভাবে আরো বেশি খরচ-সাশ্রয়ী নিয়ন্ত্রণের সৃষ্টি করেছে, তার মাত্র একটি গৌণ উদাহরণ সমীক্ষাটি খুঁজে পেয়েছে।

৫.২১ সরকারী হস্তক্ষেপের, দুটি চরম মডেল রয়েছে। প্রথমটি হল যথেষ্ট নিবিড় নিয়ন্ত্রণ, যার উদাহরণ হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কিছু দেশ। এটি এরকম একটি আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল যে, একটি সঠিকভাবে তৈরি এবং দক্ষ ও পরিশ্রমী নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরিচালিত প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে পারে। এই মডেলের অধীনে যখন নিয়ন্ত্রণসমূহ ব্যর্থ হয়, একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় নিয়ন্ত্রিতদের কাছ থেকে আরো বেশি তথ্য চাওয়া এবং প্রত্যবেক্ষণ ও শাসনের জন্য আরো বিস্তারিত নির্দেশরেখা ইস্যু করা। একেবারে ভিন্ন প্রান্তে আছে দ্বিতীয় মডেলটি, যা একটি বহুলাংশে ভিন্ন পদ্ধতি। এটি নিউজিল্যান্ড গ্রহণ করেছে। তবে বাংলাদেশের মত একটি দেশে, যেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, এবং এর সংগে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতার অপব্যবহারের একটা প্রবণতা রয়েছে, এটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধান কমিয়ে আনার নিউজিল্যান্ড-মডেলের ভিত্তিটি একটি প্রত্যয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, দক্ষ এবং অ-বিকৃতকারী নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধান ব্যবসায়ের জন্য অযথা বিলম্ব ও লেনদেন খরচের কারণ ঘটায় এ রকম বিশাল তথ্যগত আবশ্যকতাকে মোকাবেলা করতে পারে। অ-হস্তক্ষেপমূলক উপায়টি বিরাট সংখ্যক নিয়ন্ত্রকদের নিয়োগ দেয়ার অবসান ঘটায়, এবং তাদের ন্যায়পরায়নতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা গ্রহণেরও ইতি টানে। তা ছাড়া, নিয়ন্ত্রিত স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক সংস্থাসমূহকে 'দখল করার' ঝুঁকিও এতে পরিহার করা যায়।

৫.২২ এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হচ্ছে যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে ছোটখাটো পরিবর্তন এনে নিয়ন্ত্রণকারী গ্রন্থিটি মোচন করার প্রচেষ্টা থেকে প্রতিবন্ধক অথবা অকার্যকর প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণসমূহকে কেটে ফেলে দেয়া অনেক বেশি বিচক্ষণ হবে। এতে শুধু সেসব প্রবিধান রেখে দেয়া যাবে, যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতি উদ্দেশ্যসমূহকে যুক্তিযুক্ত খরচের মধ্যে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করে। এটি করা হয়ে গেলে অবশিষ্ট প্রবিধানগুলিকেও কার্যকরভাবে প্রত্যবেক্ষণ করার জন্য একটি উপায় প্রয়োজন হবে — যা কঠোর শাস্তির বিধান এবং আবেদন করার আইনগত বিধান দ্বারা সমর্থিত হবে। একটি উচ্চ-মানের এবং সু-প্রশাসিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করতে যে সময় লাগে, তার বিবেচনায় বাংলাদেশে এটিই সবচেয়ে ভাল, যদিও আইন ও বিচারগত পদ্ধতির প্রেক্ষিতে উন্নয়ন দ্বারা এটি সমর্থিত হতে হবে। অবশ্য নিরন্তর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে, এবং প্রবিধানসমূহ এবং যেসব সংস্থা সেগুলো প্রয়োগ করে, তাদের নিয়মিত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে, 'নিয়ন্ত্রকদের নিয়ন্ত্রণের' একটি আবশ্যকীয় চাহিদা রয়ে গেছে।

৫.২৩ যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমলারা প্রবিধান তৈরি ও জারি করেন, এবং প্রতিপালন নিশ্চিত করেন, সে প্রক্রিয়াটির উন্নতি বিধান হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কারের অন্যতম প্রতিপাদ্য। এর জন্য প্রয়োজন হবে বিচক্ষণ ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, এবং সর্বোপরি, প্রবিধানসমূহের ব্যবহারিক দিকটি ও তাদের পরিচালনগত নিহিতার্থ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। বর্তমানে যে পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসনিক স্বেচ্ছা-ক্ষমতার ওপর জোর দেয়, সেটি বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে অর্থনৈতিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, পরিবর্তনশীল বাজার অবস্থার সংগে দক্ষতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রাইভেট এজেন্টদের যথেষ্ট নমনীয়তা দেয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তি সহজতর করার জন্য সরকারকে চেষ্টা করতে হবে, এবং জনগণ থেকে এবং পেশাজীবী ও নিরপেক্ষ গবেষকদের কাছ থেকে তাদের চিন্তাভাবনা, মতামত ইত্যাদি উৎসাহিত করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

৫.২৪ চাঁদাবাজি-দুর্নীতির চক্র ভাঙ্গার দুরূহতা বিবেচনা করলে নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের যোগাযোগ সর্বনিম্ন করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য খ্যাতিমান প্রাইভেট এজেন্টদের হাতে নিয়ন্ত্রণকারী দায়-দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনাধীন এরকম একটি উদাহরণ হচ্ছে কাস্টমস্ এর খালাসের জন্য পিএসআই। একই কায়দায়, সরকার উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সার্টিফাইড বেসরকারী ফার্মগুলির সাথে

চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থায় আসতে পারে। ফ্যাক্টরী নির্মাণ মানদণ্ড প্রতিপালন প্রয়োগ করার জন্য; যন্ত্রচালিত যানবাহনের দুষণ মাত্রা পরিদর্শনের জন্য; শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশগত মান প্রত্যবেক্ষণ এবং ব্যবসার জন্য লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য এরকম আয়োজন করা সম্ভব।[১১] এসব চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট মান প্রয়োগে ব্যর্থতার জন্য শাস্তির বিধান থাকবে। চুক্তি ভিত্তিক হস্তান্তরের আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে আয়কর নির্ধারণ। আয়কর বিভাগ খ্যাতিমান হিসাবরক্ষকদের দ্বারা সত্যায়িত কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে পারে। একই সাথে, একটি সমর্থনকারী পদ্ধতি হিসেবে এসব রিটার্ণে একটি এলোপাতাড়ি (ধরা যাক প্রাথমিকভাবে এক তৃতীয়াংশের) হিসাব নিরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে পারে। চুক্তিভিত্তিক হস্তান্তর করা হলে হয়তো তত্ত্বাবধানের সমস্যা সৃষ্টি হবে, তবে এতে অনেক কম সংখ্যক নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন হবে। এই অল্প সংখ্যক নিয়ন্ত্রক উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে পারবেন এবং বেশি বেতনও পেতে পারেন। অন্য একটি সম্ভাবনা হতে পারে নাগরিক দলগুলিকে এবং বিষয়মুখী এনজিওগুলিকে প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত করা—যেমন, যানবাহনের ধোঁয়া উদ্‌গীরণ, অতিরিক্ত স্পীডে গাড়ী চালানো, অননুমোদিত নির্মাণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

৫.২৫ নিয়ন্ত্রণ/প্রবিধান তৈরির একটি কঠিন বিষয় হল নিয়ম-নির্ভর প্রবিধান বনাম স্বেচ্ছা-ক্ষমতামূলক পদ্ধতির ভারসাম্য। যদিও উভয়ের সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে, বাংলাদেশে স্বেচ্ছা-ক্ষমতামূলক প্রবিধানের ভীতিকর অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে, এবং স্বেচ্ছা-ক্ষমতামূলক পদ্ধতির জন্য যে উচ্চমাপের মানুষ প্রয়োজন (যাদের কিছুতেই কোনো প্রলোভনে বিচ্যুত করা যায় না) তাদের তৈরি করার দীর্ঘ সময়সাপেক্ষতার বিবেচনায়, নিয়ম-নির্ভর পদ্ধতিটিই গ্রহণযোগ্য। অবশ্য, একই সময়ে, নাগরিকদের বিধিবিধান থেকে ছাড় পাওয়ার জন্য দ্রুত প্রতিকারমূলক পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.২৬ প্রবিধানসমূহের পর্যালোচনা এবং সুসংহত করার জন্য বাংলাদেশের **একটি সুসমন্বিত কর্মসূচি প্রয়োজন**। এ ধরনের যেকোনো উদ্যোগে নিচের উপাদানগুলি থাকতে হবে:

- ***একটি সুসমন্বিত বি-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করা*** — এটি একটি ডিরেগুলেশন বা বি-নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্থাপনের মধ্য দিয়ে সম্ভব, যে কমিশনে সরকারী কর্মকর্তা, বেসরকারী খাতের স্বার্থসমূহ, এবং কারিগরী বিশেষজ্ঞরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এ ধরনের উদ্যোগের নানা দেশ-ভিত্তিক উদাহরণ ঘর ৫.৬ ও ৫.৭ এ দেয়া হয়েছে। বি-নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ বাস্তবায়ন এবং দক্ষতা ইউনিট ও কমিশন অন রিফোকাসিং গভর্নমেন্ট (CRRG)'র কাজের সাথে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করার জন্য বিনিয়ন্ত্রণের কাজ CRRG'র পরিধির মধ্যে নিয়ে আসা কাম্য হতে পারে। সম্ভব হলে বি-নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে CRRG 'র অধীনে একটি উপ-কমিশন হিসেবে রূপান্তরিত করা যায়। বি-নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বা উপ-কমিশন) মূল্য-সুফল বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনের ব্যয় নির্ধারণ, এবং বিদ্যমান প্রবিধানসমূহ পর্যালোচনা, সংশোধন বা বিলোপ করার জন্য উন্মুক্ত শুনানিসহ কারিগরী পর্যালোচনার একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে। *প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন জীবন প্রভাবিত করে যে সব প্রবিধান, সেগুলো পর্যালোচনা করা।*

---

[১১] বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক শুরু হয় যখন ফেডারেশন অফ চেম্বারস অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করার সুপারিশ জানায়। এগুলো আদায় করা ব্যবসার হয়রানিগুলির একটি বড় কারণ, বিশেষ করে শহুরে কেন্দ্রগুলিতে চালু হাজার হাজার ছোট দোকানের মত ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য।

ঘর ৫.৬ দেশে দেশে বি-নিয়ন্ত্রণ

প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণের বিধ্বংসকারী প্রভাব এবং 'আরো কম সরকার' এর জোর গণদাবীর মুখে বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার হাতে নিয়েছে।

- *ব্রাজিল* — ব্রাজিল একটি ফেডারেল ডি-রেগুলেশন (বিনিয়ন্ত্রণ) কমিশন স্থাপন করেছে, যে কমিশনটি প্রজাতন্ত্রের শুরু থেকে এ পর্যন্ত জারি করা ১২৭,০০০ টি ডিক্রীর মধ্যে ১১২,০০০ টি ডিক্রী প্রত্যাহার করতে সক্ষম হয়েছে। কমিশনটি আলাদা আলাদা মন্ত্রণালয়ের বি-নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড প্রত্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করে, যার মধ্যে আছে : বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা; দেশে ও বিদেশে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারের ওপর কড়াকড়ি তুলে নেয়া; এবং দেশের একক খুচরা দাম কাঠামো দূর করা। আরো সম্প্রতি (জুন, ১৯৯৫), সরকার টেলিযোগাযোগ ও পেট্রোলিয়াম খাতকে বি-নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

- *তুরস্ক* — দেশটি সম্প্রতি একটি শ্রেণীবদ্ধকরণ কর্মসূচি সম্পূর্ণ করেছে, যা ১,৬০০ আইন বাতিল করেছে এবং অন্য ১২,০০০ আইনকে মাত্র ৭০০ টিতে সংহত করেছে।

- *জাপান* — এপ্রিল, ১৯৯৫ তে জাপান তার পাঁচ বছরের ডি-রেগুলেশন এ্যাকশন প্রোগ্রাম শুরু করে, যার লক্ষ্য ২০০০ সালের মধ্যে শতশত সরকারী প্রবিধান বাতিল বা পর্যালোচনা করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অসংখ্য প্রবিধান পরিবর্তন করা, যাতে শিপিং কন্টেইনার ও সতর্ককারী লেবেল সংক্রান্ত নিয়মাবলী আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হয়। এসব নিয়মের একটি উদাহরণ হল কেউ যদি একটি ক্যাম্পার বা ভ্রাম্যমান ঘর (মোবাইল হোম) নিবন্ধন করতে চায়, তাহলে তাকে প্রমাণ দাখিল করা যে তার ঘরের কাছে গাড়ি পার্কিং এর জায়গা আছে। জাপানের সর্ববৃহৎ ব্যবসায় সমিতি কেইদানরেন-এর একজন কর্মকর্তার বক্তব্য হচ্ছে "বি-নিয়ন্ত্রণ একটি চলমান প্রক্রিয়া .... আমাদের লক্ষ্য ছিল যত বেশি সংখ্যক সম্ভব প্রবিধান তালিকাবদ্ধ করা, ও তারপর সেগুলো অর্জনের জন্য চাপ অব্যাহত রাখা।"

- *ভারত* — ভারত নির্বাচিত কিছু ক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রস্তুত করার জন্য নাগরিক ও শিক্ষাজীবীদের থেকে ওয়াকিবহাল সদস্য নিয়ে বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি স্থাপন করেছে। গত চার বছরে এসব ক্ষেত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল ব্যাংকিং খাত, রুগ্ন শিল্প, বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং অবকাঠামো। এ সবগুলি কমিটি সক্রিয় ভাবে জনগণের মতামত আহ্বান করে।

- *যুক্তরাজ্য* — ডি-রেগুলেশন এন্ড কন্ট্রাকটিং আউট (বি-নিয়ন্ত্রণ ও ঠিকাভিত্তিক কার্য হস্তান্তর) বিলের অধীনে নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বস্তিলাভের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসার ওপর প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নগত বোঝা কমানো বা সহজ করা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসার— যেখানে এসবের প্রভাব অসামঞ্জস্যমূলকভাবেই বেশি। ব্যবসায়ীদের সহায়তায় টাস্ক ফোর্সটি কোম্পানী সমূহের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ৩,৫০০ প্রবিধান পর্যালোচনা করছে।

- *যুক্তরাষ্ট্র* — বি-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে (অথবা গ্রহণ করা হচ্ছে)।

  – ***নিয়ন্ত্রণমূলক অন্তবর্তীকালীন (ট্রানজিশন) আইন***: এটি সকল নতুন প্রবিধানের ওপর এক বছরের একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।
  – ***নিয়ন্ত্রণমূলক পর্যালোচনা আইন*** : এ আইনে কংগ্রেসকে যে কোনো নতুন প্রবিধানে ভেটো দেয়ার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।
  – ***নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্কার*** : এটি ১০ কোটি ডলারের বেশি অর্থনৈতিক অভিঘাত রয়েছে এমন সকল প্রবিধানের ওপর প্রতি সাত বছরে পুনঃঅনুমোদিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে।

– *ফাইলের কাজ (পেপারওয়ার্ক) কমানোর লক্ষ্যে আইন সংশোধন* : এতে বাজেট অফিসকে নতুন কোনো প্রবিধানের বোঝা পরিমাপ করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং ফাইলের কাজ কমানোর জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুমতি দেয়া হয়েছে।
– *নিয়ন্ত্রণমূলক নমনীয়তা আইন সংশোধন* : ক্ষুদ্র ব্যবসার ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক বোঝা লাঘব করে।
– *OSHA 'র আমূল সংস্কার* : এটি কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রশাসনের (OSHA) আইনগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপাত্তের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা বাধ্যতামূলক করে, এবং যেসব ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মান নেই, সেসব ক্ষেত্রে জরিমানা/শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করে। প্রতিনিধি পরিষদ বিল মূল্য-সুবিধা বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করেছে।

- প্রবিধানসমূহের হিসাব রাখার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্টারের অফিসের অনুরূপ ***একটি ক্লিয়ারিং হাউস তৈরি করা***। একটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই অফিস একটি সুসমন্বিত ডকুমেন্টেশন তৈরি করবে, যা এক জায়গায় সকল আইন, প্রবিধান, এসআরও (সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণমূলক অর্ডার) এবং প্রশাসনিক অর্ডারসমসূহকে সন্নিবেশিত করবে — যেগুলোর মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনৈতিক এজেন্টদের সংগে মিথষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। এই ডকুমেন্ট বা দলিলটি পরবর্তিতে মাসে একবার হালনাগাদ করতে হবে।

- ***নিয়ম প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা*** — শুধুমাত্র জরুরী অবস্থা এবং কয়েকটি ফৌজদারী বিষয় ব্যতিরেকে প্রকাশ্য শুনানি ছাড়া কোনো নিয়মবিধি জারি না করার এবং নিয়মবিধি চূড়ান্ত করার যথেষ্ট আগে প্রধান সংবাদপত্রসমূহে খসড়া নিয়মবিধি মুদ্রণ করার বাধ্যবাধকতাসহ একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা।

- ***নিয়ন্ত্রক ও নিয়ন্ত্রিতের মধ্যে যোগাযোগ সর্বনিম্ন করার জন্য*** নাগরিক দলসমূহ, এনজিও এবং খ্যাতিমান প্রাইভেট ফার্মের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রবর্তী কর্মসূচি হাতে নেয়া।

  আইন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং প্রতিকারের অন্যান্য উপায় চালু করা, যেমন ন্যায়পালের অফিস স্থাপন।

- অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ এবং একচেটিয়া খাতের জন্য একটি নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি স্থাপন করা, যা এসব ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের প্রবেশ উৎসাহিত করবে, প্রতিযোগিতা বাড়াবে এবং উৎপাদনকারী ও ভোক্তা/গ্রাহকের স্বার্থে ভারসাম্য আনবে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকার দাতাদের সংগে কাজ করছে, তবে কাজটি ত্বরান্বিত করতে হবে।

আইনগত অচলাবস্থা

"আমার শুধু দু'বারই সর্বনাশ হয়েছিল: একবার যখন এক মোকদ্দমায় আমি হেরে যাই, আর অন্যবার যখন জিতে যাই।" (ভোলতেয়ার)

৫.২৭ বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা জনগণের চাহিদা যেমন মেটায় না তেমনি লেনদেনগত দক্ষতার একটি পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যও তা সহায়ক নয়। আইন প্রণয়ন সেকেলে এবং প্রক্রিয়াটিও দুর্বল; পদ্ধতিগুলি ঝামেলাপূর্ণ; উচ্চতর বিচারকবর্গ প্রত্যবেক্ষণ করেন খুবই কম, আদালতের সুযোগ সুবিধাও অপ্রতুল; এবং সু-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিচারক ও আইন অফিসারদের সংখ্যাও কম। আইন শিক্ষা পদ্ধতির মান ও বিষয়বস্তু

আরো উন্নত হতে পারতো। বিচার প্রশিক্ষণ সুযোগ-সুবিধাও অপ্রতুল। এসবের ফলে বিচারের রায় পেতে অযাচিত দীর্ঘ সময় লেগে যায় — তুলনামূলকভাবে সহজ এবং ছোটখাটো মামলার ক্ষেত্রেও যুগ যুগ লেগে যেতে পারে (ঘর ৫.৭)। আদালতের উপর মানুষের আস্থাও সঙ্গত কারণেই কম, এবং আদালত ব্যবহারের খরচও প্রচুর। এ জন্য বাদী বিবাদী পক্ষ প্রায়শই বিবাদ-বিসংবাদ আদালতের বিচারের জন্য পেশ করতে উৎসাহী হয় না, এবং বড় রকমের ক্ষতি মেনে নিয়ে বৈধ দাবীও ছেড়ে দেয়। এর ফলে বিচার পাওয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক উপায়গুলির সাহায্য নেয়া বেড়েছে; কিন্তু এ পদ্ধতিটি যাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে, তাদের পক্ষেই যায়।[১২]

৫.২৮ বিচারকার্যে বিলম্ব শুধু যে আদালতগুলির অতিরিক্ত বোঝার জন্য হয়, তা নয়, বরং এজন্য যে উচ্চ আদালত নিম্ন-আদালতগুলোর তত্ত্বাবধান ঠিকমত করতে পারে না। উচ্চ আদালতকে এটি নিশ্চিত করতে হবে যে, নিম্ন আদালতগুলি যাতে ঐসব আইনজীবীকে আর্থিক জরিমানা করে যারা শুনানীর মুলতবীর পর মুলতবী আদায় করে মামলা দীর্ঘায়িত করেন। যে সমস্ত উকিল আদালতে তাদের হাজিরার ওপর পয়সা পান তাদের জন্য এটি বিরাট এক প্রলোভন। সিভিল প্রসিজিউর কোড (১৯০৮) এ ধরনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিচারপতিদের ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্তু তারা কদাচিৎ এমনটি করেন। সময় ক্ষেপণের আরেকটি উপায় হল যথেচ্ছা আদালতের ইনজাংশন জারি। আদালতগুলি এ বিষয়টি ভেবে দেখে না যে, যে পক্ষ ইনজাংশন চাইছে, তার কোনো প্রাইমা ফেসি (দৃশ্যত সঠিক) কেইস আছে কি না। প্রচলিত রেওয়াজ হল, সন্দেহ হলে কেইস গ্রহণ করাই উচিত।

---

[১২] এটি 'মাস্তান'দের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। মাস্তানরা টাকার বিনিময়ে সুরক্ষা দেয়, এবং সংঘবদ্ধ চাঁদাবাজি চালায়। কোনো কোনো সময় ব্যবসায়ীরা তাদের পুলিশী কাজ করার জন্য টাকা দিয়ে নিয়োগ করে। বাড়ির মালিকরা তাদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করতে সাধারণত ভাড়া করা এই পেশীশক্তির ওপর নির্ভর করে। আইনানুগ উপায়ে ভাড়াটিয়া (ভাড়া আইন, ১৯০৫ দ্বারা সুরক্ষিত) উচ্ছেদ করা অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ করে যারা হয়তো কয়েক দশক আগে ঠিক করা হারে ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

৫.২৯ এ ধরনের বিচারগত অদক্ষতার জন্য ব্যবসায়ী লেনদেন চালানো, সম্পদ ও পরিসম্পৎ অর্জন অথবা অনাদায়ী অর্থ আদায় দুরূহ হয়ে পড়ে।[১৩] বিদেশী ও দেশী — উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানই চুক্তি প্রয়োগে আদালতগুলোর ধীরগতি এবং আদালত কী করবে আগে থেকে তা বলার অসম্ভবতার জন্য নিরুৎসাহিত বোধ করে।[১৪,১৫]

ঘর ৫.৭ : স্টক-লট নিয়ে সতেরো বছরের আইনযুদ্ধ

বাংলাদেশের আমদানী নীতি আদেশ "পুরোনো, সেকেন্ড হ্যান্ড ও রিকন্ডিশন্ড সামগ্রী, ফ্যাক্টরী কর্তৃক পরিত্যাক্ত সামগ্রী, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর/নিম্নমানের যব-লট, স্টক-লট সামগ্রী" আমদানী নিষিদ্ধ করেছে। এই বিশেষ নিয়মটি অবশ্য "স্টক-লট"এর মত বর্ণনার অস্পষ্টতার জন্য কাস্টমস্ কর্মকর্তাদের প্রায় সীমাহীন নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা দিয়েছে। এই ক্ষতিকারক শব্দগুলির আপাত দৃষ্টিতে কোনো প্রমিত সংজ্ঞা নেই। এই প্রবিধানের অস্বচ্ছতা এবং স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এক আইনযুদ্ধের কাহিনী এখানে বর্ণিত হল।

১ *১৯৭৮ সালের প্রথম দিকে* — সাতটি স্টিল রি-রোলিং মিলস্-এর মালিকরা একত্র হয়ে বৃটিশ স্টিল কর্পোরেশন (বিএসসি) কর্তৃক প্রস্তুত ২,৯০০ মেট্রিক টন মাইল্ড-স্টিল বিলেট আমদানী করেন (প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যে)।

২ *১৯৭৮ সালের শেষ দিকে* — বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট আমদানীকারকদের অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও কালেক্টর তাদের ১৯৬৯ এর শুল্ক আইনের ১৬ ও ৩২ ধারা ভঙ্গের জন্য দায়ী করলেন, এবং অন্যান্য অনেকগুলির মধ্যে এই অভিযোগ করলেন যে, বিলেটের এই চালানটি ছিল 'স্টক-লট-মানের'; এর উপরিভাগ ছিল মরিচা পড়া এবং এবড়ো-থেবড়ো। কাজেই কালেক্টরের মতানুযায়ী, এই চালানটি আমদানীর অযোগ্য।

৩ *১৯৭৯ এর প্রথম ও মাঝামাঝি* — কাস্টমস হাউজে শুনানির সময় বিষয়টি পরিষ্কার হল যে মরিচা পড়েছে চালানটি খোলা আকাশের নিচে মজুদ করার জন্য। ইস্পাতের অন্তর্নিহিত মান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল। তবুও কালেক্টর আমদানীকারকদের অনেকগুলি আইন লংঘনের জন্য অভিযুক্ত করলেন, এবং শুধু যে চালানটি বাজেয়াপ্ত করলেন, তা-ই নয়, ডিউটি ও করের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত জরিমানা হিসেবে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ধার্য করলেন।

৪ *১৯৮০ এর প্রথম দিক* — আমদানীকারকরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আপিল করলেন, এবং বন্দরের ঘাটে বকেয়া ভাড়ার পাহাড় যাতে না জমে যায়, সেজন্য ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে চালানটি খালাস করে দেয়ার অনুরোধ জানালেন। দুটো আপিলই বাতিল হয়ে গেল।

---

১৩ কোনো কোনো খাতে আইনগত কাঠামোর অপর্যাপ্ততা বাজারের অকার্যকর কর্মতৎপরতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক খাতে আইনগত দুর্বলতার জন্য: ঋণ আদায়ের সমস্যা দেখা দেয়; ঋণ প্রাপ্তিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং বন্ধকের বিনিময়ে দেয়া ঋণ-পদ্ধতিতে পরিধি সংকুচিত হয়।

১৪ দেখুন : 'পলিসি, রেগুলেটরি এন্ড ইনসেনটিভ রেজিম্স্ এফেক্টিং প্রাইভেট ফরেন এন্ড ডমেস্টিক ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ,' ফরেন ইনভেস্টমেন্ট এডভাইজরি সার্ভিস (এফআইএএস), আইএফসি/ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ওয়াশিংটন ডিসি, নভেম্বর, ১৯৯২।

১৫ বিচার পদ্ধতি নিয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারী সম্প্রদায়ের উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছিল বিদেশী ফার্মগুলোর সাথে কয়েকটি বড় আকারের জয়েন্ট-ভেঞ্চার প্রকল্পের চুক্তি সম্পর্কে সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে — এই ফার্মগুলির মধ্যে আছে সিমিটার (তেল অনুসন্ধান), কাফকো (সার), এবং সাইপেম (গ্যাস পাইপলাইন)।

৫. *১৯৮০-৮৫ সালের মধ্যে* — আমদানীকারকরা শুল্ক আইনের ১৯৬ ধারা মতে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানালেন, এবং ঘাটের ভাড়া যাতে জমতে না থাকে — যা ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে — সেজন্য পুনর্বার চালানটি খালাসের অনুরোধ জানালেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিষয়টি নিয়ে কোনো উচ্চ-বাচ্য করল না। তবে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ যখন পরীক্ষা করে দেখা হল, যার মধ্যে বিএসসি ও অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা রিপোর্টও ছিল, এটি প্রত্যয়ন করা হল যে, ইস্পাত আসলেই সর্বোচ্চ মানের, আমদানী-অযোগ্য 'স্টক-লট' নয়। এর ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাজেয়াপ্ত আদেশ বাতিল করল, এবং জরিমানা ১ কোটি ৩৬ লক্ষ থেকে কমিয়ে নামমাত্র ৪,৩০০ টাকায় নির্ধারণ করল। তবে আমদানীকারকরা অনুধাবন করলেন যে, ঐ নামমাত্র জরিমানা মেনে নেয়ার অর্থ হবে যে, তারা অপরাধ স্বীকার করছেন — যার ফলে পরবর্তীতে উদ্ভূত দায়-দেনার জন্য তাদের দায়ী করা হবে, এবং ঘাট ভাড়া ও ডেমারেজ-এর বিশাল চার্জ তাদের ঘাড়ে ফেলা হবে।

৬. *১৯৮৬ সালের মধ্যে* — সকল প্রশাসনিক প্রতিকারের উপায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর আমদানীকারকরা সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে একটি রিট আবেদন পেশ করেন। শুনানী শেষ হতে ৯ বছর লেগে যায়। ইতোমধ্যে, ১৯৯২ সালে আমদানীকারকরা 'প্রতিবাদ জানিয়ে' ঐ নামমাত্র জরিমানা দিয়ে মাল খালাস করে নিয়েছিলেন, এবং ঘাট ভাড়া বাবদ ১ কোটি টাকা জমা দিয়েছিলেন।

৭. *১৯৯৪ সালের শেষের দিকে* — সুপ্রীম কোর্ট কালেক্টরেট এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলি বাতিল করে দেয়, এবং মত পোষণ করে যে, "... আদেশসমূহ সংবিধি মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যমূলক ছিল না, বরং কোনো সিদ্ধান্তের সমর্থনে জারি করা হয়েছিল; কাজেই আমরা আদেশসমূহকে নাকচ করে দিচ্ছি .... এবং এর কোনো আইনগত প্রভাব নেই বলে ঘোষণা করছি।" তবে আদালত আমদানীকারকদের খরচ বাবদ মাত্র ৫,০০০ টাকা দেয়ার আদেশ দেন — অথচ মামলার খরচ দাঁড়িয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা, ঘাট ভাড়া ১ কোটি টাকা, চুরি থেকে ক্ষতি ৪০ লাখ এবং জমা হওয়া সুদ বাবদ খরচ (১৪ বছরে) ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

৮. যদি আমদানীকারকরা ক্ষতিপূরণ দাবী করেন, তাহলে আদালতে তার নিস্পত্তি হতে অনন্তকাল লেগে যেতে পারে।

৫.৩০ **বিচার ব্যবস্থা এবং বাধাসমূহ** — বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা চারটি বিচার প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গঠিত: সুপ্রীম কোর্ট, নিম্ন আদালতসমূহ, ম্যাজিস্ট্রেসি এবং প্রশাসনিক ট্রাইবুনালসমূহ (যেগুলোর এখতিয়ার প্রধানত বেসামরিক প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি)। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের এ্যাপেলেট ও হাইকোর্ট বিভাগে ৩৮ জন বিচারপতি রয়েছেন, এবং এটিই হচ্ছে সর্বশেষ আদালত ও একই সংগে সমগ্র বিচার ব্যবস্থার (শুধু ম্যাজিস্ট্রেসি ছাড়া) প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়ক।[১৬] প্রতিটি জেলায় একজন জেলা ও সেশন জজসহ একটি আদালত আছে, এবং এর বাইরে অতিরিক্ত জেলা ও সেশন জজরাও রয়েছেন। এই পদ্ধতির নিচের দিকে অসংখ্য অধঃস্তন এবং সহকারী জজ রয়েছেন, যাদের একই সংগে ব্যবসায়ী আদালত এবং অর্থঋণ আদালত হিসেবে ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অনাদায়ের জন্য মামলা করলে সেগুলো নিস্পত্তির জন্য এসব আদালতের বিশেষ প্রক্রিয়া রয়েছে।

---

[১৬] বাকী বিচার ব্যবস্থার তুলনায় সুপ্রীম কোর্টকে সাধারণত পেশাদারিত্ব ও সততার শেষ দুর্গ হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। এর প্রতিফলন ঘটে যখন দেশে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়, তখন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের হাতে ন্যস্ত হয়।

ঘর ৫.৮: আদালতের দুর্বলতার জন্য আইন প্রণয়ন কিভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে

অতীতে ঋণ গ্রহীতাদের জন্য ঋণখেলাপী হওয়াটা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। আইনগত কাঠামোর দুর্বলতা, এবং একই সাথে অত্যধিক মামলার চাপে ভারাক্রান্ত আদালতের জন্য আইন প্রয়োগ কঠিন হয়ে পড়ত, এবং ঋণ ফেরত না দেয়ার সংস্কৃতিকে তা উৎসাহিত করত। সরকার ব্যাঙ্কিং খাতে অনাদায়ী ঋণের বিশাল বহর দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ১৯৯০ সালে অর্থঋণ আদালত আইন জারি করে। এই আইনের অধীনে ২১টি জেলা শহরে অধঃস্তন বিচারকদের অধীনে ঋণ আদালত চালু হয়। এসব আদালতে ঋণ মামলা দায়েরের ছয় মাসের মধ্যে তাদের নিষ্পত্তি হওয়ার কথা। এই আইন তিনবারের বেশি মুলতবির, এবং উচ্চ আদালতে দু'বারের বেশি আপিলের সুযোগ রহিত করে।

তবে বাস্তবে আইনটি মোটামুটি অকার্যকরই প্রমাণিত হয়েছে। এটি অংশত ভারাক্রান্ত বিচার ব্যবস্থার পুরোনো সমস্যার জন্য — ঋণ আদালতের বিচারকরা কাজের চাপে নুয়ে পড়েন, যেহেতু তারা বেসামরিক এবং প্রশাসনিক বিষয়ের দায়িত্বে আছেন। এসব সমস্যা আরো প্রকট হয় প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে — বিচারকরা পেশ করা সাক্ষ্য প্রমাণই শুধু গ্রহণ করেন ; মামলা তালিকাভুক্ত করারও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই; এবং আদালত সহকারীরা যারা মামলার তারিখ নির্ধারণ দেখাশোনা করেন, তাদেরও অগ্রাধিকার জ্ঞান তেমন একটা নেই।

তবে অর্থঋণ আদালতের একটি গুরুতর সমস্যা হচ্ছে এই যে, ডিক্রী নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে সাধারণ সিভিল কোড পদ্ধতি অনুযায়ী, যার অর্থ হচ্ছে এই যে, একটি আলাদা আবেদন পেশ করতে হয়, এবং প্রক্রিয়াটি নতুন করে আবার শুরু করতে হয়। সিভিল পদ্ধতি কোডের অধীনে অবশ্য হুন্ডি বা বরাত-চিঠি, প্রত্যর্থপত্র, অনানুষ্ঠানিক ঋণপত্র (হুন্ডি), জামানত দলিলাদি অথবা অন্যান্য বিনিময়ের মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত (বিলম্ববর্জিত) রায় প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়াটি প্রচলিত নয়। শুধুমাত্র, যদি ঋণ গ্রহণকারী বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয় উত্থাপন করেন, তাহলে আদালত সাধারণত তা আমলে নেয়।

ঋণ আদায় সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্বের পেছনে আরো দুটি কারণ রয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে এই যে, যে সকল বিচারককে ঋণ আদালতে নিয়োগ দেয়া হয়, তাদের ব্যবসায়িক ও আর্থিক বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা থাকেনা। সেজন্য তারা এমন সব বিষয় বিবেচনায় আনেন, যেগুলো সু-প্রশিক্ষিত বিচারকরা হয়তো আনতেন না। উদাহরণস্বরূপ, তারা হয়তো ঋণ গ্রহণকারীর এই যুক্তিটি বিবেচনায় আনবেন যে ব্যাংক আরো ঋণ না দেয়ায় তার ক্ষতি হয়েছে — যদিও এটি মূল বিষয়ের সংগে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। ঋণ আদায় মামলাটি আটকে না রেখে এ বিষয়টি আলাদাভাবে নিষ্পত্তি করা উচিত। বিলম্বের অন্য কারণটি হচ্ছে এই যে, ব্যাংকগুলির আইনজীবীদের আদালতে হাজিরার ভিত্তিতে ফি দেয়া হয়ে থাকে; এতে আইনজীবীরা মুলতবীর পৌনঃপুনিক অনুরোধে সানন্দে সাড়া দেন, এবং ঋণ খেলাপীর উকিলদের মামলা বিলম্বিত করার অন্যান্য কৌশলের প্রতিও সমর্থন দেন।

৫.৩১ বিচার ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে আছে বিচার বিভাগ ও নির্বাহী শাখার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের অভাব,[১৭] এবং বিচার বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার বিষয়ে সন্দেহ। তবে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সম্পর্কেও উদ্বেগ রয়েছে।[১৮] নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির দেখাশোনা করে মন্ত্রণালয়, হাই কোর্টের বিচারকবৃন্দ নন। আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় পুরো বিচার বিভাগের জন্য বাজেট প্রণয়ন করে, এবং অধঃস্তন আদালত ও আইন কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ড ও তাদের প্রশিক্ষণ তদারকী করে। তাছাড়া নিম্ন পর্যায়ে আদালতের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

---

১৭ নির্বাহী শাখা থেকে বিচার বিভাগের সুস্পষ্ট পৃথকীকরণ অনুপস্থিত, এবং বিচার বিভাগের নিয়োগদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, যেমন রয়েছে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সম্পর্কে। এই মন্ত্রণালয়ই পুরো বিচার বিভাগের জন্য বাজেট তৈরি ও প্রত্যবেক্ষণ করে থাকে।

১৮ সংবিধানের ৯৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দিয়ে থাকলেও প্রধান বিচারপতির সংগে পরামর্শের বিধানটি রয়েছে।

৫.৩২ সরকার কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছে। ১৯৯৪ সালে এ লক্ষ্যে একটি আইন সংস্কার কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এ কমিশন এখনও কাজ শুরু করেনি, এবং শুরু করলেও এর বিচার্য বিষয়ে ব্যবসায় আইন অন্তর্ভুক্ত হবে না। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যবসা আইন স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকে চলে আসছে, এবং প্রায় ক্ষেত্রেই এসব আইন বর্তমান ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ডের সংগে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।[১৯,২০] উদাহরণস্বরূপ, শোধাক্ষমতা (insolvency) আইন শুধুমাত্র দেউলিয়া হওয়া ঘটনাগুলিতে প্রযোজ্য; এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত চ্যাপ্টার ১১ ধরনের আর্থিক পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে এ আইনের সাহায্য পাওয়া যাবে না, যদিও তা লাভজনক ব্যবসাকে ত্রাণ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতে পারত। একই রকম ভাবে ১৮৭৩ সালের প্রণীত একটি আইনের উপর ভিত্তি করা বাংলাদেশ ডাক ও তার আইন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সংগে তাল মেলাতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই, এতে সেলুলার ফোন সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থার কথা নেই। তবে সাম্প্রতিক আইনেরও পরিমার্জনা প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রণীত সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন রাষ্ট্রকে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা দিয়েছে এবং বড় আকারের অপব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ ব্যবসায় আইনের মধ্যে আছে প্যাটেন্ট সংক্রান্ত আইনসমূহ, বুদ্ধিভিত্তিক পরিসম্পদ (ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি), ভূমি নিবন্ধন এবং শুল্ক ও ট্যারিফ সংক্রান্ত আইন- সমূহ। ত্রুটিপূর্ণ আইন প্রণয়নের জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হয়। আদালতগুলির সামনে যত মামলা আছে, তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা, যার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রায়শ ভূমি সম্পদ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নে ত্রুটি বিচ্যুতি দায়ী (যেমন ১৮৮২ সালের ভূমি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ সালের স্ট্যাম্প আইন এবং ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন)।[২১]

৫.৩৩ আদালতে মামলার বোঝা নিয়ে খুব কমই দৃষ্টি দেয়া হয়। বিচার বিভাগের বাজেট বরাদ্দ হচ্ছে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা (১৯৯২/৯৩) এবং এটি বাংলাদেশ সরকারের পুরো ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত ক্ষেত্রগুলির একটি। ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মামলার মোকাবেলা করার জন্য বিচার বিভাগের আর্থিক ও মানব সম্পদ একেবারেই অপ্রতুল। ঝুলে থাকা বহু সংখ্যক মামলা শুধু যে নিষ্পত্তির ধীরগতিই প্রতিফলিত করে তাই নয়, বরং মামলা যারা করেন তাদের একটি প্রবণতাকেও তুলে ধরে — যেটি হচ্ছে এমন সব বিষয় নিয়ে আদালতে যাওয়া যা অন্যান্য দেশে বিকল্প সংঘাত নিরসন ব্যবস্থায় নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এই সমস্যাটির ব্যাপকতা বোঝা যায় যদি কিছু পরিসংখ্যানের দিকে আমরা দৃষ্টি দেই। বর্তমানে সমগ্র বিচার বিভাগে (ম্যাজিস্ট্রেসি ও ট্রাইবুনালগুলি ছাড়া) ৫০০,০০০ মামলা বিচারের জন্য অপেক্ষমান, যার ৪০,০০০ হাই কোর্টে। এসব মামলা সুপ্রীম কোর্টের ৩৫ জন বিচারপতি ও ৬৭৭ জন অধঃস্তন বিচারককে নিষ্পত্তি করতে হবে। অতিরিক্ত কাজের চাপে বিচারকরা মামলাগুলি ভালভাবে পর্যালোচনা না করতে পারলে শুনানি মুলতবী করে দেন, যাতে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের ভারগ্রস্ত করার ফলে তাদের নিম্ন আদালতসমূহের তদারকী কাজও শিথিল হয় — অথচ বেশির ভাগ বিচার নিষ্পত্তি হয় এসব আদালতসমূহেই। অংশত এই শিথিল তদারকীর জন্য, এবং অংশত নিম্ন আদালতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিচু মানের জন্য অধিকাংশ নাগরিক যে বিচার লাভ করেন, তার মান ও সময়ানুবর্তিতা খুবই খারাপ।

---

[১৯] কোম্পানী আইনে এবং ব্যাংক ও নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসন সংক্রান্ত আইনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এসব পরিবর্তন আইনসমূহ হালনাগাদ করা ও তাদের স্বচ্ছতা বাড়ানো সংক্রান্ত। নতুন কোম্পানী আইন (১৯৯৪) ১৯৯৩ এর কোম্পানী আইনের ওপর ভিত্তি করা, এবং এতে পরিবর্তিত ব্যবসা বাণিজ্য ও কর্পোরেট পরিবেশের চাহিদা প্রতিফলিত হয়েছে।

[২০] সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ খাতের সংস্কার প্রকল্পের অধীনে একটি নতুন দেউলিয়া আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

[২১] জমি-মালিকানার জাল দলিল একটি সাধারণ ব্যাপার, এবং সম্পত্তি বন্ধকী, লিয়েন (ঋণ পরিশোধ পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতার জমি-মালিকানা) ও এনকামব্রেন্স (দায়-দায়িত্ব) পরিহারের প্রবণতা উচ্চ, যেহেতু এসবের নিবন্ধন খরচ প্রচুর। বেশির ভাগ জমি সংক্রান্ত বিরোধের সূত্রপাত হয় ভূমি রেকর্ডের ত্রুটিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।

৫.৩৪ আদালত সমূহে অপর্যাপ্ত ভৌত সুবিধাদির, যেমন স্থান ও অফিস যন্ত্রপাতির অসুবিধা, এবং কাজের অনুকূল পরিবেশের অভাব তাদের যথাযথ কাজ করার পথে বড় ধরনের বাধা।[২২] আদালতগুলির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শহুরে এলাকায় অবস্থিত, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়িতে, যার রক্ষণাবেক্ষণ নিম্নমানের। অসংখ্য জেলা আদালতে বিচারকরা পালাক্রমে আদালত কক্ষ ব্যবহার করেন — প্রতি বিচারক তিন ঘন্টার পালায় কাজ করেন। আদালত ভবন ও এর সুযোগ সুবিধাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গণপূর্ত বিভাগের, যা এ কাজটি তার স্বভাবসুলভ অদক্ষতার সাথেই করে। আরেকটি সমস্যা হল অভিযুক্তদের জেল থেকে আদালতে আনা-নেয়ার জন্য যানবাহনের অভাব। এর ফলে এ রকম অসংখ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অভিযুক্তদের এক বছরের ও বেশি সময়ে আদালতের সামনে হাজির করা সম্ভব হয়নি। আদালতগুলিও চলে কোনো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া: সাক্ষ্য হাতে লিখে রেকর্ড করা হয়, বিচারের রায় টাইপ করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার টাইপমেশিনে, এবং তথ্যের প্রতিলিপি করার প্রচলিত উপায় এখনো সাইক্লোস্টাইলিং। আদালতের বিশাল সংখ্যক রেকর্ড ও দলিলপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার জন্য আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির প্রচলন এখন অত্যাবশ্যক। যেহেতু সরকারী ছাপাখানায় ইংরেজিতে সাক্ষ্য ফর্ম ছাপা বন্ধ হয়ে গেছে, গত ১৫ বছরে এ ধরনের কোনো ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে না, এবং আদালতের কর্মচারীরা অযথা হাতে লিখে এসব ফর্ম তৈরিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন।

৫.৩৫ বিচার বিভাগের বর্তমান মামলার অতিরিক্ত ভারের প্রেক্ষিতে একটি স্বাভাবিক সমাধান হওয়া উচিত বিকল্প সংঘাত নিরসন পদ্ধতির অধিকতর ব্যবহার।[২৩] এ ধরনের ব্যবস্থার প্রচলন অবশ্য রয়েছে, বিশেষ করে কর ও ডিউটি এবং শ্রম ও শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিশেষ ট্রাইবুনালসমূহে। তবে তাদের ব্যবহার হচ্ছে খুবই কম। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সালিসী কাউন্সিল রয়েছে, যেগুলো ১৯৪০ সালের সালিসী আইনের অধীনে পরিচালিত; কিন্তু এতদসংক্রান্ত আইনে বিদেশী সালিসী বা রায় অন্তর্ভুক্ত নয়।[২৪] বিরোধ নিষ্পত্তির অন্য একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে ন্যায়পালের অফিসের মাধ্যমে (পরিচ্ছেদ ৪)।

৫.৩৬ বিগত দশকগুলোতে বিচারক ও আইন কর্মকর্তাদের মান নিম্নমুখী হয়েছে। এরকম উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে যে নতুন বিচারকরা — যাদের বেশ কিছু সংখ্যক নিয়োগ পেয়েছেন মেধার বিচারে নয়, বরং অন্যান্য বিবেচনায় — কাজে যোগদানের স্তরে যথাযথ যোগ্যতার অধিকারী নন, এবং পরবর্তীতেও তাদের দায়িত্বের জন্য ঠিকভাবে তৈরি হন না। বিচার বিভাগের মান নেমে যাওয়ার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই যে,

---

২২ বর্তমান সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা সবখানে এক ধরনের নয়। বিদায়ী প্রধান বিচারপতি তাঁর বিদায় ভাষণে (এপ্রিল ১৯৯৫) উল্লেখ করেন যে, রাজশাহীর জেলা আদালত একটি বাস টার্মিনালের পাশেই অবস্থিত, এবং গাড়ির হর্ণের অবিরাম শব্দ আদালতের কাজ করা প্রায় অসম্ভব করে তোলে। একটি আলাদা প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "এ্যাপেলেট বিভাগে আমাদের একটি ইলেকট্রিক টাইপরাইটার আছে, যা বছরের বেশির ভাগ সময় (বিক্রেতার) রক্ষণাবেক্ষণ সেবার অভাবে অচল থাকে। ১৯৭১ সালের বার্ষিক এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ সিভিল জাস্টিস ছাপা হয় ১৯৮০ সালে। ১৯৬৯ সালের বার্ষিক এডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস ছাপা হয় ১৯৮০তে। ১৯৭০ সালের রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। এমনকি জিবি কার্ডের ব্যবহারও আর হচ্ছে না, যেহেতু হাই কোর্ট বিভাগের মামলার রেকর্ডগুলি ঢাকার সাতটি আলাদা জায়গায়, এবং মাঝে মধ্যে সেশন অনুষ্ঠিত হয়, সে রকম ছটি জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।"

২৩ যদিও ঢাকা ও মেট্রোপলিটন চ্যাম্বারস অব কমার্স এর নিয়মবিধির অধীনে সালিসী ব্যবস্থা রয়েছে, প্রক্রিয়াটিতে বেশ কিছু ফাঁক রয়ে গেছে যেগুলো বিরোধপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ এড়াতে হলে ভরাট করতে হবে; একটি সুপারিশ হচ্ছে আন্তর্জাতিক চ্যাম্বার অব কমার্স কর্তৃক নির্ধারিত সালিসী মান গ্রহণ করা।

২৪ বিদেশী সালিসী রায় প্রয়োগ কনভেনশন এখনও কার্যে পরিণত হয়নি। এই কনভেনশন গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশে বিদেশী কোম্পানীসমূহের বিনিয়োগ বা বাংলাদেশী কোম্পানীসমূহের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় আস্থা আসবে।

অন্যান্য বেসামরিক প্রশাসন ক্যাডারের মত তাদের দেয়া বেতন-ভাতা দিনে দিনে কমছে। যারা আইন প্র্যাকটিস করছেন বা বেসরকারী খাতে কাজ করছেন, তাদের তুলনায় বিচারকদের বেতন প্রথাগতভাবেই কম। এর ফলে নানা প্রকার অনিয়মকেই উৎসাহিত করা হয়েছে, এবং যোগ্য আইনজীবীদের বিচার বিভাগে যোগদান নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিচারকরা তাদের দক্ষতা বাড়াবার জন্য সুযোগ পান খুবই কম, অথবা একেবারেই নয়, এবং অনেকেরই বিনিয়োগের মত দ্রুত বর্ধমান ক্ষেত্রের আইনের জটিল বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয়। তবে সরকার সম্প্রতি বিচার বিভাগ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন পাশ করেছে, আইন কর্মকর্তাদের দক্ষতার মান বাড়ানোর জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিধান করেছে।

৫.৩৭ আইন মন্ত্রণালয় নিজেই একটি বিরাট বাধা। বিশেষ করে যেসব প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ব্যবসায়িক লেনদেনের সংগে জড়িত, সেসব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট। আইন মন্ত্রণালয়ে বিলম্বের কারণ হচ্ছে আইন বিশেষজ্ঞ ও মুসাবিদাকারীদের অভাব, বিশেষ করে দ্বিভাষী মুসাবিদাকারীদের অভাব যারা জাতীয় সংসদের চাহিদা মত বিভিন্ন আইন ও বিধানের ইংরেজি ও বাংলা ভাষা যোগান দিতে পারবেন। অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজিতে (যা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান ভাষা) সঠিক অনুবাদ করিয়ে নিতে তিন বা তারো বছরের বেশি সময় লেগে যায়। এ বিষয়টি ব্যবসায়িক লেনদেনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৫.৩৮ **সংস্কারের অগ্রাধিকার** — একটি আধুনিক অর্থনীতির চাহিদাগুলি পূরণের জন্য বিচার ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কার সাধন করতে হবে। আইনগত সংস্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল:

- *আইন সংস্কার কমিশনকে পুনরুজ্জীবিত করা* — বাংলাদেশে একটি আইন সংস্কার কমিশন গঠনের বিধান থাকলেও যোগ্য প্রার্থী নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বিচারবিভাগ বহির্ভূত কোনো সবেতন সরকারী কাজ করতে পারবেন না। আইন কমিশনের চেয়ারম্যানের কাজ অ-বিচারবিভাগীয় বিবেচনা করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান এ ব্যাপারে অনেক বেশি উদার, এবং তাদের আইন সংস্কার কমিশনের প্রধান হল একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। যদি আদালতসমূহ সংবিধানের বিধিটির অনুকূলে ব্যাখ্যা না দেয়, তাহলে একজন যোগ্য এবং অভিজ্ঞ প্রার্থী নিয়োগ দেয়া অত্যন্ত দূরূহ — প্রায় অসম্ভবই — হয়ে দাঁড়াবে।

- *আদালতসমূহের গতি এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করা* — সরকারকে মামলা ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার উপায় বের করতে হবে। তা ছাড়া, মামলার দক্ষ প্রক্রিয়াকরণ উন্নত করতে হলে সাংগঠনিক (অর্গানিক) আইন ও পদ্ধতিগত রীতিনীতি পরিমার্জনা করতে হবে — বিশেষ করে মামলার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার ও তুচ্ছ বিষয়ে মামলা দায়ের করে মানুষকে হয়রানি করার সুযোগ কমিয়ে আনতে হলে। এ ছাড়া, বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত আদালতে পূর্ণকালীন বিশেষজ্ঞ বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

- *প্রণীত বিধানসমূহ পরিমার্জনা ও যুক্তিযুক্ত করা* — এতে দু'টি পর্যায়ে প্রচেষ্টা নিতে হবে: পরিমার্জনা সম্পর্কে সুপারিশ দেয়ার জন্য কয়েকটি বিশেষজ্ঞ উপ-দল গঠন; আধুনিক ব্যবসায়িক ও কারিগরী চর্চার বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন, প্রস্তাবিত আইনের খসড়া করা ও সেগুলো মন্ত্রিসভা ও বিধান সভার ভিতর দিয়ে পাশ করিয়ে নেয়ার জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা জোরদার করা।

- *আইনজীবীদের পেশাগত দায়-দায়িত্ব ও আচরণের মান উন্নত করা* — এটি সম্ভব বার কাউন্সিল সমূহকে শক্তিশালী করে এবং আইনজীবীদের শৃঙ্খলা-বিধি উন্নত করে।

- *বিচার বিভাগকে উন্নত করা* — এই প্রচেষ্টায় অন্তর্ভূক্ত থাকা উচিত শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মেধাবী লোকদের আকর্ষণ করার উপায় উদ্ভাবন ও বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি জোরদার করা। বিচারকদের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় নৈতিকতা বিধি এবং একটি শৃঙ্খলাগত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা উচিত। তা ছাড়া, বিচার বিভাগের জন্য বেতন-ভাতা প্যাকেজও পর্যালোচনা করে দেখা উচিত, এবং কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরিতে প্রদত্ত বেতন-ভাতা থেকে বিচার বিভাগীয় বেতন-ভাতা আলাদা করে তা ১৯৫০ এর দশকের মাত্রায় নিয়ে যাওয়া উচিত।

- *আইনগত প্রতিবিধান আরো সহজপ্রাপ্য করা* — এটি শুরু করা যায় সরকারী আইনজীবীদের পদ্ধতিটির পুনর্বিন্যাস করা ও শক্তিশালী আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থাসমূহ তৈরি করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

- *বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিসমূহ সম্প্রসারিত করা* — এ ছাড়াও, ছোটখাটো দাবী নিষ্পত্তির আদালতগুলিকে আরো ফলপ্রর্দ করার জন্য এদের কার্যসম্পাদনা পর্যালোচনা করা।

- *চাকুরি-কালীন আইনগত প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করা*— বর্তমানে বাংলাদেশের আইন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো বিশ্বস্ত পদ্ধতি নেই; মাত্র সম্প্রতি একটি বিচার বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আইন (১৯৯৫) পাশ করা হয়েছে, যাতে কর্মরত ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিধান রয়েছে। তবে এই প্রস্তাবটি অর্থায়ন ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য বিলম্বিত হচ্ছে।

- *আইন শিক্ষার সংস্কার সাধন করা* — এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে আছে : কঠোর ভর্তি ও সনদ প্রদান পদ্ধতি চালু করা এবং অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কর্পোরেট অর্থশাস্ত্রের মত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা। বৈদেশিক বাণিজ্য, অর্থ, ব্যাংকিং ও শ্রম আইনের আন্তর্জাতিক চর্চার নানা বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ থাকতে হবে, এবং আন্তর্জাতিক ও পৌর ব্যবসায় সংবিধি ও দলিলাদির একটি বিশেষ পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে।

- *নিম্ন আদালতের তত্ত্বাবধান ও প্রত্যবেক্ষণ জোরদার করা* — নিম্ন আদালতের তত্ত্বাবধান আরো ভাল হওয়া উচিত। সম্ভব হলে কোনো অবসরপ্রাপ্ত বা চাকুরিরত সুপ্রীম কোর্ট বিচারপতির নেতৃত্বে এবং প্রধান বিচারপতির দপ্তরের অধীনে এ জন্য একটি স্থায়ী ইউনিট গড়ে তোলা উচিত। এ ছাড়া, নিম্ন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি/বদলীর জন্য উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের দায়িত্ব দেয়া উচিত।

- *বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করা* — এ ব্যাপারে সাংবিধানিক ব্যবস্থাটির পূর্ণ প্রয়োগ দরকার, যার শুরু হওয়া উচিত আর্থিক স্বাধীনতা থেকে। বিচার বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে প্রধান বিচারপতির দপ্তরে ন্যস্ত করা উচিত।

বেসরকারী খাতের প্রসার বাড়ানো

"বাজার ও সরকার যখনি একযোগে কাজ করেছে, ফলাফল হয়েছে চমকপ্রদ, কিন্তু তারা যখন বিপরীত অবস্থান থেকে কাজ করেছে, ফলাফল তখন হয়েছে সর্বনাশা।" বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন (১৯৯১)।

৫.৩৯ বেসরকারী খাতের ব্যাপক-ভিত্তিক এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে রাষ্ট্র এবং বেসরকারী খাতের কার্যকর অংশীদারিত্বের, এবং বেসরকারী খাত উন্নয়নের সংগে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উন্নত সমন্বয় ও আরো বেশি "গ্রাহক সাড়া"র ওপর। বিশেষ ভাবে, পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলি এসব বিষয়ের গুরুত্ব সপ্রমাণিত করেছে। অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য কম। বেসরকারী উদ্যোগকে সহায়তা করা ও তার প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জড়িত সংস্থাগুলিও ব্যর্থ হয়েছে।

৫.৪০ পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিগুলির সংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে সরকার ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মানের ক্ষেত্রে। প্রতিটি পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিতে সরকার ও দেশী-বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক ও নিরন্তর পরামর্শ নিশ্চিত করার জন্য শিল্প ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে, যারা এমনকি বিনিয়োগ কৌশলসমূহও সমন্বিত করে। সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করলে সব সময়ই অদক্ষতার প্রসারের ঝুঁকি থাকে, কিন্তু পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি এই সমস্যাটি মোকাবেলা করেছে বেসরকারী খাতের খেলোয়াড়দের ভিতর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, যেখানে রাষ্ট্র থাকে রেফারীর ভূমিকায়।[২৫] আরো একটি বিপদ এই যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিবিড় সম্পর্কটি অর্থনৈতিক আমলাতন্ত্রকে চাপ দেয়ার কাজে লাগায়, যাতে নীতির ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটিয়ে তাদের স্বার্থ হাসিল করা যায়।

৫.৪১ সরকার ও বেসরকারী খাতের মধ্যে একটি কার্যকর আন্তঃসম্পর্ক হচ্ছে বেশ কটি পূর্ব এশীয় দেশের মূল বৈশিষ্ট্য। এই দেশগুলির তালিকায় আছে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর — এরা সকলেই বিজিনেস কাউন্সিল স্থাপন করেছে। এসব কাউন্সিল সরকারী নীতি নির্ধারক এবং ব্যবসায়ী নেতৃত্বের মধ্যে যোগাযোগ মসৃণ করেছে, এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে কর্মচারী আদান-প্রদান উৎসাহিত করছে। উদাহরণস্বরূপ, সিঙ্গাপুর ও আরো কিছু পূর্ব এশীয় দেশ সময় সময় বেসরকারী শিল্প থেকে অভিজ্ঞ ম্যানেজারদের এনে সরকারের সংগে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা "বেসরকারী খাতের উন্নয়ন প্রসারের স্বার্থে" করা হয়। সরকার ও ব্যবসা বাণিজ্য আলাদা আলাদা দুটি পরিমণ্ডলের বিষয়, এবং প্রায়শই পরস্পরের প্রতি তাদের অবস্থান বৈরি — এই বহু-পুরোনো ধারণাটি এখন আর বৈধ নয়, এবং বাংলাদেশকেও এ সত্যটি গ্রহণ করতে হবে।

৫.৪২ এ ছাড়া, শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থাপিত তিনটি সরকারী সংস্থার— বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বিইপিজেডএ) — কার্যকারিতা জোরদার করারও জরুরী প্রয়োজন রয়েছে। সরকার আশা করেছিল যে এ তিনটি সংস্থা পূর্ব এশীয় বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলির অনুকরণ করবে। পূর্ব এশীয় সংস্থাগুলো সেসব দেশের রপ্তানিমুখী কৌশলসমূহকে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে, এবং বিদেশী বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর আকর্ষণে বিশেষভাবে সফল হয়েছে।[২৬] যদিও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করা কঠিন, মনে হচ্ছে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশের সংস্থাগুলোর প্রভাব পড়েছে সামান্যই। বস্তুতঃ সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যবেক্ষণ কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। যতবারই তাদের মনোযোগ প্রসার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করার জন্য তাদের নিয়ন্ত্রণ বা সম্পদ বন্টন কর্মকাণ্ড সরিয়ে নেয়া হয়েছে, ততবারই এসব সংস্থায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তারা এটি নিশ্চিত করেছেন যে সেগুলোর স্থানে একই রকমের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যেন ঐসব দায়-দায়িত্ব আবার তাদের হাতে চলে আসে।

৫.৪৩ *বিনিয়োগ বোর্ড* ১৯৮৯ সালে সম্ভাব্য দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সহায়তামূলক নানা সেবার একটি প্যাকেজ উপহার দেয়ার জন্য স্থাপিত হয়েছিল। বিনিয়োগ বোর্ডকে 'একত্রে সব-পাওয়া-যায় দোকান' ধরনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল — যা লেনদেন ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত ঝুঁকি ও অতিরিক্ত ব্যয় কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। তবে এ উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়নি, কারণ এটি নানা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের — যেমন ভূমি, জ্বালানী ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের — সমর্থন আদায়ের জন্য প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক উপায় ব্যবহার করেছে। এতে যে দীর্ঘসূত্রিতা ও সময়ক্ষেপণ হয়, সেতো বলাই বাহুল্য। অন্য সমস্যাটি হচ্ছে, অত্যন্ত সীমাবদ্ধকারী ও নিয়ন্ত্রণমূলক শিল্প দপ্তর থেকে বিনিয়োগ বোর্ডের কাছে পাঠানো ৭০০ এর বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিম্ন মান। যতদিন পর্যন্ত বিনিয়োগ বোর্ড নিয়ন্ত্রণ-মনা সরকারী কর্মচারীদের হাতে থাকবে, যারা জোরদার প্রসার, উন্নয়ন ও প্রচারাভিযান কর্মসূচি হাতে নিতে সক্ষম নন, ততদিন এ সংস্থাটি একটি প্রতিক্রিয়াশীল, ধীরগতির এবং অকার্যকর সংস্থা হয়েই থাকবে।[২৭] বস্তুত ১৯৯১ সালে যখন সরকার শিল্পনীতি ঘোষণা করে, বিনিয়োগ বোর্ডকে এরকম একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়াও সরকারের পক্ষে জরুরী হয়ে পড়ে যে বোর্ড যেন বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে বেসরকারী খাতকে সহায়তা দানে এর কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে। এই নীতির সংগে সঙ্গতি রেখে সরকার ১৯৯৪ সালের মার্চে ঘোষণা করে যে, বিনিয়োগ বোর্ডের সংগে ফার্মগুলির নিবন্ধন করাটা এখন থেকে স্বেচ্ছা ভিত্তিতে হবে। তবে কর সুবিধা ও সহায়তা সেবা লাভের জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের সংগে নিবন্ধন করাটা এখনও প্রয়োজনীয়, যা এই পরিবর্তনটির গুরুত্ব অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড হয়তো কিছুটা কমানো হয়েছে। তবে এটি এখনও অনেক বিষয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, যেমন বিদেশী ঋণের জন্য প্রস্তাব পর্যালোচনা; সীমিত ভিত্তিতে আমদানীযোগ্য সামগ্রী আমদানীর জন্য ফার্মগুলির যোগ্যতার প্রত্যয়নপত্র দেয়া; নিয়োগ চুক্তি ইস্যু করা; রয়্যালটি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিদেশে পাঠানোর জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিশেষ পাস বই দেয়া ইত্যাদি। সম্প্রতি বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যসম্পাদনা উন্নত করার জন্য সরকার এর ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনেছে।

৫.৪৪ *রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো* — এ প্রতিষ্ঠানটিও প্রসার ও উন্নয়ন থেকে এর দৃষ্টি ফিরিয়ে রপ্তানি প্রত্যবেক্ষণ এবং রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান করার মত অনেক বেশী সীমাবদ্ধকারী একটি ভূমিকায় নিবদ্ধ করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বিদেশে রপ্তানি মেলায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আয়োজন করারও দায়িত্ব প্রাপ্ত। তবে রপ্তানি মেলাগুলোতে অংশগ্রহণকারী নির্বাচনে সংস্থাটির অস্বচ্ছ পদ্ধতি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। এ ছাড়া রপ্তানি উপস্থাপনা ও সামগ্রীপ্রদর্শনীর আয়োজনে দক্ষতা এবং পেশাদারী কুশলতার অভাব নিয়েও অভিযোগ উঠেছে।[২৮] রপ্তানিকারকদের সমস্যা ও বাধাসমূহ দূরীকরণে এবং রপ্তানি উন্নয়নে সংস্থাটির অকার্যকারিতার কারণ অবশ্য এই যে, এ সংস্থার স্টাফ হচ্ছে সরকারী এবং বিশাল সংখ্যক অদক্ষ সহায়ক কর্মী দিয়ে এ সংস্থাটি ভারাক্রান্ত। এতে সংস্থাটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রায় একটি সম্প্রসারণই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডের মত রপ্তানি

---

২৫ দেখুন : *দি ইস্ট এশিয়া মিরাকল*, বিশ্ব ব্যাংক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ ইয়র্ক (১৯৯৩)।

২৬ দেখুন : *দি ইস্ট এশিয়া মিরাকল*, প্রগুক্ত (১৯৯৩)।

২৭ ১৯৯৩ সালে বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যপরিচালন পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি পরিকল্পনা (ইউএনডিপি/এফআইএএস যুগ্ম প্রধান কারিগরী উপদেষ্টার সহায়তায়) তৈরি হলেও এটি প্রধানত বিনিয়োগ বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বাধার মুখে বাস্তবায়িত করা যায়নি।

২৮ সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ফ্রাঙ্কফুর্ট মেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় এবং চারটি বড় ফার্মকে প্রদর্শনীর স্বত্ব বিক্রী করে দেয়। বাংলাদেশের হস্তশিল্পের রপ্তানি ফরমাশের ৭০ শতাংশ আসে এই মেলা থেকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর এই ব্যবস্থা গ্রহণে নতুন হস্তশিল্প রপ্তানিকারকদের বিশ্ব বাজারে পা রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

উন্নয়ন ব্যুরোরও এর উৎস মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র পেতে প্রশাসনিক বহু বাধার সম্মুখীন হয়।[২৯] রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উন্নয়নমূলক ভূমিকাটির বাস্তবায়নের দিকগুলি চেম্বার/ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির হাতে ছেড়ে দেয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঘর ৫.৯ বাংলাদেশ কি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের চাহিদার প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হতে পারে?

সরকার আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলিকে বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে আসার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি। বিশ্ব ব্যাংক এই উদ্যোগে সহায়তা করে আসছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি প্রযুক্তিগত তথ্যভিত্তি বা ডাটাবেজ তৈরি করতে এবং বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলির মধ্যে সম্পাদনার জন্য একটি উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি তৈরি করতে বিশ্ব ব্যাংক সাহায্য করেছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক লন্ডনে ও ঢাকায় তেল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন প্রকল্পের (পিইপিপি) অধীনে দুটি প্রচারণামূলক সভা অনুষ্ঠান করে। ১৯৯৩'র অক্টোবরে বিশ্ব ব্যাংক হিউস্টনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে যেখানে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে পাঁচটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তবে কোম্পানীগুলির আগ্রহ প্রকৃত বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়। তেল অনুসন্ধানের প্রতিযোগিতামূলক বাজার সম্বন্ধে সরকার যথাযথ সংবেদনশীলতা দেখাতে ব্যর্থ হয়, এবং নির্ধারিত শর্তসমূহ নিয়ে দেনদরবার করার সময় কর্মকর্তারা অনমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ফলে চুক্তিগুলির প্রক্রিয়াকরণে অনর্থক বিলম্ব ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ:

অফ-শোর (উপকূলবর্তী) ব্লক : পেট্রোবাংলা, কেয়ার্ন এনার্জি পিএলসি এবং হল্যান্ড সী সার্চ বাংলাদেশ বিডি -এর মধ্যে একটি উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রায় ১৮ মাস সময় লেগে যায়। এই চুক্তির ব্যাপারে প্রস্তাব জমা দেয়া হয় ২২ ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখে, কিন্তু চূড়ান্ত স্বাক্ষরিত হয় ৫ মে, ১৯৯৪ তারিখে। আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীগুলির সাথে পেট্রোবাংলার চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা সারতে সাত মাস সময় লেগে যায়। এর পর জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় চুক্তিটির পর্যালোচনা করে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটি ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় এবং আইন মন্ত্রণালয় থেকে একটি আইনগত ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। জ্বালানী মন্ত্রণালয় থেকে পরীক্ষা করার পর চুক্তিটি উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির অনুমোদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত কাউন্সিল কমিটিতে (সিসিএফইএ) পাঠাতে আরো চার মাস লেগে যায়। চুক্তিটি অনুমোদন করতে সিসিএফইএ'র লাগে ২.৫ মাস। এর পরের পর্যায়টি ছিল চুক্তি স্বাক্ষর। এটি এক সপ্তাহে করা সম্ভব ছিল, কিন্তু এর জন্য সময় লাগে প্রায় ৩ মাস। এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটি খুবই ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর ফলে অন্যান্য কোম্পানী বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে।

অন-শোর (স্থলভূমির) ব্লক : অক্সিডেন্টাল ইন্টারনেশনাল এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানীর সংগে পেট্রোবাংলার একটি উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি করতে প্রায় ১২ মাস সময় লাগে। প্রস্তাব জমা দেয়া হয় ১৩ নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১১ জানুয়ারী, ১৯৯৫ তারিখে। চুক্তিটি মূল্যায়ন করতে এবং এটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পেট্রোবাংলার সময় লাগে আট মাস। জ্বালানী মন্ত্রণালয় এই চুক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন করতে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র আদায় করতে পাঁচ মাস সময় লাগে। উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তিটি অনুমোদন করতে সিসিএফইএ-এর লাগে ৩ সপ্তাহ, যদিও চুক্তি সম্পাদনে পেট্রোবাংলার লাগে মাত্র ৪ দিন।

---

২৯ শিল্প/বাণিজ্য মেলাগুলিতে অংশগ্রহণ মাঝে মাঝে বাধাগ্রস্ত হয় এই আবশ্যকতার জন্য যে ব্যুরোর কর্মকর্তাদের তার পরও মন্ত্রণালয় থেকে বিদেশে ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেতে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয় — যদিও যে মন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন, তিনিই হয়তো (অথবা তার পক্ষে তার কোনো সিনিওর সহকারী) ব্যুরোর সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন, যে সভায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

একটি মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে, পেট্রোবাংলা কোনো নিঃস্বার্থ পক্ষ নয়। নতুন আগমনকারীরা এর একচেটিয়া স্বার্থের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দেয়, এবং এর অদক্ষতা হয়তো সবার সামনে তুলে ধরতে পারে। আরেকটি গুরুতর সমস্যা হচ্ছে এই যে, আলাপ-আলোচনায় নমনীয়তা প্রদর্শনে পেট্রোবাংলার ক্ষমতা সামান্যই। উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির একটি শর্ত ছিল যে, গ্যাস দেশের ভিতরেই বিতরণ করতে হবে, এবং শুধুমাত্র তরলীকৃত অবস্থা ছাড়া বাইরে রপ্তানি করা যাবে না। তা ছাড়া, গ্যাস কেনার ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা প্রথম সুযোগটি পাবে। এ বিষয়ে অনমনীয়তা প্রদর্শনের ফলে ফরাসী কোম্পানী টোটাল নয় মাস আলাপ-আলোচনার পর এর সমঝোতা স্মারক প্রত্যাহার করে নেয়।

তৃতীয় একটি সমস্যা হচ্ছে নিম্নমানের পরিকল্পনা। উদাহরণ হিসেবে, কেয়ার্ন এনার্জি পিএলসি ১,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় একটি ভূকম্পতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনার পরিকল্পনা করছিল। এ রকম জরিপের সময় ঐ অঞ্চল থেকে সকল মাছ ধরার জাল সরিয়ে ফেলার কথা। পেট্রোবাংলা এই জরিপের কথা জানতো, কিন্তু মৎস্য মন্ত্রণালয়ের সংগে এলাকাটি সময়মত জাল-মুক্ত করার বিষয়টি সমন্বয় করতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে জরিপের জন্য অন্য একটি সময় নির্ধারণ করতে হয়, যার জন্য খরচ প্রচুর বেড়ে যায়।

পাকিস্তানে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তি করতে মাত্র তিন মাস লাগে। এই শিল্পের উন্নয়ন পিছিয়েই থাকবে যদি না চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনা একটি স্বাধীন সংস্থা (যেমন বিনিয়োগ বোর্ড) পরিচালনা না করে — যেখানে পেট্রোবাংলা কৌশলগত সহায়তা দিতে পারে। পেট্রোবাংলাকেও আরো সুসংগঠিত হতে হবে। উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির আলাপ-আলোচনা করতে পেট্রোবাংলার আরো বেশি স্বাধিকার থাকা উচিত, এবং আলাপ-আলোচনার দলে জ্বালানী ও আইন মন্ত্রণালয়কে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। এর ফলে প্রক্রিয়াকরণের সময় অর্ধেকই বেঁচে যাবে। আলাপ-আলোচনাকারী দলগুলিকে আরো উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঘর ৫.১০ রপ্তানির জন্য মাঝে মাঝে ভাগ্য অনুকূল থাকতে হয়

চট্টগ্রামে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সংগে জড়িত একজন রপ্তানিকারক টিনজাত আমের জন্য একটি অর্ডার পান। যেহেতু এটি ছিল কোম্পাটির প্রথম রপ্তানি অর্ডার, আমলাতান্ত্রিক রোলার কোস্টারে চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতার জন্য রপ্তানিকারক তৈরি ছিলেন না। এজন্য যতগুলো অনুমোদন প্রয়োজন এবং যতগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক মান উত্তীর্ণ হতে হয়, তাদের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম বেশি। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান হল যে রপ্তানিকারককে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাগার থেকে এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র নিতে হবে যে, রপ্তানির জন্য টিনজাত ফল 'নিরাপদ এবং খাবার যোগ্য'। প্রথম দৃষ্টিতে এটি সহজই মনে হয়, কিন্তু পরীক্ষাগারটি আগে যেহেতু শুধু সজির ব্যাপারে এ ধরনের প্রত্যয়নপত্র দিচ্ছিল, টিনজাত ফলের ক্ষেত্রে এর কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করতে তারা ইচ্ছুক ছিল না। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাগার রপ্তানিকারককে 'মান প্রত্যয়নপত্র' যোগাড় করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে যোগাযোগ করার সুপারিশ করল।

রপ্তানিকারক প্রয়োজনীয় প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার জন্য ঢাকায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে আসলেন, কিন্তু ব্যুরোর কর্মকর্তারা কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারলেন না। রপ্তানিকারকের পক্ষে বিষয়টি হাতে নেয়ার পরিবর্তে এবং তিনি কোথায় যাবেন, তা খুঁজে বের করা বা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সহযোগিতা নিশ্চিত করার পরিবর্তে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো তাকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষাগারে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।

এই রোলার কোস্টার চড়কির শীর্ষ মুহূর্ত ছিল হয়তো তখন, যখন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তার কক্ষে একজন 'মর্যাদাবান' ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল, যিনি খাদ্য সচিবকে ভালভাবেই চিনতেন। এই ব্যক্তিটি জাতীয় লাভ/লোকসানের বিষয়টি ধারণা করতে পেরে নিজে থেকেই সাহায্যের প্রস্তাব দিলেন। তিনি খাদ্য সচিবকে ফোন করলেন, তাঁর কাছে রপ্তানিকারকের সমস্যা তুলে ধরলেন, এবং মাত্র তিনদিনের মধ্যে তামাদি হতে যাওয়া রপ্তানিকারকের ঋণপত্রের ব্যাপারে কিছু একটা করার ব্যাপারে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। সচিব ঐ ব্যক্তিকে বললেন রপ্তানিকারককে যেন তিনি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, এবং এরকম একটি নিশ্চয়তা দিলেন যে, বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি তাঁর সাধ্যমত সব কিছু করবেন।

সচিব একজন যুগ্ম-সচিবকে বিষয়টি দেখার দায়িত্ব দিলেন এবং পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যে তার সুরাহা করার জন্যও বললেন। এতে কাজ হল। যুগ্ম-সচিব কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে চেষ্টা করলেন, এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন (বিএসআই)কে একটি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করতে রাজি করালেন। রপ্তানিকারক শেষ পর্যন্ত তার ঋণপত্রের বৈধতার মেয়াদের ভিতরেই টিনজাত আম রপ্তানি করতে পেরেছিলেন। পরবর্তীতে রপ্তানিযোগ্য টিনজাত ফলের মান প্রত্যয়নপত্র দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের পরীক্ষাগারকে।

সরকার এবং বিশেষ করে প্রসার/উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলি স্পষ্টতই সব সময় রপ্তানি বাড়ানোর জন্য আবশ্যকতাগুলির ব্যাপারে সংবেদনশীল নয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উচিত অন্তত সকল সামগ্রীর রপ্তানির সংগে জড়িত পদ্ধতিসমূহের একটি ডাইরেক্টরী বা নির্দেশিকা রাখা এবং পদ্ধতি ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে রপ্তানিকারক ও একই সংগে সরকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ দেয়া।

৫.৪৫ *বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ* — সার্বিক অবকাঠামোর দুর্বলতা এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকাগুলি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয়, কারণ তাদের অবকাঠামো তুলনামূলকভাবে উন্নত এবং তাদের আমদানী ও বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি অনেক কম। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্তৃপক্ষ (বিইপিজেডএ) বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে সফল। এই সংস্থা বর্তমানে চট্টগ্রাম ও সাভারের (ঢাকার কাছে) যে দু'টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা পরিচালনা করছে, সেগুলোতে বিনিয়োগ সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে। চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বর্তমানে ১৫ কোটি ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ রয়েছে, এবং ১৯৯৩/৯৪ সালে এর রপ্তানি আয় ছিল ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার, এবং মূল্য সংযোজন কর ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি স্থাপিত সাভার রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো উচ্চ প্রযুক্তির শিল্পগুলি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য চালু করা হয়। এটি প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারের বিনিয়োগ আকর্ষণে ও প্রায় ৮,০০০ মানুষের চাকুরি দিতে সফল হয়েছে। তবে বিইপিজেডএ'র তুলনামূলক সাফল্য, অন্যান্য দেশের তুলনায় যতটা না এর খরচ সাশ্রয়তা, তার থেকে বেশি এর বিশেষ সুবিধা ভোগকারী মর্যাদা থেকে উদ্ভূত। এলাকাগুলোর বাইরে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণ আরো সহজ করতে যেহেতু আরো কিছু সময় লাগবে, সেহেতু বিইপিজেডএ-র পরিচালনার জন্য ভাল যুক্তি রয়েছে, যদিও এসব কাজকর্ম বেসরকারীকরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে দেখা উচিত। একটি ভিন্ন উপায় হতে পারে যে, মৌলিক অবকাঠামোগুলি বাংলাদেশ সরকার দিবে, এবং এলাকা-ব্যবস্থাপনা একটি বিদেশী ও একটি দেশী ফার্মকে যুগ্মভাবে চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে।

৫.৪৬ এই তিনটি সংস্থার উচিত হবে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে এবং আনুষ্ঠানিক আবেদনপত্র বিদ্যুৎগতিতে প্রক্রিয়াকরণ করে বিনিয়োগকারীকে সাহায্য দেয়া অব্যাহত রাখা। তবে তাদের আরো সক্রিয়ভাবে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে। এটি করার ক্ষেত্রে তিনটি সংস্থারই একটি বড় বাধা হল এই যে, কর্মকর্তা কর্মচারীরা অধিকাংশই সেই আমলাতন্ত্র থেকে আসেন (অনেক ক্ষেত্রে প্রেষণে), যা প্রবিধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ করতেই অভ্যস্ত, কারণ এতে উৎকোচ আদায়ের চমৎকার সম্ভাবনা থাকে। থাইল্যান্ড বা কোরিয়ায় একই রকমের সংস্থার দুটি সুবিধা থাকে — তারা আরো উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেসামরিক প্রশাসন থেকে কর্মী সংগ্রহ করতে পারে, এবং বেসরকারী খাত থেকেও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে পারে। তুলনায় বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাগুলো বেসরকারী ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতাসহ পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক। বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসনের দুর্বলতাগুলি মনে রাখলে এসব সংস্থা পরিচালনার জন্য বেসরকারী খাতকে সংশ্লিষ্ট করা অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। কবে বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারীরা তাদের পূর্ব এশীয় প্রতিপক্ষদের দক্ষতার মাত্রা অর্জন করবেন, তার জন্য বসে থেকে কোনো লাভ হবে না।

৫.৪৭ গ্যাট (GATT)-পরবর্তী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিবেশ অধিকতর গতিশীল এবং নিম্ন-মজুরীর রপ্তানি-মুখী অর্থনীতিগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। বৈশ্বিক বাজারসমূহের সংহতি অর্জন এবং বাংলাদেশের মত একই ধরনের শ্রম-ব্যয় সুবিধাভোগী দেশগুলোতে ব্যবসা ও বিনিয়োগের তীব্র প্রতিযোগিতা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সরকারের পক্ষে বেসরকারী খাত উন্নয়ন সংস্থাগুলোতে প্রভূত উন্নতি সাধন করতে হবে। **বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারী খাত উন্নয়ন প্রচেষ্টার কার্যকারিতা বাড়াতে হলে নিচের পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে:**

- *প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাত উপদেষ্টা কাউন্সিল স্থাপন* — যাতে প্রধান অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা/সচিবরা এবং বিভিন্ন খাত ও অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্বকারী সম্মুখসারির ব্যবসায়ীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, এবং যা প্রতিমাসে অন্তত একবার নিয়মিত সভায় মিলিত হবে। এর কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সিলকে অবশ্যই নিয়মিত বৈঠক করতে হবে, এবং বিভিন্ন বিষয় নিস্পত্তির জন্য আগে ভাগেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

- *বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার জবাবদিহিতা বাড়ানো* — এসব সংস্থাকে সেবার একটি মান (ঘর ৫.১) ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াও এদের বোর্ডে/তদারকী দলগুলোতে সদস্যপদ ক্লায়েন্টদের জন্য — অর্থাৎ বেসরকারী খাতের কার্যনির্বাহী ও রপ্তানিকারকদের জন্য — উন্মুক্ত রাখতে হবে। এ দুটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অনেক বেশি জবাবদিহিতা, এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও অভিযোগের প্রতি অধিকতর মনোযোগ নিশ্চিত করা যাবে। সংস্থার প্রধানকে নিয়োগ দান বা উচিত থেকে অব্যাহতি দেয়ার কর্তৃত্ব এই তদারকীদলের হাতে থাকা উচিত।

- *বিনিয়োগ বোর্ডকে আরো বেশি দক্ষ ও খরচ-সাশ্রয়ী করা* — মুলতবী থাকা পুনর্গঠন প্রক্রিয়াটি শুরু ও ত্বরান্বিত করা হলে, এবং পেশাদার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও অতিরিক্ত লোকবল (যার সংখ্যা প্রায় দু'-তৃতীয়াংশ) পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনলে এটি সম্ভব হবে।

- *পেশাদার ব্যবস্থা চালু করা* — নিয়োগের ক্ষেত্রে আরো বেশি নমনীয়তার প্রয়োজন হবে এবং বেসরকারী খাত থেকে মেধা অর্জনের জন্য এর বেতন স্কেল বেসামরিক প্রশাসন থেকে আলাদা হওয়া উচিত।

- *সংস্থাসমূহকে আরো বেশি স্বাধিকার দেয়া* — কার্যসম্পাদনের জন্য জবাবদিহিতা থাকার পাশাপাশি সংস্থা প্রধানদের আরো কম আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করার এবং তাদের উদ্যোগ বাস্তবায়নের সুযোগ দিতে হবে।

- *অবশিষ্ট প্রবিধান ও নিয়ন্ত্রণধর্মী কর্মকাণ্ড তুলে নেয়া* — এর অনেকগুলিই (যেমন- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান) অপ্রয়োজনীয়, এবং অতীতের অনেক বেশি সীমাবদ্ধকারী ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উত্তরসূরি। এগুলো এখন চেম্বারসমূহকে হস্তান্তর করা উচিত।

- *বিনিয়োগ বোর্ড ও বিইপিজেডএ'র একত্রিকরণ* — এ দু'টি সংস্থার কর্মকাণ্ড একই ধরনের হওয়ার জন্য বিইপিজেডএ'র সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ বোর্ডের অধীনে নিয়ে আসলে পরিচালন খরচ কমে যাবে, এবং একই সঙ্গে প্রতিদিনের প্রশাসন (ভূমি বন্টনসহ) আলাদা আলাদা এস্টেটের হাতে সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত করে দিতে হবে।

- ***গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে সমন্বয় ও সিদ্ধান্তগ্রহণ উন্নত করা*** — বর্তমান আয়োজনটি খন্ডিত, যা ঠিক না করতে পারলে বেসরকারী খাতের উন্নয়ন কার্যকর ও অগ্রবর্তীভাবে করা সম্ভব নয়। অনুচ্ছেদ ২.৪৬ তে যেভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড নতুন ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। একটি সম্ভাবনা হয়তো হতে পারে যে, সকল এসওই'কে এসব মন্ত্রণালয় থেকে বের করে নিয়ে আসা, এবং সকল নীতি নির্ধারণী ও বাদ-বাকী কর্মকাণ্ড (যাতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড ও বিইপিজেডএ'র তত্ত্বাবধান অন্তর্ভুক্ত) একটি একক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একীভূত করা; যে মন্ত্রণালয়ের আরো যথাযথ একটি নাম হতে পারে বেসরকারী খাত উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় একটি যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং সরকার যে বেসরকারী খাতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, সে সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন একটি বাণী বেসরকারী খাতের কাছে পাঠাতে পারবে।

৫.৪৮ সব শেষে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে এসওইসমূহের প্রকট উপস্থিতি হ্রাস করা। এদের অ-বাজার সুলভ আচরণ বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে।

<u>রাষ্ট্রীয়-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ</u>

"শাসকের পক্ষে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড তার প্রজাদের জন্য ক্ষতিকর এবং কর রাজস্বের ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ... এটি প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ রোধ করে, এবং সামগ্রী ও উৎপাদিত বস্তুর দাম নির্দিষ্ট করে দেয় — যা বহু ব্যবসায়ের আর্থিক ধ্বংস সাধন করতে পারে।" ইবন্ খালদুন (১৪শ শতাব্দী)।

৫.৪৯ এসওই'দের বিশাল লোকসান, যা করদাতাদের বহন করতে হয়, এবং এগুলোর দক্ষতা উন্নয়নে সরকারের অনেকগুলো উদ্যোগের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি বলা যুক্তিযুক্ত যে সরকারের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া উচিত। এটি করতে না পারলে প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হবে। তাছাড়া, সরকার যদি এসওই-দের আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহনের ব্যর্থতার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহলে ঐ ফাঁকটি তারা সরকারের বাজেট এবং দেশী ব্যাঙ্কগুলো থেকে অর্থ নিয়ে ভরাট করতেই থাকবে। এতে অন্যান্য সরকারী খরচ হ্রাস করতে হবে, বেসরকারী খাতে ঋণের পরিমাণ কমে যাবে, আর্থিক ও চলতি হিসাবের ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকবে, অথবা উপরের যে কোন দু'টি বা তার বেশি সম্ভাবনার সম্মিলিত প্রভাব অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এসওই-দের ঘাটতি হ্রাস করা না হলে আর্থিক অসমতা প্রকট হবে, এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে — এতে দ্রুত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সুস্থিতি অর্জন ব্যাহত হবে।

৫.৫০ সরকার কিছু বেসরকারীকরণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কিন্তু এগুলো আওতার দিক দিয়ে খুবই সীমিত এবং এগুলো চলছেও শম্বুক গতিতে — বিশেষ করে সরকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সরকারের দীর্ঘ সংশ্লিষ্টতার জন্য। বাংলাদেশের সংস্কার কার্যক্রমের সবচেয়ে দুর্বল অংশটি হচ্ছে বেসরকারীকরণ কর্মসূচির ধীরগতির বাস্তবায়ন। আশা করা যাচ্ছে যে নির্বাচন-পরবর্তী সরকার এসওই-সমূহের ৪০০,০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যাপারে সরাসরি পদক্ষেপ নেয়ার সাহস দেখাতে পারবে। বাংলাদেশ যখন একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখবে, তখন জাতীয় প্রবৃদ্ধি ব্যাহত এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের রুটি-রুজির বিষয়টি অনিশ্চিত করে তুলছে যে 'আকিলিসের গোড়ালী', তা নির্মূল করতে হবে। এই নির্মূল প্রক্রিয়াটি হতে পারে:

- *সম্পূর্ণ ব্যক্তিমালিকানাধীন করার* মধ্য দিয়ে — পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, আমদানী/বিতরণ (যেমন-সার, বীজ, শাক-সব্জি) ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল এসওই'কে বেসরকারীকরণ করতে হবে (ও প্রয়োজনে বন্ধ করে দিতে হবে)। বাজারে এখনো এ সকল এসওই সক্রিয়, যদিও বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাও যথেষ্ট, যার জন্য সরকারী অংশগ্রহণের কোনো যুক্তি এখন নেই।[৩০] এগুলো এখন ব্যক্তিমালীকানাধীন চলে যাওয়া উচিত। ঘর ২.২ তে সারের বেসরকারীকরণে সম্ভাব্য সুবিধার বিবরণ দেয়া হয়েছে, যদিও সারকে দীর্ঘদিন একটি 'স্পর্শকাতর' সামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বেসরকারীকরণ না হওয়া পর্যন্ত এসব এসওই'র প্রশাসনিক ও পরিচালনাগত তত্ত্বাবধান মূল মন্ত্রণালয়গুলির হাত থেকে নিয়ে নেয়া উচিত — যেমনটি উপরে সুপারিশ করা হয়েছে। এই দায়িত্বটি যথাযথ হোল্ডিং কর্পোরেশনের হাতে দিয়ে দেয়া যায়, যার আর্থিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকবে অর্থ বিভাগের এবি শাখা।

- *সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক করার* মধ্য দিয়ে — অপ্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একচেটিয়া বাজারে সক্রিয় অবশিষ্ট এসওই-গুলোর পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ ও যথেষ্ট বেসরকারীকরণ হচ্ছে একটি ভাল উপায়। এসব এসওই'র মধ্যে আছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাসন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা), তিতাস গ্যাস, এবং বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড-এর ভূমিভিত্তিক লাইন সার্ভিস সমূহ। বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সুস্পষ্ট কার্যপরিধি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে জবাবদিহিতা সৃষ্টি করতে হবে এবং কার্যসম্পাদনা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং সর্বসম্মত কঠোর বাজেট হ্রাসের ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সংস্কারের মূল উপাদনগুলি হল: ক্ষমতা/দায়দায়িত্ব/ মালিকানা ছেড়ে দেয়া, প্রতিযোগিতা, কঠোর বাজেট, স্বাধীন বোর্ডসমূহ, পেশাদারী ব্যবস্থাপনা, কার্যসম্পদনা-ভিত্তিক উদ্দীপক ব্যবস্থা এবং এসওই ও সরকারের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন। বাংলাদেশের একটি সফল প্রশাসন মডেল রয়েছে: দারিদ্র ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রশাসন কাঠামো। এসওই-সমূহের ক্ষেত্রে এটি অনুসরণ করা উচিত। পিকেএসএফ-এর একটি স্বাধীন বোর্ড রয়েছে, এর বেতন বাংলাদেশ সরকার থেকে আলাদা, এর কর্মী নিয়োগ পেয়েছে যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে — এবং এসবই এ প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একটি সফল আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রতীয়মান করেছে।

৫.৫১ যদিও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজারে এসওই-গুলির বাণিজ্যিকীকরণ দক্ষতা উন্নয়ন ও লোকসান ও বাজেট ভর্তুকি কমানোর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হতে পারে, চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এসব বাজারে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ। এর ফলে বাজেট দক্ষতার সাথে পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ফলে ভোক্তাদের লাভ হবে। **সেবাসমূহ সরকারী বা বেসরকারী, যেভাবেই দেয়া হোক, ভোক্তাদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং এর পাশাপাশি সরকারের উচিত এসব সেবা প্রদান ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে ক্রমবর্ধমান হারে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।**

---

[৩০] এদের মধ্যে আছে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠান : বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং ও বিনিয়োগ, হোটেল, পরিবহণ, পেট্রোলিয়াম আমদানী/পরিশোধন/বিতরণ, গ্যাস বিতরণ ও উৎপাদন।

৬. সরকারের কাজকর্ম — নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ

এই পরিচ্ছেদে সরকারের প্রশাসনিক পদ্ধতিসমূহকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে সরকারের নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার দিকে, এবং কোথায় উন্নয়ন সম্ভব সে সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে। এরপর আমলাদের যেসব নিয়ম মেনে চলতে হয়, সেদিকে এবং তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মানের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

৬.১ প্রতিটি সরকারের একটি মৌলিক দায়িত্ব হল সুদৃঢ় কিছু নীতির একটি কাঠামো গড়ে তোলা যার ভিতরে অর্থনৈতিক এজেন্টরা দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।[১] কোনো সুষ্ঠু নীতির পাঁচটি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটি:

- উদ্ভূত চাহিদার প্রতি *মনোযোগী* ।
- বিদ্যমান অন্যান্য নীতির সাথে *সঙ্গতিপূর্ণ* ।
- উল্টা-পাল্টা নীতি পরিবর্তন পরিহার করতে পারে, অর্থাৎ *অনুমানযোগ্য*।
- *বিশ্বাসযোগ্য,* যাতে এজেন্টরা গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলো গ্রহণ করতে পারে।
- *বাস্তবায়নযোগ্য,* এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে এমন পদক্ষেপ দ্বারা পরবর্তিতে সমর্থিত।

৬.২ যদিও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেশ কিছু চমৎকার নতুন নীতি বাস্তবায়িত করেছে, যেমন ভ্যাট-এর প্রচলন, যা উপরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের প্রতিটিতে ভাল নাম্বার পাবে, তবুও, সার্বিকভাবে অবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়।

- *মনোযোগ* — বেসরকারী খাত এবং জনগণের মধ্যে একটি দৃঢ় ঐকমত্য রয়েছে যে, বাংলাদেশে নীতি পরিবর্তন সাধারণত হয় 'অনেক দেরিতে, অনেক কম'। সবচেয়ে স্পষ্ট সাম্প্রতিক উদাহরণগুলির মধ্যে আছে বেসরকারীকরণ: এমনকি যেসব দেশ অনেক বেশি কঠিন সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থায় আছে, তারাও দ্রুত বেসরকারীকরণ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ বাংলাদেশ এখনও 'ধীরে চলার' পথে আটকে আছে। তাছাড়া, সরকার অনেকগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ও সুসংহত নীতি কাঠামো প্রতিষ্ঠায় খুবই ধীরে সুস্থে এগুচ্ছে। শিক্ষা, জ্বালানী, বেসরকারী খাত উন্নয়ন — সবগুলোতেই আছে সামূহিক কোনো বিবরণের অভাব, যা বর্তমান অর্থনৈতিক এজেন্টদের এবং নাগরিকদের কাছে 'বৃহৎ চিত্র'টি তুলে ধরতে পারত, অথবা বিশেষ নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা দিতে পারত।

---

[১] নীতি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের দায়দায়িত্বের একটি সুসংজ্ঞায়িত এলাকায় মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রমের জন্য একগুচ্ছ সুসংহত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কৌশল।

* *সঙ্গতিপূর্ণতা* — বিস্তারিত আন্তঃমন্ত্রণালয় পরামর্শ-প্রক্রিয়ার সুসঙ্গতি নিশ্চিত করা উচিত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়টি এখনও একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ: (১) তৈরি পোশাক-শিল্প খাতে সরকার ভ্যালু-এডেড বা মূল্য-সংযোজন বৃদ্ধি করতে এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ তৈরি করতে আগ্রহী, অথচ এটি গ্রে-ক্লথ আমদানী এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পগুলির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করছে; (২) সরকার জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রচুর গুরুত্ব দিচ্ছে, অথচ তা ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণমূলক হয়রানি ও খরচের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে; (৩) সরকারীখাতের যেসব একচেটিয়া অধিকার ছিল সেগুলিতে বেসরকারী খাতের প্রবেশ সরকার উৎসাহিত করতে চায়, অথচ বেসরকারী খাতের প্রবেশ উৎসাহিত করা বা সে বিষয়ে দরদস্তুর করার দায়িত্ব দিয়েছে পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ ডাক ও তার বোর্ড ও বিমান-এর মত এসওই-র হাতে, যাতে গুরুতর স্বার্থের সংঘাত দেখা দিয়েছে; (৪) ১৯৯৪ সালে ব্যবসায় লেনদেন সহজ করতে সরকার সকল রপ্তানির জন্য একটি স্বেচ্ছামূলক প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করে, অথচ এই বিচক্ষণ নীতিটি অচল করে দেয়া হয় ট্যারিফ ভ্যালু সংশোধনের দিকে অপর্যাপ্ত দৃষ্টি দিয়ে।

* *অনুমানযোগ্যতা* — অনেক নীতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পেট্রোলিয়াম আমদানীর ক্ষেত্রে বা বেসরকারী খাতে সার বিপণন এবং এসওই-সমূহ বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির ডিগবাজীর কথাটি উল্লেখ করা যায়।

* *বিশ্বাসযোগ্যতা* — কোনো নতুন নীতির ঘোষণা সাধারণত জনগণ কিছুটা অবিশ্বাসের সাথেই গ্রহণ করে। অনেকেই ভেবে থাকেন যে সরকারের নীতি ঘোষণার পেছনে পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো প্রকৃত অঙ্গীকার যতটা কাজ করে, তার থেকে বেশি কাজ করে দাতাদের শর্ত মেটানোর তাগিদ। আর যদি সরকারের বক্তব্যে অসঙ্গতি থাকে, তাহলে প্রতিক্রিয়াটি হয় আরো খারাপ। সংস্কার সম্বন্ধে নীতি নির্ধারকদের নানা ঘোষণা সংবাদপত্রে যেভাবে এসেছে, তার একটি বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (ঘর ৬.২) থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, নীতি নির্ধারকরা অসঙ্গতিপূর্ণ এবং স্ববিরোধী বক্তব্য দিচ্ছেন। যদিও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ বক্তব্যই সংস্কারের পক্ষে, এক্ষেত্রে সামান্যতম অসঙ্গতিও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে এমন একটি পরিস্থিতিতে যেখানে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন।

* *বাস্তবায়নযোগ্যতা* — সরকার যখন এমন সব নীতি ঘোষণা করে যেগুলো স্পষ্টতই অবাস্তব, তখনো প্রচুর সমস্যার সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে (বেশির ভাগ বয়স্ক) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। নীতিগত প্রতিশ্রুতিটি এখানে প্রশংসনীয় হলেও, এ ঘোষণাকে ব্যাপকভাবে হাল্কা ও বক্তৃতাধর্মী একটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে দেখা হয়, যা সাত বৎসর সময়সীমায় বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য, এবং যা প্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক বা মানবসম্পদের সুষ্ঠু মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে দেয়া হয়নি। একই ভাবে, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার শুল্ক সংস্কারের একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, কিন্তু এক্ষেত্রেও সম্ভাব্য কর অসঙ্গতিসহ অন্যান্য প্রভাব প্রতিক্রিয়া কী হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো বিশ্লেষণ হাতে নেয়া হয়নি; ধরে নেয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এটিকে একটি বাস্তবায়নযোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে অগ্রসর হবে। কিন্তু ট্যারিফ কমিশনের সামর্থ্য বাড়ানোর সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব ছিল না। ব্যাংক সহযোগিতা প্রদান করেছিল, কিন্তু এর বাস্তবায়ন পিছনে পড়ে থাকে। নীতি ঘোষণা এবং প্রকৃত বাস্তবায়নের মধ্যে ফারাকটি প্রায়শই বেসরকারী খাতের হতাশার কারণ হয় (ঘর ৬.৩)। এভাবে ১৯৯৪ সালের মে মাসে জ্বালানী মন্ত্রী একটি নীতি ঘোষণা করলেন যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে যে হারে গ্যাস দেয়া হচ্ছে,

সে একই হারে বেসরকারী খাতের বিদ্যুৎ-জেনারেটরের জন্য গ্যাস সরবরাহ দেয়া হবে। কিন্তু এই নীতিটি এখনও কার্যে পরিণত হয়নি। আমলাতন্ত্র ও বেসরকারী খাত উভয় ক্ষেত্রের কায়েমি স্বার্থের বাধার ফলে, এবং নীতি নির্ধারকদের তরফ থেকে ফলো-আপের অভাবের কারণে এটি সম্ভব হয়নি।

ঘর ৬.১. সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

সংস্কার কর্মসূচির ছ'টি মূল দিক সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের নীতি বিবরণীর সঙ্গতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য চারটি দৈনিক সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ হাতে নেয়া হয়। জুলাই, ১৯৯৩ থেকে জুন, ১৯৯৪ এই সময়সীমার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রী, অন্যান্য সব মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই বক্তব্য বা বিবৃতিসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় (এক্ষেত্রে ব্যক্তিনিষ্ঠ মূল্যায়ন পরিহার করা সম্ভব হয়নি)।

ক.	*ইতিবাচক*	-	যেভাবে পরিকল্পিত, সেভাবে বাস্তবায়িত।
খ.	*ঘোর নেতিবাচক*	-	আগের সংস্কারসমূহকে বাতিল অথবা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী করা।
গ.	*নেতিবাচক*	-	পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন, প্রধান বাধাসমূহ চিহ্নিত করা, অথবা বাস্তবায়ন মন্থর করা।

কোথায় ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেও বক্তব্য বিবৃতিসমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়: সংসদে; সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত কোনো প্রধান নীতি বিবরণীতে (যেমন- প্রধানমন্ত্রীর টেলিভিশন ভাষণ); সাক্ষাৎকারে, স্থানীয় অথবা বিদেশী কোনো সম্মেলনে, অথবা দাতাদেশসমূহের সাথে আলোচনা সভায়। সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে কিছু অমিল লক্ষ্য করা যায়: বাংলা সংবাদপত্র দু'টির মধ্যে একটি প্রবণতা বেশ স্পষ্ট আর সেটি হচ্ছে শ্রমিক ছাঁটাই ও ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ সম্পর্কে নেতিবাচক বিবৃতিসমূহের ওপর বিশেষ অলোকপাত করা। শুধু তা-ই নয়, সংস্কার সমর্থক বিবৃতি পরিবেশনেও এদের আগ্রহ কম। আনুপাতিক বিচারে বেসরকারী সংবাদপত্র দু'টি আরো বেশি নেতিবাচক বিবৃতি/বিবরণী তুলে ধরে। তথাপি ইতিবাচক বিবৃতি/বিবরণীর অনুপাত কিন্তু কম নয় — বাংলা সংবাদপত্রগুলোর ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আর ইংরেজিগুলোর ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ ভাগ। এ থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের কোনো উচ্চ-বাচ্য ছাড়াই সংস্কার বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রবণতা অংশত প্রতিফলিত হয়। রপ্তানি প্রবিধানে কোনো পরিবর্তন অথবা কোন নতুন এসআরও প্রচলন/প্রবর্তন সংক্রান্ত ঘোষণা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কর্তৃক সংবাদ মাধ্যমে প্রদত্ত কোনো বিবৃতিতে বা বিবরণীতে না এসে বরং মন্ত্রণালয় অথবা সংস্থার মুখপাত্রের কাছ থেকে আসা উচিত। সংবাদ মাধ্যমের জরিপে 'ইতিবাচক' বিবৃতির/বিবরণীর প্রতি সন্নিবিষ্ট পক্ষপাতের এটি একটি কারণ। উপরোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও নীতি সম্পর্কিত অবস্থানের প্রকৃতি ও বাংলাদেশ সরকারের সংস্কার কৌশলের সঙ্গতি সম্পর্কে জরিপটি আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে:

- সংস্কারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে (শুল্কনীতি, রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক খাত) বিবৃতিসমূহের মধ্যে অনৈক্য তেমন একটা নেই।
- অন্য তিনটি ক্ষেত্রে (মুক্ত বাজার, ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ ও কর্মচারীদের ছাঁটাই) প্রধানমন্ত্রী এবং বিশেষ করে অর্থমন্ত্রী সংস্কার-সমর্থক বক্তব্য/বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু অন্যান্য সরকারী নীতি নির্ধারকেরা ভিন্নমত ব্যক্ত করেন।
- কর্মচারীদের ছাঁটাই, ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ ও রপ্তানি নীতি — এই তিনটি নেতিবাচক বক্তব্য/ বিবৃতির অনুপাত সবচেয়ে বেশি।
- অর্থ মন্ত্রী এই সমস্ত নীতি বিবরণীর এক তৃতীয়াংশের সামান্য কিছু বেশি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত বক্তব্যের একটিও সংসদে প্রদান করেননি।
- সংবাদ মাধ্যমে প্রদানের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে মুক্তবাজার — যা থেকে অনুমান করা যায় এ ধরনের পদক্ষেপের সমর্থনে অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে।

জরিপের একটি সারণী নিচে দেয়া হল

সংবাদ মাধ্যম জরিপের সংক্ষিপ্ত সারণী
(জুলাই ১৯৯৩ - জুন ১৯৯৪)

সংবাদপত্রের নাম	ক ইতিবাচক	খ ঘোর নেতিবাচক	গ নেতিবাচক	মোট
	বিবৃতির সংখ্যা			
দৈনিক বাংলা	১০৪	১১	১৪	১২৯
সংবাদ	১০৩	১০	২১	১৩৪
ডেইলী স্টার	১৭৭	৭	১৬	২০০
বাংলাদেশ টাইমস্	১৬৬	৭	১৪	১৮৭

৬.৩ দু'টি প্রধান কারণে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপর্যাপ্ত হয়:

- *দুর্বল নীতি প্রণয়ন ক্ষমতা* — নীতিসমূহের ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে কারণ প্রণয়নের সময় এগুলোর পর্যাপ্ত বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করা হয় না। নীতি প্রণয়নের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রায়শই প্রযুক্তিগত দক্ষতা থাকে না এবং বিকল্প নীতি নির্দেশনার সম্ভাব্য প্রভাব অনুসন্ধানের জন্য যে কষ্টসহিষ্ণু গবেষণা প্রয়োজন তা চালিয়ে যেতে তারা ব্যর্থ হন। যা হোক, এ ছাড়াও কিছু পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (বিষয়টির সাথে যাদের সরাসরি সম্পর্ক নাও থাকতে পারে) মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালানো এবং ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার জন্য নীতি প্রণয়ন অনেক ক্ষেত্রে মন্থর হয়ে পড়ে। নীতি প্রণয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনও অস্পষ্ট: বৃহৎ অর্থনৈতিক নীতিসমূহের অধিকাংশই যখন অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়গুলি কর্তৃক প্রণীত হচ্ছে, খাতওয়ারী নীতিসমূহ প্রণয়নের দায়িত্ব থাকছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওপর।

- *দুর্বল বাস্তবায়ন ও প্রত্যবেক্ষণ ক্ষমতা* — আমলাতান্ত্রিক পর্যায়ে জোরালো অঙ্গীকারের অনুপস্থিতি থেকে এর উদ্ভব। দাতার উদ্যোগে কোনো নীতি প্রবর্তিত হলে প্রায় সময়ই এমনটি ঘটে। নীতিটি প্রণয়ন করার সময় প্রকৃত প্রতিবন্ধকতাগুলি চিহ্নিত না করার কারণে অথবা সীমিত সামর্থ্যের কারণে নীতিটির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে যে কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন সরকারী কর্মকর্তাদের তা নাও থাকতে পারে।

ঘর ৬.২. "নীতিগতভাবে মেনে নেয়া হল", কিন্তু বাস্তবে কি ঘটে ?

বাংলাদেশে নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার অভাব না থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন আশানুরূপ হয় না। নীতি ঘোষণা ও অপ্রতুল বাস্তবায়নের মধ্যে বিরাজমান অসংলগ্নতার প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে : নীতি নির্দেশনার অস্পষ্ট প্রকৃতি, আমলাতান্ত্রিক অঙ্গীকারের অভাব, প্রকৃত প্রতিবন্ধকতাসমূহ আগাম চিহ্নিতকরণে অক্ষমতা, এবং সর্বোপরি দুর্বল প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি/ব্যবস্থা। খুব হৈ-হুল্লোর করে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কার্যকর হতে ব্যর্থ হয়েছে এমন কয়েকটি নীতির জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ নিচে দেয়া হল:

- *বেসরকারী বিদ্যুৎ সরবরাহ* — বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার জন্য ১৯৯২ সালে শিল্প নীতি ১৯৯১ সংশোধন করা হয়। সংরক্ষিত তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার ফলে এই দু'টি ক্ষেত্রে বেসরকারী অংশগ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। দু'বছর পর মন্ত্রিপরিষদ বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কিত সংস্কার "নীতিগত ভাবে" অনুমোদন করে। সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন সিদ্ধান্ত — যার মধ্যে পাওয়ার সেল গঠনের বিষয়টিও অনুর্ভূক্ত — নিতে লেগে যায় আরও একটি বছর। এত কিছুর নিট ফলাফল হচ্ছে এই যে তিন বছর পরেও বিদ্যুৎ খাতে একটিও বেসরকারী বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যায় না।

- *বেসরকারী খাতের টেলিযোগাযোগ* — বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৯ এর সংস্কারের প্রতি অঙ্গীকার প্রকাশ করে মন্ত্রিপরিষদ ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি টেলিযোগাযোগ সংস্কার পত্র অনুমোদন করে, যাতে করে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণমুখী কার্যাবলী এর পরিচালনাগত দায়-দায়িত্ব থেকে আলাদা করা যায়। আজ পর্যন্ত প্রণীত আইনটি মুলতবী পড়ে আছে। বৃহত্তর বেসরকারী অংশগ্রহণের পথে এটি একটি বিরাট বাধা।

- *ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ/বেসরকারীকরণ বোর্ড* — ১৯৯৪ সালের গোড়ার দিকে সরকার নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাধীনকরণ (প্রাইভেটাইজেশন) বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৩টি রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে বের করে আনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। তবে নীতি প্রণয়নের উদার অঙ্গীকার অথবা বোর্ড গঠন — এগুলোর কোনোটিই এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ফলাফল প্রদান করেনি।

- *বিমান সংস্থা বিনিয়ন্ত্রণকরণ* — ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে মন্ত্রিপরিষদ বিমান চলাচল খাতে বেসরকারী অংশগ্রহণ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ রুটে বাংলাদেশ বিমান চলাচল করছে না, কেবলমাত্র সেই সমস্ত রুটে এই উন্মুক্তকরণ সীমাবদ্ধ রাখা হয়। যা হোক, স্বল্প পাল্লার উড্ডয়ন ও অবতরণ সার্ভিস এর ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধের কারণে একটিও বিমান সংস্থা কাজ শুরু করেনি।

- *বন* — সাম্প্রতিককালে মন্ত্রিপরিষদ বন নীতি অনুমোদন করেছে, কিন্তু সহায়ক বিধি-বিধান ও কার্যপ্রণালীর অভাবে বাস্তবায়ন বেশি দূর এগোয়নি। বছর খানেক আগে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কিত নীতি-বিধান তৈরির জন্য তিনটি কমিটি গঠন করে, কিন্তু এখনও এদের কাজ বেশি দূর এগোয়নি।

- *রপ্তানিকারকদের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট তহবিল* — ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানিকারকদের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। তারপর দু'বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তহবিল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শুধু তা-ই নয়, এটি প্রতিষ্ঠার কোনো কর্মোদ্যোগও গৃহীত হয়নি।

- *চলতি হিসাবের লেনদেন* — IMF-এর একাদশ আর্টিকল স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ চলতি হিসাবের সমস্ত লেনদেন উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭ (১৯৭৮ সালে সংশোধিত) এবং (মুদ্রা) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা (যেখানে অসংখ্য প্রবিধানের উল্লেখ রয়েছে) এখনও কার্যকর থাকায় নীতিটির উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

৬.৪ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উন্নত করার অসংখ্য পথ রয়েছে।

- *নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যবেক্ষণ ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ* — নীতি বাস্তবায়ন প্রত্যবেক্ষণে IMED-এর ভূমিকা বিস্তৃত করার মাধ্যমে এটি অর্জিত হতে পারে।

- *স্থানীয় থিংক ট্যাঙ্ক (চিন্তা কেন্দ্র) ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অন্তর্ভূক্তি প্রবর্তন করা* — কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়াতে ও নীতি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে যোগ্য কর্মকর্তাদের পুনর্বিন্যস্ত করতে সরকার এরই মধ্যে পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। কিন্তু সরকারের উচিত বাইরের পেশাজীবীদের আরো ভালভাবে কাজে লাগানো। উদাহরণ হিসেবে BIDS (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ) এর সংগে যারা যুক্ত তাদের কথা বলা যেতে পারে। পেশাদারী নৈপুণ্য কিছুটা হারানোর পরও বিআইডিএস এখনও দেশের অন্যতম প্রধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। শিক্ষাজীবী সম্প্রদায়ের সদস্যরাও স্বাধীন-পেশাদারী সমালোচনা ও পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারেন। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি যেমন বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি ও বিষয়সমূহ আলোচনা করে আসছে, বিশেষ করে বাজেট ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে যেগুলো সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কুশলতাও এক্ষেত্রে সমৃদ্ধ উৎস হতে পারে। এর কারিগরী কমিটি এ মুহূর্তে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগের উপর কাজ করছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ও সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ এর মত নীতি সংক্রান্ত চিন্তাকেন্দ্রের বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। এই সমস্ত নীতি-কেন্দ্রিক ফোরামসমূহ একাধারে পরিকল্পনা পর্যায়ে বিশ্লেষণাত্মক এবং খসড়া নীতিসমূহের সমালোচনা প্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সামর্থ্য বাড়ানো — বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতি পরিকল্পক ও সমন্বয়ক সেলসমূহকে জরুরী ভিত্তিতে শক্তিশালী করে তোলা দরকার। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখা ও নীতি পরিকল্পক ইউনিটের একত্রিকরণ এ লক্ষ্য অর্জনের একটি ফলপ্রদ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই সব শক্তিশালী পলিসি বা নীতি সংক্রান্ত ইউনিটসমূহ যেমন মধ্য-মেয়াদী নীতি ও কার্যক্রম তৈরি করবে, তেমনি ভাবে তৈরি করবে দীর্ঘ মেয়াদী ও কৌশলগত নীতি। শুধু তা-ই নয়, খাতসমূহের কার্য-সম্পাদন প্রত্যবেক্ষণের দায়িত্বও থাকবে এই পলিসি ইউনিটগুলির ওপর। যা হোক, নীতি প্রণয়ন যেহেতু একটি বহুবিষয়ক কর্মকাণ্ড, এই ইউনিটসমূহে সেই সব কর্মকর্তাদেরকে নিযুক্ত করতে হবে, যাদের একাধিক প্রাসঙ্গিক দক্ষতা রয়েছে — যেমন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, আর্থিক বিশ্লেষণ, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা। বিশেষ করে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত সেলকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রযুক্তিগত ও পেশাদারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ আরেকটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিষদ প্রতিষ্ঠা একটি সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু এর নীতি প্রণয়নের ভূমিকা আরো বিস্তৃত করতে হবে। সরকারের পরিকল্পনা সামর্থ্য এবং পরিকল্পনা কমিশনের সার্বিক পর্যালোচনার

অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়গুলির সামর্থ্য বাড়াতে হবে। নতুন নিয়োগ ছাড়াই পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান পেশাজীবী কর্মকর্তাদের পুনর্বিন্যাস ও পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়গুলির সামর্থ্য জোরদার করা সম্ভব।[২]

- *অংশগ্রহণমূলক মনোভাব উৎসাহিত করা* — উন্নত প্রশাসনের একটি মূলনীতি হচ্ছে, সেসব ব্যক্তির মতামত আহ্বান করা, যারা কোনো নীতির দ্বারা প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বর্তমানে অধিকাংশ শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ সংশ্লিষ্ট নাগরিক গোষ্ঠির সাথে নিয়মিত পরামর্শ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্য সরকার অসংখ্য 'শ্বেত' অথবা 'সবুজ' পত্রের মাধ্যমে জনগণকে প্রস্তাবিত নীতিসমূহ সম্পর্কে অবহিত করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে বাজেটের আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শুরু হওয়ার আগেই — অনেক সময় অর্থ বছর শুরু হবার কয়েক মাস আগেই — প্রস্তাবসমূহ জনগণের জানা হয়ে যায়। *বাংলাদেশে প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গোপনীয় একটি বিষয় — অবশ্য উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগসম্পন্ন ব্যক্তিদের কথা আলাদা।* তবে অতি সাম্প্রতিককালে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং আরো কিছু কিছু মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর এই অংশগ্রহণমূলক মনোভাব অবলম্বন করছে। কিন্তু প্রক্রিয়াটির আরো নিয়মানুগ ও যথাযথ হওয়া প্রয়োজন। অংশগ্রহণ আহ্বানের মধ্যে ঝুঁকি অবশ্যই আছে, বিশেষ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন স্বার্থান্বেষী মহল দ্বারা ছিনতাই হয়ে যেতে পারে। এই ঝুঁকি ন্যুনতম করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে বহুবিধ এবং পরস্পর ভারসাম্যরক্ষাকারী গোষ্ঠিসমূহের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা। কিন্তু দক্ষ সরকারী কর্মকর্তাদেরকে কোন নীতি পরামর্শ একটি বিশেষ সোচ্চার গোষ্ঠির উপকার করছে এবং কোনটি সাধারণভাবে জনস্বার্থ রক্ষা করছে — এ দু'য়ের পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হতে হবে।

প্রশাসনিক নিয়মকানুন ও সিদ্ধান্তগ্রহণ

"সরকারের ভিতর সকল উদ্দীপনা একটি লক্ষ্যেই ধাবিত, এবং সেটি হল: ভুল করা যাবে না। অসংখ্য নিবেদিত, সৎ, এবং উদ্বুদ্ধ মানুষ আছেন যারা সরকারের জন্য কাজ করেন। এদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে যেসব পদ্ধতির মধ্যে তারা কাজ করেন সেসব পদ্ধতি নিয়ে। সরকারের মধ্যে অনেক যোগ্য মানুষ আছেন, কিন্তু তারা রুগ্ন পদ্ধতি ও পরিবেশে বন্দী হয়ে আছেন।"

---

২ পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা নতুন করে চিন্তা ভাবনা করা অতি প্রয়োজন। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা যখন তুঙ্গে এবং এখনো এটি সেই উত্তাধিকার ও ধারা বহন করে চলেছে। উর্ধতন নীতি নির্ধারকেরা (কমিশনের সাথে যারা যুক্ত তারা বাদে) একটি বিষয়ে (যে বিষয়টি এ প্রতিবেদনেও প্রতিফলিত) একমত যে, নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে : (১) মোটরগাড়ি ও বাই-সাইকেল গণনা থেকে এর ভূমিকা পরিকল্পনা ও আন্তঃখাতীয় বিষয়সমূহের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে ; (২) সমস্ত পিসিপি, পিপি এবং টিএপিপি অনুমোদনের ক্ষমতা পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে সরিয়ে মন্ত্রণালয়সমূহকে প্রদান করতে হবে। পরিকল্পনা কমিশন একনেক (ECNEC) এর উপদেষ্টা/পরিষদ হিসেবে কাজ করে যাবে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের নিরীক্ষণ ছাড়াই সমস্ত প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি একনেক -এ চলে যাবে। কোনো পিসিপি অথবা টিএপিপি অনুমোদনের সময় পরিকল্পনা কমিশনের অভিমত যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় দ্বারা খারিজ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি একনেক পর্যায়ে আলোচনার জন্য ছেড়ে দিতে হবে; (৩) পরিকল্পনা কমিশনকে খুব দক্ষ ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের একটি ছোট ইউনিট (৩৫-৪০ জন কারিগরী কর্মকর্তা) এ পরিণত করতে হবে এবং বাড়তি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে (যাদের সংখ্যা ৬০০ এর কিছু বেশি) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতি/প্রকল্প প্রণয়নের ইউনিটগুলি শক্তিশালী করতে পুনঃবিন্যস্ত করতে হবে।

৬.৫ সরকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হন। এই সমস্ত নিয়মকানুনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রুলস্ অফ বিজিনেস এবং সচিবালয় নির্দেশনা।[৩] এই নিয়মকানুনসমূহ ক্ষমতা বন্টন করে, দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করে, আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা কাঠামো নির্দেশ করে এবং কার্যপ্রণালী ঘটিত নির্দেশাবলী প্রদান করে। অনেক ভাল দিক থাকা সত্ত্বেও এসব নিয়মকানুন কোনো কার্যকর, সুদূর প্রসারী এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদের ব্যর্থতার কারণে আমলাতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের বিদ্যমান নির্মাণ কাঠামো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার এবং যুক্তিসম্মত ভাবে পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও এখন পর্যন্ত এসব চিন্তা-ভাবনার বাস্তবায়ন হয়নি।[৪] বর্তমান অসন্তোষের দু'টি সুস্পষ্ট দিক রয়েছে: প্রথমত পদ্ধতিটি, বিশেষ করে দক্ষতা ও উন্মুক্ততার দিক থেকে, দ্রুত উন্নয়নকামী একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অনুপোযোগী; এবং দ্বিতীয়তঃ নিয়মকানুন জানার ও মেনে চলার মানসিকতা খুবই কম। এ থেকে বেসামরিক প্রশাসনের কার্যসম্পাদনে অবনতি এবং জবাবদিহিতা ও প্রত্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াসমূহের অবলুপ্তির বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৬.৬ এই সমস্ত কার্যপ্রণালী ঘটিত দুর্বলতার ফলাফল হচ্ছে এমন একটি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা একাধারে গোপনতাপ্রিয় এবং শ্লথ। এর প্রক্রিয়াসমূহ অস্বচ্ছ এবং সে কারণে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারে সহজে ব্যবহারযোগ্য। এর নিয়ন্ত্রণসমূহ অনাবশ্যকভাবে কঠোর এবং ক্রমাধিকারতান্ত্রিক। সমস্যার অনেকটাই উদ্ভূত হচ্ছে নিয়ন্ত্রণসমূহের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা থেকে। আর এই নিয়ন্ত্রণসমূহ কার্যসম্পাদনা নয় বরং নিয়মকানুন/বিধান ভিত্তিক। আমলারা সাধারণত নিয়মকানুন ও পূর্বদৃষ্টান্তের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন এবং ফলাফলের মানের দিকে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হন। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিও বেশ জটিল। বহুবছরের পুরনো এবং অসংখ্য অপ্রাসঙ্গিক 'নোট' ও সুপারিশে ফাইলবন্দী দলিলপত্র ঘেঁটে-ঘুঁটে তবেই তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও ফাইল ও 'বিচলন রেজিস্টার' এর ব্যাপারে সচিবালয়ের নির্দেশনামা যথেষ্ট স্পষ্ট, তবুও ফাইলগুলি অসংখ্য বাধা বিপত্তির আবর্তে পড়ে, এবং এগুলোর হারিয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। সংক্ষেপে, কোনো বিষয়ের খবর রাখার জন্য আধুনিক কোনো প্রত্যবেক্ষণ পদ্ধতি নেই। এই বিলম্ব অপর্যাপ্ত ভৌত সুবিধা এবং, কোনো কোনো পর্যায়ে, অতিরিক্ত কাজের চাপে প্রতিফলিত হয় — যা সুস্পষ্ট চাকুরি বিবরণীর অভাবের জন্য আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

৬.৭ বেসামরিক প্রশাসনের মানের অবনতিও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দক্ষতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, বিশেষ করে যারা নিম্নস্তরে আছেন, পর্যাপ্ত আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে। এ অবস্থার জন্য দায়ী বিধিবিধান সম্পর্কিত জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাব এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি।[৫] এ সমস্ত কারণ নিম্নোক্ত আচরণসমূহের জন্ম দিয়েছে:

---

[৩] অন্যান্য নিয়মকানুন ও আইন -এর মধ্যে আছে : সরকারী/দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন (১৯২৩); সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধি (১৯৭৯); সরকারী কর্মচারী (বিশেষ সুবিধা) অর্ডিন্যান্স (১৯৭৯); বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধান (১৯৭৯); প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল আইন (১৯৮২); পাবলিক সার্ভেন্ট (অভিযুক্ত হওয়ায় বরখাস্তকরণ) অর্ডিন্যান্স (১৯৮৫); প্রশাসনিক ক্ষমতা ডেলিগেশন; আর্থিক ক্ষমতা ডেলিগেশন; ট্রেজারী রুলস; বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস্; সাধারণ অর্থ সংক্রান্ত নিয়মাবলী; এবং বাংলাদেশ ফাইনানসিয়াল রুলস।

[৪] দেখুন ঃ "কী কন্সট্রেইন্টস ইন দি সেক্রেটারিয়েট সিস্টেম এন্ড ওয়ার্ক প্রসিজ্যুর", বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত *পাবলিক সার্ভিস এডমিনিস্ট্রেশন এফিশিয়েন্সি* এর ২য় খণ্ড (১৯৮৯)।

[৫] সাক্ষাৎকার ও একটি জরিপের ভিত্তিতে রচিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, "অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কমপক্ষে অর্ধেকেরই বিধিবিধান ও নির্দেশাবলী সংক্রান্ত জ্ঞান খবুই অসন্তোষজনক।" কর্মকর্তাদের মতে এই কমতি অপর্যাপ্ত পদ-অন্তর্ভূক্তি ও চাকুরি-কালীন প্রশিক্ষণের অভাবকেই প্রতিফলিত করে। *পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এফিশিয়েন্সি স্টাডি*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭।

- পুনঃসমর্থন করা, যাতে করে ঝুঁকি ও দায়িত্ব (স্তরবিশিষ্ট এবং সমষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ) ছড়িয়ে দেয়া যায়।

- ভীতি ও হতাশার একটি সংস্কৃতি এবং এমন একটি উপলব্ধি যে, সাধারণ বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ ও সৃজনশীলতা বিপদজনক। কর্মচারীরা জেনে গেছেন ফলাফল নিশ্চিত করা, গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করা অথবা করদাতার টাকা কামানো নয়, বরং ভুল এড়িয়ে চলাই মূল লক্ষ্য।

- পূর্বদৃষ্টান্তের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের প্রতি যথার্থ মনোযোগ ছাড়াই আপাতদৃষ্টিতে অনুরূপ বর্তমান বিষয়ের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ।

- রুটিন মাফিক বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য উচ্চতর পর্যায়ে — এমনকি মন্ত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত — ফাইল প্রেরণের প্রবণতা। বিধিবিধান সম্পর্কে অনিশ্চিত উপলব্ধি, এবং কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নীতি প্রণেতাদের সুনির্দিষ্ট স্বার্থ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকে এই প্রবণতার উৎপত্তি; তবে সময় ক্ষেপণকারী কাউকে এর সমালোচনা করতে সচরাচর দেখা যায় না।

- উর্ধতন কর্মকর্তার লিখিত সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কাজ করতে অসম্মতি। পারস্পরিক অনাস্থার এটি একটি লক্ষণ এবং এমন একটি পরিবেশের চিত্র এটি তুলে ধরে যেখানে প্রতিটি কর্মোদ্যোগের একটি ভিন্ন অর্থ করা হয় এবং যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ সন্দেহের চোখে দেখা হয় এবং প্রতিটি বিতর্কিত সিদ্ধান্তকে অবৈধ কার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- বিব্রতকর বা অসুবিধাজনক বিষয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিজ থেকে মিটে যাবে অথবা অন্যান্য ঘটনায় ধামাচাপা পড়ে যাবে এই রকম অনিশ্চিত আশায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত করার প্রবণতা।

৬.৮ অদক্ষ হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ ও রূপরেখার প্রতি এটি একটি যুক্তিযুক্ত প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে। উদ্যোগ গ্রহণ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমলাদের যদিও বা দণ্ড দেয়া হয়ে থাকে বিলম্বের জন্য তাদেরকে কদাচিৎ শাস্তি দেয়া হয়। তাই বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন যন্ত্র অদক্ষভাবে ও মন্থরগতিতে কাজ করায় বিস্ময়ের কিছু নেই। এটি যে আদৌ কাজ করছে সেটিই আশ্চর্যের বিষয়।

রুলস্ অফ বিজনেস

৬.৯ বর্তমান রুলস্ অফ বিজিনেস (১৯৭৫) এবং এর সহায়ক সচিবালয় নির্দেশনামা (১৯৭৬) অনেকাংশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের ফসল।[৬] প্রায়শ ভীষণ জটিল, অস্পষ্ট ভাষায় লিখিত এবং প্রাচীন শর্তে আবদ্ধ এই সমস্ত ও অন্যান্য বিধিবিধান অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয়ে পূর্ণ যা আসল পথ নির্দেশনা ও প্রধান

---

[৬] "১৯৪৫ সালে স্যার রিচার্ড টোটেনহাম বিধিবিধান ও নির্দেশাবলীর সমস্যার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে, দু'টি শব্দবন্ধে শাসন ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা যায়— অতিরিক্ত নোট করা ও ফাইল চালাচালি, যার সম্মিলিত ফল হচ্ছে বিলম্ব ও অদক্ষতা।" দেখুন: *পাবলিক এডিমনিস্ট্রেশন এফিশিয়েন্সি স্টাডি*, ২য় খণ্ড, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৯), পাদটিকা পৃঃ৭২।

সূত্রকে আড়াল করে দেয়। ফলস্বরূপ এই বিধিবিধানসমূহ নমনীয়তা, সংস্কার ও সহজ সমাধান নিরুৎসাহিত করে।[৭] উনিশ শতকে ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি চালু হয়েছিল কিন্তু এখন একজন কর্মকর্তার পক্ষে সমস্ত প্রশাসনিক বিধিনিষেধের একটি পূর্ণাঙ্গ সেট সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। তবে সবচেয়ে ভয়ানক বিষয়টি হল এই যে, প্রাসঙ্গিক বিধিবিধানসমূহ হচ্ছে সাবেক প্রাদেশিক বিধিবিধান (দি বেঙ্গল সার্ভিস রুলস, পরে ইস্ট পাকিস্তান সার্ভিস রুলস ও বর্তমানে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস নামে পরিচিত) ও কেন্দ্রীয় বিধিবিধানের (যেমন সাধারণ অর্থ-বিধান) একটি উদ্ভট সংমিশ্রণ। সংস্থাপন নির্দেশিকায় সংস্কার ও সংযোজনসমূহ সংকলিত হয়েছে কিন্তু তারপরও বিভিন্ন বিধিবিধানের প্রয়োগযোগ্যতা ও পূর্ব-উদাহরণ নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার একই বিষয়ে বিধিনিষেধ জারী করার প্রবণতা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। যেমন — অর্থনৈতিক সম্পদ বিভাগ (১৯৯২), অর্থ মন্ত্রণালয় (১৯৯৪) এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত সারকুলারসমূহের সাধারণ বিষয় হচ্ছে, সংগ্রহের আর্থিক সীমাবদ্ধতা।

৬.১০ বিস্তারিত নিয়মবিধি ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ইত্যাদির প্রতি পক্ষপাতিত্বের সূত্রপাত হচ্ছে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কাজের প্রতি ঐ প্রশাসনের অখণ্ড মনোযোগ। কাজ দু'টি ছিল, রাজস্ব আদায় এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, এবং একই সাথে মৌলিক সেবার কিছুটা সরবরাহ করা। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নিচের স্তরকে খুব বেশি ক্ষমতা দেয়া হত না। তিনটি উত্তর-ঔপনিবেশিক ঘটনা প্রবাহ এই ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছে। প্রথমত, সরকারের চরিত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে; এর কার্যাবলীই শুধু বিস্তৃত হয়নি, জনসেবার পরিসর ও প্রকৃতিও বদলে গেছে। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রায়ন এখন অধিকতর সাড়া ও মনোযোগ দাবী করে, এবং তৃতীয়ত, অবাধ সরকারী ক্ষমতার বহুবিস্তৃত অপব্যবহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুরক্ষামূলক স্তর এবং খুঁটি-নাটি পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষার একটি বিস্তৃত পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এর ফলে অনেকে অন্যের করা কাজ পরীক্ষা করে সময় কাটান। অধিকাংশ আমলা এ জন্য ঝুঁকি এড়ানোর কৌশল অবলম্বন করেন — আর এভাবেই অস্বস্তি ও অনাস্থার একটি অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৬.১১ বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হলেও এই পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিধিবিধান পরিবর্তিত হয়নি। আর এ থেকেই কিছু কিছু সমস্যার উৎপত্তি। উদাহরণস্বরূপ — সংসদের প্রতি মন্ত্রীদের যে একটি প্রত্যক্ষ ও সমষ্টিগত দায়িত্ব রয়েছে তা এই বিধিবিধানসমূহ প্রতিফলিত করে না; এর পরিবর্তে মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে কেবলমাত্র সহায়তা ও পরামর্শ দিতে কাজ করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে অসংখ্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সরাসরি স্থাপন করায় ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ আরো বলিষ্ঠ হয়েছে। এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অজস্র গতানুগতিক প্রশাসনিক কাজে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

৬.১২ মন্ত্রী ও সচিবদের মধ্যে রুলস অফ বিজিনেস থেকে উদ্ভূত মতানৈক্যের একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কে হবেন। ক্রমাধিকারতান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের এই পদবী শুধু ব্যয়ের ক্ষেত্রে নয়, বরং কার্যত সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী কে, তা নির্ধারণ করে। মন্ত্রীরা সাধারণত আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তাদের পর্যায়ে কেন্দ্রীভূত রাখতে চেষ্টা করেন। মন্ত্রী ও সচিবদের মধ্যে উদ্ভূত এই দড়ি-টানাটানি শাসন ব্যবস্থার সহজ ক্রিয়াশীলতাকে ক্রমশ দুর্বল করে দেয়।

---

৭ অপ্রয়োজনীয় রকম জটিল খসড়া তৈরির একটি উদাহরণ বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (প্রথম খন্ড) এর ৫৪ নং বিধির নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ থেকে দেখা যেতে পারে, যা ১৯৩৭ সালের বেঙ্গল সার্ভিস রুলস-এর ওপর ভিত্তি করে করা: "৭ম অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে একজন সরকারী কর্মচারী, যিনি একটি পদে কার্যচালনার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি স্থায়ী পদের বিপরীতে দেয় (টেন্যুর পদ ছাড়া) বেতনের উচ্চতর বেতন নিতে পারবেন না, যদি না কার্যচালনা-নিযুক্তি এমন কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত হয়, যেগুলো ঐ পদের সংগে যুক্ত (টেন্যুর পদ ছাড়া) – যার ক্ষেত্রে তার একটি লিয়েন আছে – অথবা লিয়েনটি মুলতবী না হলে লিয়েন নিতে পারবেন। এই নিয়মের সুবিধার জন্য কার্যচালনা নিযুক্তি এমন কোনো বৃহত্তর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত হবে না, যা স্থায়ী পদের বেতনসহ (টেন্যুর পদ ছাড়া) একই স্কেলে দেয়া হয়।" *পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন এফিশিয়েন্সি স্টাডি* (১৯৮৯), পৃঃ ৬৩।

৬.১৩ সেকেলে হলেও সচিবালয় নির্দেশনামা অন্ততঃপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাস্তবে এই সমস্ত পথ নির্দেশনা মেনে চলা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদিওবা নির্দেশ আছে যে সচিব বাদে দু'জনের বেশি কর্মকর্তা কোনো ফাইলের উপর মন্তব্য বা কাজ করতে পারবেন না, প্রকৃত পক্ষে অজস্র ফাইল মধ্যবর্তী ছ'টি পর্যায় পেরিয়ে তবেই মন্ত্রীর কাছে পৌঁছায়।[৮] এই সমস্ত ফাইল একই পথে অসংখ্য আদেশ-নির্দেশপূর্ণ হয়ে ফিরে আসে — কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তবা উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য এদেরকে আবারও পাঠানো হয়। সচিবালয় নির্দেশনামায় বিলম্ব এড়ানোর সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশনাও দেয়া আছে : নীতি সংক্রান্ত অথবা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (যে ক্ষেত্রে সচিবের সিদ্ধান্ত অপরিহার্য) ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে। এতদ্‌সম্পর্কে অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিবকে কর্তৃত্বের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র দেয়া হয়েছে, সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য তারা পুরো দায়-দায়িত্ব নিতে পারেন এবং এই সমস্ত সিদ্ধান্ত সরাসরি মন্ত্রীর কাছে পেশ করতে পারেন। আরো আছে বিভিন্ন বিষয়ে কাজের নির্দিষ্ট সময়-সীমা — সহকারী সচিবদের ক্ষেত্রে ৭২ ঘন্টা, উপ-সচিবদের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টা এবং অতিরিক্ত সচিব ও তদুর্ধ সচিবদের ক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা।

৬.১৪ এ ছাড়াও, অসংখ্য সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। প্রথমত, কোনো সংস্থায় না আছে ফাইল হস্তান্তরের গতি প্রত্যবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা, না আছে বিষয়-আশয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কোনো চাপ। দ্বিতীয়ত, অফিস সময় হচ্ছে সকাল আটটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত — এর মধ্যে আছে দুপুর একটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত আধ ঘন্টার বিরতি। এভাবে কর্মদিবস অধিকাংশ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মদিবসের চেয়ে কমপক্ষে দু'ঘন্টা কম।[৯] তৃতীয়ত, জনগণের সাথে মেলামেশায় গোপনীয়তা বজায় রাখার আমলাতান্ত্রিক অভ্যাসের কারণে জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা ভীষণ দুষ্কর। চতুর্থত, স্বেচ্ছাচারী আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন/প্রতিবাদ করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেই। পঞ্চমত, ইংরেজির ব্যবহার বাড়লেও ইংরেজিতে ভাল দখল আছে এমন কর্মকর্তার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।[১০]

কেন্দ্রীভূত ও বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৬.১৫ বর্তমানে বাংলাদেশে এই তিন কারণেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যর্থ হচ্ছে। উপরের আলোচনায় যেমন লক্ষ্য করা গেছে — মূল সমস্যাটি পুরোপুরি বিধিবিধানসমূহে নিহিত নয় কারণ এই বিধিবিধানসমূহ দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, জরুরী ফাইল প্রক্রিয়াকরণ করতে, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করতে, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প প্রফর্মা ও PC সমূহ প্রক্রিয়াকরণের চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করতে সচিবালয় বিধিবিধানসমূহ বরং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা নিশ্চিত করে থাকে। এবং রুলস

---

[৮] কোনো মন্ত্রণালয়ের এই পর্যায়গুলো হচ্ছে সাধারণত: শাখা সহকারী; সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব; উপ-সচিব; যুগ্ম-সচিব; অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব।

[৯] এই বিরতি নামাজের জন্য। দেরিতে আসা ও আগে চলে যাওয়া – কর্মকর্তাদের এই অভ্যাসটি খুব সাধারণ একটি ব্যাপার। আশির দশকের গোড়ার দিকে অফিস সময় বিকেল ৪ টা পর্যন্ত বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু নিম্ন বেতনভূক কর্মচারীদের, যাদের অনেকেই অন্যান্য চাকরী অথবা ব্যবসার সাথে যুক্ত, বিরোধিতার মুখে এই পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়।

[১০] অফিসে কাজ কর্মে বাংলার ব্যবহার বাড়ানোর যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে। এই সমস্ত কারণের মধ্যে রয়েছে : ন্যায়-নীতি, যেহেতু অধিকাংশ স্কুলে বাংলা হচ্ছে পাঠদানের ভাষা; জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা; এবং ব্যাপক ভিত্তিক নিয়োগের সুযোগ। দেশীয় জ্ঞানের আধিপত্য – এমনকি যা ইংরেজি বর্জন পর্যন্ত পৌঁছে যায় – কোরিয়া এবং থাইল্যান্ডের মত দেশসমূহের উন্নয়ন ব্যাহত করেনি।

অফ বিজিনেসে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া আছে যে দু'জনের বেশি কর্মকর্তা কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবেন না। তথাপি বাস্তবে, পূর্বালোচিত কারণসমূহের জন্য, অমীমাংসিত বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিরোধ লক্ষ্য করা যায়।

৬.১৬ আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রায় অচলাবস্থার জন্য দায়ী কারণসমূহ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে এই সমীক্ষা বাংলাদেশ সরকারের চল্লিশজন উর্ধতন কর্মকর্তার কাছে একটি প্রশ্নপত্র প্রদান করে।[১১] এভাবে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া/তথ্য থেকে জানা যায় যে বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে, গুরুত্ব-ভিত্তিক ক্রমানুসারে: (১) সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত করার কারণে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না; (২) অত্যধিক অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজনীয়তা; এবং (৩) অপর্যাপ্ত বেতন ভাতা। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে "জবাবদিহিতার অভাব" বিলম্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধানতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বস্তুত বিলম্বের জন্য কোনো জ্ঞাত শাস্তি নেই। এমনকি সরকারী অফিসসমূহে ফাইলের গতিবিধি অনুসরণ করার জন্য কার্যকর কোনো প্রত্যবেক্ষণ ব্যবস্থাও নেই। একটি উপযুক্ত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি মূলত এটাই প্রমাণ করে যে সাফল্যের জন্য যেমন আছে যৎসামান্য পুরস্কার তেমনিভাবে ব্যর্থতার জন্য রয়েছে সামান্য দণ্ড।

৬.১৭ বাংলাদেশে আমলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি নিরন্তর উচ্চ পর্যায়ে ঠেলে দিতে অধিকতর বেশি পছন্দ করেন, এমনকি যখন নিম্ন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধিবিধান রয়েছে তখনও। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ বিষয় প্রেরণের অভ্যাসটি এক্ষেত্রে চরম উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে — সেমিনার অথবা কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় অনুমতি; স্বল্প মেয়াদী অথবা বৃহৎ প্রযুক্তিগত সাহায্য চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগের অনুমোদন; এমনকি অধস্তন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও বদলীর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন। এক কথায় কেন্দ্রীকরণের লক্ষণ সর্বব্যাপী। উদাহরণস্বরূপ, মন্ত্রীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষকদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও বদলী অনুমোদন করতে আগ্রহী হতে পারেন। সচিবরা তাদের পরিচালকদের চুক্তি নিষ্পত্তির ক্ষমতা জবর দখল করতে পারেন। বিভাগীয় প্রধানেরা গতানুতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও দাবী করতে পারেন। সংক্ষেপে 'কর্তৃত্ব দখল করা' হচ্ছে জীবনেরই একটি অংশ।

৬.১৮ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যক্তিগত হোক অথবা সমষ্টিগত হোক, নিম্নোক্ত দুর্বলতাসমূহ দ্বারা প্রায় ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়ে থাকে। প্রথমত, অধিকাংশ কর্মকর্তা যথাযথ সরকারী নীতি সম্পর্কে হয় অনবহিত নতুবা উর্ধতন কর্মকর্তার অভিপ্রায়ের ভিন্ন অর্থ করা হবে এই ভয়ে স্পষ্ট মতামত প্রকাশে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয়ত, পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়ে একট ফাইল পাঠানো হলে কোনো সমস্যা নিরূপনের সম্ভাবনা বহুলাংশে বেড়ে যাবে — মনে হয় এমনতর বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাটি দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয়ত, সরকারী কর্মকর্তারা দল-সহায়তা প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে দলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বেশি পছন্দ করেন; কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে তারা বেশি পছন্দ করেন কারণ এতে করে দায়-দায়িত্ব ছড়িয়ে দেয়া যায়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় মিটিংসমূহে যে সমস্ত মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন, যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা না হওয়ায় তারা কোনো চূড়ান্ত পরামর্শ উপস্থাপন করতে পারেন না। এতে করে এই সমস্ত মিটিং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক না হয়ে বরং তথ্য সংগ্রহ অনুশীলনে পরিণত হয়। তাই পরামর্শ বিনিময় চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না মন্ত্রণালয় সচিব বিষয়টি সম্পর্কে 'মন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট অবস্থান' প্রদান করেন — অথবা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্তে আলাপ-আলোচনা প্রক্রিয়ার সময়সীমার প্রায় শেষ প্রান্তে চলে আসা হয়।

---

[১১] সচিব/অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিব পর্যায়ের।

৬.১৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিম্ন মানের গুরুতর প্রভাব রয়েছে: এতে করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়, নাগরিকদের জন্য বাড়তি উদ্বেগের সৃষ্টি হয় এবং বেসরকারী খাতের লেনদেন খরচ বৃদ্ধি পায়। উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত বিলম্ব কমাতে বাংলাদেশ সরকার ক্রমশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখনও অনেকদূর যেতে হবে, বিশেষ করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যা বেসরকারী খাতকে প্রভাবিত করে।

৬.২০ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের বিশেষ করে প্রকল্প পরিচালকদের, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। তথাপি অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ক্ষমতার অকার্যকর প্রয়োগ যথার্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত করছে। সীমিত সংগ্রহ ক্ষমতা বাদেও প্রকল্প পরিচালকদের পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা খুবই সীমিত। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রকল্প পরিচালক মোটরগাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য বড় জোর ১০,০০০ টাকা অনুমোদন করতে পারেন। যা হোক, যে বিষয়টি বিশেষ মনোযোগ দাবী করে তা হচ্ছে, এমনকি যখন ব্যয় ও সংগ্রহ প্রকল্প পরিচালকের ক্ষমতাভুক্ত এবং প্রকল্প প্রফর্মায় অর্থ বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে — তখনও প্রকল্প পরিচালককে সংগ্রহ কাজ শুরু করতে 'আগাম প্রশাসনিক ছাড়পত্র' সংগ্রহ করতে হবে। এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা সময় ধ্বংস করে, প্রকল্প কর্মকর্তাদের মনোযোগ নষ্ট করে, এবং মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুচিত ক্ষমতা ও প্রভাব প্রদান করে। প্রকল্প পরিচালকের প্রশাসনিক ক্ষমতাও খুব সীমিত। উদাহরণ স্বরূপ, বিধিবিধান অনুযায়ী এমনকি মধ্য পর্যায়ের প্রকল্প কর্মকর্তাদের কর্মস্থল নির্ধারণ ও বদলীর ক্ষমতা 'নিয়োগ কর্তৃপক্ষের' যা বস্তুত প্রকল্প পরিচালকের এক বা দুই ধাপ উপরের একটি পদ। প্রকল্প পরিচালকেরা কেবলমাত্র নিম্ন পর্যায়ের (দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তারও নীচে) কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করতে পারেন। এটি সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের দু'টি প্রধান উপাদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে — জবাবদিহিতা ও নমনীয়তা। এ ক্ষেত্রে বিধিবিধান-সমূহ সত্যিকার অর্থেই পূর্বের সেই অবস্থায় ফিরে গেছে, যখন বিভাগীয় প্রধানরা উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়োগদান ও বদলীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করতেন।

৬.২১ **সংগ্রহের (procurement) নানা বিপদ** — বাংলাদেশ লোক প্রশাসনের সমস্যাগুলো সম্ভবত সরকারী সংগ্রহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উদ্ভূত হয়। সংগ্রহ প্রক্রিয়াটি অনিবার্যভাবে বিলম্বের শিকার এবং দুর্নীতির অভিযোগে পূর্ণ। বিলম্বে মূল্য পরিশোধ অথবা মূল্য পরিশোধ না করা যেমন সংগ্রহকার্য মন্থর করে, তেমনিভাবে সুনির্দিষ্ট সংগ্রহ বিধিবিধানসমূহ এড়িয়ে যাওয়ার ফলেও সংকট সৃষ্টি হয়। এতে করে সরকারের নিরপেক্ষতা ও দক্ষতায় বেসরকারী খাতের আস্থাই শুধু নষ্ট হয় না, বাজার ভিত্তিক প্রতিযোগিতাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। উৎকোচলোভী ও গুরুভার আমলাতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী অপ্রতুল উদ্যোক্তা-সম্পদ আত্মীভূত করে ফেলে এবং বাস্তবায়ন বিলম্ব করে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের খরচ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।[১২] সংগ্রহ বিলম্বের কারণে প্রায় সমস্ত সরকারী কন্ট্রাক্ট দু'ভাগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় — নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে এবং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এর ফলে বিচক্ষণ দরদাতাদেরকে ঋণপত্র খোলায় বিলম্ব ও মন্থর পাওনা আদায় থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত খরচ দরপত্রে সন্নিবেশিত করতে হয়। এ ছাড়া সর্বশেষ পাওনা ও পারফর্মেন্স বন্ড[১৩] পাওয়ার জন্য দু'বছর অপেক্ষা তো আছেই। সংগ্রহ সমস্যার উৎপত্তি শুধুমাত্র কার্যপ্রণালী থেকে নয় কারণ এই সমস্ত কার্যপ্রণালী যেমন ত্রুটিমুক্ত তেমন আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আসলে সংগ্রহ সমস্যার মূলে রয়েছে কর্মকর্তাদের কার্যপ্রণালী প্রয়োগের বিষয়টি; কারণ এই সমস্ত কর্মকর্তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে এবং তারা অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় জড়িয়ে থাকেন। সংগ্রহ প্রক্রিয়ার নিম্নমানের আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশাসনিক কারণ হচ্ছে : (১) *অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়;* পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট উভয়ই অনুমোদনের জন্য সংস্থা অথবা বিভাগ থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত যায়, এবং একই পথে ফিরে আসে; (২) *কঠোর আর্থিক সীমাবদ্ধতা;* আর্থিক ক্ষমতার সীমা সময়ের দাবী এবং সামগ্রী ও সেবার ক্রমবর্ধমান মূল্যের নিরিখে অযথার্থই বটে। সংগ্রহের আর্থিক সীমা সাধারণত কেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকে যায়, যে ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধান অথবা প্রকল্প পরিচালকের সংগ্রহ ক্ষমতা এবং তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ —

গণপূর্তের কাজের জন্য মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সীমা হচ্ছে ৬.২ মিলিয়ন ইউএস ডলার, যেখানে বিভাগীয় প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকের জন্য এই সীমা হচ্ছে যথাক্রমে ৫০০,০০০ ডলার এবং ২০০,০০০ ডলার; (৩) সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্বের জন্য *জবাবদিহিতার অভাব* ও চুক্তি প্রত্যবেক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি; (৪) *আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনার অভাব* যা সরবরাহকারীদেরকে দামদর করার প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, আয় প্রত্যাশী সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং সর্বোপরি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটাতে পারে। বিলম্ব মারাত্মক ক্ষতি সাধন করতে পারে। বাংলাদেশে 'নির্মাণ মৌসুম' নাতিদীর্ঘ (৫ মাস)। একটি চক্র বাদ পড়ে গেলে কার্যত পুরো একটি বছর নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ থেকে আগাম পরিকল্পনার (সরকারী কাজে যা সচরাচর অনুপস্থিত) গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এবং *(৫) কর্মকর্তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব।* এর ফলে দরপত্রের দলিল প্রস্তুতি ও পর্যালোচনায় বিলম্ব ঘটে। সংগ্রহ বিধিবিধান ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মকর্তাদের অজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা।

---

১২ বাস্তবায়ন সমস্যায় জর্জরিত ৯০টি প্রকল্পের বিশ্ব ব্যাংক পরিচালিত একটি নমুনা পর্যালোচনা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মোট প্রকল্পের ৩৪টি (৩৮%) সামগ্রী ও সেবা সংগ্রহ সম্পর্কিত সমস্যা অথবা উপদেষ্টা নিয়োগের সমস্যা থেকে কমপক্ষে আংশিক ভাবে হলেও বিলম্বিত হয়েছে । দরপত্র আহ্বান ও কর্মাদেশ দেয়ার মধ্যে অতিবাহিত গড়পরতা সময়ের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা হচ্ছে: বিটিটিবি-এর জন্য ১৩ মাস, বিপিডিবি-এর জন্য ২১ মাস, পেট্রোবাংলার জন্য ১৯ মাস, বিপিসি-এর জন্য ৩৬ মাস এবং বিডব্লিউডিবি-এর জন্য ২০ মাস (ঘর ৬.১)।

১৩ অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও বেশির ভাগ দক্ষিণ এশিয়ার মত দেশগুলিকে "উচ্চ ব্যয়ের অর্থনীতি"তে পরিবর্তিত করার পেছনে সংগ্রহ হচ্ছে একটি মূখ্য কারণ। এটি খুবই স্বাভাবিক যে স্থানীয় ও বিদেশী ঠিকাদাররা সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত অযৌক্তিক বিলম্ব ও খরচের জন্য তাদের দরপত্রে এই বাড়তি খরচের ব্যাপারটি অন্তর্ভূক্ত করবে। উন্নয়নশীল দেশগুলির কয়েকটির মধ্যে এ ধরনের চুক্তির তুলনায় দেখা গেছে যে সংগ্রহের ক্ষেত্রে "সরকারের অদক্ষতার (অতিরিক্ত) মূল্য" মূল দরের অতিরিক্ত ৩০% পর্যন্ত হতে পারে।

ঘর ৬.৩ বিলম্বিত সংগ্রহ

সংগ্রহ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের বিলম্ব এবং অব্যবস্থার কতিপয় সাম্প্রতিক উদাহরণের মধ্যে রয়েছে:

- *আশুগঞ্জ রি-ফ্র্যাকশনেশন পরিকল্পনা* — বিশ্ব ব্যাংকের দ্বিতীয় গ্যাস উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ১৯৯১ সালে প্রথম এ জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। একটি দীর্ঘ ও জটিল আন্তর্জাতিক দামদর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার পর বাংলাদেশ সরকার হঠাৎ টেণ্ডার বাতিল করে পুনঃটেন্ডার আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯২ সালে প্ল্যান্টের জন্য পুনঃটেন্ডার আহ্বান করা হয়, কিন্তু আগের ৩ কোটি ডলারের ব্যয়ের তুলনায় এখন ব্যয় দাঁড়ায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারে। পুনঃটেন্ডারটি অবশ্য প্রকৃত সংগ্রহে রূপান্তরিত হতে পারেনি, কারণ তা আইডিএ রূপরেখা মেনে চলেনি। তখন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই প্ল্যান্টটিতে সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করবে, কিন্তু এই পরিকল্পনাও ভণ্ডুল হয়ে যায়। সরকার হয়তো নতুন একটি দরপত্রের দিকে যাবে, এবং সম্ভবত খরচ আরেক দফা বাড়বে।

- *মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুল সহায়তা প্রকল্প* — সুনির্দিষ্ট শর্ত না মানায় কম্প্যুটার এবং সহায়ক যন্ত্রপাতির টেণ্ডার দু'বার বাতিল করা হয়; এর একবার স্বার্থান্বেষী মহল টেণ্ডার বাক্স ভেঙ্গে অফিস থেকে সরিয়ে নেয়। সংগ্রহের সমগ্র পরিকল্পনাটি পরে মুলতবী হয়ে যায়।

- *ডিজিটাল মাল্টি-এক্সচেঞ্জ যন্ত্রপাতি* — এই সংগ্রহের জন্য কার্যাদেশ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের ছ'মাস পরে দেয়া হয়।

- *সিলেট কম্বাইন্ড সাইকল্ প্ল্যান্ট* — ৯০ মেগাওয়াটের প্ল্যান্ট তৈরির এক বড় চুক্তি কাউন্সিল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ২১ মাস পর।

- *যমুনা বহুমুখী সেতু* — টেণ্ডার আহ্বান ও গ্রহণের মধ্যে সময় ছিল ১৫০ দিন। টেণ্ডার মূল্যায়নে সময় লেগেছে ৩০৩ দিন, আবার কার্যাদেশ পেশ করার ও ঋণপত্র খোলার মধ্যে সময় লেগেছে ৪৮৫ দিন।

- *এরিয়াল ফটোগ্রাফি প্রকল্প* — ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার চুক্তিটি স্বাক্ষরও করেনি, অথবা টেণ্ডার লাভকারী প্রতিষ্ঠানের জামানতও ফেরৎ দেয়নি — যদিও টেণ্ডার আহ্বানের পর ইতিমধ্যে দু'বছর সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

- *হরটিকালচার পরামর্শ প্রকল্প* — দাতা একটি অভিপ্রায় পত্র (LOI) পাঠান ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সালে, এবং এরপর একটি শর্টলিস্ট ও LOI এর একটি চূড়ান্ত খসড়া প্রেরণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে দুটি তাগিদ পত্রও পাঠান — একটি ৩রা মার্চ, ১৯৯৪ এবং পরেরটি ১৯শে জুন, ১৯৯৪ সালে। প্রক্রিয়া শুরুর ১০ মাস পর মন্ত্রণালয় একটি অসম্পুর্ণ LOI পাঠায়।

- *ষোল শহর বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প* — টেণ্ডার গ্রহণ এবং তার (ক্যাবল) ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহের জন্য ঋণপত্র খোলার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ১৭ থেকে ৪৫ মাস লেগেছে।

৬.২২ সংগ্রহ ক্ষেত্রে আরো অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, সুনির্দিষ্ট কারণ দর্শানো ছাড়াই সরকারের সংগ্রহ বাতিল করার "অসীম ক্ষমতা রয়েছে"। যদিও force majeure শর্তটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি চর্চা, বাংলাদেশের মত দেশসমূহে টেণ্ডার আহ্বানকারীকে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বারবার টেণ্ডার কার্যত বাতিল করার লাইসেন্স দেয়া হয়। এই বিধি ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অতি জরুরী। দ্বিতীয়ত, এই কর্মকাণ্ড ঘিরে আছে চরম গোপনীয়তা, যদিও ব্যবস্থাটি "নিশ্ছিদ্র নয়" এবং অধিকাংশ সংগ্রহ-সংশ্লিষ্ট তথ্য অনিবার্যভাবেই "একটি নির্দিষ্ট মূল্যে" বাজারে পাওয়া যায়। সংগ্রহ কমিটির চূড়ান্ত মুল্যায়ন অত্যন্ত সতর্কভাবে

গোপন রাখা হয়। এর ফলে দরদাতাদের অভিযোগ তদন্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এবং আবারো বিলম্ব ঘটে যায়। সমস্যার তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে টেণ্ডার প্রদান চূড়ান্তকরণে বিলম্ব। সংগ্রহ সম্পর্কিত দিক নির্দেশনায় ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে টেন্ডারের বৈধতা সম্প্রসারণের নির্দেশ রয়েছে। বাস্তবে এটি প্রায় নিয়মিতই ঘটে থাকে, যা গা ছেড়ে দেয়ার মনোভাব উৎসাহিত করে। এই ধরনের সম্প্রসারণ যখন ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, দাতারা তখন কাজের ঐ নির্দিষ্ট অংশের জন্য অর্থ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে যদি না সম্প্রসারণ দাতাদের নিজস্ব কার্যপ্রণালী ঘটিত কারণে হয়ে থাকে। চতুর্থত, ছোটখাট বিচ্যুতির জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান অথবা মূল্যায়ন কমিটির স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তনের কারণেও বিলম্ব ঘটে।

৬.২৩ বাংলাদেশী আমলাতন্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়াতে হলে একাধিক ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে সিভিল সার্ভিস সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ, সংসদীয় জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ এবং আধুনিক অফিস প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ। এই সমস্ত প্রচেষ্টা **বর্তমান রুলস অফ বিজিনেস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা ও যুক্তিযুক্তকরণের কর্মসূচি শক্তিশালী করবে যার লক্ষ্য হবে বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যয় হ্রাস করা, সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সুযোগ অপসারণ করা, এবং নিরীক্ষণ ও ভারসাম্যের একটি কার্যকর পর্যায় বজায় রাখা**। এই সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রক্রিয়া ও আচরণের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন হতে হবে সহজসাধ্য যদিও বাস্তবে কায়েমি স্বার্থ ও আধিপত্যজনিত সংঘাতের কারণে প্রক্রিয়াগত এই পরিবর্তন সাধন একটি দুষ্কর কর্ম। আচরণমূলক পরিবর্তন সর্বাংশে আরো বেশি জটিল। আচরণমূলক পরিবর্তনসমূহের মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত উদ্দীপক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের বেশি বেশি ঝুঁকি নিতে ও উদ্যোক্তাসুলভ চেতনা তুলে ধরতে উৎসাহিত করা। **নিচে কর্মোদ্যোগের কয়েকটি অগ্রগণ্য ক্ষেত্র উল্লেখ করা হল :**

প্রক্রিয়া

- রুলস্ অফ বিজিনেস ও সচিবালয় নির্দেশাবলী সহ সমস্ত ***প্রশাসনিক বিধিবিধান সংস্কারপূর্বক হালনাগাদ ও সুসংহত করা***। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধিবিধানের বর্তমান কাঠামোসমূহের একাঙ্গীকরণ প্রয়োজন।

- প্রতিটি সংস্থার ***ডকুমেন্টেশন বা দলিল-পত্র কেন্দ্র স্থাপন করা,*** যার লক্ষ্য হবে সমস্ত প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত বিধি নিষেধ, এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব, আধুনিক কম্প্যুটারাইজড তথ্য প্রাপ্তিসাধ্য করা।

- ***সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা*** । প্রস্তাবিত দক্ষতা ইউনিটের (যার কাজ হবে কার্যকর প্রত্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা) কর্মকাণ্ডের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক।[১৪]

- ***দাপ্তরিক কাজে ইংরেজি ও বাংলার ব্যবহার সম্পর্কিত নির্দেশনা চালু করা***। বিভ্রান্তি এড়াতে এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট অবস্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন।

- দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ ও গণপূর্ত কাজ, সামগ্রী ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক এবং সংস্থা ও বিভাগীয় প্রধানদের ***আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা***। এতে করে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন/ক্ষমতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তার কারণে সৃষ্ট বিলম্ব এড়ানো যাবে।

---

[১৪] সচিবালয় নির্দেশ নং ১৯৪ অনুসারে মাসিক বিবরণীর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সাপ্তাহিক তালিকা আরো বেশি কার্যকর হতে পারে।

- ***আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধন*** এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ বাস্তবে প্রয়োগ করা।

- ***প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন-নির্ভর সিদ্ধান্তের সংখ্যা কমানো,*** এবং সরকারের কর্মকাণ্ডের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও পদ্ধতিগতভাবে জরুরী বিষয়গুলিতে তা সীমাবদ্ধ রাখা।

- ***সংগ্রহ বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ কমিটি বিলুপ্ত করা*** এবং এর পরিবর্তে সংগ্রহের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে সচিব পর্যায়ের একটি স্থায়ী আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা, যে কমিটির ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবদের ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবে।

- আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ***কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা,*** এবং এগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োগ করা।

আচরণ

- প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে সংগ্রহ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে জড়িত ***কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের*** ব্যবস্থা করা যাতে তারা দরপত্র রচনায় আরো বেশি দক্ষ এবং বিধিবিধান ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আরো বেশি অবগত হতে পারেন।

- কার্যসম্পাদনা পর্যালোচনায় এর প্রতি নির্দিষ্ট গুরুত্ব বৃদ্ধি করে ***দক্ষ ও তৎপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ উৎসাহিত করা।***

- দুর্নীতি দমন ব্যুরো এবং/অথবা ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিচালিত সরকারী তদন্তের অবাঞ্ছিত হয়রানির হাত থেকে উদ্যমী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর কর্মকর্তাদের রক্ষা করতে ***সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা***। ব্যুরোর জন্য প্রস্তাবিত কার্যনির্বাহী কমিটি (অনুচ্ছেদ ৪.৪২) গঠন এই সমস্যার একটি সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

- পর্যাপ্ত কারিগরী দক্ষতাসহ ***প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে কার্যনির্বাহী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা*** যাতে করে ছোটখাট বিচ্যুতি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় এবং শুধুমাত্র স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করার প্রয়োজন হয়।

- ***প্রকল্প অনুমোদনের আগে প্রথম দু'বছরের সংগ্রহের কমপক্ষে ২৫% প্রক্রিয়াজাত করা,*** যাতে পণ্য, সেবা ও গণপূর্ত কাজের সময়োচিত সংগ্রহ নিশ্চিত করা যায়।

৭. সিভিল সার্ভিস কর্মী ব্যবস্থাপনা

যারা সরকারযন্ত্র পরিচালনা করে, এই পরিচ্ছেদে তাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। কিভাবে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়, তারা কিভাবে কাজ করেন, এবং তাদের কিভাবে পুরস্কৃত করা হয়, এসব বিষয় খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। লোকবল সম্পর্কিত প্রধান বিষয়গুলি, যেমন — পেশাদারিত্ব, বেতন, নারী-পুরুষ অসমতা, এবং প্রশিক্ষণ — পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, এবং বেসামরিক প্রশাসনকে কিভাবে আরো বেশি দক্ষ ও মনোযোগী করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে পথনির্দেশও এ পরিচ্ছেদে করা হয়েছে।

"ভারত শাসিত হয়েছে ওপর থেকে — অভিজাততন্ত্রের বাছাই করা সদস্যদের দিয়ে, যারা একটি হাল্কা কিন্তু সদাশয় প্রশাসনে বিশ্বাস করতেন। এটি ছিল আদর্শিক পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উদযাপিত পদ্ধতিটির অনুরূপ : প্লেটো তার প্রজাতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বাছাইকৃত একটি অভিভাবক শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাদেরকে একথাটি স্বীকার করানো হত যে, সৃষ্টিকর্তা তাদের সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করার জন্য তাদের গঠন উপাদানে সোনা মিশিয়ে দিয়েছেন .....।" ফিলিপ ম্যাসন দি মেন হু রুলড্ ইন্ডিয়া, (১৯৮৫)।

বেসামরিক প্রশাসন [১]

৭.১ প্রায় সকল প্রথাগত আমলাতন্ত্রের রহস্য এবং আপাত অসঙ্গতির সূত্রপাত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেকেলে প্রথা আর আমলাতান্ত্রিক চর্চার অনমনীয়তায়। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়। বস্তুত যে পদ্ধতিটি এখন চালু, তার শুরু ষোড়শ শতাব্দীতেই। মোঘল শাসনামলে সম্রাট আকবর বেসামরিক প্রশাসনকে উন্নত করেন এবং একে রাজকীয় প্রশাসনের চরিত্র দেন। এই প্রশাসন সম্রাটের পক্ষে রাজকীয় আদেশ পালন করে এবং বিচার নিষ্পত্তি করে। তবে আজকের বেসামরিক প্রশাসনের চরিত্রটি বহুলাংশে নির্ধারিত হয় উনিশ শতকে এসে, যখন উপনিবেশী প্রশাসন এ দেশে চেপে বসে। উপনিবেশী প্রশাসনের ভিত্তি ছিল উদারনৈতিক শিক্ষায় বিশ্বাসের ওপর। সাধারণজ্ঞকে তা প্রশংসার চোখে দেখত — এই সাধারণজ্ঞ ছিলেন হয় 'সব্যসাচী' (সকল বিষয়ে জ্ঞাত) অথবা অপেশাজীবী। বর্তমানে বাংলাদেশ বেসামরিক প্রশাসন (বিসিএস) বহুলাংশে বৃটিশ উপনিবেশী শাসনের সময় উদ্ভাবিত কাঠামোর ওপরই ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত — যদিও এর চেতনা, কার্যসম্পাদনা ও মান অনেক ক্ষেত্রেই আর্থ-সামাজিক পরিবেশের সংগে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়েছে।

৭.২ বেসামরিক প্রশাসনের সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে, বেশির ভাগ সরকারী আমলাই জনসাধারণের চিন্তা-ভাবনার প্রতি অসংবেদনশীল; তারা অত্যন্ত বেশি আমলাতান্ত্রিক এবং স্বার্থপর; এবং একটি বহুদলীয় গণতন্ত্রে ক্রিয়াশীল আধুনিক একটি সরকার ব্যবস্থাপনায় ক্রমবর্ধমান হারে অপারগ। তবুও, এসব সমালোচকও স্বীকার করেন যে, বেসামরিক প্রশাসনে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের প্রচুর যোগ্যতা রয়েছে, কিন্তু সরকারের বেতন-ভাতা নীতি, কাজের পরিবেশ, সীমিতকারী ক্যাডার পদ্ধতি এবং চাকুরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা বিবেচনা না করে পরিকল্পনাহীনভাবে যাকে যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে নিয়োগ দেয়ার নীতির কারণে তারা তাদের সর্বোত্তম কার্যসম্পাদনা দেখাতে পারছেন না। বেতন খুবই সাদামাটা — শীর্ষ পর্যায়ের বেতন বাজারের হারের অনেক নিচে, এবং নিম্ন পর্যায়ে বেতন বাজারের হারের উপরে; শীর্ষ পর্যায়ে রয়েছে দক্ষ লোকের অভাব, অথচ নিচের দিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মচারী। বেসামরিক প্রশাসনের যেকোনো

---

[১] *দি ব্যুরোক্রেসি ইন ইন্ডিয়া : এ হিস্টোরিক্যাল এ্যানালিসিস অফ ডেভেলপমেন্ট আপ টু ১৯৪৭,* মিশ্রশবি. বোম্বে, ১৯৭৭।

সংস্কারে এসব অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। অধিকাংশ জটিল বিষয়ের ক্ষেত্রে — যেমন, বাংলাদেশ বেসামরিক প্রশাসন সম্পর্কে কোনো আলোচনাতেও আমলাভাষার কিছু শব্দবন্ধ ও পদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজন (ঘর ৭.১)।

৭.৩ সিভিল সার্ভেন্ট বা সরকারী কর্মচারী বলতে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে যা বোঝায়: তিনি সরকারের একজন কর্মচারী, যাকে বেসামরিক ক্ষমতায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যার বেতন সম্পূর্ণভাবে এবং সরাসরিভাবে জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ করা অর্থ থেকে দেয়া হয়। এই সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়েছে আরো কয়েক শ্রেণীর মানুষ যাদের বেতন রাষ্ট্র দিয়ে থাকে, তবে যাদের সরকারী কর্মচারী বলা হয় না। এদের মধ্যে আছেন, যেমন— মন্ত্রী, সাংসদ এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যারা বেসামরিক প্রশাসনের চাকুরিতে নিয়োজিত নন।

ঘর ৭.১. আমলাতান্ত্রিক অভিধান

যে কোনো জটিল বিষয়ের মত, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে আলোচনাতেও কিছু টেকনিক্যাল শব্দ বা শব্দবন্ধ বা 'আমলাভাষা' সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন।

- *গ্রেড বা স্তর* — এগুলো হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট গ্রুপ বা শ্রেণীর মধ্যে কোনো বিশেষ চাকুরির সংগে সংশ্লিষ্ট উপাধি ও পদ। ১৯৭৭ সালে সরকার শ্রেণী পদ্ধতি তুলে দিয়ে এর পরিবর্তে একটি সমন্বিত স্তর প্রথা (ইউনিফাইড গ্রেড সিস্টেম — UGS) ও একটি জাতীয় বেতন স্কেল (NPS) চালু করে। এই বেতন স্কেল সরকারের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

- *শ্রেণী* — সুনির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, 'শ্রেণী' কথাটি UGS চালু করার পর থেকে রহিত হয়েছে, কিন্তু শ্রেণীর ধারণাটি এবং এটি যে কাঠামোকে তুলে ধরত, তা এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ অনুযায়ী চিহ্নিত করতে সহায়তা করে। যেমন, নিচের সারির সহায়ক কর্মচারীদের, যথা— ক্লিনার, মেসেঞ্জার, টি বয়দের — চতুর্থ শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা হয়।

- *ক্যাডার* — কোনো নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক গ্রুপকে — অর্থাৎ যে গ্রুপে একজন সরকারী কর্মকর্তা তার চাকুরিতে প্রবেশের সময় বা পরে বদলির মাধ্যমে অন্তর্ভূক্ত হন — চিহ্নিত করতে ক্যাডার কথাটি ব্যবহৃত হয়। ক্যাডারগুলির মধ্যে আছে বিসিএস(প্রশাসন), শিক্ষা, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সার্ভিসসমূহ। উপরে যেমন বলা হয়েছে, UGS ও NPS সকল সরকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং এ ক্ষেত্রে কে কোন ক্যাডারভুক্ত, তা বিবেচনায় আনা হয় না।

- *প্রাক্তন সিএসপি* — এরা হচ্ছেন স্বাধীনতার আগে তৎকালীন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (CSP)'র মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা। এদের প্রায় সকলেই এখন নীতি নির্ধারণী অবস্থানে আছেন, এবং অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা এদেরকে ক্ষুদ্র দল-মানসিকতাসম্পন্ন বলে গণ্য করেন।

- *সাধারণজ্ঞ (জেনারেলিস্ট)/বিশেষজ্ঞ* — এসব বর্ণনা ও নিরূপিত পার্থক্য বেসামরিক প্রশাসনে বেশ ভালভাবেই স্বীকৃত, যদিও এগুলো দাপ্তরিক পরিভাষার সুনির্দিষ্ট অংশ নয়। তবুও সাধারণ প্রশাসন সার্ভিস ও টেকনোক্র্যাট বা কারিগরী বিশেষজ্ঞদের (প্রকৃচি) মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও বেসামরিক প্রশাসন সংস্কারের দাবীর কেন্দ্রে। বাংলাদেশ বেসামরিক প্রশাসনের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র হচ্ছে ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ প্রশাসন, যার সহায়ক ও অধঃস্তন ভূমিকাতেই শুধু বিশেষজ্ঞরা (প্রকৌশলী, ডাক্তার, এবং শিক্ষাবিদরা) নিয়োজিত।

- *সিনিয়র সিলেকশন পুল* — সাতটি শীর্ষ বেসামরিক প্রশাসনের স্তর এই পুলের অন্তর্ভূক্ত। প্রতি স্তরে পদগুলো পূরণ করা হয় সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা — ঐ ব্যক্তিরা আগে সাধারণজ্ঞ না বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এবং কোন শাখায় কাজ করেছেন, তা বিবেচনায় আনা হয় না। সিনিয়র সিলেকশন পুলটি ১৯৮৭ সালে সৃষ্টি করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সকল পেশা গ্রুপ থেকে 'শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে মেধাবী' দের বেসামরিক প্রশাসনের শীর্ষে ওঠার সুযোগ করে দেয়া। এই পুলটি কয়েক বছর আগে বাতিল করে দেয়া হয়, তবে সম্প্রতি তা আবার পুনর্বহাল করা হয়েছে।

- *গেজেটেড/নন-গেজেটেড কর্মী* — গেজেটেড কর্মকর্তা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার নিয়োগ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। এর ফলে ঐ কর্মকর্তা কিছু সুযোগ সুবিধা পান যেমন, প্রাধিকার তালিকায় তিনি উল্লেখ পান, স্বাক্ষর সত্যায়িত করার অধিকার পান, এবং পাসপোর্টের মত সরকারী দলিলাদি পাওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিকে তিনি সুপারিশ করতে পারেন।

স্থানীয় সরকার কর্মচারীরাও সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে পরিগণিত হন না, যদিও তাদের বেতনের অনেকটাই কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী থেকে আসে। আরো বাদ পড়েছেন পাবলিক কর্পোরেশনসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা, যাদের বেতনের একটা অংশ আসে সরকারের ভর্তুকি থেকে, যদিও তারা সিভিল সার্ভেন্ট নন।

৭.৪ **কাঠামো** — যদিও সমন্বিত বেতন স্তর পদ্ধতি সরকারী ভাবে ১৯৭৭ এর জুলাইতে চালু হয়েছিল, সকল সরকারী কর্মীকেই পরিসংখ্যানের খাতিরে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম শ্রেণীর কর্মীরা হচ্ছেন কর্মকর্তা বা অফিসার; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীরা প্রধানত তদারকীর দায়িত্ব প্রাপ্ত; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা কেরাণী ও কেরাণী থেকে নিচু মানের। প্রথম শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্টদের সাধারণত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

৭.৫ **আকার** — নিয়োগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যবেক্ষণের অভাবে এটি বলা মুশকিল ঠিক কতজন সিভিল সার্ভেন্ট কর্মরত আছেন। পৌনঃপুণিক বাজেটের অধীন সরকারী বেতন তালিকা থেকে পাওয়া স্বাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (যাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত) থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে সিভিল সার্ভেন্টের সংখ্যা দশ লাখের মত।

সারণী ৭.১ বেসামরিক প্রশাসনে চাকুরিতে বৃদ্ধি

শ্রেণী	১৯৭১	১৯৮২	১৯৮৬	১৯৯২
বিসিএস	১১,১৩০	৫৬,১০০	৬০,১০০	৭৮,৬৮৫
১ম	১২,৩২০	১৮৭,৯০০	৩২,০৪২	৩৬,৮৫৮
২য়	২৪৫,৫০০	৩০৮,৭০০	৫৯৪,৩০০	৫৭৯,৮৪২
৩য়	১৮৫,৫০০	২২৬,৫০০	৩৮৬,৪০৬	২৫১,৩৬৪
মোট	৪৫৪,৪৫০	৭৭০,০০০	১,০৭২,৮৫৪	৯৪৬,৭৪৯

৭.৬ বাংলাদেশে সরকারী চাকুরিতে এই বৃদ্ধি প্রধানত সহায়ক স্তরের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই ঘটেছে (সারণী ৭.১৬)। যদিও ১ম/২য় শ্রেণীর কর্মীদের অনুপাত, মোট কর্মীর শতকরা হিসাবে ১৯৭১ সালের ৫% থেকে ১৯৯২ সালের ১২%-তে বৃদ্ধি পেয়েছে; চূড়ান্ত হিসাবে গত দু'দশকে কর্মীদের ৮০% বৃদ্ধি হয়েছে ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কারণে — যাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কোনো প্রকৃত অবদান বলতে গেলে নেই।

সারণী ৭.২ তে মন্ত্রণালয়গুলিতে কর্মচারীদের বণ্টন দেখানো হয়েছে। সামাজিক খাতসমূহের প্রতি ক্রমবর্ধমান মনোযোগের পথ ধরে যে সব সংস্থা এসব খাতের দায়িত্বে আছে, সেগুলোতে কর্মচারীদের সিংহভাগ কর্মরত, এবং কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির বেশির ভাগই এসব খাতের জন্য হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, সরকার যখন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনবে, তখন এসব সংস্থায় কর্মকর্তা (অফিসার) পর্যায়ে নিয়োগের সংখ্যা বাড়বে।

সারণী ৭.২ সর্বোচ্চ সংখ্যক কর্মচারীর মন্ত্রণালয়সমূহ

মন্ত্রণালয়	কর্মকর্তাদের %	কর্মচারীদের %	কর্মকর্তা + কর্মচারীদের মোট সংখ্যা	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় হিস্যা
শিক্ষা	২১.৮৬	২৮.৭৪	১৮৪৩২৬	৮.৯
স্বরাষ্ট্র	৫.৯৮	১৬.০৯	১০০৩৪৯	পাওয়া যায়নি
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	২১.৮৭	১১.৫২	৭৯৮৬৩	৭.৫
যোগাযোগ	৩.৬৯	১০.৩৮	৬৪৬৫১	১২.২
ডাক ও তার	১.৬৮	৫.৩৭	৩৩৩১৫	২.৬
অর্থ	৭.৯৩	৩.২৫	২৩৩২৮	০.৬৭
কৃষি	৫.১	২.৬৫	১৮৩৭৭	৭.৩
অন্যান্য	৩১.৮৯	২২.০০	১৪৮০২৩	৬০.৮
মোট	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**৬৫২২৩২**	**১০০.০০**

৭.৭ উপরে যেমন দেখানো হয়েছে, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত, বাংলাদেশের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অনুপাতে এক বিরাট অসমতা রয়েছে। এই অনুপাত হচ্ছে ১ঃ৭, এবং এটি ১৯৮২ সালের এনাম পুনর্গঠন কমিটি কর্তৃক অধিকাংশ সংস্থার জন্য প্রস্তাবিত ১ঃ৩ এর অনেক বেশি। কেরাণী ও পিওন পর্যায়ে বিশাল সংখ্যক সিভিল সার্ভেন্ট-এর উপস্থিতি শুধু যে দক্ষতা ও বেতন বিলের ওপর একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তাই নয়; এর ফলে বেতন সংকোচনের সমস্যাও দেখা দিয়েছে। কর্মকর্তা কর্মচারী অনুপাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এটি বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভিন্ন মাত্রার হয়ে থাকে (সারণী ৭.৩)। উদাহরণস্বরূপ: মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলিতে এটি ১ঃ৩; দপ্তর ও অধিদপ্তরগুলিতে ১ঃ১৪ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনগুলিতে ১ঃ৭।

সারণী ৭.৩ মন্ত্রণালয়সমূহের উর্ধতন কর্মকর্তা ঃ কর্মচারী অনুপাত

মন্ত্রণালয়	অনুপাত
ডাক ও তার	১ ঃ ৪২
পরিবেশ	১ ঃ ৩৮
যোগাযোগ	১ ঃ ৩৮
স্বরাষ্ট্র	১ ঃ ৩৬
স্থানীয় সরকার ও সমবায়	১ ঃ ১৯
সংস্থাপন	১ ঃ ১৯
শিক্ষা	১ ঃ ১৮
স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ	১ ঃ ১৪
ভূমি	১ ঃ ১৩
প্রতিরক্ষা	১ ঃ ১৩
সংস্কৃতি	১ ঃ ১১

৭.৮ সারণী ৭.৪তে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বেসামরিক প্রশাসনের আকার তুলনা করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে প্রতি এক হাজার জনসংখ্যার মোটামুটি ৯ জন ছিল সিভিল সার্ভেন্ট, যা অন্যান্য দেশের অনুপাতের অনেক নিচে। যদিও ভূমি এলাকার পরিমাপে বাংলাদেশে ইন্দোনেশিয়া/ থাইল্যান্ডের চারগুণ বেশি ও ফিলিপাইনের দ্বিগুণ বেশি সিভিল সার্ভেন্ট রয়েছে। আকারের আন্তর্জাতিক তুলনা আলোচনা একটি আকর্ষণীয় প্রেক্ষিত জোগায়, তবে তা নীতি-ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হতে পারে না — এর প্রধান কারণ এই যে, এতে বেসামরিক প্রশাসনের দক্ষতা সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হয় না। কেউ নিশ্চয় উদাহরণ হিসেবে এ যুক্তিটি দেখাবেন না যে, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন — যাদের প্রতি হাজার জনসংখ্যায় প্রায় একই সংখ্যায় সিভিল সার্ভেন্ট রয়েছে — কার্যসম্পাদনায় সমান দক্ষ। এর মধ্যে অনেক বিষয় চলে আসে, যেমন — রাজস্ব সামর্থ্য, সরকারী-বেসরকারী মিশ্রণ, কমচারীদের সৃজনশীলতা, নিজ নিজ আমলাতন্ত্রের জটিলতা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আকৃতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাত্রা। অপেক্ষাকৃত ছোট আকার সত্ত্বেও বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসন এখনও একটি দুর্ভেদ্য, নিয়ন্ত্রণমূলক ও প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে এবং অর্থনীতির মূল এলাকাগুলিতে বিস্তৃত সংশ্লিষ্টতার জন্য দেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

সারণী ৭.৪ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার বেসামরিক প্রশাসনের আকার

দেশ	প্রতি হাজারে সিভিল সার্ভেন্ট	প্রতি বর্গ মাইলে সিভিল সার্ভেন্ট	সরকারী খরচের % হিসেবে বেতন বিল
বাংলাদেশ (১৯৯৪)	৯.৫	৬.৬	৪১% *
পাকিস্তান	২২	২.৮	পাওয়া যায়নি
ভারত	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	৯.১৪%
শ্রীলঙ্কা	৫০	১২.৯	পাওয়া যায়নি
ফিলিপাইন (১৯৭৯)	২৩	৩.৫	২৮.৫০%
মালয়েশিয়া (১৯৮৪)	৪৫	২.০	২৬.২০%
ইন্দোনেশিয়া (১৯৮৩)	১৫	১.২	পাওয়া যায়নি
থাইল্যান্ড (১৯৮৪)	১৯	১.৬	পাওয়া যায়নি
সিঙ্গাপুর (১৯৮৪)	২৯	১১৮.৭	২৯.৮০%

* পৌন:পুনিক বাজেটের শতকরা হিসাবে।

৭.৯ **বেতন বিল** — গত দশ বছরে সিভিল সার্ভেন্টদের বেতন ভাতার খরচ তিনগুণের বেশি বেড়েছে (সারণী ৭.৫) ; এবং জিডিপি'র শতকরা হারে তা ৩% থেকে ৪.২% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেতন বিলের এই বৃদ্ধি হয়েছে কর্মচারী নিয়োগে এবং বেতন পুনর্বিন্যাসে অযাচিত বৃদ্ধির জন্য। তবে বেতন পুনর্বিন্যাস পদ্ধতিগত কোনো বেতনভাতা নীতি থেকে হয়নি, বরং অগ্রবর্তী সংশোধন থেকেই হয়েছে। বেতন বিলের বৃদ্ধি এবং অপরিকল্পিত বেতন বৃদ্ধির ফলাফল হলো এই যে:

- বাজেটে গুরুতর এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত, চাপ পড়ে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর (সহায়ক পর্যায়ে) কর্মচারীদের সাম্প্রতিক বেতন বৃদ্ধির ফলে সরকারের এক বছরে আরো অতিরক্ত ১,০০০ কোটি টাকা খরচ বেড়েছে।

- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়, যেমন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) ব্যয় হ্রাস করতে হয়। বাংলাদেশে O&M ব্যয় মোট পৌনঃপুণিক ব্যয়ের (১৯৯৩/৯৪) ৪৫ শতাংশ — যে অনুপাতটি প্রাপ্ত পরিসম্পতের মূল্য রক্ষার জন্য এমনিতেই খুবই কম।

- আধুনিক এলাকাগুলিতে বেসরকারী খাতের বেতন বাড়িয়ে দেয় — কারণ এসব এলাকার ইউনিয়নগুলি দাবী জানায় যে তাদের বেতনও সরকারী খাতের বেতনকে অনুসরণ করে হওয়া উচিত। এর ফলে উদ্যোগ-সম্ভাব্যতা এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

সারণী ৭.৫ সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা (কমপেনশেসন) ব্যয়ের প্রবণতা

(একশ কোটি টাকায়)

	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৯-৯০	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
বেতন ভাতা	১৩.৩৬	২৬.৫	৪০.৫	৪১.৯
পেনশন ও অবসর	০.৭৫	১.৭	৪.৭	৫.৬
মোট কম্পেনশেসন (খেসারত)	১৪.১১	২৮.২	৪৫.২	৪৭.৫
রাজস্ব	৩৪.২১	৬৭.৪	৯২.০	১০৩.০
জিডিপি (বর্তমান দামে)	৪৮৬.০০	৭৩৮.০	১০৩৫.০	১১৩৮.০
অনুপাত				
বেতন বিল/রাজস্ব ব্যয় %	৪১.০	৪২.০	৪৯.০	৪৬.০
বেতন বিল/জিডিপি %	৩.০৩	৩.৮	৪.৪	৪.২
রাজস্ব ব্যয়/জিডিপি %	৭.৩৪	৯.১৪	৮.৮৯	৯.০৫

৭.১০ সারণী ৭.৬-তে বেতন ভাতা খাতে বাংলাদেশ সরকারের খরচ ও সিঙ্গাপুর এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের খরচের একটি তুলনা করা হয়েছে; এ দু'টি দেশের লোকপ্রশাসন খুবই দক্ষ এবং এদের অর্থনীতির উৎপাদনশীলতাও অনেক বেশি। দেখা যাবে, বাংলাদেশী করদাতারা বেসামরিক প্রশাসনের বেতন ভাতার জন্য সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের মত প্রায় একই রকম খরচ করে থাকেন, কিন্তু সেবার যে মান তারা পান তা খুবই নিচু।

সারণী ৭.৬ বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনা

দেশ	জিডিপির % হিসেবে বেতন	পৌণঃপুনিক খরচের % হিসেবে বেতন (সুদ বাবদ দেয় বাদে)
বাংলাদেশ	৪	৪৫
সিঙ্গাপুর	৬	৪১
কোরিয়া	৫	২৭
চিলি	৫	২১

৭.১১ *"বিমান বন্দরে নামার পর একটি ট্যাক্সিতে ওঠা পর্যন্ত, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে, যে কোনো ভ্রমণকারীই বুঝতে পারেন কোন যায়গায় নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে, এবং কোন জায়গায় হচ্ছে না। এ সংসদের প্রত্যেক সদস্যই জানেন সহজে কামাই করে নেয়ার মত টাকা কোথাও নেই। এ হল আমাদের পথ। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, আমরা এই সংসদে ঢোকার জন্য টাকা খরচ করেছি। আমি তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতনপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীদের একজন এবং সম্ভবত সবচেয়ে গরীব প্রধানমন্ত্রীদেরও একজন। একশ' রকম উপায়ে কাজ করা যায়। এবং আমি আমাদের উপায়টিই বলে দিচ্ছি — বাজারের সংগে তাল রেখে চলা হচ্ছে সৎ, খোলামেলা, কৈফিয়ৎযোগ্য এবং কার্যকর একটি পদ্ধতি। যদি ভণ্ডামী করে আপনি এটি বাদ দেন, তাহলে মিথ্যাচার আর দুর্নীতি আপনাকে পেয়ে বসবে।"* সিঙ্গাপুরের সরকারী খাতের বেতন বাজার পর্যায়ে উন্নত করার জন্য সংসদে বিল পেশ করার সময় প্রধান মন্ত্রী লী'র বক্তৃতা।

৭.১২ বাংলাদেশে অকার্যকর আমলাতন্ত্রের অনেকগুলি সমস্যাই স্বল্প বেতনের সঙ্গে সংযুক্ত — যা বেতনের ক্রমাগত হ্রাস পাওয়া ও সংকোচনের ফল। সময় সময় সরকার অবশ্য (বেতন ভাতা) সমন্বিত করেছেন — এজন্য চার থেকে আট বছরের ব্যবধানে জাতীয় বেতন সার্ভিস কমিশন স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে একটি বেতন কমিশন মূল বেতন দ্বিগুণ করার সুপারিশ করে, এবং ১৯৯১ সালে বেতন বাড়ে ১.৭ গুণ; তাছাড়া 'মহার্ঘ' ভাতার ক্ষেত্রেও কয়েকবার বৃদ্ধি ঘটেছে। তবে এটি পরিষ্কার যে সরকারী বেতন- ব্যবস্থাপনা ও নীতি পর্যায়ে বেসরকারী খাতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। পে কমিশন প্রতিবেদনগুলি সরকারীভাবে প্রকাশিত হয় না, কাজেই কিসের ওপর ভিত্তি করে বেতন পুনর্বিন্যস্ত ও সংশোধিত করা হয়, তা অজানা রয়ে যায়। তবে এতে বেসামরিক প্রশাসনের মনোবল ও যোগ্যতার উপর নিম্ন পর্যায়ের বেতনের যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা বিবেচনায় আনা হয় বলে মনে হয় না। বেশির ভাগ বেতন সংশোধনী নিচের দিকের কর্মচারীদের দিকে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে, কর্মকর্তাদের দিকে নয়; এবং এতে বেতন সংকোচন (compression) সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান বেতন কাঠামোতে ২০টি সুনির্দিষ্ট স্তর রয়েছে (সারণী ৭.৭) এবং অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি রয়েছে।

৭.১৩ **অসম কাজের জন্য সমান বেতন** — বেতন কাঠামোতে পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কাজের ধরন অনুযায়ী পার্থক্য করার কোনো উপায় নেই। কাজেই প্রথম শ্রেণী পদে কর্তব্যরত ডাক্তার, প্রকৌশলী অথবা রাজস্ব অফিসাররা একই বেতন পাবেন।

৭.১৪ **বেতন সংকোচন** — একটি দক্ষ বেতন কাঠামোর উচিত এমন বেতন হার দেয়া, যা ভিতরে ও বাইরে প্রতিযোগিতামূলক হবে; এবং এতে স্তরবিন্যাস ও খেসারত প্রদানে অভ্যন্তরীণ ন্যায়-নীতি বজায় থাকবে। বেতন কাঠামোর কার্যকারিতার একটি ভাল সূচক হচ্ছে বেতন সংকোচন অনুপাত — অর্থাৎ সর্বোচ্চ বেতনের সংগে সর্বনিম্ন বেতনের অনুপাত । সারণী ৭.৮-এ যেমন দেখানো হয়েছে বেতন সংকোচন ১৯৬২ সালের ৪৬ঃ১ থেকে ১৯৯১ সালে ১০ঃ১ এ নেমে এসেছে, এবং ১৯৯৪'তে এই ফারাক আরো কমেছে। বেতন ও সুবিধাদির আরো বেশি উদ্বেগজনক একটি দিক হল এই যে, যদিও বেতন স্তর কাঠামোর উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তা (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর) ও কর্মচারীর (তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর) সংকোচন হার ৫ঃ১ এর মত, যখন প্রকৃত প্রদেয় অর্থ হাতে পাওয়া যায়, তখন এটি ২ঃ১ এ নেমে আসে। *এভাবে, ১৯৯৩তে গড় বার্ষিক কর্মকর্তা প্রতি খরচ ছিল প্রতি মাসে ৮,৩০০ টাকা, সেখানে কর্মচারীদের জন্য এই অংক ছিল ৪,০০০ টাকা। এর কারণ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অতিরিক্ত প্রচুর সংখ্যক ভাতা পেয়ে থাকে।*

সারণী ৭.৭ বেসামরিক প্রশাসনে বেতন স্তরসমূহ (১৯৯১)

শ্রেণী	স্তরের সংখ্যা	বেতন
১ম শ্রেণী	৯	২,৮৫০ -১০,০০০ টাকা
২য় শ্রেণী	২	১,৭২৫ - ২,৩০০ টাকা
৩য় শ্রেণী	৭	১,১২৫ - ১,৭২৫ টাকা
৪র্থ শ্রেণী	৩	৯০০ - ১,০৫০ টাকা

সারণী ৭.৮ সংকোচন হারের প্রবণতা (টাকা/প্রতি মাসে)

বছর	১৯৬২	১৯৭৩	১৯৭৭	১৯৮৫	১৯৯১	১৯৯৪
সচিব (নমিনাল)	৩০০০	৩০০০	৩০০০	৬০০০০	১০০০০	১০০০০
পিওন (নমিনাল)	৬৫	১৩০	২৪০	৫৫০	৯৭৫	৯৭৫
সংকোচন হার	১ঃ৪৬	১ঃ২৩	১ঃ১২	১ঃ১১	১ঃ১০	১ঃ১০

৭.১৫ **চূড়ান্ত এবং আপেক্ষিক মাত্রায় বেতন হ্রাস**— বর্তমান বেতন ব্যবস্থা হচ্ছে সরকারের একটি দীর্ঘস্থায়ী নীতির প্রতিফলন, যে নীতি হচ্ছে বেতন হ্রাস করে চাকরীর সংখ্যা বাড়ানো। যারা স্কেলের শীর্ষে আছেন, তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ১৯৬২ সালের হিসাবে একজন সচিবের মূল বেতন ৮৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, সেখানে একজন পিওনের কমেছে ৪৩ শতাংশ। ১৯৬২ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে সচিব, যুগ্ম সচিব ও উপ-সচিবদের প্রকৃত আয়ের বেশ বড় ধরনের হ্রাস হয় (সারণী ৭.৯)।[২] অন্যভাবে দেখতে গেলে, যদি একজন সচিবের ১৯৬২ সালের বেতন — যা ছিল ৩,০০০ টাকা — ক্রয় ক্ষমতা ভোক্তার মূল্যসূচক বা CPI অনুযায়ী একই হারে বাড়িয়ে বজায় রাখা হত, তাহলে এখন তা ২৬০,০০০ টাকা হওয়া উচিত ছিল। অথচ এটি এখন মাত্র ১০,০০০। বর্তমান ডলার হিসাবে, একজন সচিবের বেতন ১৯৬২ সালের ৬৬৭ ডলার থেকে কমে ২৫০ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। বিচারকদের বেতনেও একই ধরনের হ্রাস পরিলক্ষিত হয়(সারণী ৭.১০)। *দক্ষতার নিম্নমুখিতা, নিচু মনোবল, অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং নতুন চাকুরেদের মানের ক্রমাবনতি— এসবের একটি বড় কারণ গত তিন দশকের বেতন হ্রাস।*

---

[২] ভিত্তি বছর হিসেবে এ বছরটিকে নেয়া হয়েছে, যেহেতু স্বাধীনতার আগের বেতন পরিসংখ্যান এ বছরের জন্য সহজপ্রাপ্য।

সারণী ৭.৯ শীর্ষ সচিবালয় কর্মকর্তাদের নমিনাল ও প্রকৃত বেতন (টাকা/প্রতি মাসে)

বছর	ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) ১৯৬৯/৭০ =১০০	সচিব		যুগ্ম-সচিব		উপ-সচিব	
		নমিনাল	প্রকৃত	নমিনাল	প্রকৃত	নমিনাল	প্রকৃত
১৯৬২	৭১	৩০০০ (৬৬৭ ডলার)	৩০০০	২৩০০ (৫১১ ডলার)	২৩০০	১৫২৫ (৩৩৯ ডলার)	১৫২৫
১৯৭৭	৪৪১	৩০০০ (১৯৯ ডলার)	৪৮৩	২৩৫০ (১৫৬ ডলার)	৩৭৮	১৮৫০ (১২৩ ডলার)	২৯৮
১৯৮৫	১০১৪	৬০০০ (২০১ ডলার)	৮২০	৪৭৫০ (১৫৯ ডলার)	৩৩৩	৩৭০০ (১২৪ ডলার)	২৫৯
১৯৯১	১৬৭১	১০০০০ (২৬২ ডলার)	৪২৫	৭৮০০ (২০৪ ডলার)	৩৩১	৬৩০০ (১৬৫ ডলার)	২৬৮
১৯৯৪	১৮৫৩	১০০০০ (২৬০,০০০ টাকা)* (২৫০ ডলার)	৩৮৩	৭৮০০ (১৯৫ ডলার)	২৯১	৬৩০০ (১৫৮ ডলার)	২৪১

* যদি ১৯৬২ সালের বেতনের ক্রয়ক্ষমতা CPIএর ভিত্তিতে বজায় রাখা হত তাহলে ১৯৯৪ সালের নমিনাল বেতন যা হতে পারত।

৭.১৬ যদিও বেতন-সম্পূরক ব্যবস্থা, সরকারী বাসস্থান ও যানবাহন বেতন হ্রাসের প্রভাব কিছুটা লাঘব করে, ঘরে নেয়ার মত বেতন এখনও একটি সুন্দর মধ্যবিত্ত জীবনযাপনের জন্য, বাচ্চাদের ভাল প্রাইভেট স্কুলে পাঠাবার জন্য, বা ব্যক্তিগত চিকিৎসা খরচ মেটাবার জন্য খুবই কম। সরকার প্রদত্ত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও প্রচণ্ড রকম নিচু মানের হওয়ার জন্য লোকের বেসরকারী খাতের দিকে মুখ ফেরানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। দু'টি সন্তান বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে, বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে, এরকম একজন সচিবের মাসে সর্বনিম্ন ঘরে নেয়ার মত বেতন থাকা উচিত ২০,০০০ টাকা, বর্তমানে যেখানে তিনি পাচ্ছেন ১৩,০০০ টাকা। কাজেই বর্তমান ঘরে-নেয়ার বেতন প্রতিদিনের খরচ মেটানোর জন্য অপর্যাপ্ত তো বটেই, এতে বিরাট কোনো এককালীন খরচ, যেমন সন্তানের বিবাহ, বা গাড়ি কেনা বা অবসর নেবার পর থাকার জন্য একটি বাড়ি করার কোনো ব্যবস্থা নেই; আগে সরকার যা দিত, তার বিকল্পও এখন আর নেই। তবে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষতি বেশি হলেও মোটামুটি সকল পর্যায়েই ক্রয়ক্ষমতার নিরিখে বেতনের হ্রাস ঘটেছে।

- মধ্য ষাট পর্যন্ত প্রবেশ পর্যায়ে একজন সিভিল সার্ভেন্ট তার ছয় মাসের মাইনা দিয়ে একটি ছোট গাড়ি কিনতে পারতেন। এখন ঐ একই গাড়ি কিনতে প্রয়োজন হবে ৪০ মাসের বেতন।
- ৫০ বছর আগে একজন বিচারকের মাসিক বেতন ছিল ১০০ ভরি সোনার মূল্যের সমান; এখন তার বেতনে কেনা যাবে মাত্র দুই ভরি সোনা (সারণী ৭.১০)।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

- ১৯৬৯ সালে একজন সচিবের একদিনের বেতন ছিল ১০০ কেজি চালের, ২৫ কেজি গরুর মাংস ও ৪০ কেজি মাছের দামের সমান; এখন একদিনের বেতনে কেনা যাবে ১৫ কেজি চাল, ৬ কেজি গরুর মাংস ও ৪ কেজি মাছ।

সারণী ৭.১০ বিচারকদের বেতনের ক্রয় ক্ষমতা

হাইকোর্টের বিচারপতির মাসিক বেতন		মাসিক বেতনের ক্রয়ক্ষমতা সোনা (তোলা) *	উৎকৃষ্ট আবাসিক জমির (প্রতি ১৪,০০০বর্গফুট অনুযায়ী) দামের নিরিখে মাসিক বেতন
১৯৪৭	৪,০০০ রুপি	১০০	২ দিন
১৯৬০	৪,০০০ রুপি	৬৬	৫ মাস
১৯৭০	৪,০০০ রুপি	৩০	৮ মাস
১৯৭২	৪,০০০ টাকা	২৬	১২ মাস
১৯৯৪	১১,৯০০ টাকা	২	১০০০ মাস

* ১ তোলা = ১১.৬ গ্রাম

৭.১৭ ১৯৬৯ সালে বেসামরিক প্রশাসনের একজন সচিবের ঘরে-নেয়ার মত বেতন ছিল প্রায় ৩,০০০ রুপি (টাকা)। সেই তুলনায় বেসরকারী খাতে কর্পোরেট প্রধান নির্বাহীদের বেতন ছিল গড়ে ৪,০০০ রুপি। ১৯৬৮ সালের এক জরিপে দেখা যায়, শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পদের বেতন গড়ে সরকারী খাতেই বেশি ছিল (সারণী ৭.১১)। গত পঁচিশ বছরে বেসরকারী খাতের বেতন নাটকীয়ভাবে বাড়লেও (একাউন্ট সুবিধাদি ধরলে সম্ভবত ৩০-৫০ গুণ), এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও সরকারী খাতে প্রকৃত অর্থে বেতন নাটকীয়ভাবে কমেছে। আজকে ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বেসরকারী খাতের বেতন সরকারী খাতের তুলনায় ৫-৭ গুণ বেশি। তুলনা হিসাবে বলা যায় সরকারী খাতের বেতন (বেসরকারী খাতের বেতনের % হিসেবে) অন্যান্য দেশে হচ্ছে : ১১০% (সিঙ্গাপুর), ৭০% (কোরিয়া), ৪৭% (থাইল্যান্ড), ৪০% (মালয়েশিয়া)। এই বিশাল পার্থক্য ছাড়াও বেসরকারী খাতে বেতন আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আলাদা। প্রথমত, বেসরকারী কোম্পানীগুলিতে বেতন ভাতা (খেসারত) দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে; এবং সহায়ক-কর্মচারীদের দিকে না ঝুঁকে এখানে বেতন ব্যবস্থাপক, প্রযুক্তিগত পেশাদারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর দিকে ঝুঁকে। দ্বিতীয়ত, সংকোচন হারও খুবই আলাদা। বেসরকারী খাতের শীর্ষ ব্যবস্থাপক একজন উর্ধতন সিভিল সার্ভেন্ট-এর থেকে ছয় গুণ বেশি বেতন পেতে পারেন, কিন্তু বেসরকারী খাতের একজন পিওন পাবেন সরকারী খাতের তার কোনো প্রতিপক্ষের তুলনায় দ্বিগুণ। বেসরকারী খাতের প্রতিপক্ষের মত সিভিল সার্ভেন্টদেরও একই বেতন হতে পারে না এ জন্য যে তাদের চাকুরি অনেক বেশি নিশ্চিত; কিন্তু তাদের সঙ্গে অন্তত একটি যৌক্তিক ও সুষম সম্পর্ক থাকা উচিত, এবং তেমন একটা ফারাক থাকাও উচিত নয়। এধরনের কোনো নীতির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা রয়েছে। প্রথমত, সরকারকে যে জাতীয় শ্রম বাজারে মেধার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হয়, এই বাস্তবতা এতে প্রতিফলিত হবে। দ্বিতীয়ত, এটি সরকারী খাতে বেতন পার্থক্য স্থাপনের একটি সহজ, বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি দিবে। উদাহরণস্বরূপ, জাপান ও সিঙ্গাপুরে একটি নিয়ম আছে যে বেসামরিক প্রশাসনের বেতন বেসরকারী খাতের বেতনের দু'তৃতীয়াংশের নিচে নামতে পারবে না। বেসরকারী খাতের প্রবৃদ্ধি দ্রুত বাড়তে থাকায় বেসরকারী খাতে সুযোগ সম্ভাবনা বাড়বে,

কাজেই বাংলাদেশ সরকারকে সবচেয়ে মেধাবী ও শ্রেষ্ঠদেরকে আকর্ষণ করার জন্য সরকারী খাতের বেতন বাড়াতে হবে।

সারণী ৭.১১ বেসামরিক প্রশাসন ও বেসরকারী খাতের বেতন (টাকা/প্রতি মাসে)

পদ	সরকারী সুযোগ সুবিধা ছাড়া সাধারণ ঘরে নেয়ার মত বেতন	সুযোগ সুবিধার আর্থিক মূল্য সংযোজিত বেতন (প্রায়)	তুলনীয় বেসরকারী খাত (সুযোগ সুবিধাসহ)	বেসরকারী খাত ও বেসামরিক প্রশাসন বেতনের অনুপাত
১	২	৩	৪	৪/৩
		১৯৯৫		
সচিব	১৩,০০০	২৭,০০০	১৭৬,০০০	৬.৫
যুগ্ম সচিব	১১,০০০	২২,০০০	১০৭,০০০	৪.৯
উপ-সচিব	৮,৯৫২	১২,০০০	৭২,০০০	৫.৯
		১৯৬৮		
কেন্দ্রীয় সরকার *	২,৬৩৩	(সুযোগ সুবিধা ছাড়া) পাওয়া যায়নি	২,২৩৫	

* শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের বেতন জরিপ, ১৯৬৮

৭.১৮ **স্বচ্ছতার অভাব** — বেশির ভাগ সরকারী কর্মকর্তাই অর্থ-বহির্ভূত সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, যেমন বাসস্থান, কাজের লোক, যানবাহন, টেলিফোন ও ভর্তুকি প্রদত্ত আবাসিক জমি। গত তিন দশকে কর্মকর্তাদের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসের ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে এসব যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এটি খুবই অকার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। এর ফলে যে ভারি প্রশাসনিক বোঝার সৃষ্টি হয়, শুধু তা নয়, এতে সরকারী কর্মকর্তাদের কর্মশক্তি ধাবিত করে স্বল্প সরবরাহের পণ্যের দিকে, এবং সরকারী খাতের প্রকৃত নিয়োগ ব্যয় আড়াল করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তুলনাহীন। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে একই রকমের নীতি হাতে নেয়া হয়েছে, কিন্তু সারা বিশ্বে এরকম একটি উপলব্ধির জন্ম হচ্ছে যে সম্পূর্ণ অর্থে প্রদান করা বেতন পদ্ধতি অনেক বেশি পছন্দনীয়। কোনো কোনো দেশ, যেমন ইন্দোনেশিয়া, অর্থ-নির্ভর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশে বেতনকে অর্থ-নির্ভর করা খুবই জটিল হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সরকারী কোনো বাসায় না থেকে কোনো সরকারী কর্মকর্তা যদি বাসস্থান ভাতা পান, তাহলে তিনি সরকারী বাড়ি ছেড়ে নগদ অর্থ নিতেই পছন্দ করবেন — এতে বাজেটের খরচ বাড়বে, যদি না সরকারী বাড়িগুলি বিক্রী করে দেয়া হয়। বাজেটের ওপর চাপ স্বল্প বা মধ্য মেয়াদে অপরিবর্তনশীল থাকবে, অর্থাৎ সরকারের যখন ঐসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, অথচ তাকে নগদ অর্থে ভাতা দিতে হচ্ছে। দীর্ঘ সময়ের পর এবং গতিশীলতার ভিত্তিতে লাভ নিশ্চিতভাবেই হবে, এবং যথেষ্ট পরিমাণেই হবে, কাজেই সরকারকে বাড়ির মালিক হওয়ার বা বাড়ি বানানোর প্রয়োজন পড়বে না। মূলধন খরচ ও পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সাশ্রয়, বাসস্থান ভাতার খরচ মেটাতে ব্যয় কম হতে পারে, এবং প্রশাসনিক লোকবলও যথেষ্ট পরিমাণ কমানো সম্ভব হবে । এরকম একটি অর্থ-নির্ভর ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে

সকল খুঁটিনাটি তলিয়ে দেখার ও এ ব্যবস্থার প্রক্রিয়াদি পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি সমীক্ষার প্রয়োজন হবে। তবে এরকম সমীক্ষা ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার পরিত্যক্ত বাড়ি বিক্রী করে দেয়ার মাধ্যমে এই বাস্তবায়ন পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে শুরু করতে পারে।

৭.১৯ **স্বয়ংক্রিয় বেতন বৃদ্ধি** — বাংলাদেশ বেসামরিক প্রশাসন সমন্বিত বা একীভূত বেতন-স্কেলের প্রথাগত, ঋজু পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে, যেখানে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়, পূর্ব-নির্ধারিত বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে। এর অনেকগুলো অসুবিধা রয়েছে। এর একটি হল: ব্যবস্থাপকরা, তাদের কর্মচারীদের সবচেয়ে ভাল জানলেও, তাদের বেতন-ভাতা স্তর ঠিক করার ক্ষেত্রে প্রায় কোনো প্রভাব রাখতে পারেন না। তা ছাড়া, এ পদ্ধতি 'স্তর বেয়ে ওঠার' বিষয়টিও উৎসাহিত করে। তবে, আরো সাধারণ ভাবে, এতে সৃজনশীলতা ও উদ্যম বাধাগ্রস্ত হয়। কাজেই, বেশির ভাগ সংস্কারাধীন দেশ প্রথাগত পদ্ধতির মূল উপাদানগুলি বজায় রাখলেও অনেক বেশি নমনীয়তার আশ্রয় নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সুইডেনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এরকম একটি উদ্যোগ 'ব্রোড ব্যান্ডিং' বলে পরিচিত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, চাকুরিতে নিযুক্তির সময় কর্মকর্তারা কোনো স্থির বিন্দুতে না ঢুকে একটি বেতন পর্যায়ে ঢোকেন। তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, পরবর্তী সময়ে বেতন বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয় নয়, বরং কার্যসম্পাদনার সাথে জড়িত।

৭.২০ **এসওই-গুলির অপ্রতুল বেতন** — রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেতন কাঠামো সংস্কারের জরুরী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এসব বেতন কাঠামোর সাথে কার্যসম্পাদনা, বা প্রতিষ্ঠানটির বেতন দেয়ার ক্ষমতা, বা একই ধরনের বেসরকারী খাতের ফার্মের বেতনের কোনো যোগাযোগ নেই। বাংলাদেশ হচ্ছে খুব কম সংখ্যক দেশের একটি যেখানে এসওই-র বেতন নিয়মিত সরকারী বেতন থেকে আলাদা নয়। এই অসন্তোষজনক বেতন নীতির যে বিকৃত প্রভাব এসওই-র কার্যসম্পাদনা, সেবার মান, দুর্নীতি, এবং ব্যবস্থাপকদের ক্রমশ নিম্নমুখী মানের ওপর পড়েছে, তা সর্বজনবিদিত। বাংলাদেশ সরকারের বেতন থেকে এসওই-র বেতন বিযুক্ত করা বহুদিন আগেই উচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উৎপাদনমুখী এসওইগুলিতে তাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট বেতন স্কেল রয়েছে। কোনো একক এসওই বেতন স্কেল নেই, এবং বৃহত্তর ফার্মগুলির বেতন সাধারণত ছোট ফার্মগুলি থেকে বেশি। এসওই-গুলি তাদের লাভ ও অর্থ প্রদানের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে। অন্যান্য অসংখ্য পূর্ব এশীয় ও নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশে এই প্রথা অনুসরণ করা হচ্ছে।

৭.২১ **একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন** — বাংলাদেশে বেতন পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন চালু করার ক্ষেত্রে যুক্তিগুলি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রথমত এটি একেবারেই পরিষ্কার যে, সরকার যে বেতন দিবে, সে অনুযায়ী সেবা পাবে। নিম্ন বেতনের সংগে নিম্নমানের কাজের একটি সম্পর্ক রয়েছে, এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরির মর্যাদার ব্যাপারটিও তেমন কোনো সাহায্য করে না। মর্যাদার দৌড়ও একটা স্থান পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত, ন্যায়নীতির বিষয়টি, অর্থাৎ উপরের ও নিচের বেতন অনুপাত সংকোচনের বিষয়টি পছন্দনীয় হলেও তা বাংলাদেশের নাগরিক এবং/অথবা করদাতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতি-উৎপাদনশীল বিবেচিত হবে। তারা নিঃসন্দেহে সচিব বা সংস্থা প্রধান কতটা বেতন পান, তার থেকে প্রদেয় সেবার মান নিয়েই বেশি ভাবিত। তৃতীয়ত, উপনিবেশী প্রশাসনের পক্ষে বেতন মাত্রার পর্যাপ্ততার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার একটি ভাল যৌক্তিকতা ছিল, যেহেতু নিম্ন বেতন "জনসেবা"র ধারণাগুলি "স্ব-সেবাতে" রূপান্তরিত করে। যদি গ্রাহক/ভোক্তাকে সেবা দেয়ার ওপর দৃষ্টি দিতে হয়, তাহলে ঐ নাগরিক/করদাতা নিকৃষ্ট সেবা ও সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য নিচু বেতনের চাইতে পছন্দ করবেন সিঙ্গাপুরের-ধরনের দক্ষতা, যেখানে সরকারী খাতে ব্যবস্থাপকরা বেসরকারী খাতের ব্যবস্থাপকদের ধারে কাছে বেতন পান। চতুর্থত, একটি গরীব দেশ উচ্চ বেতন দিতে সমর্থ নয়; বেতনের সংগে মাথাপিছু আয়ের একটি সঙ্গতি থাকতে হবে — এ ধরনের যুক্তিও শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। সরকারী খাতের একজন শীর্ষ ব্যবস্থাপক যে একটি সুন্দর জীবনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি, যেমন সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা,

মাথাপিছু আয়ের একটি সঙ্গতি থাকতে হবে — এ ধরনের যুক্তিও শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। সরকারী খাতের একজন শীর্ষ ব্যবস্থাপক যে একটি সুন্দর জীবনের আবশ্যকীয় উপাদানগুলি, যেমন সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা, গাড়ি, ব্যক্তিগত একটি বাড়ি ও জীবনের অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাখ্যান করবেন, এটি আশা করাও একটি অসম্ভব ব্যাপার। বাংলাদেশে নীতি-নির্ধারকরা যতই বিশ্বাস করতে চান যে তারা নিচু বেতন দিয়েই সিঙ্গাপুরের মত দক্ষতা ও কর্ম-নৈতিকতা[৩] অর্জন করতে পারবেন — দুঃখজনকভাবে, এ ধরনের সাফল্যের ঘটনা কোথাও নেই। সবশেষে, সমষ্টিক অর্থনীতি সংস্কারের এবং অর্থনীতিকে উদারকরণের একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দামটা ঠিকমত পাওয়া। ঐসব সংস্কার চেষ্টা করে এমন একটি মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ করতে, যাতে বাজারের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়; পণ্য ও সেবার দাম যাতে সঠিক হয়, এবং সঠিক সুদের হার যাতে নির্ধারিত হয়। কিন্তু মানুষের মনোযোগ একটি দামের বিবেচনা এড়িয়ে যায় : যারা অন্যসব দাম ঠিক করবে, তাদেরকে কতটা দাম দেয়া হয়? "দেশের প্রত্যাশা কী? কমসংখ্যক কিন্তু অতিশয় উদ্বুদ্ধ এবং উচ্চ বেতনভুক সিভিল সার্ভেন্ট, যারা দেশকে আরো বেশি সমৃদ্ধশালী করার জন্য সরকারী সেবার মান ও উৎপাদনে মানগত অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করবে, না কি যেমনটি ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে নিম্নবেতনভুক, মনোবলহীন সিভিল সার্ভেন্ট, যাদের দেশকে অগ্রযাত্রার দিকে নেয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই তেমন ধরনের সিভিল সার্ভেন্ট?" এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার সময় আশা করা যায় নীতি নির্ধারকরা বর্তমান বিকৃত অবস্থা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে এবং প্রথম পছন্দের বিষয়টি বেছে নিতে সাহস দেখাতে পারবেন।

৭.২২ সারণী ৭.১২ বেশ কটি কল্পিত চিত্র দেয়া হয়েছে যেখানে বেতন সংস্কারের জন্য অর্থায়নের একটি উপায় দেখানো হয়েছে। নিয়োগ দান ও মন্ত্রণালয়গুলির *বাজেট-নিরপেক্ষ* যৌক্তিককরণের মধ্যে দিয়ে এই অর্থায়ন সম্ভব। যেমন (সারণীতে ছায়াযুক্ত রেখাগুলি দেখুন) পাঁচ বছরের সময়সীমার মধ্যে:

> **চিত্র 'ক': ছাঁটাই থেকে বাঁচানো অর্থ দিয়ে (৩১৫০ কোটি টাকা) একই সঙ্গে কর্মকর্তাদের বেতন ১০০% বাড়ানোর খরচ (২৭২০ কোটি টাকা) ও কর্মী ছাঁটাই খরচ ৬৩০ কোটি টাকা (এক বছরের বেতন) মেটানো যাবে,** যদি নিচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয় : (১) কর্মকর্তা ঃ কর্মচারী অনুপাত, কৃষি, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ছাড়া (কারণ এদের কাজের চরিত্র এমন যে উচ্চতর কর্মচারী ঃ কর্মকর্তা অনুপাত প্রয়োজন হয়) সকল মন্ত্রণালয়ে এনাম কমিটি সুপারিশকৃত হার ১ঃ৩ এ নিয়ে আসা যাবে (অনুচ্ছেদ ৭.৭); (২) বাদ পড়া মন্ত্রণালয়গুলির প্রায় ১০% কর্মচারী হ্রাস করা যাবে, যা বর্তমান অতিরিক্ত লোকবলের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য বলে বিবেচনা করা যায় ; এবং (৩) কিছু মন্ত্রণালয় (যেমন শিল্প, বাণিজ্য, পাট, বস্ত্র ইত্যাদি) যদি একীভূত/যুক্তিযুক্তকৃত হয়, তাহলে এদের বর্তমান লোকবলের ১৫-২০% হ্রাস করা সম্ভব হবে।

> **চিত্র 'ঘ': ছাঁটাই থেকে বাঁচানো অর্থে (২৪৯০ কোটি টাকা) একই সঙ্গে কর্মকর্তাদের বেতন ৭৫% বাড়ানোর খরচ (২০৪০ কোটি টাকা) এবং কর্মী ছাঁটাই খরচ ৪৯৯ কোটি টাকা (এক বছরের বেতন) মেটানো যাবে,** যদি নিচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়: (১) এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৭.৭) কৃষি, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ছাড়া — যাদের উচ্চতর কর্মচারী ঃ কর্মকর্তা অনুপাত প্রয়োজন — প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য কর্মকর্তা ঃ কর্মচারী অনুপাত ১ ঃ ৪ এ নিয়ে আসা যায়; এবং (২) ঐসব বাদ পড়া মন্ত্রণালয়ের ১০% এর মত কর্মচারী হ্রাস করা যায়, যা মন্ত্রণালয়গুলোর বর্তমান অতিরিক্ত লোকবলের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য বলেই বিবেচনা করা যায়।

---

[৩] সিঙ্গাপুরে ১৯৮৯ সালে সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভেন্ট-এর মোট বেতন ছিল প্রতিমাসে ২৬,০০০ মার্কিন ডলার, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সিভিল সার্ভেন্ট-এর বেতন হচ্ছে প্রতি মাসে ৭,২০০ ডলার। সরকারী খাতের বেতনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী লী'র বক্তব্য ছিল: "সিভিল সার্ভেন্টদের পর্যাপ্ত বেতন দেয়া লোক প্রশাসনের মান বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়।"

সারণী ৭.১২ বেতন বৃদ্ধি ও ছাঁটাইয়ের অর্থায়ন

কর্মকর্তা ঃ কর্মচারী অনুপাত	কর্মকর্তার সংখ্যা	কর্মচারীর সংখ্যা	অতিরিক্ত কর্মচারী	৫ বছরের মোট সঞ্চয় ১০০ কোটি টাকায়	কর্মকর্তাদের ৫ বছরের বেতন বৃদ্ধি ১০০ কোটি টাকায়	কর্মচারীরে ৫ বছরের বেতন বৃদ্ধি ১০০ কোটি টাকায়	কর্মচারীদের ছাঁটাই ব্যয় ১০০ কোটি টাকায়	৫ বছরের মোট সঞ্চয় ১০০ কোটি টাকায়
<u>চিত্র 'ক'</u>								
ধরে নেয়া : কর্মকর্তাদের বেতন ১০০% বেড়েছে/মন্ত্রণালয়গুলি ছোট হয়েছে/যুক্তিযুক্ত হয়েছে								
১ঃ০৩ ও -১০%	৫২০১৮	৫৭৬৬৩৫	১৩৭৯৪৭	৩৩.৩৩	২৫.৯০	০.০০	৬.৬৭	০.৭৭
১ঃ০৪ ও -১০%	৫২০১৮	৬০০৮৬২	১১৩৭২০'	২৭.৪৮	২৫.৯০	০.০০	৫.৫০	-৩.৯২
১ঃ০৫ ও -১০%	৫২০১৮	৬২৫৪৬১	৮৯১২১	২১.৫৩	২৫.৯০	০.০০	৪.৩১	-৮.৬৭
১ঃ০৬ ও -১০%	৫২০১৮	৬৫০০৫৯	৬৪৫২৩	১৫.৫৯	২৫.৯০	০.০০	৩.১২	-১৩.৪৩
<u>চিত্র 'খ'</u>								
ধরে নেয়া : কর্মকর্তাদের বেতন ৭৫% বেড়েছে/মন্ত্রণালয়গুলি ছোট হয়েছে/যুক্তিযুক্ত হয়েছে								
১ঃ০৩ ও -১০%	৫২০১৮	৫৭৬৬৩৫	১৩৭৯৪৭	৩৩.৩৩	১৯.৪২	০.০০	৬.৬৭	০.২৪
১ঃ০৪ ও -১০%	৫২০১৮	৬০০৮৬২	১১৩৭২০	২৭.৪৮	১৯.৪২	০.০০	৫.৫০	-২.৫৬
১ঃ০৫ ও -১০%	৫২০১৮	৬২৫৪৬১	৮৯১২১	২১.৫৩	১৯.৪২	০.০০	৪.৩১	-২.২০
১ঃ০৬ ও -১০%	৫২০১৮	৬৫০০৫৯	৬৪৫২৩	১৫.৫৯	১৯.৪২	০.০০	৩.১২	-৬.৯৫
<u>চিত্র 'গ'</u>								
ধরে নেয়া : কর্মকর্তাদের বেতন ১০০% বেড়েছে/মন্ত্রণালয়গুলি আগের মতই আছে								
১ঃ০৩ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৫৮৪২৪০	১৩০৩৪২	৩১.৪৯	২৭.২২	০.০০	৬.৩০	-২.০৩
১ঃ০৪ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৬১১৪০৬	১০৩১৭৬	২৪.৯৩	২৭.২২	০.০০	৪.৯৯	-৭.২৮
১ঃ০৫ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৬৩৮৭৫৪	৭৫৮২৮	১৮.৩২	২৭.২২	০.০০	৩.৬৬	-১২.৫৭
১ঃ০৬ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৬৬৬০১১	৪৮৫৭১	১১.৭৪	২৭.২২	০.০০	২.৩৫	-১৭.৮৩
<u>চিত্র 'ঘ'</u>								
ধরে নেয়া : কর্মকর্তাদের বেতন ৭৫% বেড়েছে/মন্ত্রণালয়গুলি আগের মতই আছে								
১ঃ০৩ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৫৮৪২৪০	১৩০৩৪২	৩১.৪৯	২০.৪২	০.০০	৬.৩০	৪.৭৮
১ঃ০৪ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৬১১৪০৬	১০৩১৭৬	২৪.৯৩	২০.৪২	০.০০	৪.১৯	-০.৪৭
১ঃ০৫ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৬৩৮৭৫৪	৭৫৮২৮	১৮.৩২	২০.৪২	০.০০	৩.৬৬	-৫.৭৬
১ঃ০৬ ও -১০%	৫৪৬৭৭	৬৬৬০১১	৪৮৫৭১	১১.৭৪	২০.৪২	০.০০	২.৩৫	-১১.০৩

৭.২৩ যেমন ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে, বেতন বিলের পরিমাণ খুব বেশি না বাড়িয়েও বড় ধরনের সংস্কার হাতে নেয়া সম্ভব — যেগুলো অন্তত এ আশাবাদ সূচিত করে যে, মানবসম্পদের মান নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। উঁচু মানের সেবা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের করদাতাদেরকে যদি জিডিপির আরো ১-২% প্রদান করতে হয়, যেমন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে হচ্ছে — একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে, বেতন সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়ার জন্য অতিরিক্ত আয়কর দিতে তারা আপত্তি করবেন না। এমন অনেক উদাহরণ আছে যে, বাংলাদেশের গরীব জনসাধারণও (যেমন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ গ্রহীতাগণ) উন্নত সামগ্রী এবং সেবার জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয় করতে আগ্রহী। *বেতন সংস্কার জরুরী হয়ে পড়লেও জনগণ বর্তমান সরকারী কর্মচারীদের নিচুমানের সেবা, দায়িত্বহীনতা এবং শোষনমুখী আচরণের জন্য বড় ধরনের বেতন বৃদ্ধি সমর্থন করবে না। দক্ষতার সুনির্দিষ্ট মাত্রা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পরই বেতন ব্যবস্থায় তেমন বড় কোনো পরিবর্তন আনা যেতে পারে। আর তখনই বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটি যৌক্তিক হবে।* অধিকন্তু মৌলিক সংস্কার স্বভাবতই বেশ জটিল, এ প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ এর জন্য যথেষ্ট নয়; এবং অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ এবং উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া উচিত। এরকম পরিব্যাপ্ত সমীক্ষা যতদিন না হয়, সেই অন্তবর্তী সময়ে 'পরিবর্তনের প্রতিনিধি' বলে কথিত হাজারো বিশিষ্ট ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যায়। উল্লেখ্য, অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও এরা কাজ ছেড়ে যাননি।

- ***মেধাবী সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য পুরস্কার প্রদান*** — সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগে দক্ষতার দিক থেকে শিখরে অবস্থানকারী ১-২% কর্মকর্তারা এ পুরস্কার পাবেন। দক্ষতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র, যেমন — সময়মত এডিপি বাস্তবায়ন, রাজস্ব আদায়ে নির্দিষ্ট মাত্রা অর্জন, শুল্ক আদায়, অথবা উঁচু মান সম্পন্ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ — এগুলোর ভিত্তিতে এ কর্মদক্ষতা হিসেব করতে হবে। পুরস্কার হিসেবে নগদ টাকার ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত হবে এবং তা ১৮ মাসের বেতনের সমপরিমাণ হতে পারে যা দিয়ে কর্মকর্তা গাড়ি খরিদ, সন্তানের কলেজ শিক্ষার খরচ, বিবাহ কার্য এবং অনুরূপ বিষয়গুলো মোকাবিলা করতে পারেন, যেগুলো বর্তমান ক্ষেত্রে প্রায়শই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। সরকারের প্রতিটি বিভাগ বা মন্ত্রণলায়ে দায়িত্ব-প্রাপ্ত একটি কমিটি কর্মকর্তা বাছাইয়ের কাজটি করবে এবং সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও বিজ্ঞ পেশাজীবী সমন্বয়ে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কমিটি চূড়ান্ত মনোনয়ন দেবে। প্রশাসনের বাইরে থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ কমিটি এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া দুর্নীতি রোধে সহায়ক হবে।

- ***বিশেষ যোগ্যতা ভাতা প্রবর্তন*** — OECD ভুক্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ বা ডক্টরেট ডিগ্রীধারী কর্মকর্তাগণ এ ভাতা পাবেন। এখানেও অর্থের ব্যাপারটি গুরুত্ব পাবে। এম.এ ডিগ্রীধারীকে মূল বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ এবং একজন পিএইডি ডিগ্রীধারীকে শতকরা ২০০ ভাগ প্রদান করা যেতে পারে। এতে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে, এমনকি নিজেদের ব্যয়েও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপার আগ্রহ গড়ে উঠবে এবং অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকগণ সরকারী চাকুরিতে উৎসাহিত হবেন।

- ***ব্যয় হ্রাস পুরস্কার প্রচলন*** — সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সম্পদের অপব্যবহার এবং খরচ কমানোর জন্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মন্তব্য চেয়ে পাঠানো যেতে পারে। যে কর্মকর্তার মন্তব্য বিবেচনা করা হবে তিনি এ পুরস্কার পাবেন। পরিবর্তনের প্রতিনিধিদের ব্যয় হ্রাসের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭.২৪ **সরকারকে মনে রাখতে হবে সফলতাকে পুরস্কৃত না করার অর্থ ব্যর্থতাকে অনুমোদন করা।** এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে খরচের চেয়ে লাভের পরিমাণই বেশি। প্রতিটি এক লাখ টাকা হিসেবে এক হাজারটি পুরস্কার (মোট নিয়োজিত কর্মকর্তার শতকরা ১ ভাগ), ২ লাখ টাকার ১০০টি ডক্টরেট ভাতা, ১ লাখ টাকা করে ২০০টি মাস্টার্স ভাতা — সব মিলে বছরে ১৪ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে না।

৭.২৫ এর সাথে, নিচের পদক্ষেপগুলো সুপারিশ করা হচ্ছে:

- ***অর্থ মন্ত্রণালয়ে পেশাজীবীদের নিয়ে বেতন গবেষণা ইউনিট প্রতিষ্ঠা*** — বেতন গবেষণা ইউনিট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করবে। এডহক বেতন কমিশনের কাছে দায়িত্ব ছেড়ে না দিয়ে এ ইউনিট নিয়মিতভাবে বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে পদ্ধতিগত এবং ব্যাপক পর্যালোচনা করবে এবং বার্ষিক প্রবৃদ্ধির সুপারিশ করবে। ***প্রথম কাজ হবে*** ব্যয়ের আর্থিক লক্ষ্যসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বেতন প্রদানের ব্যাপারটি মানিয়ে নেয়ার বিষয়ে পরীক্ষা চালানো, যেগুলো ৫ থেকে ৭ বছর পর এ্যাট্রিশন বা নিজ থেকে কমে যাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অবসর গ্রহণ, সরকারের নিচু পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি, এবং অদক্ষ কর্মকর্তা কমানোর ভিত্তিতে উঁচু পর্যায়ে বড় অঙ্কের বেতন বৃদ্ধি — ইত্যকার সংস্কারের মাধ্যমে বেতনভাতা দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। স্বচ্ছ এবং একীভূত বেতন কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ সমীক্ষা বিনামূল্যে গৃহায়নের মত অর্থ বহির্ভুত ব্যাপারগুলিকে অর্থের সাথে একই হিসেবের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বেতন এবং অন্যান্য ভাতার অর্থগত দিক আলোচনা করবে। সমীক্ষার পূর্বে বেতন বিলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে, যাতে করে ইউনিটটি ট্রেড-অফের প্রেক্ষিতে বাজেট সীমাবদ্ধতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারে, যা সংকোচন হার, ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের বেতনক্রম এবং কর্মকর্তাদের পর্যায় ও পরিচিতি, ইত্যাদি বিষয় থেকে উঠে আসতে পারে।

- ***সরকার থেকে বিচার বিভাগ এবং গণমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের বেতন আলাদা করা*** — একটি প্রাথমিক কাজ হবে উচ্চ আদালত এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের বেতনক্রম বাজারের দ্রব্যমূল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পুনর্বিন্যাস করা। অতঃপর মধ্য মেয়াদে গণমালিকানাধীন থেকে যাওয়া এসওই-গুলিকে বাণিজ্যিক সুবিধার বিবেচনা এবং বেতন প্রদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে স্বায়ত্ত্বশাসন দিতে হবে।

দক্ষতার অপপ্রয়োগ — জেলা ব্যবস্থাপক হিসেবে ডাক্তার

৭.২৬ দক্ষতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুবিন্যস্ত নীতিমালা এবং নির্দিষ্ট কাজের অভাব বর্তমান পেশাজীবিতার সংকোচন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যার একটি বড় কারণ। সমন্বিত নীতিমালা প্রবর্তনের জন্য ক্যাডার পদ্ধতি, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং পদোন্নতি নীতিমালায় সংস্কার প্রয়োজন।

৭.২৭ **নিয়োগ** — বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের মোট ২৯টি ক্যাডারে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে 'রুদ্ধ প্রবেশ'(close entry) নীতি অনুসরণ করা হয়। মধ্যম এবং উচ্চ পর্যায়ে, এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের পদগুলোতে শতকরা দশ ভাগ নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক অথবা অন্যান্য সেক্টর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেষণের মাধ্যমে হতে পারে। অবশ্য এই 'নতুন' মানবসম্পদ খুব কমই ব্যবহার হয়, এবং এতে প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতার চাপ কমে। উপরোক্ত নিয়োগ কাঠিন্যের পাশাপাশি বর্তমান নিয়োগ ব্যবস্থা পুরোপুরি

কেন্দ্রীকৃত এবং সময় সাপেক্ষ। কোনো বিভাগে নতুন নিয়োগ দেয়ার আগে প্রচলিত নিয়মবিধির বিস্তারিত খসড়া করতে হয়। তারপর সে খসড়াটি বেশকিছু মন্ত্রণালয়, যেমন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। অবশেষে তা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে 'মতামত' দেয়ার জন্য পাঠানো হয়, যদিও মতামত প্রদান বাধ্যতামূলক। অতএব, খুব সাধারণ একটি নিয়োগেও অনেক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া বিস্ময়ের কিছু নয়।[৪] কেন্দ্রীকৃত প্রক্রিয়াটি আবার প্রায়ই খুব বেশি গুরুভার থাকে, নির্দিষ্ট পদের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতার প্রতি উদাসীন থাকে এবং প্রায়শই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী হয়। বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন যে কোনো নিয়োগের সময়ে এগুলো বিশেষভাবে নজরে আসে।

৭.২৮ **ক্যাডার পদ্ধতি** — যদিও প্রতিটি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের একই পর্যায়ে নিয়োগ দেয়া হয়, তাদের সবারই পেশাগত সমৃদ্ধি বা গতিশীলতা একরকম থাকে না । উদাহরণস্বরূপ, কলেজ শিক্ষকরা বছরের পর বছর ধরে একই বিষয় পড়াতে থাকবেন, এবং তাদের খুব নগণ্য সংখ্যকই শিক্ষা বিষয়ক প্রশাসনে উঁচু পদে আসীন হবেন। যদিও সরকার সবগুলো ক্যাডারের জন্যই সচিবালয়ের বড় পদসমূহ উন্মুক্ত করেছেন — এমনকি সচিব পদটিও, যা একজন সরকারী কর্মকর্তার পেশাগত জীবনে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন পদ। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ পদই এখনও দখল হচ্ছে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দ্বারা, যাদের পেছনে আবার রয়েছেন অন্যান্য সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ, যেমন- অর্থ, শুল্ক এবং শিক্ষা ক্যাডারের। এতে পেশাজীবী এবং কারিগরী ক্যাডারের (যেমন- ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক, কৃষিবিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞ) কর্মকর্তাগন মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেন। অনেক কর্মকর্তা রয়েছেন যারা এ ২৯টি ক্যাডারের কোনোটির অন্তর্ভূক্ত নন এবং কিছু ক্যাডারের — যেমন পরিসংখ্যান — রয়েছে সীমিত পেশাগত ভবিষ্যৎ। অধিকন্তু আন্তঃবিভাগীয় নিয়োগ অনেক সময় কাজ করে সন্দেহপূর্ণ মাপকাঠি, জ্যেষ্ঠত্ব বা প্রতিযোগিতার সাথে যার সম্পর্ক খুব সামান্য। সিভিল সার্ভিসের সংস্কার সম্পর্কিত বিতর্কের অনেকটাই কোনো মৌলিক সংস্কারের চেয়ে ক্যাডার পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ক্যাডারের আপেক্ষিক মর্যাদা নিয়েই বেশি জড়িত।

৭.২৯ ১৯৭৭ সালের ক্যাডার পদ্ধতির প্রচলন, সিএসপি(CSP) ক্যাডারের অবলুপ্তি ঘোষণা এবং উঁচু পর্যায়ে গতিশীলতা অনুমোদনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে পার্থক্য পরিহার, সমপরিমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং নির্বাহী বা পরিকল্পনা-প্রণয়নকারী পদগুলোতে নিয়োগের ভিত্তিটি প্রশস্ত করা। প্রশাসনিক সিভিল সার্ভিস ক্যাডার থেকে 'মেকি অভিজাততন্ত্র' উচ্ছেদ এর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। সে যাই হোক, কার্যত এসব উদ্দেশ্যের কোনোটিই অর্জিত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারিগরী ও পেশাজীবী সার্ভিস ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের অনুকূলে। এবং কর্মকর্তাদের নিয়োগ-উত্তর প্রশিক্ষণে প্রাধান্য পায় আইন, রাজস্ব এবং সাধারণ প্রশাসন। এতে করে উঁচু পদগুলো হতে কারিগরী ও পেশাজীবীরা বাদ পড়ে যান, যেখানে থাকলে তারা পরিকল্পনা গ্রহণে ভূমিকা রাখতে পারতেন। ফলে পেশাগত এবং কারিগরীভাবে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তার (প্রকৃচি) সাথে সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের যোগ্যতার দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। পদোন্নতি আধুনিক সিভিল সার্ভিসের অন্যতম বিতর্কিত বিষয় এবং ক্যাডারসমূহের মধ্যে সংঘাতের কারণ। এ ব্যাপারে প্রধান অভিযোগটি হল পদোন্নতি ব্যাপারটি রাজনীতিকরণের শিকার; তাছাড়া সরকারের উচ্চ পদে সব ক্যাডারের জন্য পদোন্নতির ক্ষেত্রে একই রকমের সুযোগ সৃষ্টি করে হয়। প্রকৃতপক্ষে, সম্প্রতি বাংলাদেশ হাইকোর্ট পদোন্নতি বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ উপ-কমিটিকে (অনুচ্ছেদ ৭.২৫) বিধি-বহির্ভূত ঘোষণা করেছে এবং প্রায় দু'শত সরকারী কর্মকর্তার পদোন্নতি নিয়ম-বহির্ভুত বলে ঘোষণা করেছে।

---

[৪] যে আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে 'উদ্দীপক' জিনিসটিকে 'দূরভিসন্ধি' বলে ভুল করা হয়, সেখানে অনেকেই একটি ফাইলের পেছনে ছোটা থেকে নিবৃত্ত থাকতে চাইবেন।

৭.৩০ আজকের দ্রুত ধাবমান, জটিল এবং পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো সরকারের জন্যই নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। এর সাথে বাংলাদেশে রয়েছে অতিশয় জটিল এবং বিশাল উন্নয়নের চ্যালেঞ্জসমূহ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অতিমানবিক ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন। বিদ্যমান ক্যাডার ভিত্তিক 'রুদ্ধ-প্রবেশ' আমলাতন্ত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার যোগান দিতে অক্ষম। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের বিবিধ ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন। নীতি নির্ধারণের জন্য চাই তেমন ব্যক্তিদের যারা একটি মন্ত্রণালয়ের অধীন এলাকাকে সরকারের বৃহত্তর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংযুক্ত করতে পারবেন এবং রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অপর পক্ষে অর্থনীতি এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষ মূল পেশাজীবীদের মত কুশলী ব্যক্তিবর্গেরও প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবস্থাপনা পদে যোগ্য এবং সুপ্রশিক্ষিত কর্মকর্তার নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিচের সুপারিশগুলি করা হচ্ছে :

- *বিশেষ কার্যপরিচালনা গ্রুপ সৃষ্টি* — বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দক্ষতা অপপ্রয়োগের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার একটি সম্ভাব্য পদক্ষেপ হতে পারে মন্ত্রণালয়সমূহকে কয়েকটি কার্যপরিচালনা গ্রুপে বিভক্ত করে 'বিশেষ উর্ধতন কর্মকর্তা পুল' (SSSP) প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে কার্যপরিচালনা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা করা। বিদ্যমান একীভূত SSP তখন ভেঙ্গে দেয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ের কার্যপরিচালনা গুচ্ছে/গ্রুপে থাকতে পারে: একটি সমষ্টিক অর্থনৈতিক গ্রুপ, একটি সামাজিক খাত গ্রুপ, একটি অবকাঠামো গ্রুপ, একটি কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রুপ এবং একটি সাধারণ প্রশাসন গ্রুপ। উপ-সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন যে কোনো ক্যাডারের কর্মকর্তা পেশাগত রেকর্ড এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে SSSP'র যে কোনো একটি গ্রুপে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করবেন। এই পরীক্ষাগুলি হবে মাষ্টার্স-স্তরের বিশেষভাবে তৈরি মডিউল, যাতে প্রতিটি বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হবে। কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ সময়মত পড়াশোনা করবেন এবং পছন্দসই একের অধিক গ্রুপে মনোনয়নের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে যে কোনো পদে নিযুক্ত সবাইকে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বিটিএসি'তে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। SSSP শ্রেণীর যে কোনোটির জন্য নির্বাচিত একজন কর্মকর্তা পেশাজীবনের বাকী সময়টি এখানেই কাটাবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প প্রধান বা সচিবের পদ অলঙ্কৃত করবেন — যদি তার কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক হয়।

- *আরো বেশি প্রো-এ্যাক্টিভ ল্যাটেরাল নিয়োগ নীতি প্রবর্তন* — একটি অধিকতর উন্মুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত বেশি সুবিধাজনক হতে পারে কারণ এতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনের সুযোগ থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত একটি ব্যবস্থা তেমন কার্যকর না-ও হতে পারে। এর একটি কারণ হলো যারা আড়াআড়ি (ল্যাটেরাল) চাকুরিতে ঢুকছেন, তারা চাকুরি ছেড়ে সহজে যেতে চাইবেন না যেহেতু অন্যত্র চাকুরির তেমন সুবিধা নেই। আরেকটি কারণ হতে পারে যে, একটি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সরকারী কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব উভয়েরই হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে। বরং এর পরিবর্তে আংশিক উন্মুক্ত পদ্ধতির কথা চিন্তা করা যেতে পারে। যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক শিল্পোন্নত দেশ এবং মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা ও চিলিসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ খোলা বাজার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে থাকে। এটি বাংলাদেশের কাছে একটি অনুকরণযোগ্য উদাহরণ হতে পারে।

- ***আরো বেশি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ*** — উপরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত ক্যাডার নিয়োগের ফলে দক্ষতার ফারাক নিরসনের জন্য সরকার চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা নিয়োগের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারেন। সরকার বিভিন্ন সময়ে কর্মকর্তাদের অবসর-উত্তর নিয়োগদানের মাধ্যমে পদ্ধতিটি কাজেও লাগিয়েছেন; বিশেষ করে প্রাক্তন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (CSP) এবং প্রশাসনের অনেক পুরুষ কর্মকর্তা পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন। পেশাজীবী এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আরেকটি সম্ভাবনা হতে পারে স্বল্প-মেয়াদী চুক্তিতে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ। বহির্বিশ্বের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে কোনো ব্যাপক সংস্কার বা আধুনিকায়ন পরিকল্পনা হাতে নিতে গেলে সরকারের প্রতিনিয়ত এমন সব কর্মীর প্রয়োজন, যারা অনেক বিষয় সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত। এরা হতে পারেন স্বল্প মেয়াদে নিযুক্ত স্বাধীন কনসালটেন্ট বা পরামর্শদাতা যারা নির্দিষ্ট সময় শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা গবেষণা ক্ষেত্রে ফিরে যাবেন।

- ***নিয়োগ বিকেন্দ্রীকরণ*** — নিয়োগ নীতিমালা (ঘর ৭.২) তৈরির সময় এবং এটি যে আর্থিক উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাজেট-নিরপেক্ষ, তা নিশ্চিত করার জন্য, এবং যথাযথ নিরোধ ও ভারসাম্য (চেকস এন্ড ব্যালেন্স) নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। নিকট ভবিষ্যতে এ বিকেন্দ্রীকরণের পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করবে সরকার বিভিন্ন বিভাগের পরিচালকের নিকট পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক প্রচলিত এবং পরিচালিত বিধির সাথে সঙ্গতি রেখে কতটা ক্ষমতা হস্তান্তর করে তার ওপর। সে যাই হোক, আরো মৌলিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সরকারী ইউনিটগুলোর কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি সরকার কোনো এজেন্সি-পদ্ধতি নির্বাচন করে, তবে এজেন্সির নির্বাহীদের মাঝারী ধরনের কর্মকর্তা নিয়োগসহ বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে। যুক্তরাজ্য এবং নিউজিল্যান্ডে এজেন্সি নির্বাহীদের উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রচলিত বাজার হারে কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে ইতোমধ্যে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে।

- ***মন্ত্রণালয়সমূহের দক্ষতা বৃত্তান্ত তৈরি করা*** — সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/এজেন্সির গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রয়োজনীয় দক্ষতার বৃত্তান্ত প্রস্তুত করা উচিত এবং এসব উঁচু পদে কাজ করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের পক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে কর্মকর্তা নির্বাচন করা উচিত। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনের নিমিত্তে এসব কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত জীবন পরিচালিত হবে। যদিও কিছুটা অপচয় হবে, তবে লাভের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত অনেক বেশিই হবে।

৭.৩১ এসব পরিবর্তন সরকারের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে সিভিল সার্ভিসের উঁচু স্তরে পৌঁছার সুযোগ করে দেবে এবং শিক্ষিত অপেশাদারিত্বের ঐতিহ্যটি দূর করবে। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তাদের তাদের বাছাইকৃত দক্ষতার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবার সুযোগ এনে দেবে। কঠিন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত যুক্তিহীন অবস্থাও এর ফলে অনেক কমে যাবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থাপনা পদে — তা নীতি প্রণয়ন বা এজেন্সিই হোক — পেশাগত এবং কারিগরীভাবে প্রচুর জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ অপরিহার্য। পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে পরিবেশ, মূলধন বাজার এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের মত বিষয়ের সাথে এটি মেলানোর লক্ষ্যে যথেষ্টভাবে জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ কর্মকর্তার নিয়োগ বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ঘর ৭.২ নিয়োগ চেকলিস্ট

- এ পর্যায়ে অথবা আদৌ, শূন্য পদটি পূরণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?
- যদি থাকে তবে পদটির প্রকৃতি কী এবং ভবিষ্যতে তা কেমন দাঁড়াতে পারে ?
- কী কী যোগ্যতা, গুণাবলী, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং অর্জন ভবিষ্যতের এ পদের একজন কর্মকর্তার অবশ্যই থাকতে হবে ?
- কর্মকর্তা যে শীর্ষদলের সাথে কাজ করবেন তার যোগ্যতা কী ?
- বিভাগের মধ্যেই যথেষ্ট প্রার্থী রয়েছে কি? অথবা শক্তিশালী একদল প্রার্থীর জন্য সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য ক্যাডারে কি খোঁজ নেয়া প্রয়োজন ? নাকি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যাবস্থা করতে হবে ?
- বিভাগের স্বার্থে অথবা সিভিল সার্ভিসের বৃহত্তর স্বার্থে বিভাগে বা সিভিল সার্ভিসে এ শূণ্যতার বিপরীতে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের কোনো যুক্তি আছে কি ?

উৎস : *দি সিভিল সার্ভিস : কন্টিনিউইটি এন্ড চেঞ্জ,* প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জুলাই,১৯৯৪ তে সংসদে উপস্থাপিত শ্বেতপত্র।

পদোন্নতি

৭.৩২ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও সিভিল সার্ভিস নিয়মানুযায়ী পদোন্নতির ব্যাপারটি মেধা এবং জ্যেষ্ঠত্ব উভয়ের ওপর নির্ভরশীল।[৫,৬] তবে জ্যেষ্ঠত্বের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়ার একটি প্রবণতা রয়েছে। সংস্কারবাদী অনেক দেশ বেতন এবং পদোন্নতিকে দক্ষতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। অধিকতর ঐতিহ্য-নির্ভর দেশ, যেমন: কোরিয়া, জাপান এবং থাইল্যান্ড, পদোন্নতির ব্যাপারে বহুলাংশে জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর। সাধারণভাবে, বাংলাদেশে বেতন সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মুখে একটি 'দক্ষতা বাধা' রয়েছে যেটি প্রত্যেক সরকারী কর্মকর্তারই জয় করা উচিত, যদিও তোমধ্যে এটিকে একটি 'নিয়ম' হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সিঙ্গাপুরে একটি কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণের মাধ্যমেই শুধু দক্ষতা বাধাটিকে অতিক্রম করা যায়।

৭.৩৩ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সিনিয়র সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (এসএসএসবি) সরকারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ব্যাপারে একমাত্র কর্তৃত্বপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালে তৎকালীন সরকার পদোন্নতি বিষয়ক মন্ত্রিপরিষদ উপ-কমিটি সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে রাজনীতিকরণ করেন। নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে সরকার পদোন্নতি পদ্ধতিকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারেন:

---

[৫] এ অংশের আলোচনা বিদ্যমান সিভিল সার্ভিস পদ ব্যবস্থার ভিতরে পদোন্নতির একটি মূল্যায়নের মধ্যে সীমিত থাকবে। সমপর্যায়ের (ল্যাটেরেল) নিয়োগ ৩.৬৪ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

[৬] বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পদোন্নতি নীতিমালা এবং বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ এর চার সচিবের রিপোর্ট: টুওয়ার্ডস বেটার গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ- এ রয়েছে।

- ***পদোন্নতি প্রক্রিয়াকে রাজনীতিমুক্তকরণ*** — যেখানে অধিকাংশ দেশে উর্ধতন নিয়োগ রাজনীতি পর্যায়ের ছাড়পত্র প্রক্রিয়ার অধীন, সেখানে কমিটি কর্তৃক সিনিয়র সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের সুপারিশমালা প্রত্যাখ্যানের কারণগুলি স্পষ্টভাবে লিখিত এবং স্বচ্ছ হওয়া উচিত। তাছাড়া কর্মী ব্যবস্থাপনায় পেশাগতভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্বাচনী বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। নির্বাচনী বোর্ডের সভ্যপদ বাড়িয়ে, অথবা রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং সরকারী কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে এটি করা যায়। নির্বাচন পদ্ধতিতে বহিরাগত সদস্য অন্তর্ভুক্ত করলে অনেকগুলি লাভ হবে। কর্মী সংক্রান্ত নীতি ও কর্মকৌশলসমূহ যে বেসরকারী খাতের সাথে তুলনীয় হয়, এটি তা নিশ্চিত করবে। বেসরকারী খাত এতে আরো আশ্বস্ত হবে যে, সমপর্যায়ের বা ল্যাটেরাল নিয়োগের পছন্দটি নৈর্ব্যক্তিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে ।

- ***কার্যসম্পাদনার সাথে পদোন্নতির সম্পর্ক স্থাপন*** — একজন কর্মকর্তা থেকে সর্বোচ্চ সেবা পাবার প্রধান উপায় হচ্ছে তাকে তার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং সে উদ্দেশ্যের বিপরীতে তার কার্যসম্পাদনার মূল্যায়ন করা। তবে এটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের স্বাভাবিক রেওয়াজ নয়। প্রকৃত বিচারে অধিকাংশ কর্মকর্তা কাজের ফলাফলের বর্ণনা অস্পষ্ট রেখে দিতে পছন্দ করেন যাতে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন এড়িয়ে চলা যায়। এমনকি যেসব প্রকল্পে দাতারা কার্য বিবরণী দিতে দাবীও করে, সেখানেও কর্মী নিয়োগ অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। ঘর ৭.৩ এ দেখানো হয়েছে কিভাবে অন্যান্য দেশে সিভিল সার্ভিসের পদোন্নতি প্রতিযোগিতামূলক করার প্রয়াস হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, বস্তুনিষ্ঠ কার্যসম্পাদনা-মান নির্ধারণ বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের শক্তির সম্পূর্ণ আওতার মধ্যেই।

বদলী ব্যবস্থা

৭.৩৪ সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্বল কার্যসম্পাদনার আরেকটি কারণ হচ্ছে ঘন ঘন চাকুরিস্থল পরিবর্তন। গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের এরকম ঘন ঘন এবং অপরিকল্পিত বদলীর পেছনে কারণও রয়েছে। প্রধান কারণটি হল 'in situ' পদোন্নতি সীমাবদ্ধ করার নীতি। কিন্তু উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তাগণ বদলী ব্যবস্থাকে দ্রুত পদোন্নতির উপায় হিসেবে মনে করেন — তারা আশা করেন দাতা কর্তৃক অর্থায়নকৃত একটি উচ্চ মর্যাদার চাকুরি নিয়ে সরে পড়তে। একজন আমলা যেমন বলেন : "বর্তমানে সফল চাকরীর নামে প্রহসনটি হল যত বেশি সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পাওয়া, আর অতি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম করা।" এই ব্যাপারটি শুধু যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেই শুধু ঘটে, তা নয় (ঘর ৮.৪), বরং সিভিল সার্ভিসের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু বদলী ব্যবস্থা সাধারণত পেশাগত উন্নয়ন এবং পেশাজীবন পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

ঘর ৭.৩ কিভাবে অন্যান্য দেশ কার্যসম্পাদনার সাথে পদোন্নতির সম্পর্ক নির্ণয় করে।

- *যুক্তরাজ্য* — গত কয়েক বছর ধরে অপেক্ষাকৃত প্রতিনিধিত্বকারী এবং উদ্দেশ্য-নির্ভর পদোন্নতি পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়/ সংস্থাগুলোকে কিছু নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের ভিত্তিতে নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এই নীতিটি যে প্রত্যেক সরকারী কর্মকর্তা বার্ষিক ভিত্তিতে চাকুরি মূল্যায়ন পর্যালোচনায় মূল্যায়িত হবেন, যা বার্ষিক স্টাফ রিপোর্টের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। পূর্বে স্বীকৃত কার্য-উদ্দেশ্যাবলীর বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি আলোচনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক কর্মীদের সাক্ষাৎকার নেন, এবং নতুন বছরের উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ করেন। একটি 'উন্মুক্ত' বিভাগে উভয় পক্ষের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে, *বর্তমান পদে কার্যসম্পাদনাকে পদোন্নতির যোগ্যতা থেকে আলাদা করে মূল্যায়ন করা হয়। পদোন্নতি নির্ভর করে স্টাফ রিপোর্টের ওপর, এবং প্রার্থীর প্রাক্তন উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ওপর।*

- *সিঙ্গাপুর* — সিঙ্গাপুর কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। পদোন্নতি বহুলাংশে মেধা-ভিত্তিক, এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্টাফদের আদান-প্রদান হয় যথেষ্ট পরিমাণ। প্রথমত সরকার গোপন মূল্যায়ন পদ্ধতি থেকে শেল ওয়েল কোম্পানী প্রবর্তিত অংশীদারী কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন পদ্ধতির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কার্যসম্পাদনা মূল্যায়নের দু'টি অংশ রয়েছে। একটি অংশ কর্মকর্তার অতীতের বিভিন্ন পদে কার্যসম্পাদনার পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করে। অন্য অংশ প্রার্থীর সম্ভাবনা আবিষ্কার এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতির লক্ষ্যে তার ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী — যাকে 'হেলিকাপ্টার সামর্থ্য' বলা হয় — মূল্যায়ন করে থাকে।

- *নিউজিল্যান্ড* — নিউজিল্যান্ড কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন এবং পদোন্নতির সবচেয়ে নিবিড় সংযোগগুলি সৃষ্টি করেছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের আদর্শ ব্যবহার করে নিউজিল্যান্ড সরকার পর্যালোচনা বছরের শুরুতে সম্মত উদ্দেশ্য এবং আদর্শের বিপরীতে কার্যসম্পাদনা মূল্যায়ন করে থাকে। কার্যসম্পাদনা-মান ফলাফল (যেমন — অপরাধের হার, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদি) এবং উৎপাদন বা আউটপুট (যেমন — প্রহরার সংখ্যা, সড়ক উন্নয়ন ইত্যাদি) উভয়ের সাথে সংযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের চুক্তির ব্যাপারটি মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে জড়িত। যদি বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতি বছরে ০-২ শতাংশের মধ্যে রাখা যায় তিনি একটি বিশেষ বোনাস পাবেন; যদি মুদ্রাস্ফীতি চুক্তিবদ্ধ লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যায় তবে তিনি শুধু বোনাস থেকেই বঞ্চিত হবেন না, উপরন্তু প্রচণ্ড তিরস্কারের মুখোমুখি হবেন এবং তাঁর চুক্তি নবায়ন না ও হতে পার।

৭.৩৫ প্রতিটি নিয়োগ এবং বদলির আদেশের সাথে "জনস্বার্থের" বিষয়টি জড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ মাপকাঠির অনুপস্থিতির কারণে এ ধরনের দাবী প্রায়ই অর্থহীন বিবৃতিতে পরিণত হয়। কর্মকর্তাদের সংক্ষিপ্ত কার্যকাল খুবই ক্ষতিকারক। কর্মকর্তারা বদলিকে তাদের সম্মত কার্য-উদ্দেশ্যবলী না মেটানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেন। কোনো সমস্যা আলোচনা করতে গেলে প্রায়ই শোনা যায় : "আমি তো এ চাকুরিতে মাত্র কয়েক মাস ধরে আছি"। এতে করে একটি প্রশ্ন সামনে আসে যে, একটি পদ একজন কর্মকর্তার বহাল থাকার সবচেয়ে অনুকূল সময়কালটা কি? এর কোনো সহজ উত্তর নেই। তবে বেশির ভাগ সফল আমলাতন্ত্র একজন নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দিষ্ট পদে কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছর চাকুরি নিশ্চিত করে। এতে কর্মকর্তা শেখার জন্য, সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য সুযোগ পান। বাংলাদেশে এ ধরনের নীতি প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ঘর ৭.৪ A Rolling Stone Angers No Boss.

সিভিল সার্ভিসের একটি বড় দুর্বলতা হচ্ছে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পুনঃপুনঃ বদলি। এতে জবাবদিহিতার শর্তটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সুবিধা পাওয়া যায় না এবং জরুরী পদক্ষেপগুলোর প্রতি দায়িত্বশীলতা কমে যায়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে ঘনঘন বদলির কিছু নমুনা প্রদান করা হল:

- *পাট মন্ত্রণালয়* — ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ সরকার পাট খাত পুনর্বিন্যাসের জন্য এযাবৎ সর্বোচ্চ আইডিএ ঋণ (২৫০ মিলিয়ন ডলার) লাভ করে। যে সচিব এই ঋণ বন্দোবস্তের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, চূড়ান্ত আলাপ আলোচনার এক মাসের মধ্যে তাকে বদলি করা হয়। এরপর পাট মন্ত্রণালয়ের দুজন সচিব বদল হন — এর মধ্যে একজন অবসরগ্রহণের পর চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হন। তিনি পরে অন্যত্র চলে যান। তৃতীয় একজন সচিব ৩০শে জুন, ১৯৯৫ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন।

- *পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়* — প্রায় চার বছর সময়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বদলি হয়েছেন তিনবার। ভারতের সাথে নদীর পানি বন্টন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনায় এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায় এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ভূমিকা সত্ত্বেও এ বদলি ঘটেছে।

- *স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়* — বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অন্যতম বড় খাত এবং বহুদাতার অর্থপুষ্ট (৬০ কোটি ডলার) পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের অন্যতম গ্রহীতা হল স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গত চার বছরে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব বদলি হয়েছেন চার বার।

- *সড়ক ও জনপথ বিভাগ* — এটি এডিপির সর্বোচ্চ একক ব্যবহারকারী, এবং গত বিশ মাসে তিনজন প্রধান প্রকৌশলী এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রধান প্রকৌশলী পদটি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের মূল্যবান উপহার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

- *পরিকল্পনা কমিশন* — সরকারের থিংক ট্যাঙ্কটি অনেক সচিবের সাক্ষাৎ পায়। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে চারজন সচিব নিয়োজিত রয়েছেন যাদের অধিকাংশই যে কোনো কার্যক্রম ভিত্তিক পদে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন। পরিকল্পনা কমিশন সচিবদের জন্য 'পার্কিং লট' বা বিরতি পর্ব, অথবা অবসরের আগে অথবা পরে 'ঘাসী মাঠ' হিসেবে কাজ করে।

সরকারের 'সংকট ব্যবস্থাপনা' নীতিই হচ্ছে সচিবদের যাযাবর চরিত্রের একটি কারণ। পেশাগত জীবনে কিছু সচিব 'অগ্নি নির্বাপক' কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত হন, কারণ যখনই কোথাও সমস্যা দেখা দেয়, তাদের ডেকে পাঠানো হয়। বদলির আরেকটি কারণ হলো ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্য অর্জনে ব্যর্থতা। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, শীর্ষ পর্যায়ের ঝানু সরকারী কর্মকর্তার সংখ্যা খুবই কম। তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের তিনশ বিশিষ্ট কর্মকর্তা দ্রুত দুর্লভ প্রজাতিতে পরিণত হচ্ছেন। এদের শেষ দল আগামী ২০০১ সাল নাগাদ অবসর গ্রহণ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

নারী-পুরুষ বৈষম্য

৭.৩৬ ১৯৯২ সালের সরকারী কাজে নিয়োজিত সমগ্র সংখ্যার সর্বমোট ৭৮,০৫৭ জন অথবা মাত্র ৮.২% ছিলেন মহিলা। সর্বত্র কোটা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও অবস্থাটি এমন (প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে ১০%, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে ১৫%)। সারণী ৭.১৩ তে ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং চাকুরি প্রাপ্তদের মধ্যে লিঙ্গ প্রভেদ হার দেখানো হয়েছে। যদিও এ সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যায় কার্যত তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

৭.৩৭ আরো আশঙ্কার ব্যাপার এই যে, সিভিল সার্ভিসে মহিলাদের শুধু অবমূল্যায়নই করা হয় না, তাদের যতটা সম্ভব নিচু পদগুলোতে বেঁধে রাখার একটি মানসিকতাও লক্ষ্য করা যায়। নিয়োজিত সমগ্র মহিলা কর্মীদের ৯০ ভাগ তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে চাকুরিরত। এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে সরকারী দায়িত্ব প্রাপ্ত বিশাল সংখ্যক মহিলা কর্মচারী অল্প বেতনভুক, অফিস সহকারী হিসেবে নিয়োজিত যাদের নীতি প্রণয়ন বা বাস্তবায়ন কোনোটিতেই কোনো রকম প্রভাব নেই। এ অবস্থার একটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে সরকারী চাকুরিকে পেশা হিসেবে মহিলারা অনেক পরে গ্রহণ করেছেন। এর পরও বাংলাদেশী মহিলা সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রবাদসিদ্ধ 'গ্লাস সিলিং' নির্দিষ্ট স্থানেই রয়েছেন। বর্তমানে একজনও মহিলা সচিব নেই। অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন একজন (প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত), যুগ্ম-সচিব তিনজন এবং উপ-সচিব তিনজন। মাঠ পর্যায়ে সরকার কিছু যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিচ্ছে, যেমন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন সব খালি পদের বিপরীতে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত মহিলাদের সংখ্যা এতে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরে নেয়ার কারণ নেই।[৭]

সারণী ৭.১৩ বিসিএস নির্বাচনে নারী-পুরুষ অনুপাত

বছর	সর্বমোট প্রার্থী	সর্বমোট নির্বাচিত প্রার্থী	নির্বাচিত পুরুষ প্রার্থী (শতকরা হার)	নির্বাচিত মহিলা প্রার্থী (শতকরা হার)
১৯৮৬	৩৩৫০৪	২১১৭	৮৫.৪৫	১৪.৫৫
১৯৮৮	৩৭৩৪৮	১১৬৬	৮৩.৭০	১৬.৩০
১৮৮৯	২৮৪১৯	১০২২	৮৮.৬৫	১১.৩৫
১৯৯০	৩০৬৭৭	৯৫৫	৮৬.৬২	১৩.৩৮
১৯৯১	৩৭৫৯৩	উপাত্ত নেই	উপাত্ত নেই	উপাত্ত নেই
মোট	১৬৭৫৪১	৫০০০	৮৫.৮৬	১৪.১৪

৭.৩৮ সরকারী কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রথমে নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারে। এতে অবশ্যই মহিলাদের নিয়োগ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা এবং দ্রুত পদোন্নতির জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকবে। এ ছাড়া নিচের বিষয়গুলোও এর সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে :

- মহিলাদের চাকুরির অনুকূল পরিবেশের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, বিশ্রাম কক্ষ, আবাসিক ব্যবস্থা, যাতায়াতের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধাদির উন্নতি বিধান।

- যতটা সম্ভব চাকুরিরত দম্পতিদের একই কার্যক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া।

---

[৭] এখানে বলে রাখা জরুরী যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব একেবারেই কম। উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলা ক্যাবিনেট মন্ত্রী নেই। সংসদে মহিলাদের জন্য তিরিশটি আসন সংরক্ষিত যারা আবার সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত।

- মহিলাদের হয়রানির ব্যাপারে কঠোর সরকারী নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

- ব্যবস্থাপনায় লিঙ্গভেদ, যৌন উৎপীড়ন, নারীদের সমঅধিকারসহ অন্যান্য সমার্থক বিষয়ে আলোকপাত করে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- চুক্তিভিত্তিক বা উপদেষ্টা হিসেবে অধিক মহিলা কর্মী নিয়োগসহ অন্যান্য অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ গ্রহণ।

প্রশিক্ষণ

৭.৩৯ আগামী বছরগুলোতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে প্রশিক্ষণ। একটি মৌলিক বিষয় হল এই যে, বাজেট বরাদ্দে বা পদোন্নতি সংক্রান্ত নীতিতে এবং উদ্দীপক ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণকে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। এমনকি একজন কর্মকর্তা কোনো বিশেষ বিষয়ে সুপ্রশিক্ষিত হলেও তাকে অপরিচিত একটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়।[৮] আগামী বছরগুলোতে সরকারী কর্মকর্তার দায়িত্বের পরিধি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর অধিক নির্ভরতা এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের দিকে ধীরে ধীরে সরে যাবার কারণে এমনটি ঘটবে। সুতরাং সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পুনঃপ্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত। বাংলাদেশে বেশ বিস্তৃত সরকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে। এতে রয়েছে লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ এবং মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দপ্তরের ব্যবস্থাপনার অধীন বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ। *উন্নততর সরকারের লক্ষ্যে* প্রতিবেদনে বর্তমান পদ্ধতির ত্রুটি নির্দেশসহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনটি সংস্কারের জন্য তিনটি এলাকায় আলোকপাত করে:

- *সমসাময়িক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুসৃত পাঠক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতির পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।* প্রশিক্ষণসূচী খুবই প্রথাগত। মানবসম্পদ উন্নয়নের বিপরীতে একটি নীতিকথামূলক শিক্ষায় পূর্ণ। এজন্য পাঠ্যসূচিতে সংস্কৃতি, ইতিহাস, আইন এবং নিয়ম সংক্রান্ত শিক্ষার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এর বিপরীতে গুণগত এবং ব্যাখ্যামূলক দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয় কম।

- *সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নিযুক্তি দ্রুত পদোন্নতির শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করা।* প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্তিকে হেলাফেলার চোখে দেখা হয়। এটি শাস্তিমূলক বদলি হিসেবেও পরিগণিত। সামরিক বাহিনীতে, যেমন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী বা মিলিটারী স্টাফ কলেজে, কমান্ডেন্ট বা প্রশিক্ষক পদে নিয়োগ উঁচু পদসমূহে দ্রুত পদোন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে নিযুক্তিগুলি একধাপ উঁচু হওয়া উচিত। প্রশিক্ষণের আধুনিকায়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন এবং সুনির্দিষ্ট এ্যাকশন প্ল্যান সহ এ ধরনের নীতি পরিবর্তন সরকারের সমন্বিত মানবসম্পদ নীতির অংশ হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত।

---

[৮] ইউএনডিপি'র লোক প্রশাসন সংস্কার সমীক্ষায় এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

- ***বিদেশে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য সরকারকে বিশেষ নীতি প্রবর্তন করতে হবে।*** বর্তমানে তাদের নিযুক্তি এবং পেশাগত সম্ভাবনা, পেশাগত কৃতিত্ব এবং স্বাভাবিক জ্যেষ্ঠতা ও ক্যাডার বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হচ্ছে। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পদোন্নতির জন্য আগে তার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার পদোন্নতির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, যার হয়তো কোনো পেশাগত কৃতিত্বই নেই। এ ক্ষেত্রে প্রায়শই বিদেশের প্রতিষ্ঠানে গৃহীত প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন সব পদের দায়-দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়। সরকার ক্যাডার নির্বিশেষে এসব কর্মকর্তাদের জন্য দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে পারে অথবা যে পদে তারা সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারেন সেখানে তাদের নিয়োজিত করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারের বাইরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ব্যাংক এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের। সরকার সুনির্দিষ্ট নিযুক্তির ভিত্তিতে নীতি প্রণয়নে তাদের সুযোগ দিতে পারে এবং মন্ত্রণালয়ে তাদের কৃতিত্বের প্রেক্ষিতে অনেককে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করতে পারে।

ঘর ৭.৫ সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ

প্রতিটি সংস্কারাধীন দেশ সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়। এ পথ ধরেই নেতৃস্থানীয় দেশগুলো তাদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি বাণিজ্যিক ভিত্তি দেয়াসহ ঢেলে সাজাচ্ছে। একই সাথে ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সম্পদ বন্টনের সিদ্ধান্তের জন্য জবাবদিহি করতে হয়।

- *যুক্তরাজ্য* — যুক্তরাজ্যের সিভিল সার্ভিস কলেজে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে, এবং বর্তমানে এটি একটি বিজনেস স্কুলের রূপ নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, কলেজটি ব্যবসা বিজ্ঞানের ভাষা এবং পদ্ধতি গ্রহণ করেছে; একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং সাতটি 'মার্কেট বিজনেস গ্রুপ'- এ সংগঠিত কোর্সের আয়োজন করেছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে খুব কঠিনভাবে কার্যসম্পাদনা পরিমাপ করা হয় এবং কিভাবে কৃতিত্বকে বেতনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শের জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রধান উদ্দেশ্য হল একটি শোধনাগার হিসেবে কলেজের প্রাচীন সুনামটিকে পরিবর্তন করা যেখানে ব্যর্থ সরকারী কর্মকর্তাদের পাঠানো হত। বর্তমানে এ কলেজের কোর্সের জন্য সবচেয়ে মেধাবী ও শ্রেষ্ঠ প্রার্থীরাই আবেদন করছেন। প্রতিটি কোর্সের জন্য সপ্তাহে আনুমানিক ১,০০০ পাউন্ড খরচ হয় এবং বিভাগীয় বাজেটের মধ্যেই এ পরিমাণ অর্থ ধার্য করা হয়। এটি আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, ১৯৯২ সালে ১৪.৭ মিলিয়ন পাউন্ড লেনদেনকৃত অর্থের মধ্যে সিভিল সার্ভিস কলেজ ১৩৩,০০০ পাউন্ড মুনাফা লাভ করেছে।

- *ভারত* — ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (IAS) এর প্রশিক্ষণেও বিশাল পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন বাজার পদ্ধতির ভিত্তিতে IAS কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঢেলে সাজানো হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য নবায়নী কোর্সগুলো চারটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIMS)এ আয়োজন করা হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষের পাঠদান ছাড়াও কর্মকর্তাদের স্টক এক্সচেঞ্জ, শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স-এ ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে উদারনীতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপক কর্মকর্তার সংখ্যা ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অধিকাংশ কর্মকর্তা এখন পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক নীতির সাথে তাল মেলাতে এবং ভারতে গ্যাট-এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে সচেষ্ট। সম্ভবতঃ এসব নতুন পরিবর্তনের বড় ফলাফল এসেছে সরকারী কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তনের মধ্যে।

কর্মী যৌক্তিকীকরণ এবং অতিরিক্ত কর্মী ব্যবস্থাপনা

৭.৪০ একটি সুষম এবং গ্রহণযোগ্য কর্মচারী যৌক্তিকীকরণ এবং অতিরিক্ত কর্মচারী ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ সরকারের ভূমিকা সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, যেহেতু সরকারের ভিতরে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজনাতিরিক্ততার সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে পাঁচটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য এ প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হচ্ছে:

- ***সময়পূর্ব অবসর গ্রহণ এবং সাধারণ এ্যাট্রিশন*** বা নিজ থেকে ঝরে পড়া হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তা সংখ্যা কমানোর সহজতম পদ্ধতি। ক্যামেরুন, কোস্টারিকা, ঘানা এবং আংশিকভাবে পাকিস্তান ও ভারতে সিভিল সার্ভিস সংস্কারে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০,০০০ সরকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। সুতরাং কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংখ্যা সংকোচনে অবসর গ্রহণ তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। তথাপি অবসর গ্রহণের বয়স যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে, এবং যারা চাকুরিতে ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন, তাদের বিধি মোতাবেক সময়ের আগে অবসর প্রদান করলে সরকারী কর্মচারী সংখ্যা মোটামুটি কমানো যেতে পারে।

- ***'অনুপস্থিত' কর্মীদের নির্মূল করা*** অনেক দেশে কার্যকর কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১] বাংলাদেশ এ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারে। প্রাথমিক ভাবে সরকারী কর্মচারীর সঠিক সংখ্যা এবং প্রকৃতি জানার জন্য জরিপ চালানো যেতে পারে। এ পর্যায়ে অন্যতম জটিল সমস্যা হল শতকরা প্রায় ২০ ভাগ সরকারী কর্মকর্তার উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ভাড়া করে আনা হয়েছে এবং এদের অনেকেই হিসাবের মধ্যে নেই। প্রকল্প সহায়তার একটি আবশ্যকতা হিসেবে এ ধরনের আমলাতন্ত্র তৈরি করার জন্য দাতা সংস্থাগুলোও অনেকাংশে দায়ী। পৌনঃপুনিক বাজেটের মধ্যেই উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন অধিকৃত করা হয় এবং এতে স্থায়ী সরকারী কর্মকর্তাদের সংখ্যা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

- ***সুসংহত অতিরিক্ত কর্মী কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা*** সরকারী কর্মচারী সংখ্যা হ্রাসের পথে একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। কর্মচারী নিয়োগের সাথে মিলে এতে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যাপারটি গতিশীল হবে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং নিয়মিত সরকারী বিভাগগুলোতে ছাঁটাই কর্মসূচি চালু করেছে। এ পদক্ষেপ যথেষ্ট সফল হয়েছে বলতে হবে, কারণ কোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ ছাড়াই ২৩,০০০ কর্মীকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তবুও ছাঁটাই পরিকল্পনা সমর্থনদানকারী নীতিগুলোকে সুসংহত করা প্রয়োজন, বিশেষ করে নিয়মিত সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ততার ব্যাপারটি প্রয়োগ করা। কর্মচারী ছাঁটাইয়ের বর্তমান নীতি ১৯৯২ সালে মোস্তাফিজ কমিটির সুপারিশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে সরকারী কর্মচারী ছাঁটাইয়ের একটি ব্যাপক স্কীম রয়েছে। ঐ কমিটি সুপারিশ করে যে, সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অতিরিক্ত জনসম্পদ নির্ধারণের জন্য একটি আলাদা কমিটি গঠন করা হোক; যেসব প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে অতিরিক্ত কর্মচারীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছে এবং নতুনভাবে বিন্যস্ত কাঠামোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে এসেছে সরকারের তাদের সহযোগিতা করা উচিত; অতিরিক্ত মানবসম্পদকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মোট পেনশনের ৫০ ভাগের বেশি গ্র্যাচুইটি প্রদান করা হোক; যারা গ্র্যাচুইটি নীতি বা কারখানা আইনের অধীনে পড়েন, তাদেরকে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী বেতন, গ্র্যাচুইটি, এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধা দেয়া হোক; ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের বিকল্প নিয়োগের কোনো নিশ্চয়তা দেয়া হবে না এবং এ ব্যাপারে কোনো কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে না। সারণী ৭.১৪ তে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক প্রদত্ত

অতিরিক্ত শ্রমিকদের প্রদেয় সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হল। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে অবশ্যই অধিকতর উদার। ব্যাপারটি আরো তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

- *প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মী আত্মীকরণের বাধ্যতামূলক নীতি প্রত্যাহার* — বিভিন্ন বিভাগের ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পরিপূর্ণভাবে ছাঁটাইয়ের পরিবর্তে বিভাগে গ্রহণ করে নেয়ার ফলে সরকারের অতিরিক্ততার কর্মসূচি বেশ সমস্যায় পড়েছে। অবশ্য বিভাগ-দপ্তরগুলির এতে করার প্রায় কিছুই নেই, যেহেতু ১৯৮৫ সালের এক সরকারী নিয়মে বলা হয়েছে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কাজ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রদান করতে হবে। যখন সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘোষণা করা হয় তারা সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত শাখায় প্রত্যাবর্তন করে এবং সেখান থেকে তাদের নাম অন্যান্য বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এতে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের চেয়ে কখনো তাদের অবস্থা উন্নততর হয়। অতিরিক্ত কর্মকর্তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার শর্তপূরণের প্রয়োজন হয় না, বিভাগীয় পরীক্ষাসমূহ থেকেও তাদের বাদ দেয়া হয়; এমনকি বদলীর পর সুনির্দিষ্ট বিভাগীয় অভিজ্ঞতার অভাব সত্ত্বেও তাদের জ্যেষ্ঠত্ব বহাল থাকে।[৯] এভাবে একজন ডাক-বিভাগীয় কর্মকর্তা হয়তো কর বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ করবেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, অতিরিক্ত ঘোষিত হওয়াটা এক ধরনের আশীর্বাদ হয়েও দেখা দিতে পারে।

- *অতিরিক্ত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের তহবিল বৃদ্ধি* — অতিরিক্ত কর্মচারী ছাঁটাই কার্যক্রমের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। ১৯৯৪ অর্থ বছরের বাজেটে ছাঁটাই কার্যক্রমের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা ছিল অনেক বেশি। বর্তমান বাজেটে একই রকমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অনুকূল আর্থিক অবস্থা এবং অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের স্বল্প-থেকে-মধ্য মেয়াদী আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত সুবিধাদির প্রেক্ষিতে ***ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের দেয়ার জন্য তহবিল উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর সুপারিশ করা হচ্ছে।*** সুষ্ঠু অর্থায়নকৃত এবং সুপ্রচারিত অতিরিক্ত তহবিল সৃষ্টি করা হলে সংস্কারের বিপক্ষে প্রতিরোধ যথেষ্ট কমিয়ে আনবে, যেমন পাট মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে।

---

[৯] ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় বাজেট হস্তান্তরের আওতায় উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেছিল। দেখা গেল, এদের মধ্যে অনেকেই আছেন, বিশেষ করে ডাক্তাররা, যারা ঢাকায় চাকুরি করছিলেন, অথবা বেতন পেতেন কোনো থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে। থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির জন্য তারা "অশরীরী ডাক্তার" ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না।

সারণী ৭.১৪: নির্বাচিত কয়েকটি দেশে অব্যাহতির ফর্মূলা

দেশ	ফর্মূলা
এশিয়া	
বাংলাদেশ	চাকুরির প্রতিবছরের জন্য ২ মাসের মুল বেতন এবং অবদান (contribution) (কর্মী/নিয়োগকর্তা) হিসেবে জমাকৃত অতিরিক্ত গ্র্যাচুইটি।
পাকিস্তান	সকল সুবিধাসহ ১ মাসের মূল বেতন এবং প্রতিবছর চাকুরির জন্য চার মাসের মূল বেতন।
ভারত	১.৫ মাসের মূল বেতন; প্রতি বছর চাকুরির জন্য নির্ধারিত মহার্ঘ ভাতা।
লাওস	এক বছরের বেতন।
শ্রীলঙ্কা	প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হলেও ৫৫ বছর পর্যন্ত চাকুরির নিশ্চয়তা। কোনো ফর্মূলা ব্যতিরেকে এবং নির্বাচিত ভিত্তিতে ছাঁটাই। চামড়া শ্রমিকদের সম্প্রতি প্রদেয় সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ছিল ২০০,০০০ রুপী।
ল্যাটিন আমেরিকা	
আর্জেন্টিনা	বিভিন্ন রকম শর্ত; তবে গড়ে ছয় মাসের জন্য মূল বেতনের ৭৫% প্রদান। সাথে থাকে ছয় কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য গড়ে ৩,০০০ ডলারের (চাকুরি মেয়াদকালের ওপর নির্ভরশীল) ছাঁটাই ভাতা।
আফ্রিকা	
কেন্দ্রীয় আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	চল্লিশ মাসের বেতন এবং কর্মচারীর জমাকৃত পেনশনের অর্থ।
গাম্বিয়া	চাকুরির প্রতি বছরের ১.২ মাসের বেতন।
ঘানা	চার বছরের মূল বেতন এবং চাকুরির প্রতি বছরের জন্য ২ মাসের মূল বেতন।
গিনি	গড় কর্মচারীর জন্য পাঁচ বছরের মূল বেতন। ৩০% সরাসরি প্রদান; বাকীটা বিশটি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
গিনি বিসাউ	মাসিক কিস্তিতে একবছরের বেতন পরিশোধ।

সরকারী চাকুরির মূল্যবোধ বৃদ্ধি

৭.৪১ এটি দু'পর্যায়ে সম্পন্ন হতে পারে: ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা শক্তিশালী করে এবং সরকারী চাকুরির নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটিয়ে।

৭.৪২ বর্তমান সরকারী চাকুরি আচরণ নীতিতে (Civil Service Conduct Rules - CSCRs) সরকারী কর্মকর্তার অশোভন আচরণ এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য বিশেষ আইনানুগ বাবস্থা গ্রহণের নিয়ম রয়েছে।[১০] কিন্তু 'যথাযথ প্রক্রিয়া' এতটা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ এবং প্রত্যাভিযোগের সুযোগ এতটাই প্রকৃত যে জ্যেষ্ঠ

---

১০ জবাবদিহিতা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ব্যবস্থাপকরা যে তাদের কার্যসম্পাদনা মান অর্জনে যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছেন, তা নিশ্চিত করায় মৌলিক একটি সমস্যা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ডীল যুগে প্রশাসনিক পরিবর্তনসমূহ এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল যাতে নির্বাচিত কর্মকর্তারা জনগণের পয়সা চুরি না করতে পারেন। এর ফলে যে নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, তার একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় এই যে, জনগণের অর্থ ও পরিসম্পৎ ব্যবস্থাপনা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কর্মকর্তাগণ সুবিধামত বদলির আদেশকেই একটি মৃদু পন্থা হিসেবে পছন্দ করে থাকেন। চাকুরিকে বিস্তারিতভাবে শর্ত সাপেক্ষ করে এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার জবাবদিহিতার পরিমাণ বাড়াতে পারে বলে পরামর্শ দেয়া যায়। কিন্তু এগুলো হবে সম্পূর্ণ স্বল্প-মেয়াদী পদক্ষেপ। কার্যসম্পাদনা মান প্রবর্তনের পাশাপাশি ব্যবস্থাপককে অদক্ষ কর্মচারী ছাঁটাইয়ের ক্ষমতা দেয়া হলে CSCRs-কে গতিশীল করা যেতে পারে। যদি সরকারী কর্মচারীদের তাদের স্বীয় কার্যসম্পাদনার নিরিখে মূল্যায়ন করা হয় এবং জীবন-মেয়াদী নীতি তুলে দেয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার সচেতনতা জন্ম নেবে।

৭.৪৩ জনসেবার নীতির চেয়ে টাকা পয়সা কর্মকর্তার আচরণের ওপর অধিকতর প্রভাব ফেলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবুও সরকারী চাকুরির নৈতিকতা জোরদার করার লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।[১১] অতীতে সরকারী চাকুরির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল নিরপেক্ষতা, সততা, সৌজন্যবোধ, ন্যায়পরায়ণতা এবং 'জনস্বার্থের' আদর্শ। এই মূল্যবোধগুলি এখনো গুরুত্বপূর্ণ, তবে নাগরিকরা এখন এদের সম্পূরক হিসেবে গুণগত মান, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা দাবী করছেন।

৭.৪৪ উপরের দুইপ্রস্থ মূল্যবোধ আবশ্যকীয়ভাবে সমমনা, যদিও এদের এক রকম মনে নাও হতে পারে, তবুও গুরুত্ব এবং প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন সরকারী কর্মকর্তা "গুণগত মান" অর্জন করতে পারেন না যদি না তিনি নিরপেক্ষতা, সৌজন্যবোধ এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন; একই ভাবে "জনস্বার্থ" সেবায় অবশ্যই দায়িত্ববোধ, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা থাকবে। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের কাজ করতে হয় সেখানে হয়তো অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকবে: পিতৃতান্ত্রিক শাসনের (জনগণের "মা-বাপ") স্থলে এখন নতুন একটি প্রেক্ষিত তৈরি হয়েছে, যেখানে সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ, দেশ-বিদেশের পেশাদারী এবং অধিকতর অগ্রগামী এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নাগরিকদের সাথে কাজ করতে হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কাজ করতে হলে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে "জনস্বার্থ" সেবার বা জনকল্যাণার্থে কাজ করার মূল তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতনতা সহ অধিকতর বিচিত্রমুখী জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব, উত্তেজনা এবং পুরস্কার — সবই বাড়বে। নিচের দিকে থাকতে পারে ফলাফলের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব, যেভাবেই সেগুলো অর্জিত হোক না কেন। উপরের দিকে, অর্থাৎ ইতিবাচক দিকে, থাকবে নানা ঝুঁকি — নতুন সংস্কৃতি বা মূল্যবোধ প্রসারের, যার সাথে উদ্দীপক ও শাস্তির ব্যাপার জড়িত। তবে, সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সরকারী চাকুরির নমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে। জনগণের সাধারণ সেবকের পরিবর্তে সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তখন হতে হবে গতিশীল সেবক এবং জনগণের প্রত্যাশার প্রতি দায়িত্বশীল। সিভিল সার্ভিসের পেশাদার অভিজাত ভূমিকা বজায় রাখার জন্য এ পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারী চাকুরি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ

৭.৪৫ শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল — দু'সারির দেশেই সিভিল সার্ভিস সংস্কারসমূহ সঠিক সিভিল সার্ভিস (CSM) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশে সরকারী চাকুরি ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করে থাকে সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। তবে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে কাজ করতে হয় বলে ব্যাপারটি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মী কমিটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, অনেকটা যুক্তরাজ্যের মত, মন্ত্রিপরিষদ সচিব *কার্যত* বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত। সরকারী কর্ম কমিশনও বিশেষ ভূমিকা রাখে, যেহেতু এর

---

[১১] কেনেথ কার্নাহান, *দি ইমার্জিং পাবলিক সার্ভিস কালচার : ভ্যালুজ, ইথিকস্ এন্ড রিফর্মস,* ক্যানাডিয়ান পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন, ভলিউম-৩৭, সংখ্যা ৪ (শীত)।

রয়েছে মাঝারি এবং উঁচু পর্যায়ের ক্যাডারভিত্তিক সব ধরনের কর্মকর্তা নিয়োগের একমাত্র অধিকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ও এতে জড়িত; সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে কাজ করে অর্থ মন্ত্রণালয় কমপ্লিমেন্ট কন্ট্রোল নিশ্চিত করে এবং আর্থিক বাজেট প্রত্যবেক্ষণ প্রণালীর মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা এবং তাদের প্রদেয় বেতন-ভাতার পরিমাণ নির্ণয়ে বিরাট ভূমিকা রাখে। এ ছাড়া, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ প্রত্যক্ষভাবে সরকারী চাকুরির সাথে জড়িত নয় এ ধরনের প্রশাসনিক ব্যাপার পরিচালনা করে।

৭.৪৬ এই দায়িত্ব ভাগাভাগির কিছুটা অনির্দিষ্ট পদ্ধতির জন্য খণ্ডায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ সরকারের সবচেয়ে সময় ক্ষেপনকারী — এবং হতাশাব্যঞ্জক — ভূমিকা সংস্কারপন্থী সবচেয়ে উৎসাহী ব্যক্তিকেও নিরুৎসাহিত করতে পারে। বিনিয়োগ বোর্ডে পরিবর্তনের নমুনাগুলো এ বিষয়টিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে। বিনিয়োগ বোর্ডে পুনর্বিন্যাস প্রস্তাবনা প্রক্রিয়াকরণ করতে সময় লেগেছে প্রায় দু'বছর। এগুলো প্রথমে যায় প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে (যা বিনিয়োগ বোর্ডের প্রশাসনিক দায়িত্বে); এরপর মতামত ও অবস্থান পুনর্নির্ধারণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে এবং তারপর প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসের আর্থিক দিকটি খতিয়ে দেখার জন্য যায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে।

৭.৪৭ অন্যান্য দেশের সরকারী কর্মব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (CSM) পর্যালোচনা দু'টি সুপ্রবর্তিত নমুনাকে স্পষ্ট করে। প্রথমত রয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মী ব্যবস্থাপনা, যদিও এর সাথে নিয়োগের ঘনত্ব সমান করার বিষয়টি আছে। এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডায় প্রবর্তন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত বিকেন্দ্রীকরণ, নমনীয়তা এবং নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা প্রদান করা, যেমন যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডে রয়েছে। উভয় পদ্ধতিরই সুবিধা অনেক; কিন্তু যেসব দেশে কর্ম দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, বিশেষ করে, নিচু পর্যায়ের কর্মচারীদের মধ্যে, কেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিটি অধিকতর উপযুক্ত বলে মনে হয়। জবাবদিহিতা, মেধা নির্ভর পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণের মত কর্মী-সংক্রান্ত বিষয়ে মানসমূহের সঙ্গতি এক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়। সে যাই হোক, বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত একটি পদ্ধতি হবে মন্ত্রণালয়গুলোকে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত মানের ভিত্তিতে ও বরাদ্দকৃত অর্থের অনুকূলে স্ব-স্ব কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বোচ্চ স্বায়ত্বশাসন প্রদান। এতে মানব সম্পদ পরিকল্পনা এবং দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রীকৃত বিষয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

৭.৪৮ ***সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে শক্তিশালী করা হবে*** সরকারী কর্ম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংস্কারের একটি অগ্রাধিকার। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার ভিতরেই কাজ করে। একে এমন সব নিয়ম এবং নীতি মেনে কাজ করতে হয় যেগুলো প্রায়শই সেকেলে এবং রহস্যময়, এর কম্প্যুটারাইজড কর্মী ডাটাবেজ এখনও অনুন্নত। কিন্তু উদ্বেগের প্রধান কারণ হচ্ছে এর সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা (O&M) শাখা, যেখানে সামর্থ্য এবং কর্মক্ষমতার মারাত্মক অভাব রয়েছে। একজন যুগ্ম-সচিব বিভাগটি পরিচালনা করে থাকেন এবং এতে প্রায়ই এমন সব কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হয় যাদের মানব সম্পদ উন্নয়ন, অফিস ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনায় পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা নেই। অতীতে এর উন্নতিবিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় লোক প্রশাসন (প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প (১৯৮৩) অনেকটা অসফলভাবে সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনা শাখাকে শক্তিশালী করতে এবং কম্প্যুটারাইজড কর্মী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে আরো অনেক কিছু করার রয়েছে — শুধু সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি নয়, বরং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এর নাম থেকেই যেমন বোঝা যায়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে 'সংস্থাপন' ব্যবস্থাপনা, মানুষের সেবা করা নয়। ***শুরুর একটি পদক্ষেপ হিসেবে এর নাম পরিবর্তন করে মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা দেয়া উচিত,*** যা সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ — এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের — ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এর নতুন উদ্যোগকে

প্রতীকায়িত করবে। যদি এটি সম্ভব হয়, তাহলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্মী ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য সংস্থাগুলিকে সাহায্য করতে পারবে, যাতে পুরোভাগে দক্ষতা নিশ্চিত করা যায়।[১২]

---

১২ সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে যেমন, এ ধরনের প্রশিক্ষণের উচ্চ ফললাভ হয়েছে; কারণ পকিল্পনা ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা জড়িত হওয়ায় একটি অতিশয় ঋজু ও কেন্দ্রীভুত পদ্ধতির সম্ভাব্য ঝুঁকি দূর হয়েছে।

৮. গন্তব্যের দিকে যাত্রা — দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন

যেসব কারণে সরকারী খাতে সংস্কার সূচিত হতে পারে, এবং সংস্কার চালিয়ে যেতে যেসব অবস্থা বজায় রাখতে হবে, শেষ পরিচ্ছেদে তার একটি আলোচনা উপস্থাপন করা হল। রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও উন্নত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব এখানে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনের এই শেষ অংশে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রশাসন কেমন হতে পারে, তারও একটি কল্পিত চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

"অতীতের যা আমরা ভালো বলে মনে করি, তা রক্ষা করার একটি উপায়ই হচ্ছে অতীতের সকল খারাপ জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করা।" লী কুয়ান ইউ (সিঙ্গাপুর, ১৯৫৯)

পরিবর্তনের শক্তিসমূহ

৮.১ **একথাটি বলা হয়তো উচিত হবে যে বাংলাদেশে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংস্কার প্রক্রিয়াটি চলছে। যেমন, এক দশক আগেও সরকারী খাতের ভূমিকা যা ছিল, সে তুলনায় এনজিওসমূহ ও বেসরকারী খাত অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে : সরকার কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগও গ্রহণ করেছে, এবং রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান একটি স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংস্কার আন্দোলনটি সঠিক গন্তব্যেই ধাবিত, এবং এটিকে আর বাধা দেয়া যাবে না। গত দশকের অর্জিত সাফল্য নস্যাৎ হয়ে যাবে, এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। তবে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও আমাদের সামনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কার আন্দোলনটি যেন মনে হয় হিমবাহের গতিতে চলছে। আগের পরিচ্ছেদগুলিতে কিছু কিছু নতুন ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রশাসন পরিবর্তনের জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। কিন্তু আরো দ্রুত চলার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে ? "আমলা ও রাজনীতিবিদরা কেন এমন একটি কাঠামোর সংস্কার সাধন করতে যাবেন যে কাঠামোটি চারদিকের নানা অনিশ্চয়তার মধ্যেও তাদের জন্য নিরাপদ এবং আরামের একটি জীবন নিশ্চিত করে?" সরকারী খাতে ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ক্ষেত্রে এরকম কঠিন বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। অনেক সংস্কারাধীন দেশে সাফল্য এসেছে গুরুতর কোনো সঙ্কটের পথ ধরে — যেমন যুদ্ধ, অর্থনৈতিক ব্যর্থতা বা বিরাট কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন। সেসব দেশের নেতৃত্ব ঐ সময়টাকে কাজে লাগিয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছেন এবং সেগুলোর সমর্থনে ঐকমত্য গড়ে তুলেছেন। অথবা অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সংস্কার ছাড়া নেতৃত্বের আর কোনো বিকল্প ছিল না। তবে সংস্কারের দ্বিতীয় পথটি ততটা টেকসই হয় না। বাংলাদেশ অবশ্য কোনো আসন্ন বা সুস্পষ্ট ওলটপালটের সম্মুখীন হচ্ছে না : বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি হল লোক-ব্যবস্থাপনায় একটি ক্রমাগত এবং নিষ্ক্রিয়কারী দুর্বলতা, যা দেশটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। কাজেই এখানে সংস্কার প্রক্রিয়াটি শুরু করাটা হবে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জপূর্ণ, তবে অনেক বেশি লাভজনকও। ভবিষ্যতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, চারটি পরস্পর সহায়ক শক্তিকেন্দ্র — যেগুলোর জন্ম হয়েছে মাত্র, এবং এখনও গতিশীলতা অর্জন করেছে — সংস্কারকে অনিবার্য করে তুলতে পারে।**

৮.২ **প্রথমত জনগণ** — সাধারণভাবে, জনগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত জনসেবার এবং বিদ্যুৎ, পানি ও টেলিযোগাযোগের মত মূল অবকাঠামোর নিম্নমানের জন্য ক্রমাগত হারে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। বিচার ব্যবস্থা কার্যত ভেঙ্গে পড়ায় এবং আইন শৃঙ্খলার ক্রমাগত অবনতি ঘটায় জনগণের জীবনে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি দেশে ব্যবসা করার খেসারত দিচ্ছে, যেখানে অদক্ষতা আর দুর্নীতির জন্য বেশির ভাগ লেনদেন বিলম্বিত অথবা বিকৃত হয়। জনগণ যখন দেখতে পায় অন্যত্র আমূল সংস্কার চলছে,

তখন নেতিবাচক অনুধাবনটি তীব্র হয় — যদি এগুলো প্রতিবেশী থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামে হতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে কেন নয় ? নাগরিকরা এবং বেসরকারী খাত এখন বুঝতে পেরেছে যে বাংলাদেশ বৈশ্বিক গ্রামের একটি অংশ, যেখানে মানুষজন, বিজ্ঞানী, শ্রমিক, উদ্যোক্তা ও ফার্মগুলো ছুটে চলেছে একটি বোয়িং ৭৪৭ বিমানের গতিতে। কাজেই তারা সরকারকে চাপ দেবে দক্ষতা অর্জনের জন্য যা কিছু করা উচিত, তা করার জন্য।

৮.৩ **দ্বিতীয়ত, সংস্কার-মনা একদল রাজনীতিবিদ ও সংবাদ মাধ্যম** রাজনৈতিক বিভাজন রেখার উভয় দিকেই, ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছেন, এবং এ বিষয়টি স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংস্কার — অর্থাৎ এর প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনা — সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দুর্বল বাস্তবায়ন অক্ষমতা ও নিম্ন মানের জন্য গুরুতর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়টিও এখন স্বীকৃত যে এসব সমস্যার সমষ্টিগত অভিঘাত হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতির ব্যর্থতা অথবা নিম্ন প্রবৃদ্ধির ফাঁদ থেকে দেশটিকে বের করে আনার ক্ষমতা। উন্নয়নের জন্য আর্থিক সম্পদের সমাবেশ ঘটানোয় এবং সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি হাতে নেয়ার সরকারের আপেক্ষিক সাফল্য সত্ত্বেও এটি ঘটেছে। রাজনীতিবিদ ও সংবাদ মাধ্যমসমূহ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে সরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যে যে নিম্নগামীতা দেখা দিয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, জনসেবা সরবরাহ উন্নত করা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য সুস্থির সমষ্টিক অর্থনৈতিক ও বাজার-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা আরো বেশি দুরূহ হয়ে পড়বে।

৮.৪ **তৃতীয়ত, বহু আত্মনিবেদিত, দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন এবং উদ্ভাবনশীল কর্মকর্তা**, যারা নিজেদের উদ্যোগে পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন (ঘর ৮.১), যাদের পরিবর্তনের প্রতিনিধি বলা যাবে।

ঘর ৮.১ আমলাতান্ত্রিক খোলস থেকে বেরিয়ে আসা

বাংলাদেশে অনেক সরকারী কর্মকর্তা ইতিমধ্যে উদ্ভাবনার জন্য তাদের প্রচন্ড আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। নিচের উদ্যোগগুলি যদিও খুবই প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে, তবুও আশাবাদ সঞ্চারের জন্য এগুলো যথেষ্ট।

- *ঢাকা মহানগর পুলিশ* — ঢাকা মহানগর পুলিশ (DMP) একটি বিস্তারিত দ্বিবার্ষিক কর্পোরেট পরিকল্পনা তৈরির অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আছে পুলিশ বাহিনীর শক্তি ও দুর্বলতার মূল্যায়ন, এবং এর কর্ম-উদ্দেশ্যাবলী ও কার্যসম্পাদনা সূচকগুলি পরীক্ষা করে দেখা। এই পরিকল্পনা তৈরির সিদ্ধান্ত — যা বাংলাদেশের কোনো সরকারী দপ্তরের পক্ষ থেকে এই প্রথম — ১৯৯৩ সালে DMP'র একটি পাক্ষিক সভায় নেয়া হয়েছিল। DMP'র যে নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা সামর্থ্য ছিল না, এ বিষয়টি তখন কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। DMP শুধু আমলাতান্ত্রিক চর্চাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরামর্শক সাহায্য চায়। এই পরিকল্পনাটি প্রণয়নের পর ১৯৯৪ সালের জানুয়ারিতে একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা পরিচালিত হয়। এরপর পরিকল্পনার ধারণাটি পুলিশ বাহিনীতে শীর্ষ কর্মকর্তা থেকে সবচেয়ে নিচু পদ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে DMP-র পরিকল্পনাটি কয়েকজন সিনিয়র সচিবের কাছে পেশ কর হয়, যাতে এর বাস্তবায়নে তাদের সমর্থন পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনাটি অর্থের বিনিময়ে মূল্যকে সর্বোচ্চ করতে আগ্রহী, এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ করার ও ব্যয়কে নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের সংগে সম্পর্কিত করার প্রস্তাব রেখেছে। এখন প্রশ্ন শুধু একটি, এবং তা হল — এর উদ্ভাবনা, নমনীয়তা ও স্বাধিকারের অনুমতি সরকারী পদ্ধতি ও চর্চার মধ্যে দেয়া সম্ভব কি না।

- *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো* — বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ব্যবস্থাপনা সরকারের সার্বিক দাপ্তরিক প্রক্রিয়ার কাঠামোর ভিতরে থেকেই বিভাগের কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চালু করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, সচিব ও সাতজন ইউনিট ম্যানেজারের মধ্যে 'কর্ম চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছে।'একটি বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ইউনিট ম্যানেজাররা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে একটি সম্মত মানের সামগ্রী সরবরাহ দিতে রাজি হয়েছেন। অনড়ভাবাপন্ন সিভিল সার্ভেন্টদের সাথে চুক্তিভিত্তিক দায়-দায়িত্বের চর্চাটি না হলেও শুধু ধারণাটির পরিচয় করিয়ে দেয়াও অনেকখানি সামনে এগিয়ে যাওয়া। এরকম আরেকটি অভূতপূর্ব উদ্যোগ হচ্ছে পরিসংখ্যান বিভাগের নিয়ম মাফিক কাজের ডাটা-এন্ট্রির দিকটি বাইরের কাউকে চুক্তি-ভিত্তিক দিয়ে দেয়া। এখন বিভাগটি চিন্তা করছে পুরো কৃষি শুমারীর বিষয়টি প্রতিযোগিতামূলক দর-হাঁকার ভিত্তিতে করা যায় কি না। এরকম একটি বিষয় নিয়ে যে ভাবনা চিন্তা চলছে, এটিই অবাক করার মত।

- *সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প* — প্রকল্প সমন্বয় ইউনিট (PCU), যা দাতা-সহায়তা প্রাপ্ত সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা করে — তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে একটি উদ্ভাবনী উপায় নিয়ে চেষ্টা করে দেখছে। ইউনিটটি শুধু যে প্রকল্পের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অংশটি ১৬টি এনজিওকে চুক্তি-ভিত্তিক দিয়ে দিয়েছে, তা-ই নয়, এসব এনজিওর তত্ত্বাবধানও চুক্তি-ভিত্তিক একটি প্রাইভেট কোম্পানীর হাতে দিয়েছে, যার নাম ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স কনসালটেন্টস। কনসালটেন্ট এনজিও কার্যক্রম প্রত্যবেক্ষণ করে এবং মাসিক ভিত্তিকে PCUকে তার রিপোর্ট দেয়। এরা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনও প্রকাশ করে যা সরকারী তহবিল বরাদ্দের জন্য ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে যে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পে বহিঃস্থ তত্ত্বাবধান আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। তারা যে শুধু কর্মসূচির পরিমাণগত দিকের মূল্যায়ন ও তার উপর প্রতিবেদন দিবে, তা নয়, বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত দিকটিও তারা প্রত্যবেক্ষণ করবে।

- *জাতীয় রাজস্ব বোর্ড* — কিছুদিন আগে পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রপ্তানিমূলক শিল্পের আমদানী তত্ত্বাবধানে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল। কাচা মালের শুল্কমুক্ত আমদানীর জন্য ইউটিলাইজেশন পারমিট ব্যবস্থাপনাও প্রদান করা ছিল এর কাজ। তৈরি পোষাক শিল্পের উৎপাদনকারীরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে এই নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ ঝঞ্ঝাটপূর্ণ এবং ব্যয়বহুল; এবং বেশ কয়েক বছর ধরে তারা প্রক্রিয়াটি সমন্বিত করা বা এর দায়িত্ব তাদের নিজস্ব সমিতির কাছে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে আসেন। ১৯৯৪ এর মাঝামাঝি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঠিক ঠিকই এই দায়িত্ব বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এর কাছে হস্তান্তর করে — যা অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কাজকর্ম বেসরকারী খাতের হাতে হস্তান্তরের একটি সুস্থ নজির স্থাপন করে।

৮.৫ **সবশেষে, দাতারাও ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে**। তারা দুষ্প্রাপ্য সাহায্য সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তাদের জাতীয় সংসদের চাপের নিচে আছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে দেয়া তাদের সহায়তার প্রকৃতি ও আকৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। যদি অন্যান্য দেশ সাহায্যের উন্নততর ব্যবহার করতে আগ্রহী থাকে, তাহলে বাংলাদেশকে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের নিম্ন হারের জন্য উন্নয়নের গতি শুধু বাড়াতে নয়, তা বজায় রাখতে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার জন্য এবং বিশ্ব বাজারে মূলধন সংগ্রহের অসম্ভাব্যতার জন্য বাংলাদেশ দাতাদের কাছ থেকে বিশেষ ছাড়ের বিরল তহবিল পাওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী সমর্থন পাবে — তবে এ জন্য তার লোক-প্রশাসনের দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৮.৬ **এই প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রচার হলে তা দেশের ভিতরের সদ্যগঠিত শক্তিগুলোকে সচল করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে**, যাতে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু হয়ে যেতে পারে। এ প্রতিবেদনটি এ কাজটি করতে পারে সরকারী/বেসরকারী খাতে 'পরিবর্তনের প্রতিনিধি'দের এবং নীরব সংখ্যাগুরু নাগরিকদের এসব ধারণা শক্তিশালী করে যে, বর্তমান অবস্থাটি সমর্থনযোগ্য নয়; সেবা সরবরাহ উন্নত করা রাজনৈতিকভাবেও

যুক্তিযুক্ত; অনীহার ভাব শুধু উন্নাসিক স্বার্থপরতাকেই তুলে ধরে এবং ভাল অর্থনৈতিক প্রশাসনের জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন।

অভিজ্ঞতার শিক্ষা

৮.৭ শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল, উভয় শ্রেণীর দেশে সরকারী খাতের ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ইতিহাস বিফল প্রচেষ্টা, অসমাপ্ত বিষয়সূচি এবং কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত করতে ব্যর্থ কর্মসূচিতে পরিপূর্ণ। এ কাজের অন্তর্নিহিত দুরূহতা ছাড়াও, সাফল্যের অভাবের জন্য তিনটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়কে দায়ী করা যায়। **প্রথমত সংস্কার যারা বাস্তবায়ন করবেন, সেই আমলাদের সংকল্প অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল**। ক্রমাগত রাজনৈতিক সমর্থন নিশ্চয়তা করার কোনো ব্যর্থতা-রোধক পদ্ধতি হয়তো নেই, তবে এ ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানো সম্ভব। একটি অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক সংস্কার প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ঝুঁকি হ্রাস করা যায়, যেখানে এ বিষয়টি নিশ্চিত হবে যে, সংস্কার কার্যক্রমের বিস্তৃত উদ্দেশ্যাবলী সকল পক্ষই মেনে নিচ্ছে। বাস্তবে এতে প্রয়োজন হবে আইন প্রণেতা বা সাংসদগণ, বেসরকারী খাত, শিক্ষাবিদ, স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং এনজিওদের সমর্থনের সমাবেশ ঘটানো। এটি অর্জন করা সম্ভব কর্ম পরিকল্পনা, কর্মশালা ও সংবাদ মাধ্যমে আলোচনার মধ্য দিয়ে একদিকে সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করে এবং অন্যদিকে সংস্কার ও বাস্তবায়ন কৌশলগুলি চিহ্নিত করে। এর প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন, পেশাদারী দল ও কর্মচারী সমিতিগুলিকে জড়িত করা গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৮ **দ্বিতীয়ত, সরকার যখন একটি সামূহিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার বিষয়সূচি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে, তখন সরকারী খাতের সংস্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে**। এই প্রতিবেদনে সরকারী খাতের সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি 'ইক্রিমেন্টাল' বা পর্যায়বিশিষ্ট উপায় গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। প্রক্রিয়াটিকে উন্মুক্ত হতে হবে; বস্তুত এর সমর্থন আদায়ে জনসচেতনতা-প্রচারাভিযান হচ্ছে পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাস্তবে এর অর্থ হচ্ছে পর্যায়ক্রমে সংস্কার প্রবর্তন, এবং অগ্রবর্তী কর্মসূচিতে প্রথমে তাদের প্রয়োগ করা, কিন্তু একই সাথে এটি নিশ্চিত করা যে প্রয়াসসমূহ 'সংযুক্ত' এবং গুরুত্বপূর্ণ সূচনা-বিন্দুতে স্থির নিবদ্ধ। এতে এসবের সম্ভাব্য সুবিধাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংস্কারের পক্ষে সমর্থনই গড়ে উঠবে না, বরং যারা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থাপনা করবেন, তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু শিক্ষাও উপহার দিবে। এই প্রতিবেদনে অগ্রবর্তী কর্মসূচি নির্বাচনের মান-বৈশিষ্ট্য প্রস্তাব করা হয়েছে, এবং প্রারম্ভিক সংস্কারের জন্য কয়েকটি বিভাগ/সংস্থার নাম সুপারিশ করা হয়েছে (তৃতীয় খণ্ড - বাংলাদেশে সু-প্রশাসন ODA প্রতিবেদন, জানুয়ারি, ১৯৯৫)। নির্বাচনের প্রধান মান-বৈশিষ্ট্য যেসব বিষয়ে দৃষ্টি দিবে সেসব হল: (১) মৌলিক জনসেবা, যেখানে কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত অসংঘবদ্ধ এবং যথেষ্ট পরিমাপযোগ্য, যাতে কার্যসম্পাদনার যথাযথ প্রত্যবেক্ষণসহ ব্যবস্থাপনার স্বায়ত্বশাসনের সুযোগ থাকে; এবং (২) এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে দক্ষতা-লাভ শুধু আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি সুসমন্বিত করে সহজেই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব।

৮.৯ **এবং তৃতীয়ত, সরকারী খাতের সংস্কারসমূহ হোঁচট খেয়েছে কারণ সিভিল সার্ভেন্টরা এদের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনেনি এবং এদের যথাযথ সমর্থন দেননি, অথচ এই সিভিল সার্ভেন্টরাই সংস্কার বাস্তবায়ন করবেন, এবং তাদের উপরও একাধিক উপায়ে সংস্কারের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া পড়বে**। সকল আমলাতন্ত্রেরই পরিবর্তিত সময় ও নতুন কর্ম-উদ্দেশ্যের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। কেউ কেউ হয়তো এ কাজটি ভালভাবে করেন, কিন্তু বেশির ভাগ সিভিল সার্ভেন্ট বরং স্থিতাবস্থার প্রতি প্রবল আনুগত্য প্রকাশেই প্রলোভিত হন, এবং বিদ্যমান ক্ষমতা-বিন্যাসের প্রতি একটি সংরক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন, যা সাধারণত তাদের নিজেদেরসহ কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহলকে উপকৃত করে। তবে, সৌভাগ্যজনকভাবে, প্রতিটি আমলাতন্ত্রেই একদল 'প্রি-এম্পটিভ' বা আগে-ভাগেই ব্যবস্থা গ্রহণকারী আমলা থাকেন, যারা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আগে থেকেই উপলব্ধি করেন, এবং এ জন্য প্রস্তুত হন — অন্তত বিষয়টি নমনীয়তার সংগে মোকাবেলা করেন।

এসব "পরিবর্তনের প্রতিনিধি" সরকারী খাতের সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা জরাজীর্ণ, সেকেলে ও অদক্ষ পদ্ধতি ও চর্চার স্থানে প্রকৃত পরিবর্তন কামনা করেন। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এদের উদ্যম এবং প্রাণশক্তি ধরে রাখতে হলে তাদেরকে ব্যাপক স্বীকৃতি দিতে হবে। তা ছাড়া, সংস্কারের জন্য যারা স্বল্প-মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন (বিজিতরা) তাদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে — যাতে তারা সংস্কারের বিরোধিতা না করেন।

পরিবর্তনের প্রচার ও ব্যবস্থাপনা

৮.১০ সফল পরিবর্তন নিজ থেকে ঘটে না, একে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে পরিচালনা করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের — এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে একজন লড়াকুর — প্রয়োজন। ধারণা করা হয় যে, এই লড়াকু হবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে সরকারের সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশন ও দক্ষতা ইউনিট, উভয়কে পরিবর্তনের প্রধান প্রচারক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে দেখা হয়। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের কৌশল নিচের মূল উপাদাগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরি করা উচিত:

- পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা — অর্থাৎ সংস্কারের মুখ্য ফলভোগকারীদের মধ্যে এই সচেতনতা বৃদ্ধি করা যে, পরিবর্তন আবশ্যকীয় এবং অবশ্যম্ভাবী; এবং প্রত্যাশা যাতে বাস্তবসম্মত হয়, তা নিশ্চিত করা। সংস্কার যেন দ্রুত সাফল্যের ভ্রান্ত কোনো প্রত্যাশা সৃষ্টি না করে, সে সম্ভাবনা পরিহার করা। এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, সরকারী খাতের সংস্কার "কোনো ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া।"

- বিভিন্ন দলের জন্য সংস্কারের অর্থ কী হতে পারে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার একটি চিত্র দিয়ে, যেখানে প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ ও সুরক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রতিরোধ কমিয়ে এনে এবং ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা হ্রাস করে। সংস্কারকে বাজারজাত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আগের ক্রিয়া পদ্ধতি বা চর্চাগুলির ভুল-ত্রুটির সমালোচনা না করে বরং পরিবর্তনের গুণাবলীকে যেন তুলে ধরা হয়।

- নতুন পদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত ও কার্যকর করা — নতুন পদ্ধতিটি যাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, তাদের সক্রিয় সমর্থনে এ কাজটি করতে হবে।

- সংস্কারকে প্রাতিষ্ঠানিক করা — এর অর্থ হবে নতুন পদ্ধতি বা মডেলটিকে স্থিতিশীল করা, নতুন দক্ষতা-চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও পরিবর্তন-মূল্যবোধকে অন্তর্লীন করা।

৮.১১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য একটি বৈপ্লবিক সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হতে পারে, কারণ সংস্কারের ফলে নেতৃত্বের ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। একই ভাবে, সিভিল সার্ভেন্টদেরকে সংস্কারের সমর্থনে একত্রিত করার কাজটি সহজ নাও হতে পারে, কারণ এতে তাদের স্বেচ্ছাধীন কর্তৃত্ব, সুযোগ সুবিধা, এবং সর্বোপরি, উৎকোচ গ্রহণের সম্ভাবনা কমে যাবে। সব শেষে, এনজিওসমূহ ও বেসরকারী খাত কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলির মধ্য দিয়ে জনগণের সম্পদ প্রবাহিত করার অঙ্গীকার কায়েমি স্বার্থের মূলেই আঘাত করবে।

৮.১২ তবে, এসব "কায়েমি স্বার্থ" থেকে সম্ভাব্য প্রতিরোধ সত্ত্বেও সরকারের উচিত হবে দৃঢ়তার সাথে সংস্কার চালু করা। এর যৌক্তিকতা, আর কিছুতে না হলেও, রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিজস্ব "আলোকপ্রাপ্ত

এসব "পরিবর্তনের প্রতিনিধি" সরকারী খাতের সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা জরাজীর্ণ, সেকেলে ও অদক্ষ পদ্ধতি ও চর্চার স্থানে প্রকৃত পরিবর্তন কামনা করেন। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এদের উদ্যম এবং প্রাণশক্তি ধরে রাখতে হলে তাদেরকে ব্যাপক স্বীকৃতি দিতে হবে। তা ছাড়া, সংস্কারের জন্য যারা স্বল্প-মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন (বিজিতরা) তাদেরকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে — যাতে তারা সংস্কারের বিরোধিতা না করেন।

পরিবর্তনের প্রচার ও ব্যবস্থাপনা

৮.১০ সফল পরিবর্তন নিজ থেকে ঘটে না, একে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে পরিচালনা করতে হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের — এবং সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে একজন লড়াকুর — প্রয়োজন। ধারণা করা হয় যে, এই লড়াকু হবেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে সরকারের সংস্কারের জন্য জাতীয় কমিশন ও দক্ষতা ইউনিট, উভয়কে পরিবর্তনের প্রধান প্রচারক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে দেখা হয়। পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের কৌশল নিচের মূল উপাদাগুলিকে কেন্দ্র করে তৈরি করা উচিত:

- পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা — অর্থাৎ সংস্কারের মুখ্য ফলভোগকারীদের মধ্যে এই সচেতনতা বৃদ্ধি করা যে, পরিবর্তন আবশ্যকীয় এবং অবশ্যম্ভাবী; এবং প্রত্যাশা যাতে বাস্তবসম্মত হয়, তা নিশ্চিত করা। সংস্কার যেন দ্রুত সাফল্যের ভ্রান্ত কোনো প্রত্যাশা সৃষ্টি না করে, সে সম্ভাবনা পরিহার করা। এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, সরকারী খাতের সংস্কার "কোনো ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া।"

- বিভিন্ন দলের জন্য সংস্কারের অর্থ কী হতে পারে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার একটি চিত্র দিয়ে, যেখানে প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ ও সুরক্ষা-ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রতিরোধ কমিয়ে এনে এবং ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা হ্রাস করে। সংস্কারকে বাজারজাত করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আগের ক্রিয়া পদ্ধতি বা চর্চাগুলির ভুল-ত্রুটির সমালোচনা না করে বরং পরিবর্তনের গুণাবলীকে যেন তুলে ধরা হয়।

- নতুন পদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত ও কার্যকর করা — নতুন পদ্ধতিটি যাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, তাদের সক্রিয় সমর্থনে এ কাজটি করতে হবে।

- সংস্কারকে প্রাতিষ্ঠানিক করা — এর অর্থ হবে নতুন পদ্ধতি বা মডেলটিকে স্থিতিশীল করা, নতুন দক্ষতা-চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও পরিবর্তন-মূল্যবোধকে অন্তর্লীন করা।

৮.১১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য একটি বৈপ্লবিক সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হতে পারে, কারণ সংস্কারের ফলে নেতৃত্বের ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। একই ভাবে, সিভিল সার্ভেন্টদেরকে সংস্কারের সমর্থনে একত্রিত করার কাজটি সহজ নাও হতে পারে, কারণ এতে তাদের স্বেচ্ছাধীন কর্তৃত্ব, সুযোগ সুবিধা, এবং সর্বোপরি, উৎকোচ গ্রহণের সম্ভাবনা কমে যাবে। সব শেষে, এনজিওসমূহ ও বেসরকারী খাত কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিগুলির মধ্য দিয়ে জনগণের সম্পদ প্রবাহিত করার অঙ্গীকার কায়েমি স্বার্থের মূলেই আঘাত করবে।

৮.১২ তবে, এসব "কায়েমি স্বার্থ" থেকে সম্ভাব্য প্রতিরোধ সত্ত্বেও সরকারের উচিত হবে দৃঢ়তার সাথে সংস্কার চালু করা। এর যৌক্তিকতা, আর কিছুতে না হলেও, রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিজস্ব "আলোকপ্রাপ্ত

আত্মস্বার্থের" বিচারে যুক্তিযুক্ত, কারণ সংস্কারের ফলে সরকারের জন্যই বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তি জুটে যাবে। পূর্ব এশীয় ও অন্যান্য দ্রুত বৃদ্ধিমান দেশের অভিজ্ঞতা খুব ভালভাবেই দেখিয়েছে যে, একটি দক্ষ সরকারী খাত হচ্ছে দারিদ্র বিমোচনের একটি উপায় হিসেবে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চাবিকাঠি। বাংলাদেশেও এই পথটি অনুসরণ করা রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ : এতে জনগণের বিশাল সমর্থন মিলবে, এবং ভোট ব্যাঙ্কের উন্নতি ঘটবে — যদি সরকার আন্তরিকভাবে সরকারী খাতের অদক্ষতা, জনসেবাসমূহের নিম্নমান অথবা অনুপস্থিতি, সরকারী কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা এবং জবাবদিহিতার অভাব, এবং সর্বব্যাপী দুর্নীতির উপর সকল দিক থেকে আক্রমন পরিচালনা করেন। সাধারণ মানুষজন এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। যেসব দেশ নিজের ঘর গুছাতেই ব্যর্থ হচ্ছে তাদেরকে সাহায্য অব্যাহত রাখা দাতা সম্প্রদায় খুব সহজে যুক্তিযুক্ত করতে পারছে না। সর্বোপরি, সরকারের ভিতরেই মিত্ররা রয়েছে — দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি মূল দল ও "পরিবর্তনের প্রতিনিধি" যারা প্রস্তাবিত কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত করবে।

৮.১৩ সংস্কারধর্মী সফল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে নিয়ে একটি বাস্তবায়ন বিষয়সূচি নির্বাহী সারসংক্ষেপে দেয়া হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দী — বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খাতের চেহারা

৮.১৪ একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশকালে বাংলাদেশ হবে একটি ভিন্ন দেশ। এটি কোনো পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়। একটি দ্রুত বর্ধমান ও অনেক বেশি সোচ্চার ভোটার গোষ্ঠির থেকে আসা অভ্যন্তরীণ চাপ এবং অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বহিঃস্থ চাপ মিলে নতুন নতুন সম্ভাবনা ও দাবীর জন্ম দেবে। বর্তমানে সরকারী খাতটি যেভাবে সংগঠিত, তা এই চাপ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না, যদি না তা আগামী শতাব্দীতে পা রাখার জন্য যোগ্য প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী তৈরি করে।

৮.১৫ যে জনসেবা বা পাবলিক সার্ভিস নাগরিকদের চাহিদার প্রতি নজর দেয়, ভবিষ্যত বাংলাদেশে সেরকম একটি জনসেবার রূপকাঠামো কল্পনা করা সহজই বটে। প্রশাসন অবশ্যই নির্ভর করবে একটি স্থিতিশীল গণতন্ত্র এবং যথাযথভাবে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর — যে সরকার একদম ভিন্ন ভাবে তার দায়-দায়িত্ব পালন করবে। এটি নিশ্চয়ই কোনো পূর্ব নির্ধারিত নীলনক্সা অনুসরণ করবে না — যেহেতু এটি এমন এক যুগে প্রবেশ করবে, যেখানে একমাত্র নিশ্চয়তা হবে ক্রমাগত পরিবর্তন। তবে এই প্রতিবেদনে এই পরিবর্তনের কিছু সাধারণ গন্তব্যের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী হয়তো করা যাবে।

৮.১৬ প্রথমত, সরকার হবে **ক্ষুদ্রতর কিন্তু অনেক বেশি কার্যকর, মনোযোগী এবং জবাবদিহিমূলক**। একটি সফল প্রশাসন বর্তমানের অনেক কর্মকাণ্ড পুনর্বণ্টন করে দেবে, যাতে অন্যরা সেগুলো অনেক বেশি দক্ষতার সাথে ও কার্যকরভাবে করতে পারে। এর অর্থ হবে স্থানীয় সরকারের কাছে অনেকটা কাজ ছেড়ে দেয়া, এবং অন্য অনেকগুলো কাজ এনজিও বা বেসরকারী ফার্মের কাছে চুক্তিভিত্তিক দিয়ে দেয়া। সরকার বেশ কয়েক ধরণের সেবার, যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য খরচ যোগান দিতে থাকবে, কিন্তু এগুলোর দায়-দায়িত্ব এমন সব প্রতিষ্ঠানকে ছেড়ে দেবে, সেগুলো এসব সেবা দিতে সবচেয়ে বেশি সমর্থ্য। এবং নাগরিকরা যাতে অর্থের বিনিময়ে মূল্য পায়, সেজন্য সরকার নিরন্তর এসব কর্মকাণ্ডের ফলাফল প্রত্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

৮.১৭ অন্যান্য আরো অনেক ক্ষেত্রে সরকার এখন যেসব কাজ করছে, সেসব কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবে — হয়তো এ কারণে যে ঐসব কাজের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, অথবা সেগুলো বেসরকারী

খাত আরো ভালভাবে অর্থায়ন ও সরবরাহ করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার অনেকগুলি রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেবে অথবা বন্ধ করে দেবে।

৮.১৮ এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারটি মেদহীন এবং অনেক বেশি সমর্থ্য হয়ে দাঁড়াবে, এবং সেসব কাজে তা মনোনিবেশ করতে পারবে যেগুলো শুধু সরকারের পক্ষেই সবচেয়ে ভালভাবে করা সম্ভব। সরকার যদিও একটি অত্যন্ত সক্রিয় উন্নয়ন ভূমিকা পালন করে যাবে, এ ভূমিকাটি সরকার মূলত একজন সহায়ক, তত্ত্বাবধায়ক ও ঠিকাদার হিসেবেই পালন করবে। সরকার প্রকল্পসমূহের জন্য থোক অনুদান/মঞ্জুরী প্রদান করবে এবং এগুলোর ন্যায়পরতা ও কার্যকারিতা প্রত্যবেক্ষণ করবে।

৮.১৯ বেসরকারী খাতটি সামান্য রাস্তার ফেরিওয়ালা থেকে নিয়ে সর্ববৃহৎ কর্পোরেশন পর্যন্ত যে বিস্তৃত অঞ্চলে সক্রিয় হবে, বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নতি লাভ করবে, সে অঞ্চলটি পরিষ্কার করা নতুন প্রশাসন কাজে নামবে। এ সরকার প্রবিধান/নিয়ন্ত্রণের ঝোঁপঝাড় কেটে ফেলবে — শুধু যেগুলো জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায়নীতিভিত্তিক এবং সৃজনশীল ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড প্রসারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, সেগুলো যথাস্থানে থাকবে। এবং এ সরকার বিচার ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করবে যাতে ব্যক্তি ও কর্পোরেট আচরণ উভয়কেই জবাবদিহি করতে হয়, এবং দ্রুততা ও সততার সাথে বিচার নিশ্চিত হয়।

৮.২০ তবে সর্বোপরি, বাংলাদেশের আগামী প্রশাসন মানুষের সাথে একটি নতুন সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে। গোপনস্বভাবী এবং স্বার্থপর আমলাতন্ত্রের দিনগুলি তখন এক অস্বস্তিকর স্মৃতি হয়েই থাকবে। সংস্কারকৃত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জনগণ তাদের সরকারের সাথে অবাধ ও উন্মুক্ত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। তারা এর পরিকল্পনায় অংশ নিতে পারবে, এর কার্যকারিতা পরিমাপ করতে পারবে, এবং এর ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারবে। সরকারী কর্মীদের তাদের দক্ষতা, তাদের কার্যসম্পাদনা এবং সাধারণ নাগরিকদের সাহায্য করার আগ্রহের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হবে ও বেতন দেয়া হবে। এ সরকার আমলাতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে মান ও সেবার একটি সংস্কৃতির দিকে, নিয়ন্ত্রণ থেকে ফলাফলের দিকে বেশি গুরুত্ব দিবে; নৌকার সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ না করে শুধু হাল ধরে অন্যদের হাতে বৈঠা ছেড়ে দিবে; এমন একটি অবস্থা যেখানে সরকার চাকুরির নিশ্চয়তা দেয়, তা থেকে যেখানে গ্রাহক চাকুরির নিশ্চয়তা দেয় তেমন একটি অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে; এ সরকার হবে এমন একটি সরকার যা শুধু নিয়ম নির্ধারণ না করে উদাহরণ সৃষ্টি করবে ও দূরদৃষ্টির যোগান দিবে; শুধু তার সিভিল সার্ভেন্টদের খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা না করে সিভিল সার্ভেন্টদের ভাল হতে উৎসাহিত করবে; শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড রোধ করে, সেরকম একটি পদ্ধতি থেকে এ সরকার আমাদের এমন একটি পদ্ধতি উপহার দিবে, যা কাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড লালন-পালন করে। সর্বোপরি এটি হবে এমন একটি সরকার যা অনেক বেশি দক্ষ অথচ কম ব্যয়বহুল।

বাংলাদেশ
একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা: সরকারী খাতের সংস্কার
সরকারের কাঠামো

১. ১৯৯১ সালে একটি সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি সংসদীয় সরকার পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, এবং রাষ্ট্র-প্রধান হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। দেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীই প্রয়োগ করেন, যিনি মন্ত্রীসভারও প্রধান। মন্ত্রীসভাটি আবার সমষ্টিগতভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ। এ কারণে এককক্ষ বিশিষ্ট্য সংসদটি চূড়ান্ত আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ, এবং একই সাথে জনগণের কাছে জবাবদিহিতার সর্বশ্রেষ্ট আধার। সরকারী সংগঠনটিকে একটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক পদ্ধতি/হিসেবে ভাবা যায়। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের (যাকে সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের একত্র সংমিশ্রণস্থল হিসেবে দেখা হয়) দায়িত্ব হচ্ছে নীতি ও ক্লিয়ারিং হাউসের (বা কার্যসম্পাদনা গৃহের) কার্যক্রম যোগান দেয়া। সাধারণ প্রশাসন (আইন ও শৃঙ্খলা, ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব সংগ্রহ), জনসেবা সরবরাহ, এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন হয় বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের মন্ত্রণালয়/দপ্তরগুলির পক্ষে। তা ছাড়া, পুরোমাত্রার স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষও বিদ্যমান, যেমন— শহরগুলিতে পৌর কর্পোরেশন, জেলা কাউন্সিল, থানা কমিটি ও ইউনিয়ন কাউন্সিল। তাদের কিছু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি রয়েছে, এবং তারা সীমিত কিন্তু বহুমুখী প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। নিচের সারণীতে প্রতিটি পর্যায়ে প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের সংখ্যা, তাদের গড় জনসংখ্যা এবং তাদের আওতার মোটামুটি এলাকা দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ইউনিটসমূহ

পর্যায়	সংখ্যা	গড় জনসংখ্যা	গড় এলাকা (কিলোমিটারে)
বিভাগ	৫	২ কোটি ৪০ লক্ষ	২৯৫১৪
জেলা	৬৪	১৯ লক্ষ	২৩০৫.৭৮
থানা	৪৮৯	২ লক্ষ ৪৫ হাজার	৩০২

২. সরকারের কর্মকাণ্ড নিম্নলিখিত সাংগঠনিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয় :

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ — সরকারের শীর্ষ চূড়াটি গঠন করে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ, যেগুলো নীতি প্রণয়ন এবং কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রত্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত। মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক প্রধান একজন মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হলেও এর প্রশাসনিক প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হচ্ছেন সচিব (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সচিব)। একটি মন্ত্রণালয় একটি বা একাধিক বিভাগ নিয়ে গঠিত হতে পারে। সরকারের ক্রমপরিবর্তনশীল চেহারার জন্য এবং মন্ত্রণালয়গত কর্মপরিধির পুনর্বিন্যাস ও কর্মকাণ্ডের হাত বদলের জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন — তবে তাদের অন্তত তিনটি শ্রেণীতে অনানুষ্ঠানিকভাবে

ভাগ করা যায়: *অর্থনৈতিক* — যাতে আছে অর্থ, পরিকল্পনা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; *উন্নয়ন* — যেখানে আছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও সড়ক যোগাযোগ মন্ত্রণালয়; এবং *সেবা-মুখী বা কল্যাণ* — যেখানে আছে ত্রাণ, সমাজ কল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়। যখন মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড সাংগঠনিক সীমানা ছাড়িয়ে যায়, এবং সিদ্ধান্ত ঋদ্ধ করার জন্য পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তখন সর্বোচ্চ সমন্বয়কারী সংঘ হচ্ছে মন্ত্রীসভা এবং এর কমিটিসমূহ। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় আমলাতান্ত্রিক পর্যায়েও ঘটে থাকে।

১. *দপ্তর (ডিপার্টমেন্ট) ও অধিদপ্তর (ডাইরেক্টরেট)* — সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজটি মূলত দপ্তর ও অধিদপ্তরগুলির দায়িত্ব। বর্তমানে ১৭৮টি দপ্তর রয়েছে। এগুলো শুধু আকৃতি নয়, মর্যাদা ও চরিত্র অনুযায়ীও ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোনো কোনো অধিদপ্তর শুধু সার্ভিস প্রদান করে থাকে — এগুলো হয় কোনো জনসেবা (যেমন – মটর ভেহিকল্ অধিদপ্তর) দিয়ে থাকে, অথবা কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে (যেমন – বস্ত্র অধিদপ্তর)। এদের অনেকগুলির জনগণের সঙ্গে প্রচুর লেনদেন হয়, যেমন – শুল্ক ও আয়কর দপ্তর এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা যেমন, মাধ্যমিক শিক্ষা মহাপরিচালক এবং স্বাস্থ্য সেবা মহাপরিচালক।

২. *স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশন* — এগুলো রাষ্ট্রপতির বিশেষ অর্ডার, অর্ডিন্যান্স বা এ্যাক্টের অধীন সংবিধিবদ্ধভাবে স্থাপন করা হয়। এভাবে সৃষ্ট সরকারী খাতের প্রতিষ্ঠান অনেক ধরনের সামগ্রী ও সেবা সরবরাহ করে। এর কয়েকটি, যেমন বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত (এ ধরনের ১৫৩টি এসওই রয়েছে)। কর্পোরেশনগুলির কর্মচারীদের মধ্যে আছে প্রশাসনিক, পরিচালনা সংক্রান্ত ও বিপণন কর্মী ও শ্রমিক। প্রথমোক্ত শ্রেণী হচ্ছে সিভিল সার্ভেন্ট, এবং শ্রমিকরা নিয়ন্ত্রিত হয় নানা ধরনের শ্রম আইনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ
একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা: সরকারী খাতের সংস্কার
দাতা-সহায়তা প্রাপ্ত লোক প্রশাসন সংস্কার সমীক্ষা

১. গত তিন বছরে দাতারা সরকারী খাত ব্যবস্থাপনা সংস্কারের ওপর তিনটি প্রধান সমীক্ষা হাতে নিয়েছে।

২. *১৯৮৯ সালের ইউএসএইড লোকপ্রশাসন দক্ষতা সমীক্ষা (PAES)* — এই সমীক্ষায় চারটি মূল ক্ষেত্রে প্রস্তাব রাখা হয়েছে (ক) সচিবালয় পদ্ধতি ও কর্মপ্রক্রিয়া; (খ) মন্ত্রণালয়-দপ্তর সম্পর্ক; (গ) মন্ত্রণালয় - কর্পোরেশন সম্পর্ক; এবং (ঘ) প্রকল্প আবর্ত নীতি ও পদ্ধতিসমূহ। সমীক্ষাতে ডিলিগেশন বা দায়িত্ব হস্তান্তর ও জবাবদিহিতা, এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর সারগর্ভ প্রস্তাবনা রয়েছে, এবং অফিসের কাজকর্ম উন্নত করা নিয়ে বিরাট সংখ্যক সুপারিশ রাখা হয়েছে। PAES সমীক্ষার বাস্তবায়ন খণ্ড খণ্ড ভাবে ধীরে সুস্থে এগুচ্ছে — বাংলাদেশ সরকার এ সমীক্ষার 'কম বিতর্কিত' কিছু অংশ গ্রহণ করেছে।

৩. *১৯৯৩ সালের ইউএনডিপি লোকপ্রশাসন খাত সমীক্ষা (PASS)* — এই সমীক্ষার সূত্রপাত হয় সরকারী খাতের কার্যসম্পাদনায় অবনতির ফলে উদ্ভূত ব্যাপক উদ্বেগ থেকে এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার নীতিসমূহ যে মানা হচ্ছে না, অনুধাবন থেকে। এই সমীক্ষার সুপারিশসমূহ দু'টি শ্রেণীতে প্রদান করা হয় — সংহতকরণের জন্য, এবং সংস্কার সাধনের জন্য। শেষোক্ত সুপারিশসমূহের লক্ষ্য একটি অনেক বেশি সংবেদনশীল, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক পদ্ধতি গড়ে তোলা।

৪. *১৯৯৩ সালের চার সচিবের প্রতিবেদন (FSR)* — এই প্রতিবেদনটি ODA কর্তৃক আয়োজিত "দক্ষ প্রশাসন" কাজের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য সফরের ওপর ভিত্তি করে রচিত। FSR এ আছে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ, যাদের উদ্দেশ্য হল: মেধা-ভিত্তিক নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়গুলিকে বিবেচনায় এনে বেসমারিক প্রশাসনের কর্মকাণ্ড উন্নত করা, কার্যসম্পাদনার মান বৃদ্ধির জন্য উদ্দীপকের ব্যবস্থা করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, জবাদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো, হিসাব-নিরীক্ষণ অফিস শক্তিশালী করা এবং ন্যায়পালের পদটি চালু করা; এবং সবশেষে, উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ জোরদার করা। *বাংলাদেশে আরো উন্নত সরকারের লক্ষ্যে* শিরোনামের এই প্রতিবেদনটি সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে, এবং বর্তমানে এটি অলি আহমদ কমিটির পর্যালোচনাধীন রয়েছে (ঘর ১.৪)।

বাংলাদেশ
একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা: সরকারী খাতের সংস্কার
সংস্থা পদ্ধতি (এজেন্সি এ্যাপ্রোচ)

১. সংস্থা পদ্ধতির কয়েকটি সরাসরি লাভ রয়েছে:

- এতে মন্ত্রী ও সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকা সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণিত করা হয়।
- সুনির্দিষ্ট মান ও লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমে যে কাজটি করতে হবে তার উপর, এবং প্রয়োজনীয় ফলাফলের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়।
- এর ফলে অনেক বেশি ব্যবসা বা কর্মী-সুলভ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হয়, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও এ্যাক্রুয়াল (accrual) হিসাবরক্ষণের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়।
- সেবার মান, প্রতিবেদন ও হিসাবসমূহ প্রকাশিত হওয়ার জন্য এতে অনেক বেশি উন্মুক্ততা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়।

২. সংস্থা পদ্ধতি সরকারের কাজকর্মকে একটি আধুনিক, দক্ষ ও ফলাফল-মুখী ব্যবস্থাপনা ভিত্তিতে স্থাপন করার একটি প্রায়োগিক ও নমনীয় কৌশল উপহার দেয়। এটি প্রতিটি সংগঠনকে তার সম্পাদিত কাজের সংগে সঙ্গতি রেখে একটি নির্দিষ্ট গতিতে ও উপায়ে অগ্রসর হবার সুযোগ দেয়। এতে কর্মীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাও পাওয়া যায়। সংস্থাগুলোর একটি শক্তিশালী আত্মপরিচয় বোধ রয়েছে, এবং প্রধান নির্বাহী তার কর্মীদের মধ্যে একটি বৃহত্তর গর্ববোধ ও অঙ্গীকার গড়ে তুলতে পারেন। 'সম্মুখ সারির' কর্মীরা তাদের মূল বিভাগের কর্মীদের থেকে গ্রাহকের/ভোক্তার অনেক কাছাকাছি থাকেন, এবং অনেকসময় সেবা উন্নত করার জন্য তাদের সুপারিশও থাকে। একটি সংস্থায় এই ধারণাগুলি বারবার 'প্রধান কার্যালয়ে'র বিবেচনার জন্য না পাঠিয়েও গ্রহণ করা যায়। গ্রাহক সেবার একটি প্রকৃত অনুধাবনও সংস্থা উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় অফিসগুলির খোলার সময়টি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা যায়; এবং কর্ম-বিন্যাস এমনভাবে পরিকল্পনা করা যায় যাতে গ্রাহকরা পরিচিত কর্মীদের সঙ্গে লেনদেন করতে পারেন। গ্রাহক ও কর্মী উভয়ের সন্তুষ্টিমত পরিবেশ তৈরির জন্য স্থানীয় অফিসগুলি সাজানো এবং সেগুলোতে সুযোগ-সুবিধা সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৩. সংস্থা চালু করার আগে এর কর্মকাণ্ডের একটি মৌলিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। যদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, একটি কর্মকাণ্ড বজায় রাখার পক্ষে যুক্তি রয়েছে, এবং এটি যদি সরকারের ভিতরে সরকারী কোনো কর্মকর্তাকে গ্রহণ করতে হয়, তখন ঠিক কোন কাজগুলি করতে হবে, তা নির্ধারণ করতে আরেকটি পর্যালোচনার প্রয়োজন পড়ে। এর জন্য হয়তো নতুন আর্থিক ও কর্মীগত এমন কোনো আবশ্যকতা দেখা দিতে পারে, যা বেসমারিক প্রশাসনের সাধারণ চর্চা থেকে অনেক বেশি পৃথক। যেসব কর্মী ব্যয় ও মান সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবেন, তাদের জন্য ব্যক্তিগত বা দলগত উদ্দীপক ব্যবস্থা, যেমন বোনাসের সুযোগ রাখতে হবে। তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, প্রধান নির্বাহীকে পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হবে, যাতে তিনি মন্ত্রী বা তার কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তার দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করতে

পারবেন। সংস্থা তার দক্ষতার মাধ্যমে অর্জিত লাভের একটি অংশ যাতে রেখে দিতে পারে, তার অনুমতি সংস্থাটিকে দিতে হবে। এই অর্থ সংস্থাটি ব্যবসায়ে পুনর্বিনিয়োগ করবে।

৪. তবে জনগণের অর্থ ও জনসেবা যেখানে জড়িত, সংস্থা সেখানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না। মন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত নীতির জন্য ও তাদের নামে পরিচালিত কর্মকাণ্ডের জন্য দায়িত্বশীল থাকেন। কাজেই সংস্থার জন্য একটি রূপরেখা-দলিল প্রণয়ন প্রয়োজন, যা সংস্থার কর্মকাণ্ডের একটি সীমা চিহ্নিত করে দেয়। এই রূপরেখাটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা প্রধান (প্রধান নির্বাহী) এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হবে। সার্বিক উদ্দেশ্যাবলী ও ক্ষমতা বা ম্যান্ডেট নির্দিষ্ট হয়ে গেলে প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির দেয়া প্রস্তাবনা থেকে শুরু হবে। আদর্শিকভাবে, রূপরেখা দলিলের আওতায় থাকবে :

- সংস্থার প্রধান দায়িত্ব বা কর্ম উদ্দেশ্য
- এর মূল কাজ ও উদ্দেশ্যাবলী (ঘর ৪.৬ এবং ৫.১ হচ্ছে দুটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ)
- এর জনসেবার মান
- প্রধান কর্তাব্যক্তিদের ভূমিকা : মন্ত্রী, মন্ত্রণালয় এবং প্রধান নির্বাহী
- যে কার্যসম্পাদনার নিরিখে ফলাফল বিচার করা হবে
- প্রধান নির্বাহীর আর্থিক ও কর্মী সংক্রান্ত স্বাধীনতা ও নমনীয়তা
- সংস্থার হিসবারক্ষণ ও রিপোর্টিংয়ের পদ্ধতিসমূহ।

৫. সংস্থাটির কাজ শুরু হলে রূপরেখা-দলিলটি প্রকাশিত হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট সকলেরই — মন্ত্রী, মন্ত্রণালয়, সংস্থার কর্মী, জাতীয় সংসদ ও জনগণ — সংস্থা কিভাবে কাজ করবে, সে সম্পর্কে একটি অভিন্ন উপলব্ধি থাকবে। রূপরেখা-দলিল হচ্ছে একটি প্রতিনিধিত্বকারী চুক্তি যা উভয় পক্ষকেই — মন্ত্রী ও সংস্থাকে — দায়বদ্ধ করে। যদি অবস্থার পরিবর্তন হয়, রূপরেখা দলিলও পরিবর্তন করা যাবে; তবে যে কোনো ক্ষেত্রেই যাতে বাস্তবের প্রতিফলন ঘটে সেজন্য কয়েক বছর পর পর এগুলো পর্যালোচনা করা হবে।

বাংলাদেশ
একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা: সরকারী খাতের সংস্কার
বাজেট পঞ্জিকা ও প্রক্রিয়া

সারণী ১ : বাজেট পঞ্জিকা — রাজস্ব

তারিখ	রাজস্ব বাজেট কর্মকাণ্ড
৩১ আগষ্ট	পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য বাজেট ফর্ম ছাপানো ও বিতরণ (এস্টিমেটিং অফিসার্স ফর্ম ও কন্ট্রোলিং অফিসার ফর্ম সমূহ)।
৩০ সেপ্টেম্বর	বাজেট ফর্ম প্রস্তুতকরণ, ছাপানো ও CGA 'র কাছে সরবরাহ (CGA এর ফর্ম)।
১০ অক্টোবর	এস্টিমেটিং অফিসারগণ কর্তৃক প্রাক্কলন দাখিল।
৩১ অক্টোবর	CAO থেকে ৩ মাস প্রকৃত (actual) সহ প্রাক্কলন অর্থ মন্ত্রণালয় ও CGA এর অফিসে গ্রহণ।
২৫ নভেম্বর	CGA এর অফিস থেকে ৩ মাস প্রকৃত সহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে কনসলিডেটেড প্রাক্কলন গ্রহণ।
২০ জানুয়ারি	অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট প্রাক্কলন পরীক্ষা সমাপন।
২২ জানুয়ারি	অর্থ মন্ত্রণালয়ে নতুন ব্যয় তফসিল গ্রহণ।
১৫ ফেব্রুয়ারি	CGA এর অফিস থেকে ৬ মাসের প্রকৃত গ্রহণ।
১৫ ফেব্রুয়ারি	অর্থ মন্ত্রণালয়ে খাত (লাইন) মন্ত্রণালয়গুলির সঙ্গে বাজেট সভা শুরু।
২৮ ফেব্রুয়ারি	অর্থ মন্ত্রণালয়ে ৬ মাসের প্রকৃত ভিত্তিক প্রাক্কলনের পর্যালোচনা সমাপন।
১ মার্চ	বাজেট ও নতুন ব্যয়ের তফসিলের ১ম সংস্করণ প্রস্তুত ও মুদ্রণকারীদের কাছে পাঠানো।
১০ মার্চ	মুদ্রণকারীদের থেকে বাজেটের ১ম সংস্করণ ফেরত পাওয়া ও মন্ত্রণালয়-গুলিতে পাঠানো।
২৮ মার্চ	খাত (লাইন) মন্ত্রণালয়গুলির সাথে প্রাক্কলন আলোচনা সমাপন।
৭ এপ্রিল	বাজেট প্রাক্কলন মন্ত্রী সভায় উপস্থাপন।
মে	বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুতি ও ছাপানো, জমা ও খরচের বিশদ বিবরণ, সম্পূরক প্রাক্কলন, অর্থ মন্ত্রীর বক্তৃতা এবং এক নজরে বাজেট।
মে	সংসদে সম্পূরক প্রাক্কলন উপস্থাপন।
জুনের ১ম সপ্তাহ	সংসদে বাজেট প্রাক্কলন উপস্থাপন।
জুনের ১ম সপ্তাহ	সম্পূরক প্রাক্কলন সত্যায়ন।
১ জুলাই	বাজেট প্রাক্কলন সত্যায়ন।

সারণী ২: বাজেট পঞ্জিকা — উন্নয়ন

তারিখ	সাহায্য স্মারক	প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন	সম্পদ প্রক্ষেপণ	তিন বছরের প্রবাহমান বিনিয়োগ কর্মসূচি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	উন্নয়ন বাজেট
জুলাই/ আগস্ট		চলমান প্রক্রিয়া		TYRIP'তে অন্তর্ভূক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অনুরোধ		
সেপ্টেম্বর		মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সেলের কাছে (অধিদপ্তরগুলির পেশ) করা নুতন প্রকল্প				
অক্টোবর			TYRIP এর জন্য করা প্রক্ষেপণ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য করা প্রক্ষেপণ	প্রোগামিং কমিটির মাধ্যমে করা ক্রমাগত প্রকল্প প্রবাহ		
নভেম্বর	বহিঃসম্পদ বিভাগ কর্তৃক রূপরেখা প্রণয়ন পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুরোধকৃত খাত (লাইন) মন্ত্রণালয়ের নিবেদন	পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগের কাছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সেল কর্তৃক প্রকল্প কনসেপট পেপার পেশ সেক্টর বিভাগ প্রকল্প কনসেপট পেপার ECNECকে পেশ করা	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা বিভাগ থেকে বাজেট শাখা কর্তৃক অনুরোধকৃত কর রাজস্ব প্রক্ষেপণ	নির্দেশক সম্পদ খুঁটিনাটি ব্যবহার করে TYRIP সম্পূর্ণকরণ		
ডিসেম্বর		ECNEC অনুমোদন মঞ্জুর		ছাপানো	সংশোধিত বাজেটের জন্য প্রাক্কলনের অনুরোধ	

তারিখ	সাহায্য স্মারক	প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদন	সম্পদ প্রক্ষেপণ	তিন বছরের প্রবাহমান বিনিয়োগ কর্মসূচি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	উন্নয়ন বাজেট
জানুয়ারি	সেক্টর মন্ত্রণালয় সমূহের নিবেদন গৃহীত GED কর্তৃক মন্ত্রীসভার কাছে খসড়া পেশ	সেক্টর মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিস্তারিত প্রকল্প প্রফর্মা তৈরি			সেক্টর মন্ত্রণালয়-গুলি থেকে সংশোধিত প্রাক্কলন গৃহীত	
ফেব্রুয়ারী	মন্ত্রী সভার অনুমোদন	সেক্টর মন্ত্রীর অনুমোদন চাওয়া			সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সমাপ্ত	
মার্চ					সেক্টর মন্ত্রণালয়-গুলি কর্তৃক প্রাক্কলন পেশ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাররূপান্তর শুরু
এপ্রিল					সেক্টর বিভাগ নিরীক্ষা ও মন্ত্রণালয় সভা প্রোগ্রামিং কমিটি সভা	
মে			চূড়ান্ত সম্পদ প্রাক্কলন		বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকৃত এবং ECNEC এর কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি উন্নয়ন বাজেটে রূপান্তরিত

80314

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

CONFINED